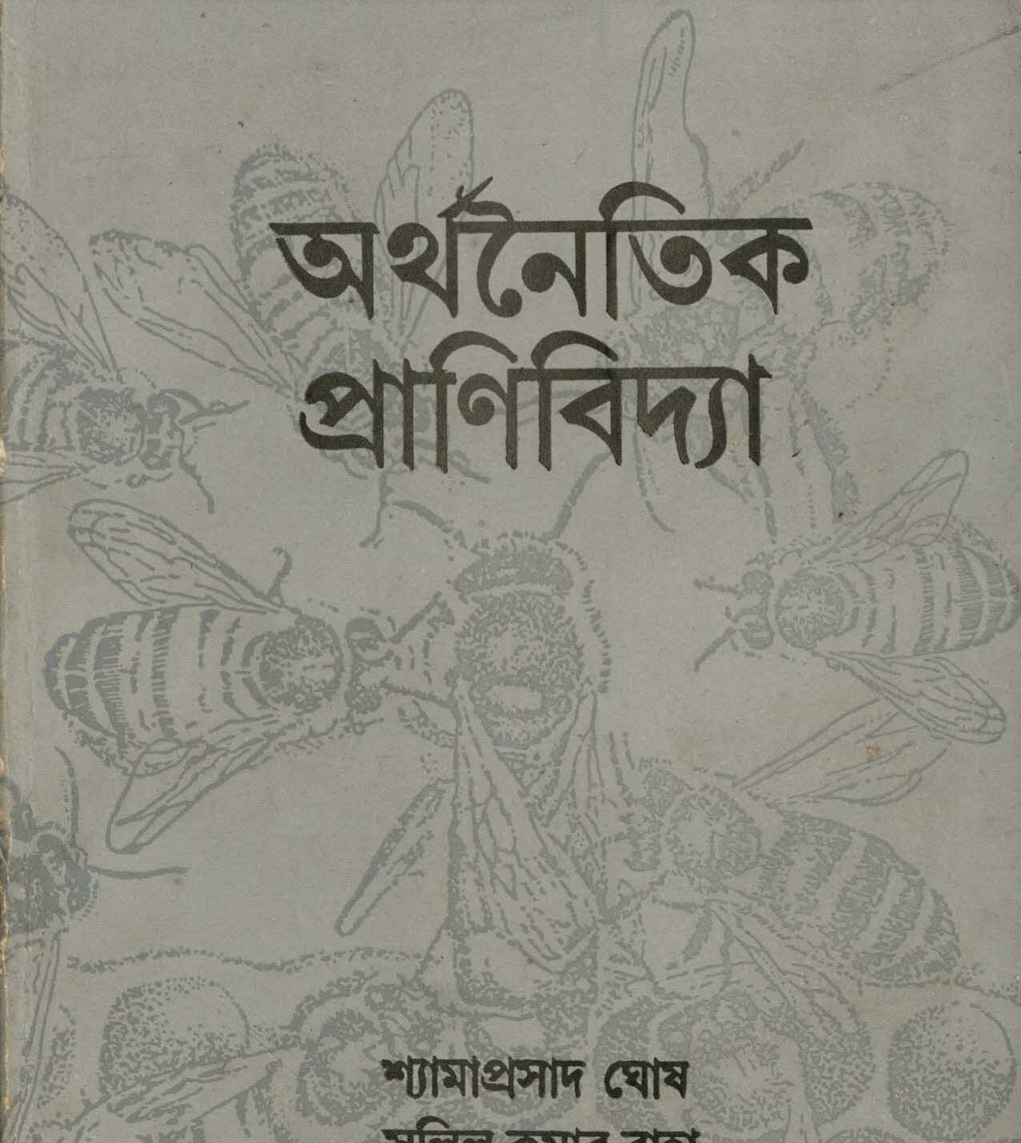


অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যা

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ
সলিল কুমার রাহা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

উৎসর্গ

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পিতামাতার উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক গুহামানব যেদিন ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য বন্যপ্রাণীদের শিকার ও পরে দুধ ও মাংসের জন্য তাদের পালন করতে শুরু করে, সেদিন থেকেই অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যার সূচনা হয়। সে আজ প্রায় 30 হাজার বছরের ইতিহাস। ক্রমে যাবাবর শিকারী থেকে মানুষ কৃষিযুগে প্রবেশ করে। এই উত্তরণেও তার সাথী হয় অতি বিশ্বস্ত দুটি প্রাণী—গরু ও মহিষ। খাদ্য-সংগ্রহকারী থেকে মানুষ হল খাদ্য উৎপাদনকারী। নব্যপ্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ ও লৌহযুগের ধারা বেয়ে আজ সভ্য মানুষের উত্তরণে যাদের সবচেয়ে বেশী দান, সেই প্রাণীদের সম্বন্ধে আলোচনা অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যার এক বিশেষ উদ্দেশ্য।

অসংখ্য প্রাণীদের মধ্যে মানুষের প্রভূত উপকারসাধনকারী প্রাণীরা যেমন গুরুত্ব পায়, আবার যারা মানুষের অশেষ ক্ষতিসাধন করে তারাও কোন প্রকারে উপেক্ষণীয় নয়। প্রাণিবিজ্ঞানের যে শাখায় যেসব প্রাণী বা প্রাণীজ দ্রব্যাদির উৎপাদনে নানা রকম কুটিরশিল্প বা মাঝারী শিল্প গড়ে ওঠে, যাতে বহুলোকের জীবিকার সংস্থান হয়, সেই সকল প্রাণীর বা প্রাণীজ শিল্পের ব্যবসায়িক মূল্যায়ন এবং যেসব প্রাণী মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে অর্থনৈতিক উপকার বা অপকার করে তাদের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়, তাকে অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যা বা Economic Zoology বলে।

প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শনগুলিতে, পঠিত বা অপঠিত লিপিমালায়, শিলালিপিতে, গুহাগাত্রে এবং সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির বিভিন্ন শ্লোকে মানুষের পরম উপকারী প্রাণীদের কথা আপন গৌরবে ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

গোপালনই সম্ভবতঃ অর্থকরী প্রাণিবিদ্যার সর্বপ্রথম ধাপ। আদিম মানুষ যেদিন শিকারের সঙ্গে শাবকসহ দুগ্ধবতী পশু ধরে নিয়ে এল এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল যে পশুশাবকটি মাতৃদুগ্ধে পুষ্টিলাভ করছে। অনুরূপভাবে মানুষের মনে ওই পশুমাতার দুগ্ধ পান করার স্পৃহা জাগে। ক্রমশঃ সে এও উপলব্ধি করে যে, সে দুগ্ধ খুবই সুমিষ্ট এবং ক্ষুধানিবৃত্তির এক প্রকৃষ্ট উপায়।

সেই থেকেই পশুদুগ্ধ পান করার এক বাসনা তার মনে তীব্রভাবে জেগে ওঠে। তখন থেকেই শাবকসহ বন্য পশু ধরে এনে পালন করার প্রথা প্রচলিত হয়। বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে গোপালনের বিশেষ উল্লেখ আছে।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে মৌচাষ চলে আসছে। তবে তা আধুনিক অর্থে নয়। আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলিতে তার উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রেও। সেরকম উল্লেখ আছে 'পত্রোর্ণী' বা পতঙ্গজাত বস্ত্রের কথা যা রাজারা বা রাজপুরোহিতরা পরতেন বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের সময় বা উৎসবে। হাজার পাঁচেক বছর আগে চীনা সাম্রাজ্ঞী লিং শি (Ling Shi) কোন এক গাছের নীচে বসে চা পান করছিলেন। হঠাৎ ঐ গাছ থেকে একটি রেশম গুটিকা তার গরম চায়ের কাপে পড়ে যায়। সাম্রাজ্ঞী একটি কাঠি দিয়ে সম্ভবতঃ গুটিকাটি নাড়াচাড়া করতে করতে লক্ষ্য করেন যে, সে গুটিকা থেকে সুন্দর, মসৃণ ও উজ্জ্বল একপ্রকার সুতো বেরিয়ে আসছে। আর তা থেকেই নাকি আধুনিক রেশম সুতোর উৎপত্তি।

সেরকম আর একটি প্রাচীন পরিচিত প্রাণী হল লাক্ষা কীট। মহাভারতের জতুগৃহ নির্মাণে লাক্ষার ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। লাক্ষা অলঙ্কার শিল্প প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন। শুধু ভারতে নয়, বহু প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লাক্ষার উৎপাদন ও ব্যবহার জানা ছিল। ইউরোপ, আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারতে আসা সম্রাট ও বাদশাদের আত্মজীবনীতে ও পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনীতে লাক্ষার উল্লেখ আছে।

সম্ভবতঃ কৃষিকার্য যত প্রাচীন, ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও অন্যান্য ক্ষতিকারক প্রাণীদের ক্ষতির প্রকৃতি তত প্রাচীন। বস্তুতঃ মানুষের আবির্ভাবের প্রায় কয়েক কোটি বছর আগে পতঙ্গকুল জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, জীবজগতের সকল সম্ভাব্য পরিবেশে 'মৌরসী পাট্টা' গেড়ে বসে আছে। তাই আদিম বাসিন্দা হিসাবে সে ভাবে প্রকৃতির ফসলে তারই পূর্ণ অধিকার। আবার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্তজলকরা পরিশ্রমের ফসল পোকা-মাকড়ে খাবে তা মানুষ কিভাবে সহ্য করতে পারে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হল বিষাক্ত রাসায়নিক কীটনাশক দিয়ে পতঙ্গের বিরুদ্ধে রাসায়নিক যুদ্ধ ঘোষণা। তা আজও চলছে। আমরা বুঝেও বুঝতে চাইছি

না যে এইসব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে আবার আমাদের দেহেই ফিরে আসছে, এবং মানবের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করছে।

যাই হোক, এদের সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার মানুষের পরিচয় ছিল। পঙ্গপাল যে ফসলের ক্ষতি করে তা বহু প্রাচীন কাল থেকেই জানা ছিল। আর মেঠো ইঁদুর বা ধেড়ে ইঁদুর যা মাঠে ও শস্যভাণ্ডারে ফসলের প্রভূত ক্ষতি করে তার রোষ থেকে বাঁচার জন্যই খুব সম্ভব গণেশ বা গণপতির বাহনরূপে তাকে মানুষ পূজা করে আসছে।

আজ অবশ্য বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যাও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। উন্নততর মৎস্য চাষ থেকে কুমির চাষ, ব্যাঙ চাষ থেকে মুক্তা চাষ, বৈজ্ঞানিক প্রথায় হাঁস-মুরগী প্রতিপালন-এর কথা আজ কারো অজানা নয়। বিজ্ঞানের এইসব প্রয়োগপদ্ধতি যাতে সাধারণ মানুষ সহজে আয়ত্ত করতে পারেন এবং বীক্ষণাগার থেকে তা যাতে সাধারণ মানুষ যারা এইসব জীবিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তাদের কাছে পৌছোয় তার জন্য খুব সহজ ভাষায় যেমন এই বইটি লেখা হয়েছে, আবার প্রাণি-বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা যারা স্নাতক, স্নাতক সাম্মানিক বা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনা করছেন তারা যেন এর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেতে পারেন ও কোলকাতা, বর্ধমান, কল্যাণী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচীর সঙ্গে সমতা রেখে চলতে পারেন তার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, ছাত্র-ছাত্রীরা, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ এবং এইসব পেশায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপকৃত হলে এবং বইটির গুণগত উৎকর্ষতার জন্য গঠনমূলক সমালোচনা রাখলে সাগ্রহে গৃহীত হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে লেখকদ্বয় আরও পরিমার্জিত করবেন বলেই আশা রাখি।

বিনীত

দিলীপকুমার চক্রবর্তী

গ্রন্থকারদ্বয়ের নিবেদন

সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের এই ফলিত শাখার ভূমিকা অপরিসীম। পৃথিবীর অসংখ্য উপকারী ও অপকারী প্রাণীদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সম্পূর্ণ বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা যতদূর সম্ভব এই পুস্তকে সহজ সরল করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে বন্যপ্রাণী ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়টিও এই পুস্তকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞানের সব স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা ও এইসব পেশায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এবং কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব। এছাড়া শিক্ষক মহলে এই পুস্তকখানি সমাদৃত হলে বিশেষ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হব।

পুস্তক রচনায় উপযুক্ত পরিভাষা ব্যবহার করেই আধুনিক মতবাদের উপর পর্যালোচনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি সীমিত থেকে গেছে। তাই এই পর্যায়ে আমাদের এই প্রচেষ্টার ভুলত্রুটিগুলির জন্য সকল স্তরের শিক্ষাব্রতীর নিকট আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। মুদ্রণকার্যে অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা' আগামী সংস্করণে সম্পূর্ণ সংশোধন করবার আশা রাখি। পরবর্তী সংস্করণের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সকল শ্রেণীর পাঠক এবং পাঠিকাদের সাহায্য ও মতামত সাদরে গৃহীত হইবে।

এই পুস্তক রচনায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুজিত দাশগুপ্ত ও ডঃ দিলীপ চক্রবর্তী (প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা) মহাশয়দ্বয়ের গঠনমূলক নির্দেশিকা আমরা প্রতি স্তরে অনুসরণ করেছি। তাঁদের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বই লেখার শুরু থেকেই আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপার্থ-প্রতিম বিশ্বাস মৎস্যচাষের উপর গঠনমূলক ধারণা দিয়ে ও বিভিন্ন পুস্তক সরবরাহ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়া যে সকল অধ্যাপক ও গবেষক বিভিন্নভাবে সাহায্য ও প্রেরণা দিয়েছেন যাঁদের কাছে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে অন্যায় হবে তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য এঁরাই—ডঃ মোহিতকুমার সিন্‌হা (জুট রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট, ব্যারাকপুর), অধ্যাপক গণপতি মুখার্জি, অধ্যাপক দেবজ্যোতি চ্যাটার্জি, ডঃ প্রদ্যোৎ মেদ্দা, অধ্যাপক সজল রায়, অধ্যাপক পান্নালাল দাস (রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, রহড়া), ডঃ কমলেশ মিশ্র (ঋষি বঙ্কিম কলেজ, নৈহাটী), ডঃ স্বপন দাস, ডঃ বিনায়ক মিশ্র, অধ্যাপক সজল ভট্টাচার্য (আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা), অধ্যাপক ধীলন রায় (আচার্য প্রফুল্ল কলেজ, নিউ ব্যারাকপুর), অধ্যাপক সমর ঘোষ (শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া), ডঃ বাসুদেব ঘোষ (সেন্ট্রাল সেরিকালচার রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট, বহরমপুর)।

এই পুস্তক রচনায় বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই সকল গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশকদের এই নিবেদনের মাধ্যমে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। এই সঙ্গে চিত্রশিল্পী শ্রীদুর্গা রায়কেও জানাই আমাদের ধন্যবাদ। পুস্তকটির দ্রুত মুদ্রণকার্য এবং আন্তরিক সহযোগিতার জন্য জ্ঞানোদয় প্রেসের কর্ণধার শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং অন্যান্য কর্মিবৃন্দকে জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

পাণ্ডুলিপির পুনর্লিখনে শ্রীমতী রঞ্জনা রাহা এবং পাণ্ডুলিপির সার্বিক উন্নতি ও প্রয়োজনীয় ত্রুটিমুক্ত করবার সুপারিশ-এর জন্য শ্রীব্রজেন বণিককে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

সর্বোপরি, পুস্তকটি প্রকাশনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের প্রাক্তন মুখ্য প্রশাসন আধিকারিকদ্বয় শ্রীদিব্যেন্দু হোতা, শ্রীলাডলীমোহন রায়চৌধুরী এবং বর্তমান আধিকারিক শ্রীশিবনাথ চট্টোপাধ্যায়কে ও তৎসঙ্গে প্রোডাকশন ইন-চার্জ শ্রীঅশোক এ্যান্টনি বিশ্বাস এবং অন্যান্য কর্মচারীদের জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ।

কলিকাতা বিনীত

২রা জুন, ১৯৮৮

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ
সলিলকুমার রাহা

সূচীপত্র

রেশমচাষ

মৌমাছি পালন

লাক্ষাচাষ

পোলট্রি

মৎস্যচাষ

চিংড়ী চাষ

কাঁকড়া চাষ

ব্যাঙ চাষ

মুক্তা চাষ

স্পঞ্জ, প্রবাল ও শম্বুকের খোলক

বন্যপ্রাণী ও সংরক্ষণ

চিত্র সূচী

অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যা

রেশমচাষ (Sericulture)

সূচনা (Introduction) ঃ

রেশম পোকা বা **রেশম মথের** (Silk-worm or silk-moth) গুটি হইতে রেশম সুতা সংগ্রহ বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। এই প্রাকৃতিক রেশম ও রেশমজাত বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তখন হইতেই মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যদিও কৃত্রিম তন্তু, যথা—টেরিলিন, নাইলন, রেয়ন ইত্যাদির প্রচলন বর্তমানে ব্যাপকভাবে দেখা দিলেও **রেশম** প্রাচীন দিনের মত আজও **'সূতার রাণী'** (the queen of fibres) হিসাবেই স্বীকৃত এবং পৃথিবীর সর্বত্র সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে বিলাসবহুল সামগ্রী হিসাবেই সমাদৃত।

প্রাকৃতিক রেশমের বিপুল বাণিজ্যিক চাহিদা থাকায় রেশমশিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপক ব্যবহারের দরুন রেশম উৎপাদনের প্রতিযোগিতাও বিভিন্ন দেশে ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষেও রেশম শিল্পের প্রসার ও উৎকর্ষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা কুটিরশিল্প হিসাবেই স্বীকৃত। বিশ্বে উন্নত প্রাকৃতিক রেশম উৎপাদনকারী দেশগুলির মাঝে ভারতবর্ষ প্রথমদিকেই স্থান করিয়া লইয়াছে।

রেশম সুতা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রেশম মথের প্রতিপালন, রোগবিহীন রেশমবীজের উৎপাদন, বাণিজ্যিক হারে কোকুন বা গুটি (Cocoon) উৎপাদন এবং আরও একটি প্রয়োজনীয় দিক—পোষক উদ্ভিদের চাষ প্রভৃতি **রেশমচাষের** (sericulture) অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে মালবেরি (Mulberry) এবং নন-মালবেরি (Non-mulberry) রেশমচাষ হইয়া থাকে। তবে, সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক রেশমচাষ শুরু হইয়াছিল পুসা (Pusa)তে 1905-1906 সনে। 'Lefroy', 'Hutchinson', 'M. N. De' প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ তুঁতজাত রেশম মথ ও এরিপোকা দ্বারা রেশম বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

রেশমশিল্প নিঃসন্দেহে লাভজনক ব্যবসা। কিন্তু বেশ পরিশ্রমসাধ্য

হইয়া দাঁড়ায় যেহেতু প্রাকৃতিক পর্যায়ের উপর নির্ভরশীল। তাই রেশম-শিল্পের তিনটি বিষয়ের উপর ভীষণভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেমন—কীট-পতঙ্গাদি বিষয়ক (Entomology), উদ্ভিদবিষয়ক (Botany) এবং র-সিল্ক উৎপাদন (Raw silk production) বিষয়ক।

সিল্ক বা রেশম (Silk) :

রেশম মথের পরিণত লার্ভার দেহস্থিত সিল্ক গ্রন্থির ক্ষরণ মুখনিঃসৃত হইলে বাতাসের সংস্পর্শেই শক্ত সুতায় পরিণত হইয়া গুটি বা কোকুন উৎপন্ন করে। এই গুটি বা কোকুন হইতে প্রাপ্ত সূক্ষ্ম তন্তুই **রেশম**।

রেশমের রাসায়নিক গঠন (Chemical composition of silk) :

রেশম সুতার কেন্দ্রীয় তন্তু **ফাইব্রয়েন** (Fibroin)-কে বেষ্টন করিয়া **সেরিসিন** (Sericin)-এর একটি আবরক থাকে। কেন্দ্রীয়তন্তু ও আবরণী উভয়ই প্রোটিন দ্বারা তৈয়ারী। **ফাইব্রয়েনের** রাসায়নিক সংকেত $C_{30}H_{46}N_{10}O_{12}$ এবং ইহার রঙ সাদা। **সেরিসিনের** রঙ রেশম মথের রক্তের ন্যায় এবং ইহার রাসায়নিক সংকেত $C_{30}H_{40}N_{10}O_{16}$। রেশম সুতায় প্রকৃতপক্ষে শতকরা 75-80 ভাগ **ফাইব্রয়েন** এবং শতকরা 20-25 ভাগ **সেরিসিন** থাকে। সিল্ক গ্রন্থির ক্ষরণের সহিত লার্ভার লায়োনেট গ্রন্থির (Lyonet's glands) ক্ষরণ মিশ্রিত হইয়াই রেশম সুতাকে তৈলাক্ত ও উজ্জ্বল করে।

রেশমতন্তুর বৈশিষ্ট্য এবং ধর্ম (Peculiarities & properties of silk) :

রেশম সর্বদা উজ্জ্বল থাকে। শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই রেশমবস্ত্র আরামদায়ক। রেশমতন্তু প্রকৃতপক্ষে একগুচ্ছ সুতার সমষ্টি। একটি সুতার ব্যাস 15μ হইতে 20μ পর্যন্ত হয় এবং যে কোন তন্তুর তুলনায় ইহা হাল্কা।

রেশমের নিজস্ব ধর্ম ব্যতীত কৃত্রিম তন্তুর বিশেষত্বগুলি রেশমের মধ্যেও বিদ্যমান—

1. স্থিতিস্থাপক, কোমল, সূক্ষ্ম এবং দীর্ঘায়িত।
2. উত্তম তাপ অপরিবাহী (Heat insulator)।
3. জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বেশী।
4. রেশমসুতা বস্তুতঃ প্রোটিন—ফাইব্রয়েন জলে দ্রাব্য নয় এবং গ্লাইসিন, এলানাইন এবং টাইরোসিন দিয়া তৈয়ারী। সেরিসিন সহজেই জলে দ্রাব্য এবং ইহাতে সেরিসিন, এলানাইন এবং লিউসিন থাকে।

রেশমের ব্যবহার (Uses of silk) :

বেশীর ভাগ রেশমসূতাই বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র ও পোষাকাদি তৈয়ারিতে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে কৃত্রিম তন্তুর সহিত যুক্ত করিয়া টেরিসিল্ক, কটসিল্ক ইত্যাদি তৈয়ারি করা হয়। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা বর্তমান। বস্ত্র ও পোষাকাদি ব্যতীত প্যারাস্যুট, মাছ ধরিবার সূতা, কার্তুজ থলি, টেলিফোনের ইনসুলেশান কয়েল, ফিল্টার কাপড়, রেসিং মোটরের টায়ার প্রভৃতি তৈয়ারিতে রেশমসূতা ব্যবহৃত হয়। রেশমশিল্পের উপজাত বস্তু লার্ভা বা শুককীটের তৈল কয়েক প্রকার প্রাণীর (মাছ, গৃহপালিত পাখি) খাদ্য হিসাবে যোগ্য। সারজিকাল অপারেশানের সেলাইয়ে ও ড্রেসিং করিবার জন্য রেশমসূতা অপরিহার্য।

বিভিন্ন প্রকার রেশম (Types of silk) :

প্রধানতঃ চার প্রকার রেশম, যথা—**মালবেরি বা তুঁতজাত, তসর, এরি ও মুগা** বিভিন্ন প্রজাতির রেশম মথ দ্বারা সৃষ্ট হয়। লেপিডপ্টেরা বর্গের অন্তর্গত গোত্র Saturniidae এবং Bombyciidae-র অধীনস্থ রেশম মথগুলি কয়েক প্রকার পোষক উদ্ভিদের উপর জীবনযাপন করে।

ভারতবর্ষেই শুধুমাত্র ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই চারি প্রকার রেশম চাষ করা হয়। অন্যান্য রেশম উৎপাদক দেশগুলি হইল জাপান, চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, বুলগেরিয়া, ফ্রান্স, স্পেন এবং ইটালি। এইসব দেশ-গুলিতে **তুঁতজাত রেশম** এবং **তসর** উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে উৎপন্ন চারিপ্রকার রেশম, উৎপন্নকারী রেশমপোকা ও তাহাদের পোষক উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করা হইল।

1. **তুঁতজাত রেশম** (Mulberry silk) : সব থেকে উৎকৃষ্ট ধরনের এবং দুধের সরের মত সাদা হয়। উজ্জ্বলতায় ও আভিজাত্যে এই সিল্কের কদর বেশী এবং 'Pat' ভ্যারাইটি নামে পরিচিত।

রেশমপোকা—বোম্বিক্স মোরি (*Bombyx mori* Linn.)।

পোষক উদ্ভিদ—মালবেরি উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতিগুলি হইল মোরাস ইণ্ডিকা (*Morus indica*), মোরাস সেরাটা (Morus serrata) ও মোরাস লেভিগাটা (*Morus levigata*)।

উৎপাদিত অঞ্চল : কাশ্মীর, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ (বাঁকুড়া,

মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ) আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি।

2. **তসর** (Tasar): তাম্র বর্ণের হয়। মালবেরীর পরেই ইহার স্থান।

রেশমপোকা—**অ্যানথেরিইয়া মাইলিট্টা** (*Antheraea mylitta*), **অ্যানথেরিইয়া পাফিয়া** (*Antheraea paphia*) ইত্যাদি।

পোষক উদ্ভিদ—অর্জুন (*Terminalia arjuna*), শাল (*Shorea robusta*), আসন (*Terminalia tomentosa*) ইত্যাদি।

উৎপাদিত অঞ্চল: মধ্যপ্রদেশ, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ (বাঁকুড়া, মালদহ) বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু ইত্যাদি।

3. **মুগা** (Muga): সোনালী বর্ণের হয়। ভারত ব্যতীত আর কোন দেশে ইহা উৎপন্ন হয় না।

রেশমপোকা—**অ্যানথেরিইয়া আসামেনসিস্** (*Antheraea assamensis*)।

পোষক উদ্ভিদ—সালু (*Litsea polyantha*), চাঁপা (*Michalia champaka*), ময়ূস্করী (*Litsea citrata*) ইত্যাদি।

উৎপাদিত অঞ্চল—আসাম, কর্ণাটক এবং পশ্চিমবঙ্গ (মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া)।

4. **এরি** (Eri): সাদা রঙের রেশম কিন্তু মালবেরীর তুলনায় অনুজ্জ্বল।

রেশমপোকা—**ফাইলোসোমিয়া রিসিনি** (*Philosamia ricini*) অথবা **অ্যাটাকাস রিসিনি** (*Attacus ricini*)।

পোষক উদ্ভিদ—রেড়ি (*Ricinus communis*)।

উৎপাদিত অঞ্চল—আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ (বাঁকুড়া ও মালদহ), বিহার, উড়িষ্যা।

রেশম উৎপাদনের পরিমাণ (Quantity of silk production):

কৃত্রিম তন্তুর প্রচলন থাকা সত্ত্বেও রেশমের চাহিদা গত 15 বৎসরে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় 40 শতাংশেরও অধিক

রেশম উৎপন্ন হয়। 1974 সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে মোট উৎপাদিত 45 হাজার টন রেশমের মধ্যে 63 শতাংশ জাপান, 15 শতাংশ চীন, 8 শতাংশ রাশিয়া, 4·2 শতাংশ ইটালি এবং 4 শতাংশ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছিল। 1975 সালে অনুষ্ঠিত 13th International sericulture congress-এ ভারতের উৎপন্ন তুঁতজাত রেশমের পরিমাণ ছিল 2445 টন এবং উৎপন্নকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ পঞ্চম স্থান অধিকার করে। বর্তমানে ভারতবর্ষের উৎপন্ন রেশমের পরিমাণ প্রায় 75 লক্ষ কি.গ্রা.-এ দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তসর উৎপন্নকারী দেশ হিসাবে ভারতের স্থান দ্বিতীয় এবং উৎপন্নের পরিমাণ প্রায় 3,50,000 কি. গ্রাম। এরি সুতার উৎপন্নের পরিমাণ কম হলেও মুগার বাণিজ্যিক জগতে ভারতবর্ষের একাধিপত্য কারণ আর কোন দেশে মুগা উৎপন্ন হয় না। বৎসরে প্রায় 85,000 কি.গ্রা. মুগা উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষে মোট উৎপাদিত রেশমের পরিমাণ 31 লক্ষ কিলোগ্রাম। ইহার মধ্যে মালবেরী রেশমের পরিমাণ 25 লক্ষ কিলোগ্রাম। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কর্ণাটকেই 76 শতাংশ রেশম উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় 3 লক্ষ কিলোগ্রাম রেশম উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলিতে সরকারী ও বেসরকারী রেশমচাষ কেন্দ্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ব্যবসায়িক মূল্যায়ন (Commercial evaluation) ঃ

রেশমশিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ভারতের ন্যায় উন্নতিশীল দেশে অপরিসীম। বৎসরে ভারতবর্ষে মোট উৎপাদিত রেশমের মূল্য প্রায় 80 কোটি টাকা। রপ্তানিকৃত বিভিন্ন প্রকার রেশম হইতে প্রতি বৎসর প্রায় 15 কোটি টাকার বেশী উপার্জন হয়। 1979-80তে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় 48·83 কোটি টাকা উপার্জন হইয়াছিল। 1985-86 সনে রপ্তানির পরিমাণ আরও বেশী।

প্রায় 50 লক্ষ মানুষের জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রেশমশিল্পের উপর নির্ভরশীল। সেই হিসাবেও গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে রেশমশিল্পের প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে।

রেশমশিল্পের ইতিহাস (History of sericulture industry) ঃ

অনেকের মতে অন্যান্য বহু জিনিসের মত রেশমচাষও চীনসভ্যতার একটি অবদান। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব 3,500 সনে চীনদেশে সর্বপ্রথম রেশমপোকার

গুটি হইতে সূতা সংগ্রহের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। আবার অন্যান্যদের মতে হিমালয় পর্বতের পূর্বাঞ্চলের কোন এক দেশে সম্ভবতঃ রেশমচাষ হইত। তবে, বিজ্ঞানী Chansdale-এর মতানুসারে চীনদেশই প্রথম দেশ যেখানে রেশম-চাষের সূত্রপাত হইয়াছিল।

রেশমগুটি হইতে রেশমসূতা পাওয়ার ঘটনাটি আকস্মিক এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী। কথিত আছে চীনদেশের সম্রাট হোয়াং টি-র (Howang Ti) রাজত্বকালে (204 B. C.) সম্রাজ্ঞী লিং শি-র (Ling Shi) হাত হইতে ফুটন্ত গরমজলের পাত্রে কয়েকটি রেশমগুটি ঘটনাচক্রে পড়িয়া যায়। গুটিগুলি গরমজলে গলিয়া যায় এবং মাকড়সার জালের মত রেশমসূতা নির্গত হইতে থাকে—যাহা রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর কৌতূহলবশতঃ ঐভাবেই সূতা সংগ্রহ পদ্ধতি পরবর্তীকালে রেশমশিল্পের সূচনা ঘটায়। তখন হইতে প্রায় 2,000 বৎসর ধরিয়া শুধুমাত্র চীনদেশেই গুটিপোকার চাষ হইত।

কবে প্রথম ভারতবর্ষে রেশমচাষের প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহা সঠিকভাবে জানা না থাকিলেও অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্বে 1,000 সনে যে রেশমচাষের প্রচলন ছিল সে সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের কোন রাজা পারস্য সম্রাটকে খ্রীষ্টজন্মের 1,000 বৎসর পূর্বেই রেশমবস্ত্র উপঢৌকন দিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারত এই মহাকাব্যগুলিতেও রেশমবস্ত্রের ব্যবহার উল্লিখিত আছে।

খ্রীষ্টজন্মের 200 বৎসর পরে জাপান রেশমচাষ শুরু করে। বর্তমানে 21টি দেশে রেশমচাষ হয় এবং উৎকৃষ্ট রেশম সৃষ্টির ব্যাপক প্রতিযোগিতা চলে।

তুঁতজাত রেশম মথ (Mulberry silk-moth) ঃ

চীনদেশ হইতে আগত এই রেশম মথ পৃথিবীর রেশম উৎপাদনশীল দেশ-গুলিতে সার্থকভাবে প্রতিপালিত হয়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম *Bombyx mori* Linn. (বোম্বিক্স মোরি) এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ প্রজাতিগুলি হইল—

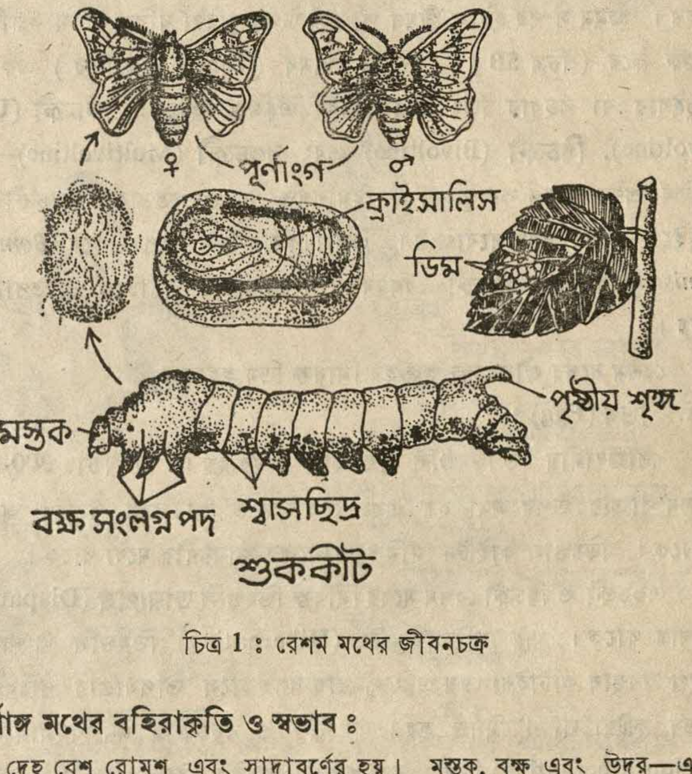
Bombyx textor (বোম্বিক্স টেক্সটর)

B. fortunatus (বো. ফরচুনেটাস্)

B. meridionalis (বো. মেরিডিওনালিস্)

Bombyx mori (বর্গ—Lepidoptera গোত্র—Bombyciidae)-এর গুটি হইতে উৎকৃষ্ট ধরনের রেশমসূতা পাওয়া যায়। ইহাদের লার্ভা বা

শুককীট শুধুমাত্র মালবেরী বা তুঁতগাছের পাতা (চিত্র 5C) খায়, তাই ইহারা তুঁতরেশম মথ নামে পরিচিত।



চিত্র 1 : রেশম মথের জীবনচক্র

পূর্ণাঙ্গ মথের বহিরাকৃতি ও স্বভাব :

দেহ বেশ রোমশ এবং সাদাবর্ণের হয়। মস্তক, বক্ষ এবং উদর—এই তিনটি অংশেই দেহটি বিভক্ত। মাথার দুইপার্শ্বে একজোড়া পালকের মত শুড় ও পুঞ্জাক্ষি বিদ্যমান। পুরুষ মথের তুলনায় স্ত্রীমথ আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং অনুজ্জ্বল বর্ণের হয়। পুরুষ মথের ডানায় ছাই রঙের ছোপ দেখা যায়। মথ ডানা ছড়ানো অবস্থায় 40-50 মি. মি. দৈর্ঘ্যের হয়। ইহারা রাত্রে ঘোরাফেরা করে। বিশ্রামরত অবস্থায় ডানা দেহের দুইপাশে ছড়াইয়া রাখে।

রেশম মথের জীবন বৃত্তান্ত (Life history of silk-moth) :

রেশম মথের চক্রাকার জীবন বৃত্তান্তে—ডিম, শুককীট বা লার্ভা, পিউপা এবং পূর্ণাঙ্গ দশা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান (চিত্র 1)। সম্পূর্ণ সময়কাল প্রায়

দুইমাসের মত (6-8 সপ্তাহ)। 23-25°C তাপমাত্রা এই সময়কালে নির্দিষ্ট থাকে।

রেশম মথ গুটি হইতে বাহির হইবার কিছুক্ষণ পরেই প্রজনন কার্যে রত হয়। জনন সম্পন্ন হইলে স্ত্রীমথ পাতার উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডিম পাড়িতে শুরু করে (চিত্র 5B)। বৎসরে স্ত্রীমথ (বিভিন্ন প্রজাতির) একবার, দুইবার বা বহুবার ডিম পাড়ে এবং এইজন্য ইহাদের **একচক্রী** (Univoltine), **দ্বিচক্রী** (Bivoltine) এবং **বহুচক্রী** (Multivoltine)—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। পরিমাণগত ও গুণগতভাবে একচক্রী মথ হইতে উৎপন্ন রেশম সর্বোৎকৃষ্ট। একাধিকবার ডিম উৎপন্ন করে *Bombyx mistri* এবং এই বহুচক্রী রেশমমথ পশ্চিমবঙ্গ ও কর্ণাটকে প্রতিপালিত হয়।

রেশম মথের জীবনচক্র শুরু হয় নিষিক্ত ডিম হইতে।

A. **ডিম** (Egg) ঃ

পোস্তদানার মত ডিমগুলি হাল্কা হলুদ বর্ণের হয়। 24 ঘন্টায় 300-500 ডিম পাতার উপর জমা হয় এবং দেহনিঃসৃত আঠালো পদার্থে আবৃত থাকে। ডিমগুলি কাইটিন নির্মিত খোলকের আবরণীর মধ্যে থাকে।

একচক্রী ও দ্বিচক্রী রেশম মথের নিষিক্ত ডিমগুলি **ডায়াপজ** (Diapause) দশায় থাকে। এই হাইবারনেটিং (Hibernating) ডিমগুলি শীতকালে সুপ্ত অবস্থায় কাটাইয়া দেয় এবং পুনরায় বসন্তকালে তাপমাত্রার পরিবর্তনে ডিম ফুটিয়া লার্ভা নির্গত হয়। দ্বিচক্রী ও বহুচক্রীর নন-হাইবারনেটিং (Non-hibernating) ডিম হইতে শূককীট বাহির হইতে প্রায় 10-12 দিন সময় লাগে। সদ্য নির্গত লার্ভা বা শুককীট সরু চুলের ন্যায় এবং লম্বায় প্রায় 3 মি. মি. পর্যন্ত হয়।

B. **লার্ভা বা শুককীট** (Larva) ঃ

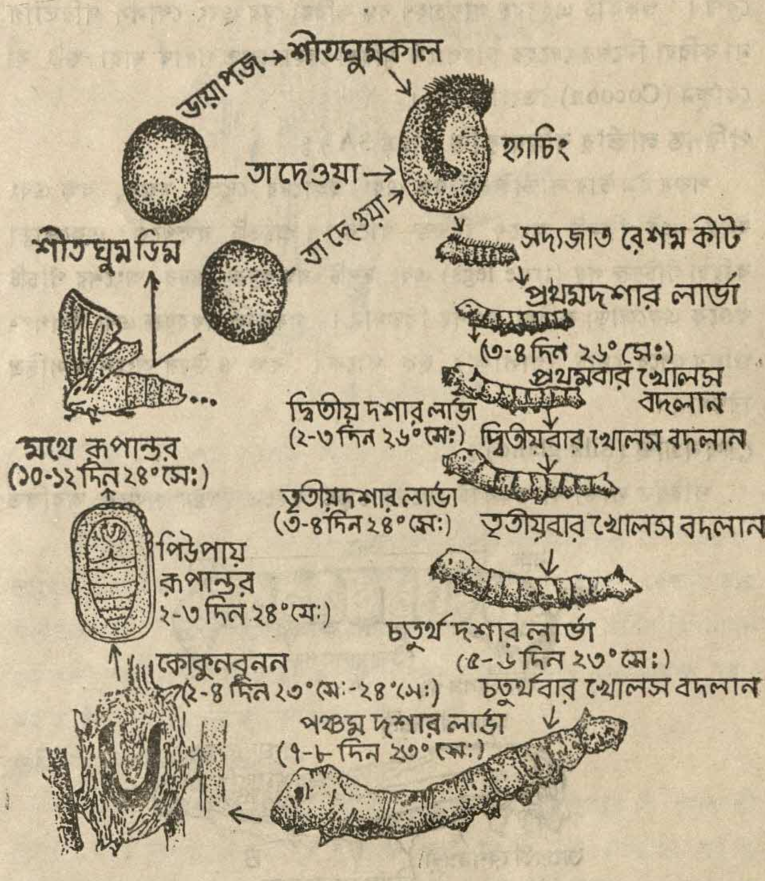
শুককীটগুলিকে প্রচলিত কথায় **পলু** বলা হয়। বাদামী রঙের মস্তক-বিশিষ্ট পলুর গায়ের রঙ ধূসর বর্ণের। সদ্যোজাত শিশু পলুগুলি তুঁতগাছের কচি পাতা খাইতে শুরু করে। রেশম মথের শুককীটদশা প্রায় একমাস স্থায়ী হয়।

শুককীটের রূপান্তর (Transformation of larva) ঃ

সদ্যনির্গত লার্ভা হইতে পরিণত লার্ভায় আসিতে ইহারা চারবার খোলস

ছাড়ে। মধ্যবর্তী দশাগুলিকে ইনস্টার (**Instar**) বলা হয়। প্রথমবার খোলস ত্যাগের পূর্বে ইহারা প্রচুর তুঁতপাতা খায়। কীট পালনের সময় কচি তুঁতপাতা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া দিতে হয়।

প্রথম ইনস্টার লার্ভাদশা তিনদিন স্থায়ী। প্রত্যেকবার খোলস



চিত্র **2** : তুঁতজাত রেশম মথের জীবনচক্র

বদলানোর পূর্বে ইহারা খাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। দ্বিতীয় ইনস্টার লার্ভা **2-3** দিন, তৃতীয় ইনস্টার লার্ভা **3-4** দিন পর্যন্ত খাদ্য খাইয়া বড় হইতে থাকে এবং খোলস বদলাইয়া পঞ্চম ইনস্টার লার্ভায় পরিণত হয় (চিত্র 2)। এই অবস্থায় ইহাদের দেহ বেশ মোটা, মাংসল ও গোলাকার

হয় এবং সোনালী-বাদামী রঙ ধারণ করে। এই দশা সবথেকে দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং আটদিন ধরিয়া ক্রমাগত খাদ্য গ্রহণ করিতে থাকে। লার্ভাদশায় প্রতিটি পলু নিজের দেহের ওজনের 30,000 গুণ পাতা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

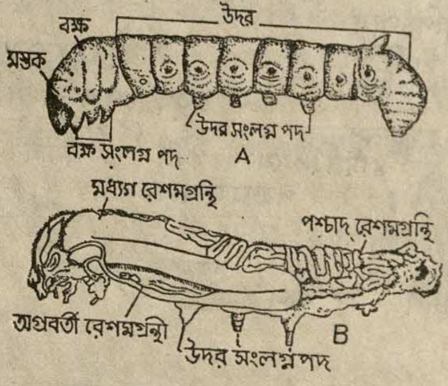
এই দশায় লার্ভার ওজন সদ্যোজাত লার্ভার ওজনের প্রায় 10,000 গুণ বেশী। শুককীট এরপরই খাদ্যগ্রহণ বন্ধ করিয়া দেয় এবং খোলস পরিত্যাগ না করিয়া নিজের দেহের চারপাশে ঘুরিয়া দেহনিঃসৃত পদার্থ দ্বারা গুটি বা কোকুন (Cocoon) তৈয়ারি করে।

পরিণত লার্ভার বহিরাকৃতি (চিত্র 3A) ঃ

পঞ্চম ইনস্টার লার্ভাই পরিণত এবং ইহাদের দেহটি মস্তক, বক্ষ এবং উদর—এই তিনটি অংশে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি বক্ষখণ্ডে একজোড়া করিয়া গাঁটযুক্ত পদ (true legs) এবং দশটি খণ্ডকযুক্ত উদর অংশের পাঁচটি খণ্ডকে একজোড়া করিয়া উপপদ বিদ্যমান। পদগুলি নখরযুক্ত এবং উপপদ-গুলির শেষে ছোট গোলাকার হুক থাকে। বক্ষ ও উদর অংশে শ্বাসছিদ্র বিদ্যমান।

রেশমগ্রন্থি (Silk gland) ঃ

পরিণত লার্ভা বা শুককীট দেহের চতুর্থ হইতে অষ্টম খণ্ডকে অবস্থিত



চিত্র 3 : A—রেশম মথের লার্ভা ও B—লার্ভার দেহে রেশমগ্রন্থির অবস্থান

একজোড়া নলাকার রেশমগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রসের সাহায্যে গুটি তৈয়ারি করে। পরিণত রেশমগ্রন্থি (চিত্র 4) দৈর্ঘ্যে লার্ভার দেহের পাঁচগুণ এবং ওজনে সমগ্র দেহের ওজনের $\frac{2}{5}$ অংশ।

অগ্র, মধ্য এবং পশ্চাদ অংশ লইয়াই প্রতিটি গ্রন্থি দেহের পার্শ্বে অবস্থিত



চিত্র 4 : রেশমগ্রন্থি

(চিত্র 3 B)। মধ্য অংশটি স্ফীত এবং সেরিসিন নামক প্রোটিন নিঃসরণ করে। পশ্চাদভাগ হইতে ফাইব্রয়েন নিঃসৃত হয়।

রেশমগ্রন্থি নিঃসৃত এই রস স্পিনারেটের (Spinneret) মধ্য দিয়া তরলাকারে বাহির হয় এবং বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়াই শক্ত হইয়া রেশমসূতায় পরিণত হয়। মুখোপাঙ্গের গোড়ায় অবস্থিত ফিলিপ্পি গ্রন্থির (Filippi glands) অথবা লায়োনেটগ্রন্থির নালী রেশমগ্রন্থির সম্মুখভাগে উন্মুক্ত হয়। এই গ্রন্থির ক্ষরণ রেশমকে তৈলাক্ত ও উজ্জ্বল করে।

গুটি বা কোকুন (Cocoon) :

লার্ভা বা শুককীট নিজের দেহের চারধারে রেশমসূতার যে আবরণী তৈয়ারি করে তাহাকেই কোকুন বা গুটি বলা হয়। গুটি তৈয়ারি হইতে 3-4 দিন সময় লাগে এবং লার্ভাকে 60,000 হইতে 300,000 বার নিজের দেহের চারপাশে ঘুরিতে হয়। প্রতি মিনিটে প্রায় 15 cm রেশম বাহির হয়। এক একটি গুটি হইতে প্রায় 400-800 মিটার দীর্ঘ সূতা দিয়া পাওয়া যায়।

গুটি বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট, যথা—ডিম্বাকার, বর্তুলাকার, ত্রিকোণাকৃতি ইত্যাদি। বিভিন্ন বর্ণেরও হইতে পারে, তবে সাধারণতঃ হলুদবর্ণের

হয়। ফ্লাভোন (Flavone) বা ক্যারোটিনয়েড (Carotenoid) নামক রঞ্জকের উপর গুটিরর বর্ণ নির্ভর করে। পুরুষ মথের গুটি হইতেই বেশী পরিমাণ রেশমসূতা উৎপন্ন হয়।

পুরুষ ও স্ত্রী মথের লার্ভা ও গুটি সনাক্তকরণ :

শুককীট (Larva) : উভয়েরই দেহের 11-12 খণ্ডকে বিশেষ চিহ্ন বর্তমান। পুরুষের ক্ষেত্রে একটিই গোলাকার স্পটকে **হেরল্ডসবাড** (Heroldsbud) এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুইজোড়া স্পটদের **ইসিওয়াটা ইমাজিনালবাড্** (Ishiwata imginalbud) বলা হয়।

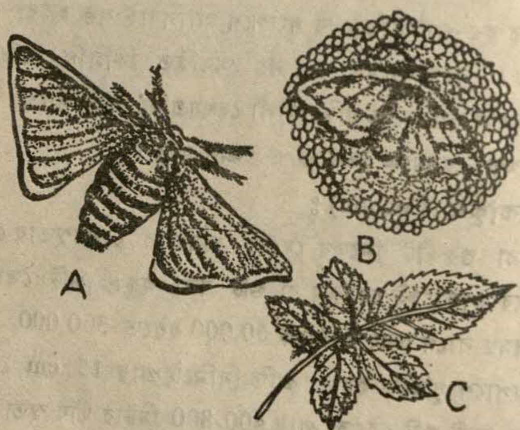
গুটি (Cocoon) : পুরুষ লার্ভা দ্বারা সৃষ্ট গুটির ওজন স্ত্রী লার্ভা দ্বারা সৃষ্ট গুটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত হাল্কা হয়।

C. পিউপা (Pupa) :

গুটির অভ্যন্তরে আবদ্ধ শুককীট পিউপায় রূপান্তরিত হয়। এই দশায় ইহারা নিশ্চল ও অনড় থাকে। গুটির মধ্যে পিউপার অঙ্গসমূহের আমূল পরিবর্তন ঘটে (Histolysis)। পিউপাদশা 10-12 দিন স্থায়ী হয়। পিউপা গুটির অভ্যন্তরে সমঙ্গমথে রূপান্তরিত হয়।

D. পূর্ণাঙ্গ (Imago) :

পিউপাদশা অতিবাহিত করিয়া পূর্ণাঙ্গ মথ (চিত্র 5A) গুটি কাটিয়া



চিত্র 5 : রেশম মথ ও তুঁত পাতা

বাহিরে আসে। পুরুষমথ এই ব্যাপারে স্ত্রীমথের তুলনায় সপ্রতিভ। পূর্ণাঙ্গ জীবনদশার স্থায়ীকাল 5-10 দিন। ইহারা খাদ্য না খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

সঙ্গম : গুটি হইতে বাহির হইয়া পুরুষমথ স্ত্রীমথের দিকে ধাবিত হয়। স্ত্রী মথের **গন্ধ গ্রন্থি** (Scent gland) হইতে ক্ষরিত পদার্থ পুরুষ-মথকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। স্ত্রীমথের সহিত মিলিত হইবার পরেই পুরুষ মথ মারা যায়। সাফল্যের সহিত সঙ্গমক্রিয়া প্রায় তিনঘণ্টা ধরিয়া চলিতে পারে। স্ত্রীমথ এরপর ডিম পাড়িতে শুরু করে। এইভাবে জীবন-চক্র আবর্তিত হয়।

উল্লেখযোগ্য তাপমাত্রা, আলোক ও আর্দ্রতার উপর রেশম মথের জীবনচক্র ও উহাদের বিভিন্ন দশার দেহগঠন ভীষণভাবে নির্ভর করে।

তুঁতজাত রেশমচাষ (Mulberry sericulture)

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (Scientific method)—ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বেশী সংখ্যায় গুটি বা কোকুন তৈয়ারির উদ্দেশ্যে এই তুঁতজাত গৃহ-পালিত রেশম মথের (*B. mori*) প্রতিপালন করা হয়। ইহাদের গুটি হইতে উৎকৃষ্ট ধরনের রেশমসূতা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদের চাষ সর্বাপেক্ষা বেশী করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে (সরকার পরিচালিত) রেশমচাষ সম্পর্কিত গবেষণা করা হয়।

প্রকৃত রেশমচাষ (Sericulture proper)-এ নিম্নলিখিত নির্ভরশীল পর্যায়গুলি অন্তর্ভুক্ত—

1. পোষক উদ্ভিদের চাষ অর্থাৎ—**মালবেরি চাষ ও প্রতিপালন** (Mulberry propagation and cultivation) ;
2. **রেশম মথের প্রতিপালন** (Rearing of silk-worms) ;
3. **গুটি এবং রোগমুক্ত বীজের উৎপাদন** (Production of cocoon & disease free seeds) ;
4. **গুটি হইতে প্রাপ্ত র-সিল্ক রীলিং এবং বিপণন** (Reeling of raw-silk from cocoon & marketing) ;
5. **রেশমশিল্পের সমস্যা** (Problems of sericulture)—রোগ, শত্রু ও তাহার প্রতিকার।

নিম্নে এই পর্যায়গুলি আলোচিত হইল—

1. **মালবেরি চাষ ও প্রতিপালন** (Mulberry propagation and cultivation) **:** বিভিন্ন প্রজাতির মালবেরি উদ্ভিদের পাতা রেশম মথের

লার্ভা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। সুতরাং তুঁতগাছের চাষ ও প্রতিপালন বিশেষ আবশ্যক। Moraceae গোত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির তুঁতগাছ (*Morus indica*, *Morus serrata* বা *Morus levigata*) বহুবর্ষজীবি এবং যে কোন মৃত্তিকায় জন্মায়। তবে, তুঁতগাছের আদর্শ মৃত্তিকায় 40% খনিজ পদার্থ, 30% জল এবং 10% জৈব যৌগ থাকা আবশ্যক। জমিতে সার (Manure) প্রয়োগে তুঁতগাছের বৃদ্ধি হয় ও উন্নতমানের বেশী সংখ্যায় পাতা পাওয়া যায়। কম্পোস্ট সার, খইল, কচুরিপানা ইত্যাদি সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

অযৌন পদ্ধতিতেও তুঁতগাছ বংশবিস্তার করে। তাই, অধিক সংখ্যায় তুঁতগাছের উদ্দেশ্যে **গ্রাফটিং** (Grafting), **লেয়ারিং** (Layering) এবং **কাটিং** (Cutting) পদ্ধতিতে ইহাদের চাষ করা হয়। কাটিংগুলি 4-5 বৎসরের তুঁতগাছ হইতে কাটা হয়। 6″ লম্বা ও 1″ ব্যাস বিশিষ্ট কাটিংগুলি সাধারণতঃ সারিবদ্ধভাবে জমিতে বপন করা হয়। গাছগুলি বেশী উচ্চতাসম্পন্ন হইতে দেওয়া হয় না এবং নিয়মিত ডাল ছাঁটিয়া প্রচুর শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন করা হয়।

তুঁতপাতা ও কাণ্ড বিভিন্ন রোগ ও প্রাণী কর্তৃক বিনষ্ট হয়। তুঁতগাছের রোগের মধ্যে ছত্রাক ঘটিত **মিলডিউ** (Mildew), শারীরবৃত্তীয় এবং পচনে **টুকরা** (Tukra) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল রোগদমনে মেটাসিসটক্স, ডেমিক্রন, বোরাডেক্স প্রভৃতি কীটনাশক স্প্রে করিলে সাময়িক পরিত্রাণ পাওয়া যায়। পাতা, কাণ্ড ও মূল ভক্ষণকারী প্রাণীদের (স্কেল ইনসেক্ট, বিটল্, থ্রিপস, মোলর্যাট নামক স্তন্যপায়ী) হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

2. **রেশম মথ প্রতিপালন** (Rearing of silk-worms)—বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রেশম মথের প্রজনন ঘটান এবং তাহাদের লার্ভাগুলিকে উপযুক্ত ব্যবস্থায় সঠিকভাবে প্রতিপালন বিশেষ সতর্কতার সহিত করা হয়। যেমন—

1. **কীটঘর বা পলুঘর** (Rearing room)—রেশম মথ পালনে যে ঘর ব্যবহৃত হয় তাহাকে **পালনঘর** (Rearing room) বা কীটঘর বা পলুঘর বলা হয়। মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল দিয়া তৈয়ারী ঘরগুলি গ্রীষ্ম ও শীত উভয় ঋতুতেই পালনের উপযুক্ত। ঘরের ভিতর আলো, বাতাস প্রবেশের জন্য বড় বড় জানালা থাকা বাঞ্ছনীয়। লার্ভার ভালভাবে বৃদ্ধির জন্য ঘরের

তাপমাত্রা সর্বদাই 22°C হইতে 27°C-এর মধ্যে এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 30%-90% রক্ষা করা উচিত।

2. **পালন-ট্রে** (Feeding trays)—সদ্যোজাত কীটগুলিকে বাঁশের তৈয়ারী পালন ট্রে-তে তুঁতগাছের নরম পাতা খুব মিহি করিয়া কাটিয়া নির্দিষ্ট সময়ে খাইতে দেওয়া হয়।

3. **মাঁচান** (Machan)—পালনঘরের বাঁশের অথবা কাঠের তৈয়ারী মাচার তাকে পালন-ট্রেগুলি হেলানো অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়।

4. **জাল** (Nets)—পালন-ট্রের তলায় জাল রাখা হয়। লার্ভার মল, উদ্বৃত্ত পাতার টুকরো, আবর্জনা ইত্যাদি এই জালের মধ্যে জমা হয়।

5. **স্পিনিং-ট্রে** (Spinning tray)—গুটি গঠনের পূর্বে পরিণত লার্ভাগুলিকে এই ধরনের ট্রে-তে স্থাপন করা হয়। বিশেষ ধরনের এই ট্রে **চন্দ্রাকী** (Chandraki) নামে পরিচিত। লার্ভা এই ট্রের নির্দিষ্ট স্থানে গুটি গঠন করে।

6. **রাসায়নিক পদার্থসমূহ** (Chemicals)—কপার সালফেট দ্রবণ, সালফার, ফরমালিন ইত্যাদি রোগজীবাণু ও অন্যান্য পোকামাকড়ের হাত হইতে লার্ভাকে রক্ষার নিমিত্ত ব্যবহার করা হয়।

মালবেরি রেশম মথ গুটি হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রজনন কার্যে লিপ্ত হয়। যুগলরত মথ একটি বড় গোলাকার কার্ডবোর্ডের বা কাচের ছোট বলয়ের উপর রাখিয়া একটি টিনের ফানেল চাপা দেওয়া হয়। স্ত্রীমথ কার্ড-বোর্ডের উপর ডিম পাড়ে। এই বলয়টিকে **সেলিউল** (Cellule) বলে। ডিম-সহ কার্ডবোর্ডটি এখন পালন-ট্রেতে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রজননের পূর্বে স্ত্রীমথগুলিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয় যাহাতে কোন রকম রোগ দ্বারা আক্রান্ত না থাকে। অসুস্থ মথগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হয়।

ডিম ফুটিয়া পলু বাহির হয় এবং তাহাদের মিহি তুঁতপাতা খাইতে দেওয়া হয়। লার্ভা ক্রমশঃ আকারে বড় হয় এবং চারবার খোলস ত্যাগ করে। লার্ভাদশার বৃদ্ধির সহিত স্থান সংকুলানেরও ব্যবস্থা করা হয় এবং তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতারও পরিবর্তন করা হয়।

লার্ভার বিভিন্ন বয়সের খাদ্যপরিমাণ এবং পলুঘরের অত্যাবশ্যকীয় তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

বয়স	খাদ্য পরিমাণ (পাতা কাটিয়া)	তাপমাত্রা —°C	আপেক্ষিক অদ্র´তা —%
প্রথম ইনস্টার লার্ভা	4—5 পাতা	26—27	80—90
দ্বিতীয় ইনস্টার লার্ভা	5—6 পাতা	25—26	75—85
তৃতীয় ইনস্টার লার্ভা	8—10 পাতা	24—25	70—80
চতুর্থ ইনস্টার লার্ভা	4–5 পাতা	23—24	65—75
পঞ্চম ইনস্টার লার্ভা	8—10 পাতা	22—23	60—70

পরিণত লার্ভা শেষবার খোলস (Moult) ত্যাগ করিয়া খাওয়া বন্ধ করে। এই অবস্থায় এইগুলিকে স্পিনি-ংট্রেতে স্থানান্তরিত করা হয়। লার্ভা এখন পিউপায় পরিণত হইবার জন্য পালন-ট্রের কিনারায় আসে এবং রেশম গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রস দিয়া দেহের চারপাশে রেশমগুটি তৈয়ারি করে।

3. **সর্বোত্তম গুণসম্পন্ন গুটিগুলিকে পৃথক করিয়া রাখা হয়।**

সতর্কতা (Precautions) : মালবেরি রেশম মথ প্রতিপালনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে।

1. কীটগুলিকে এক জায়গায় জড় হইতে দেওয়া কখনই উচিত নয়।
2. অভুক্ত তুঁতপাতা, লার্ভার মল এবং মৃত কীট নিয়মিত পরিষ্কার করিতে হইবে।
3. শুকনা অথবা ভিজা তুঁতপাতা পলুকে কখনও খাওয়ানো উচিত নয়।
4. খোলস ছাড়িবার পূর্বে পলু যাহাতে বিরক্ত না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।
5. পালনঘরে ধূমপান হইতে বিরত থাকা উচিত।
6. পোকামাঁকড় বা ক্ষতিকারক জীব যাহাতে পালনঘরে প্রবেশ না করিতে পারে সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।
7. রোগাক্রান্ত কীটগুলিকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

8. প্রয়োজনে পানীয় জল ছিটাইবার ব্যবস্থা রাখা দরকার।

4. গুটি হইতে প্রাপ্ত রেশমসূতার রীলিং :

উন্নত মানের রেশমস্থতা রীলিং জন্য সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি চালু করা হইয়াছে। রেশম শিল্পের একটি অতি প্রয়োজনীয় দিক হইল রীলিং, কারণ উৎপাদিত গুটি সরাসরি র-সিল্ক উৎপাদনের ভূমিকা গ্রহণ করে। গুটির অভ্যন্তরের পিউপাকে গরম বাষ্পে বা ধূপন পদ্ধতিতে বা রৌদ্রে 3-4 দিন রাখিয়া মারিয়া ফেলা হয়। ইহাকে স্টিফলিং বলা হয়। শুষ্ক গুটিগুলিকে এরপর বেসিনে গরম জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থায় একটি কাঁচের দণ্ড দিয়া সর্বদা নাড়াইতে হয়। ফলে, গুটির আঠাল পদার্থ গলিয়া যায় এবং রেশমস্থতা খুলিয়া যায়।

স্থতা গুটাইবার জন্য চরকা, বিদ্যুৎচালিত চরকা ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। অনেকগুলি গুটি হইতে প্রাপ্ত রেশমস্থত্রের প্রান্তভাগ চরকার 'গ্লাস আই' (Glass eye)-এর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। স্থতার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য শেষোক্ত প্রান্তভাগের সহিত নতুন গুটির প্রান্তভাগ জুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাকে **এণ্ড কাস্টিং** (End casting) বলা হয়।

স্থনির্দিষ্ট রিলিং পদ্ধতিতে উৎপন্ন রেশমতন্তুই **রিল্ড সিল্ক** বা **র-সিল্ক** (Raw silk)। এরপর এই র-সিল্কের গুণগত মান পরীক্ষা করিয়া বাজারে সরবরাহ করা হয়। এক একটি গুটি হইতে 400—800 মিটার রেশমস্থতা পাওয়া যায়।

এক কিলোগ্রাম র-সিল্ক তৈয়ারি করিতে প্রায় 55,000-এর মত গুটি প্রয়োজন।

যে সব গুটি হইতে মথ গুটি কাটিয়া বাহিরে আসে সেই কাটা গুটি হইতে রিল্ড সিল্ক তৈয়ারি হয় না। সম্পূর্ণ গুটি হইতে মোটা ডেনিয়ার (Denier) রেশমস্থতা পাওয়া যায়। কাটাই করিবার আগে যে স্থতা পরিত্যক্ত হয় তাহাই **চশম** এবং ইহাদের পাকাইয়া **স্প্যান সিল্ক** (Spun silk) তৈয়ারি করা হয়। কাটা গুটিগুলিকে **লাটকোয়া** বলে এবং ইহাদের কাটাই করিয়া যে স্থতা পাওয়া যায় তাহাকে **মটকা** বলা হয়।

নন্-মাল্‌বেরি রেশমচাষ (Non-mulberry sericulture) :

মালবেরি রেশম-গুটি ব্যতীত তসর, এরি ও মুগা মথের রেশম-গুটি চাষ

এই শ্রেণীভুক্ত। Saturniidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির মথ এই সকল রেশম উৎপন্ন করে।

তসর (Tasar) ঃ

তসর উৎপাদনে চীনদেশের পরই ভারতের স্থান। পৃথিবীতে যে পরিমাণ তসর উৎপাদন হয় তাহার 10% উৎপন্ন হয় এই দেশে।

যদিও তসর মথগুলি বনাঞ্চলের, তথাপি গৃহপালিত করিবার যথেষ্ট প্রচেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষে কয়েকটি প্রজাতির মথ হইতে তসর সিল্ক উৎপন্ন হয়। তবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে *A. mylitta*-র উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা বেশী।

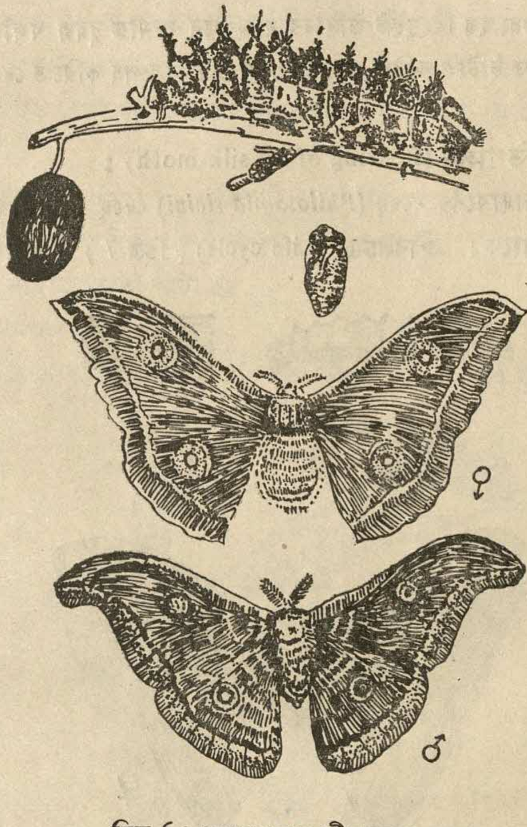
পোষক উদ্ভিদের চাষ (Cultivation of food plants) ঃ

ভারতীয় তসর মথ পূর্বে উল্লিখিত কয়েক প্রকার বৃক্ষ ছাড়াও আরও কয়েকটি গৌণ পোষকের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে (যথা ওক, কুল প্রভৃতি)। পোষক উদ্ভিদের খুব বেশি যত্ন না নিলেও লার্ভার স্থানান্তরিতের (এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষ) সময় বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। রেশম মথ পালনের পূর্বে পোষক উদ্ভিদের শাখাপ্রশাখা বাড়াইবার জন্য নিয়মিত ডাল ছাঁটা হয়। বৃক্ষগুলিকে গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর হাত হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন।

তসর মথ প্রতিপালন (Rearing of tasar silk-moth) ঃ

ভারতীয় তসর মথ অন্যান্য মথের তুলনায় আকৃতিতে বেশ বড়। *A. mylitta*-র পুরুষমথ হলুদাভ লাল এবং স্ত্রীমথ হলুদাভ ধূসর বর্ণের হয়। ইহারা সাধারণতঃ দ্বিচক্রী প্রকৃতির হয়। ইহাদের **জীবনচক্র** (Life cycle) (চিত্র 6) সম্পন্ন করিতে প্রায় আড়াই মাসের মত সময় লাগে। ডিম ফুটিবার সময়কাল 7-10 দিনের মত। সদ্যোজাত লার্ভা হলুদ বর্ণের হয় এবং অসংখ্য রোমে আবৃত থাকে। লার্ভা কচিপাতা খাইয়া বড় হইতে থাকে এবং সময়মত খোলস পরিত্যাগ করে। লার্ভাদশা কাটাইতে 40-50 দিনের দিনের মত সময় লাগে। পরিণত লার্ভা 4-5 ইঞ্চির মত লম্বা হয় এবং 50 গ্রাম ওজন পর্যন্ত হইতে পারে। গুটি গঠন করিতে 4-6 দিন সময় লাগে এবং পিউপা দশাও সম্পন্ন করিতে ঐ একই সময় অতিবাহিত করিতে হয়। তসর গুটিগুলি শক্ত ধরনের হয়।

বিজ্ঞানভিত্তিক চাষে সতর্কতার সহিত **বীজ বা ডিম্ব সংগ্রহ** করা হয়। রোগবীজাণুমুক্ত ডিমগুলি বাজারে সরবরাহ করা হয়।



চিত্র 6 : তসর মথের জীবনচক্র

রীলিং (Reeling) : কোকুনগুলি শক্ত হওয়ার দরুন রীলিং পদ্ধতি অন্য রকমের হয়। আরও উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে রিল্ড সিল্ক তৈয়ারি করা হয়।

এরি (Eri) :

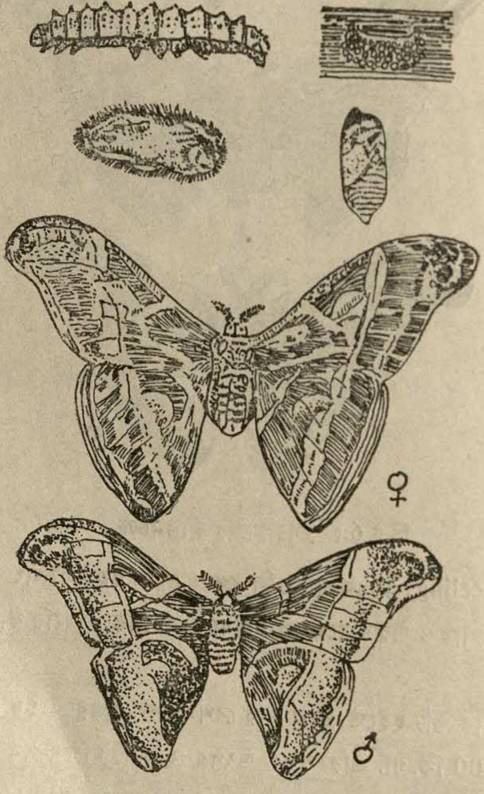
এরি পোকার গুটি হইতে প্রাপ্ত এরি রেশম বেশ মজবুত হয়। বর্তমান ভারতে 200,000 কি.গ্রা. এরি সূতা উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আসামে এরি মথগুলি বন্য বা গৃহপালিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এরি রেশম-চাষ সহজভাবেই করা যায় এবং আসামে বৃহৎ কুটিরশিল্প হিসাবে স্থান লাভ করিয়াছে।

পোষক উদ্ভিদের চাষ (Cultivation of food plants) :

অন্যান্য ফসল উৎপন্নকারী উদ্ভিদের মত ক্ষেত করিয়া রেড়ি উদ্ভিদের চাষ-আবাদ করা হয়। দুইটি উদ্ভিদের মাঝখানে সামান্য দূরত্ব বজায় রাখা হয়। নিয়মিত ছাঁটাই করিয়া গাছকে বেশী উচ্চতাসম্পন্ন করিতে দেওয়া হয় না।

এরি মথ প্রতিপালন (Rearing of eri silk-moth) :

সবুজ ও সাদাবর্ণের মথের (*Philosamia ricini*) দেহে ও ডানায় বিচিত্র বর্ণের ছাপ থাকে। **জীবনচক্র** (Life cycle) (চিত্র 7) তুঁতজাত রেশম



চিত্র 7 : এরি মথের জীবনচক্র

মথের ন্যায়। মথগুলি বৎসরে 4-5 বার জীবনচক্র সম্পন্ন করে (বহুচক্রী)। একটি স্ত্রীমথ গড়ে প্রায় 75-85 ডিম পাড়ে। 8-12 দিন পরেই ডিম ফুটিয়া

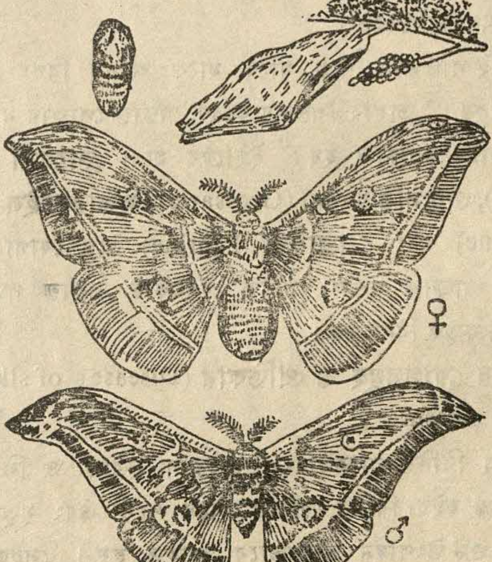
লার্ভা বাহির হয়। সদ্যোজাত লার্ভা সবুজ-হলুদ বর্ণের এবং ইহাদের দেহে কালো দাগ থাকে। লার্ভাদশা প্রায় 40-45 দিনে সমাপ্ত হয়। সাধারণতঃ পাতার অগ্রভাগে বা পাতার ভাঁজে ইহারা গুটি সৃষ্টি করে। গুটি কাটা অবস্থায় সংগৃহীত হয়।

তুঁতজাত রেশম মথের ন্যায় একই রকম সতর্কতার সহিত ইহদের পালন করা হয়।

রীলিং (Reeling) ঃ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, তাহার কারণ সৃষ্ট গুটি হইতে ধারাবাহিকভাবে সূতা পাওয়া যায় না। পুসা যন্ত্র, চরকা অথবা তকলীর সাহায্যে সূতা কাটা হয়।

মুগা (Muga) ঃ

বৎসরে প্রায় 85,000 কি.গ্রা. সূতা উৎপন্ন হয়। তসর মথের মত বন্য



চিত্র 8 : মুগা রেশম মথের জীবনচক্র

ধরণের মথ কেবলমাত্র আসামেই পাওয়া যায়। *Antheraea assamensis* নামক মথ চাঁপা, সালু ইত্যাদি গাছের পাতা খায় ও ঐ সকল বন্য গাছে

গুটি তৈরি করে। মুগা মথের **জীবনবৃত্তান্ত** (চিত্র 8), **মুগা নিষ্কাশন** প্রভৃতি তসর মথের ন্যায়। বাউরী নামক যন্ত্রে সুতা কাটা ও রীলিং করা হয়।

5. রেশম শিল্পের সমস্যা (Problems of sericulture)—**রোগ, শত্রু ও তাহার প্রতিকার** (Diseases, enemies and their control) ঃ

অর্থনৈতিক মূল্য থাকার দরুন রেশমের চাষ যথেষ্ট সতর্কতার সহিত করা হইয়া থাকে। রেশমের মান উন্নয়নার্থে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় রেশম মথের প্রজনন ঘটাইয়া নতুন জন্তুর সৃষ্টি এবং ইহাদের লার্ভাগুলিকে প্রতি-পালন ও রেশম নিষ্কাশন ইত্যাদি সঠিকভাবে করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতি দেশেই রেশম গবেষণা কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রধান গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন জাতের রেশম মথের মধ্যে প্রজনন ঘটাইয়া উন্নত শ্রেণীর সঙ্কর জাতের সৃষ্টি করা ও এই শিল্পের আনুষঙ্গিক দিকগুলির উন্নতি প্রকল্পে নিরলস গবেষণা চলিতেছে।

কিন্তু এই লাভজনক শিল্পে মাঝে মাঝে আসন্ন বিপদ ঘটিতে পারে বলিয়া বোধ হয়। তাহার অন্যতম কারণ, অন্যান্য পোকার মত রেশম মথও একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়। ইহাদের মধ্যে **ফ্লাচেরী** বা কালশিরা (Flacherie), **গ্রাসেরি** বা রসা (Grassarie), **মুস্কারডাইন** বা চুনাকাঠি (Muscardine) এবং **পেব্রাইন** (Pebrine) উল্লেখযোগ্য। এই সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ব্যতীত রেশমকীট অন্যান্য পতঙ্গ, পাখী ও উচ্চতর প্রাণী কর্তৃক বিনষ্ট হয়।

রেশম মথের রোগসমূহ ও প্রতিকার (Disease s of slk-moth and preventive measure) ঃ

রেশম মথ বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ও কিছু আন্তপ্রাণি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিভিন্ন রোগের কবলে পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলে গুটি উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। সেইজন্য রেশমকীট প্রতিপালকদের রেশম মথের বিভিন্ন রোগগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং কিভাবে প্রতিকার সম্ভব তাহা বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।

রেশম মথ যখন বহিরাগত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন ইহাদের **পেব্রাইন** ও **মুস্কারডাইন** রোগ দেখা দেয়। এই রোগগুলিকে **জীবাণু-ঘটিত রোগ** (Germ disease) বলা হয়। আবার ইহাদের শারীরবৃত্তীয়

রেশম মথের রোগসমূহ ও প্রতিকার

রোগের নাম (Name of disease)	রোগের প্রকৃতি (Nature of disease)	রোগের লক্ষণ (Symptoms of disease)	প্রতিকার (Preventive measure)
1. জীবাণুঘটিত			
(a) পেব্রাইন	নোসেমা (Nosema) নামক পরজীবী আত্মপ্রাণি কর্তৃক ডিমের মাধ্যমে লার্ভাদশায় এই রোগের প্রকাশ ঘটে।	আক্রান্ত লার্ভার সারা দেহে কালো স্পট দেখা যায়। লার্ভা নিশ্চল হইয়া পড়ে, দৈহিক বৃদ্ধি অসমান হয় এবং ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘটে।	রোগাক্রান্ত লার্ভার তাৎখনিক অপসারণ এবং 47°C-এ ডিমগুলি উত্তপ্ত করিলে রোগ-মুক্তি ঘটে।
(b) মুস্কারডাইন	ছত্রাকঘটিত। লার্ভার দেহের উপর স্পোর বিভিন্ন বর্ণের হয়। যেমন—সাদা, লাল, হলুদ ইত্যাদি।	রোগাক্রান্ত লার্ভার গায়ে ছিট্ ছিট্ দাগ দেখা দেয়। লার্ভা খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। লার্ভার দেহ শক্ত হইয়া যায়।	লার্ভার অপসারণে স্পোরের বিস্তার বন্ধ হয়। পালন-ঘরগুলি ফরমালিন দ্রবণ (2%) দ্বারা ধৌত করা হয়।

রোগের নাম (Name of disease)	রোগের প্রকৃতি (Nature of disease)	রোগের লক্ষণ (Symptoms of disease)	প্রতিকার (Preventive measure)
2. **শারীরবৃত্তীয়**			
(a) ফ্লাচেরী	লার্ভাদশায় স্ট্রেপটোকক্কাস, ব্যাসিলাস নামক ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণ।	আক্রান্ত লার্ভার দেহচর্ম কুঞ্চিত হয়। বমি করে এবং সর্বোপরি দেহে পচন ধরে।	সর্তকতার সহিত রেশমকীট পালন ছাড়া আর কোন প্রতিকার নাই।
(b) গ্রাসেরী	ভাইরাসজনিত রোগ পূর্ণাঙ্গ মথ বা লার্ভার মাধ্যমে।	আক্রান্ত লার্ভার দেহ হলুদ বর্ণ ধারণ করে। রক্ত পুঁজের ন্যায় আকার ধারণ করে। লার্ভা খোলস ত্যাগ বন্ধ করে। গুটি গঠন করে না।	মৃত লার্ভার অপসরাণ। পালন ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক।
(c) গ্যাটাইন	লার্ভাদশায় বিপাকীয় কার্যের ত্রুটির ফলে।	লার্ভার ত্বক স্বচ্ছ হইয়া যায়। অসম বৃদ্ধি ঘটে।	সতর্কতার সহিত রেশমকীট পালন।
(d) কোর্ট	লার্ভাদশায় বিপাকীয় কার্যের ত্রুটির ফলে।	সুস্থ লার্ভা গুটি গঠনে অক্ষম হয়।	সতর্কতার সহিত রেশমকীট পালন।

কার্যের বিচ্যুতির জন্য কয়েকটি রোগের সৃষ্টি হয়। যেমন—ফ্লাচেরী, গ্রাসেরী, গ্যাট্যাইন (Gattine) এবং কোর্ট (Court)। ইহাদের শারীরবৃত্তীয় রোগ (Physiological diseases) হিসাবে বিবেচিত করা হয়। ছকের মাধ্যমে সকল প্রকার রোগ ও উহাদের প্রকৃতি, লক্ষণ এবং প্রতিকার আলোচনা করা হইল।

রেশম মথের পরজীবী ও শত্রু ঃ রেশম মথের ক্ষতিকারক পরজীবীদের মধ্যে **ট্রাইকোলিগা বম্বাইসিস** (*Tricholyga bombycis*) মাছি উল্লেখযোগ্য। এই মাছির দ্বারা রেশম মথ ভীষণভাবে আক্রান্ত হয় এবং রেশম শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হয়। স্ত্রীমাছি লার্ভার দেহের উপর ডিম পাড়ে। মাছির ডিম হইতে উদ্ভূত ম্যাগট বা লার্ভা রেশম মথের লার্ভার শরীরে প্রবেশ করে এবং লার্ভার দেহের ক্ষতি করে ও লার্ভাকে মারিয়া ফেলে।

ট্যাকনিড মাছি (Tachnid fly) উহার দীর্ঘ রসট্রাম লার্ভার শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ফলে প্রচুর পরিমাণে হিমোলিম্ফ (Haemolymph) নির্গত হয় এবং লার্ভা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পালনঘরে এই সকল মাছি যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে সেইজন্য তারের জাল জানালা, দরজায় লাগান হয়। ইহা ছাড়া পিঁপড়া, টিকটিকি, পাখী ও ইঁদুর যাহাতে রেশম পোকার ক্ষতি না করে, সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

রেশম ডিগামিং (Degumming) ঃ

সকল প্রকার রেশমই রং করিবার পূর্বে ডিগামিং করিয়া লইতে হয়। তবে স্পান সুতার (Spun silk) ডিগামিং করার প্রয়োজন হয় না। কিছু পরিমাণ লিসাপল সি পেষ্ট (Lissapol C paste) পরিমিত জলে মিশ্রিত করিয়া সামান্য গরম করিতে হয়। রেশমসুতাকে আধঘণ্টা জলে ডুবাইয়া রাখিলে রঙ করিবার উপযুক্ত হয়।

রেশম উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় (Means for increased production of silk) ঃ

গবেষণালব্ধ ফল ও অন্যান্য তথ্যাদি কাজে লাগাইয়া বর্তমানে আমাদের দেশে রেশম উৎপাদন বাড়াইবার খুবই চেষ্টা চলিতেছে। রেশম উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি প্রয়োজন—

1. ব্যাপকভাবে পোষক উদ্ভিদের চাষ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

2. রোগমুক্ত বীজ গুটি উৎপাদন ও সুলভে রেশমচাষীভাইদের কাছে প্রদান।
3. উন্নত মানের রেশম পাইবার উদ্দেশ্যে সঙ্কর জাতের রেশম মথ সৃষ্টি।
4. দ্বিচক্রী মথের পালন ও প্রয়োজনে রেশমগ্রন্থি বৃদ্ধিতে হরমোন প্রয়োগ।
5. চাষীভাইদের অল্প সুদে ব্যাঙ্ক-ঋণের ব্যবস্থা, রেশম মথের বিভিন্ন রোগ ও তাহাদের প্রতিকার সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা।
6. রেশমশিল্পের উপজাত দ্রব্য বিক্রয়।
7. রেশম শিল্পকে কুটিরশিল্প হিসাবে গ্রহণ।

উপরিউক্ত উপায়গুলির বাস্তব রূপায়ণ বর্তমানে সম্ভব হইয়াছে। রেশম-শিল্পের উন্নতিকল্পে সরকার কর্তৃক আরও অর্থ বিনিয়োগে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে রপ্তানিকৃত রেশমের পরিমাণ আরও যাহাতে বৃদ্ধি করা যায় সেজন্য রেশম উৎপাদিত রাজ্যগুলিতে উন্নত ধরনের প্রকল্প নেওয়া হইয়াছে। এইসব প্রকল্পে প্রায় 100 কোটি টাকার বৈদিশিক মুদ্রা অর্জন করা যাইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রধান চারিটি গবেষণা কেন্দ্রগুলি হইল—

1. সেণ্ট্রাল সেরিকালচার রিসার্চ স্টেশন, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ (মালবেরী)।
2. সেরিকালচার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, চানাপাতনা, মহীশূর (মালবেরী)।
3. সেণ্ট্রাল মুগা এ্যাণ্ড এরি রিসার্চ স্টেশন, টিটাবড়, আসাম।
4. সেণ্ট্রাল তসর রিসার্চ স্টেশন, রাঁচী, বিহার।

এই গবেষণা কেন্দ্রগুলির অধীনে অনেকগুলি ছোট কেন্দ্র (Substation) এবং এক্সটেন্‌শন সেণ্টার (Extension centre) বিভিন্ন রাজ্যে ছড়াইয়া আছে। কেন্দ্রীয় রেশম সংস্থার (Central Silk Board)-সহায়তায় রেশম-শিল্পের বিভিন্ন বিষয়গুলি এইসব ছোট সংস্থা দেখাশুনা করে ও প্রশিক্ষণ দেয়।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ অংশত দৃঢ় করিতে রেশমশিল্পের অবদান যথেষ্ট। এই শিল্পে সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে নিযুক্ত থাকিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্নসংস্থান যেমন হয় তেমন অন্যদিকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও উপার্জন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে. বিশেষতঃ অনুন্নত এলাকার অধিবাসীরা রেশমচাষে নিযুক্ত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন।

মৌমাছি পালন (Apiculture)

সূচনা (Introduction) ঃ

মৌমাছি একটি অর্থকরী উপকারী পতঙ্গ। এই পতঙ্গ পালন করিয়া বর্তমানে একটি লাভজনক কুটিরশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন যুগ হইতে ভারতে মৌমাছি ও মধুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। প্রাচীন পুঁথি, বেদ, পুরাণ ইত্যাদিতে মধুর উল্লেখ আছে। পৌরাণিক রাজাদের পোষাকে, মুদ্রায়, গম্বুজে, মুকুটে, মৃতদেহের কফিন বাক্সে মৌচাকের চিত্র উৎকীর্ণ থাকিত। প্রাচীনকালে মধু ও মৌ-মোম কর হিসাবে গ্রহণ করা হইত। পূজাপার্বন ও সামাজিক উৎসবে মধুর ব্যবহার প্রাচীনকালেই প্রচলিত ছিল। ঔষধ হিসাবে বিভিন্ন প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রে মধুর উল্লেখ আছে। বর্তমানে মধু ও মোমের ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

প্রাচীনকালে দেশে ও বিদেশে মৌমাছি পালন অমনোবৈজ্ঞানিক ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 1851 খ্রীষ্টাব্দে Reverend L. L. Langstroth মৌচাষের নূতন আধুনিক ধারার প্রবর্তন করেন। 1865 খ্রীষ্টাব্দে Major Hruschka মধু নিষ্কাশক যন্ত্র এবং 1870 খ্রীষ্টাব্দে Moses Quinby স্মোকার আবিষ্কার করেন।

কৃত্রিম উপায়ে 1882 খ্রীষ্টাব্দে অবিভক্ত বংগদেশে এবং 1884 খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে মৌমাছি চাষ শুরু হয়। তৎকালীন ইংরেজ সরকার মৌচাষের কিছু তথ্য 1883 সালে প্রকাশ করেন। 1907 খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম Bee-Keepers association গড়িয়া ওঠে এবং সিমলায় প্রথমে মৌচাষের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। 1917 খ্রীষ্টাব্দে Reverend Newton সমতলভূমিতে উপযুক্ত মৌচাষের হাইভ (Hive)নির্মাণ করেন। দক্ষিণ ভারতে এখনও এই হাইভ **'নিউটন হাইভ'** নামে প্রচলিত। 1928 খ্রীষ্টাব্দে Royal commission on agriculture মৌচাষ সম্পর্কে মানুষকে উৎসাহিত করে এবং তাঁহাদের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মৌচাষ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। 1939 খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত মৌপ্রতিপালক সংস্থা সৃষ্টি হয়। ইহাদের নেতৃত্বে জেলা ভিত্তিক ও আঞ্চলিক ভিত্তিক মৌপ্রতিপালক সংস্থা গড়িয়া ওঠে। 1945 খ্রীষ্টাব্দে

প্রথম পাঞ্জাবে কেন্দ্রীয় মৌচাষ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে কোয়াম্বাটুর, রূপতলা ও সুন্দরনগরে এই গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সর্বভারতীয় খাদি এবং গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পুনা ও মহাবালেশ্বরে কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়।

বর্তমানে কানাডা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে মৌমাছির ব্যাপক চাষ হয়। মৌমাছি পরাগসংযোগে সাহায্য করে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে মৌবাক্স স্থাপনের একটি প্রবণতা দেখা যায়। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে মৌবাক্স স্থাপনের অঞ্চলে আম, লিচু, জাম ইত্যাদির ফলন অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মৌচাষ শিক্ষণ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। বেকার ও দুঃস্থ ব্যক্তিরা এই কেন্দ্রে অন্ততঃপক্ষে একুশ দিনের শিক্ষণ গ্রহণ করিতে পারে। এই সকল কেন্দ্র হইতে অল্প টাকার বিনিময়ে চাষের বাক্স (Hivebox) বিক্রী করা হয়। এবং রাণী মৌমাছি, শ্রমিক ও পুরুষ মৌমাছি সরবরাহ করা হয়। এক ঋতুর পরেই একটি হইতে দুইটি হাইভ তৈরি করা যায় অবশ্য তখন বাক্সটি শুধু কিনিতে হইবে।

ভারতে বিভিন্ন ধরনের মৌমাছি (Different types of honeybees in India) ঃ

ভারতে সাধারণতঃ পাঁচ ধরনের মৌমাছির চাষ করা হয়।

(i) **এপিস ইণ্ডিকা** (Apis indica) ঃ বনে জঙ্গলে ও সমতলভূমিতে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ফোকর, শাখাপ্রশাখা, গুহার মধ্যে, ঘন ঝোপে ও বাড়ীর অন্ধকার নির্জন এলাকায় সিঁড়ির তলায় ইহারা চাক তৈয়ারি করে। ইহারা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। কাঠের তৈয়ারী বাক্সে ইহাদের পালন করা হয়। প্রতিটি মৌচাক হইতে 4-4·5 কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

(ii) **মেগাপিস ডরসাটা** (*Megapis dorsata*) বা এপিস ডরসাটা (*Apis dorsata*) ঃ ইহারা আকারে খুব বড় হয়, গাছের শাখার নীচে ও পাহাড়ের খাঁজে ছয়ফুট পর্যন্ত লম্বা মৌচাক তৈয়ারি করে। ইহাদের ভারতে এবং এশিয়া মহাদেশের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে ইহাদের শুধুমাত্র ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে পাওয়া যাইত, পরে মৌচাষীরা ইহাদের দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে লইয়া যায়। কাঠের মৌবাক্সে ইহারা মৌচাক

তৈয়ারি করে না। একটি চাক হইতে অন্ততঃ 25 হইতে 30 কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

(iii) **এপিস মেলিফেরা** (*Apis mellifera*) ঃ এই মৌমাছি আকারে ক্ষুদ্র। মেগাপিস ডরসাটার ন্যায় ইউরোপে ইহাদের বাসস্থান ছিল। ইহারা সহজেই পোষ মানে। পশ্চিমবঙ্গে এই মৌমাছির চাষ করা হয়।

(iv) **এপিস মেলিপোনা** (*Apis mellipona*) ঃ আকারে ছোট এই মৌমাছির হুল থাকে না। ভারতের পূর্বাঞ্চলে, আসাম, মেঘালয়ে এই মৌমাছির চাষ করা হয়। মাটি, মোম ও রেজিন জাতীয় পদার্থ দ্বারা ইহারা চাক তৈয়ারি করে।

(v) **এপিস ফ্লোরিয়া** (Apis florea) ঃ ইহাদের লিটল-বি বা ছোট মক্ষী বলে। ইহারা সমতলভূমিতে বাস করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 275 মিটার উচ্চতার উপরে ইহাদের পাওয়া যায় না। পরিযান করা ইহাদের বৈশিষ্ট্য। পাঁচ-ছয় মাসের বেশী একস্থানে বাস করে না। ইহাদের চাকটি ছয় ইঞ্চির মত লম্বা হয়। ঝোপে, ঝাড়ে, চিমনির মধ্যে, বাড়ীর কার্ণিসে চাক তৈয়ারি করে। ইহাদের চাক হইতে বৎসরে এক কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

মৌ-কলোনী ও জীবনচক্র (Bee-colonies and life cycle) ঃ

মৌমাছি পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণী। ইহাদের দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর লইয়া গঠিত। বক্ষে তিনজোড়া পদ, একজোড়া ডানা থাকে। মস্তকে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি, একজোড়া শুঙ্গ ও মুখ উপাঙ্গ আছে।

পর্ব ঃ সন্ধিপদ (Arthropoda)
শ্রেণী ঃ ইনসেক্টা (Insecta)
বর্গ ঃ হাইমেনোপটেরা (Hymenoptera)
গোত্র ঃ এপিডি (Apidae)
গণ ঃ এপিস (Apis)

মৌমাছি একটি সামাজিক পতঙ্গ। ইহাদের মধ্যে শ্রমের বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। মৌমাছির কলোনীতে গঠন ও শ্রমের ভিত্তি করিয়া মৌমাছি তিনটি শ্রেণীতে (caste) বিভক্ত। যথা—রাণী মৌমাছি (Queen), শ্রমিক (Workers) এবং পুরুষ মৌমাছি (Drones)। একটি আদর্শ কলোনীতে একটি রাণী, 20,000 হইতে 30,000 শ্রমিক এবং কয়েকশত ড্রোনস্ থাকে।

1. **রাণী** (Queen) : রাণী মৌমাছি হইতেছে পরিণত স্ত্রী মৌমাছি। একটি চাকে একটি মাত্র রাণী মৌমাছি থাকে। পুরুষ মৌমাছির সহিত সংগমের পর রাণী মৌমাছি প্রায় সারা বছরই ডিম পাড়ে। রাণী মৌমাছি উড়ন্ত অবস্থায় পুরুষ মৌমাছির সহিত ছয়বার পর্যন্ত সংগমে লিপ্ত হয়। শ্রমিক মৌমাছির নির্দেশানুসারে রাণী নিষিক্ত বা অনিষিক্ত ডিম্বাণু প্রসব করে। নিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে শ্রমিক ও রাণী মৌমাছির উৎপত্তি ঘটে। অনিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে পুরুষ মৌমাছির সৃষ্টি হয়। পরিণত রাণী মৌমাছি মৌচাকের উপর চলিয়া বেড়ায়, চাকের নির্দিষ্ট ফাঁকা খোপে ডিম পাড়ে। ডিম হইতে তিনদিন পর লার্ভাদশায় পরিণত হয়। লার্ভাকে এই অবস্থায় কর্মী মৌমাছিরা এক বিশেষ ধরনের খাদ্য (brood food) সরবরাহ করে। এইভাবে পাঁচদিন খাওয়াইবার পর কর্মী মৌমাছিরা প্রকোষ্ঠের মুখ মোম দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয়। যে লার্ভা প্রায় খাদ্যের মধ্যে ভাসিয়া থাকে এবং রাজকীয় জেলী (Royal jelly) খায় তাহারা পরবর্তী পর্যায়ে রাণী মৌমাছিতে পরিণত হয়। প্রকোষ্ঠের মধ্যে লার্ভা গুটির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে এবং পরবর্তী 7 দিনে পূর্ণাঙ্গ রাণী মৌমাছিতে পরিণত হয়। ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় আসতে প্রায় 16 দিন সময় লাগে। নূতন রাণী সৃষ্টি হইবার পর কর্মী মৌমাছি এই রাণীকে পুরাতন রাণীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। মৌচাক হইতে নূতন রাণী মৌমাছি বাহির হইয়া একাধিক পুরুষ মৌমাছির সহিত সংগমে লিপ্ত হয়। সংগমের পর পুরুষ মৌমাছি মারা যায় এবং রাণী মৌমাছি চাকে ফিরিয়া আসে।

চাকে ফিরিয়া নূতন রাণী ডিম পাড়িতে শুরু করে। চাকের রাণী মৌমাছি বৃদ্ধ হইলে বা ডিম উৎপাদনে অক্ষম হইলে কর্মী মৌমাছিরা নূতন রাণী মৌমাছি সৃষ্টি করে। অনেক সময় নূতন রাণী মৌমাছি পুরাতন রাণীর সহিত একসপ্তাহ কাল একই চাকে অবস্থান করে। পরে পুরাতন রাণী মারা যায় অথবা কর্মী মৌমাছিরা উহাকে মৌচাক হইতে বাহির করিয়া দেয়। অনেক সময় কর্মীরা পুরাতন রাণী মৌমাছির জন্য চাকের একপাশে ছোট কুঠুরী তৈয়ারি করে।

2. **শ্রমিক বা কর্মী** (Workers) : কর্মী মৌমাছি স্ত্রী মৌমাছি, কিন্তু সংগমকার্যে রত হয় না এবং ডিম পাড়ে না। রাণী মৌমাছি অপেক্ষা ইহারা আকারে ছোট। দেহের কোন কোন অংশ রাণী অপেক্ষা উন্নত হয়। চোখ

এবং পশ্চাৎপদ উন্নত, পশ্চাৎপদে একটি বিশেষ অংশ পরাগ বহনে সাহায্য করে। পেটের নিচে Scent গ্রন্থি ও মোম গ্রন্থি আছে। মস্তিষ্কে Brood food গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রস খাওয়াইয়া তাহারা চাকে নূতন রাণী মৌমাছি তৈয়ারি করে। মৌচাকের সাধারণ প্রকোষ্ঠ হইতে কর্মী মৌমাছির সৃষ্টি হয়। রাণী মৌমাছি মৌচাকের সাধারণ প্রকোষ্ঠে নিষিক্ত ডিম পাড়ে। ডিম পাড়িবার তিনদিন পর ডিম হইতে লার্ভা বাহির হয়। রাণী মৌমাছির সৃষ্টির ন্যায় ইহাদেরও Brood food খাওয়ানো হয়, তবে মাত্র দুইদিন এই খাদ্য কর্মীরা সরবরাহ করে। ইহার পরে কর্মীরা ইহাদের পাতলা জল মিশ্রিত মধু ও পরাগ খাইতে দেয়, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য দেওয়া হয় না। এইভাবে পাঁচদিন খাওয়ানোর পর কর্মীরা প্রকোষ্ঠের মুখ মোম দ্বারা বন্ধ করে। এই প্রকোষ্ঠে লার্ভা পিউপাতে পরিণত হয়। প্রায় ডিম পাড়িবার একুশ দিন পর পূর্ণাঙ্গ কর্মী মৌমাছিতে পরিণত হয়। তবে গ্রীষ্মকালে ইহাদের জীবনচক্র শীঘ্র সংঘটিত হয়।

কর্মী মৌমাছিরা মৌচাকের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে। চাকের লার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা, রাণীকে ও কর্মীকে খাওয়ান, মৌচাক গঠন, মধু সংগ্রহ, চাক পরিষ্কার রাখা, বাতাবরণের ব্যবস্থা, চাক পাহারা দেওয়া, মধু সঞ্চয় প্রভৃতি চাকের সকল কার্য সম্পন্ন করে।

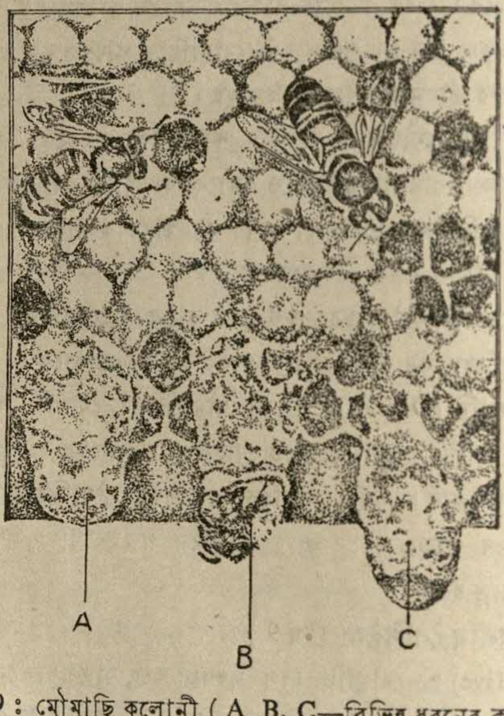
চাকের বাইরে কর্মী মৌমাছিরা দুইটি পৃথক কাজে ব্যস্ত থাকে, একদল খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় অপরদল সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকে।

পুরুষ মৌমাছি (Drones) : পুরুষ মৌমাছি কর্মী মৌমাছি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বড়, পেটের পশ্চাৎপ্রান্ত ভোঁতা হয়। মৌচাকের বড় প্রকোষ্ঠে পুরুষ মৌমাছি বাস করে। কর্মী মৌমাছির মতই পুরুষ মৌমাছির জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়। ডিম পাড়া হইতে প্রায় 24 দিন পর ইহারা পূর্ণাঙ্গ পুরুষ মৌমাছিতে পরিণত হয়।

মৌমাছি কলোনীর বৈশিষ্ট্য (চিত্র 9) :

মৌচাক (Hive) : মৌমাছি বাস করবার জন্য, বাচ্চা পালনের জন্য এবং মধু সংগ্রহের জন্য মৌচাক তৈরারি করে। মৌমাছি মোম দ্বারা মৌচাক তৈরারি করে। মৌবাক্সে কাঠের ফ্রেমে কুঠুরি সমেত মৌচাক কেনা যায়। শ্রমিক মৌমাছির উদরের নিচে মোমগ্রন্থি থাকে। এই মোম গ্রন্থি হইতে মোমের আঁশ তৈরী হয়। এই মোম হইতে মৌমাছি মৌচাক তৈরি করে।

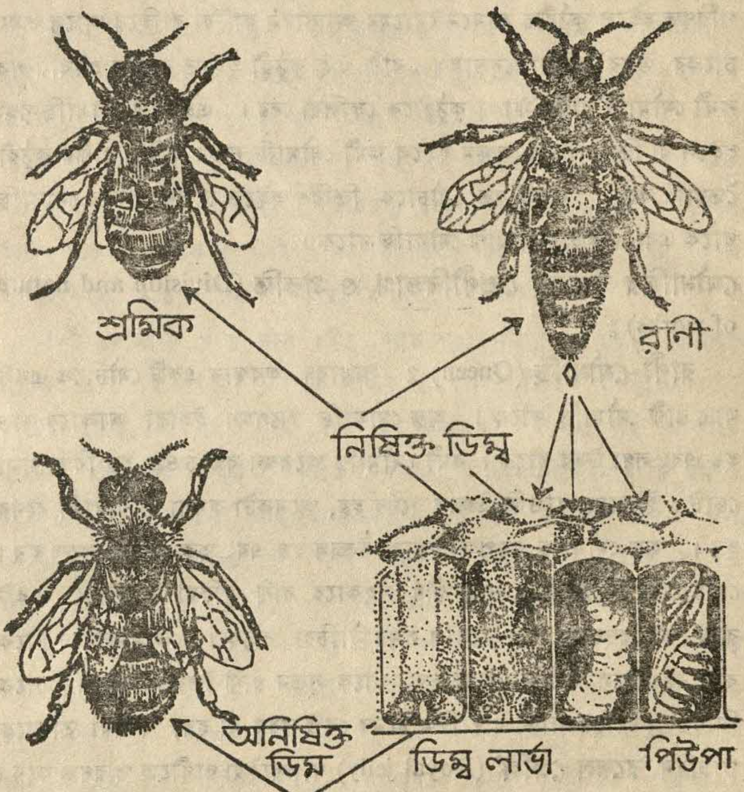
মৌচাক কোন বস্তুর সহিত আটকাইয়া নিচের দিকে ঝুলিতে থাকে। স্বাভাবিক পরিবেশে বা মৌবাক্সে কাঠের ফ্রেমে উপরের দিক হইতে নিচের দিকে কর্মীরা চাক তৈয়ারি করে। চাকে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলির ষড়্ভূজাকার প্রাচীর বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠের পশ্চাৎদেশ বন্ধ এবং সামনের মুখ খোলা। তবে পশ্চাতের প্রাচীর হইতে সামনের মুখ কিছুটা উপরে অবস্থান করে, যাহাতে মধু গড়াইয়া না পড়ে। মৌচাকগুলি প্রথমে সাদা থাকে, পরে হলুদ বর্ণের বা কালো হয়। চাকের প্রকোষ্ঠগুলি পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। মৌচাক প্রায় 30 হইতে 45 সেন্টিমিটার লম্বা এবং 15 হইতে 30 সেন্টিমিটার চওড়া হইতে পারে।



চিত্র 9 : মৌমাছি কলোনী (A, B, C—বিভিন্ন ধরনের কুঠুরী)

মৌচাকে বিভিন্ন ধরনের প্রকোষ্ঠ থাকে। উপরের দিকের প্রকোষ্ঠে মধু জমা থাকে, ইহাকে **মধু কুঠুরী** (*Honey chamber*) বলা হয়। মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠে পরাগরেণু সঞ্চিত থাকে। নিচের প্রকোষ্ঠগুলিতে রাণী মৌমাছি ডিম পাড়ে, ইহাদের **অপত্য প্রকোষ্ঠ** (*Brood chamber*) বলা হয়।

অপত্য প্রকোষ্ঠের উপরের ছোট কুঠুরীতে শ্রমিক মৌমাছি জন্মায় ও থাকে, মধ্য কুঠুরী অপেক্ষাকৃত বড়, পুরুষ মৌমাছি থাকে। নিচের দিকে চাকের প্রান্তভাগে বিশেষ কুঠুরীতে রাণী মৌমাছি থাকে। রাণী মৌমাছির প্রকোষ্ঠ চাকের সীমানা নির্ধারণ করে। যদি মধু পরিপক্ক হয় বা লার্ভাকে খাওয়ান



চিত্র 10 : মৌমাছির জীবনচক্র

সম্পূর্ণ হয় তবে কর্মী মৌমাছিরা মধু কুঠুরী এবং অপত্য কুঠুরীর মুখ মোম দ্বারা বন্ধ করে। কর্মী মৌমাছির কুঠুরী $\frac{1}{5}$ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হয় এবং পুরুষ মৌমাছির কুঠুরীর ব্যাস হয় $\frac{1}{2}$। 35 সেন্টিমিটার লম্বা ও 22 সেন্টিমিটার চওড়া মৌচাকে প্রায় তিন কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

রাণী মৌমাছির কুঠুরী প্রায় আড়াই সেন্টিমিটার লম্বা এবং বেলনাকৃতি।

এই কুঠরীর মুখ চাকের নিচের দিকে থাকে। এই কুঠরী মোম দ্বারা তৈয়ারী। কিন্তু এই মোমের সঙ্গে প্রচুর পরাগরেণু মিশিয়া থাকে, ফলে কুঠরীর বর্ণ অপেক্ষাকৃত কালচে হয়। একটি চাকে দুই-তিনটি এই কুঠরী দেখা যায়। এই কুঠরীতে নিষিক্ত ডিম হইতে রাণী মৌমাছির সৃষ্টি হয় এবং কুঠরীতে কর্মী মৌমাছি তৈয়ারি হয় (চিত্র 10)। এই কুঠরীতে রাণী পরিণত হইলে কুঠরীর সামনে মোমের আচ্ছাদন কাটিয়া বাহিরে আসে এবং চাকের উপর ঘুরিয়া বেড়ায়। রাণী এই কুঠরী হইতে বাহির হইবার পর কর্মী মৌমাছি রাণীর ফাঁকা কুঠরীকে ফেলিয়া দেয়। এই রাণী মৌমাছি বৃদ্ধা হইলে বা ডিম পাড়ায় অক্ষম হইলে কর্মী মৌমাছি নূতন করিয়া রাণীর কুঠরী তৈয়ারি করে। একটি বড় মৌচাকে তিরিশ হইতে চল্লিশ হাজার মৌমাছি থাকে এবং একটি মাত্র রাণী মৌমাছি থাকে।

মৌমাছির কাজের শ্রেণীবিভাগ ও প্রকৃতি (Division and nature of works) ঃ

রাণী মৌমাছি (Queen) ঃ সাধারণ অবস্থায় একটি মৌচাকে একটি মাত্র রাণী মৌমাছি থাকে। অন্য মৌমাছি অপেক্ষা ইহারা আকারে বড় হয় এবং লম্বা উদর থাকে। কর্মী মৌমাছি অপেক্ষা বক্ষ চওড়া হয় কিন্তু ডানা ছোট। ইহাদের পাগুলি উজ্জল বর্ণের হয়, অনেকটা কমলা বা বাদামী বর্ণের হয়। অন্য মৌমাছি অপেক্ষা ইহারা উজ্জল হয় এবং ত্বক নরম ও মসৃণ হয়। মৌচাকের উপর ধীরে ও গাম্ভীর্য সহকারে রাণী ঘুরিয়া বেড়ায়। একটি রাণী তিন বছর বা তারও বেশি সময় বাঁচিয়া থাকে। কোন কারণে চাকে রাণী নষ্ট হইলে শ্রমিক মৌমাছিরা চাকে নূতন রাণী তৈয়ারি করে। চাকে নিষিক্ত ডিম্বাণুর লার্ভা যদি তিনদিনের বেশী বয়স্ক না হয়, কর্মীরা তাহাকে পাঁচদিন **'রয়েল জেলি'** (Royal jelly) খাওয়াইয়া রাণীতে পরিণত করে। এই অবস্থায় কর্মীরা এই কুঠরীকে বড় করে। এই সময় কর্মীরা একাধিক রাণী তৈয়ারি করে। পরবর্তী পর্যায়ে সবাইকে মারিয়া ফেলে। শুধুমাত্র একটি রাণী মৌমাছি ডিম পাড়িবার উপযোগী হয়। এই ক্ষেত্রে মৌচাকের চাকে বা কোন রোগে রাণী মৌমাছি মারা যায়।

রাণী মৌমাছির পিছনে বাঁকা হুল থাকে। এই হুল তাহারা সাধারণতঃ মানুষকে ফোটায় না। প্রতিদ্বন্দী রাণী মৌমাছিকে হুল দ্বারা আক্রমণ করে। রাণী মৌমাছির একমাত্র কাজ ডিম পাড়া। ইহারা চাকের অন্য কোন কাজ

করে না। কর্মী মৌমাছিরা তাহাকে পরিষ্কার রাখে এবং কর্মীর মস্তিষ্কে অবস্থিত গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাওয়ায়, ফলে রাণী মৌমাছি প্রতিদিন দুই হাজার পর্যন্ত ডিম পাড়ে। সংগমের সময় এবং 'সোয়ার্মিং'-এর সময় রাণী মৌমাছি উড়ে।

চাকে নূতন রাণী মৌমাছি জন্মাইবার উপক্রম হইলে পুরাতন রাণী কিছু কর্মী লইয়া নূতন চাক করিবার জন্য অন্যত্র উড়িয়া যায়। যদি রাণী মৌমাছি বৃদ্ধা হয় বা ডিম পাড়িতে অক্ষম হয় তবে রাণীকে কর্মী মৌমাছি চাক হইতে বাহির করিয়া দেয়, খাদ্য দেয় না কিংবা মারিয়া ফেলে।

কর্মী মৌমাছি (Workers) ঃ কর্মী মৌমাছিরা ফুলের মকরন্দ এবং পরাগ সংগ্রহ করে। ইহারা স্ত্রী মৌমাছি এবং বিশেষ প্রতিকূল পরিবেশে ডিম পাড়ে। শ্রমিক বা কর্মী মৌমাছিরা ডিম লার্ভার পরিচর্যা করে, খাদ্য সংগ্রহ করে, মৌচাক তৈয়ারি করে, মৌচাককে রক্ষা করে।

কর্মী মৌমাছি মাত্র চার হইতে পাঁচ সপ্তাহ বাঁচিয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড প্রখরতায় ইহারা বিশেষ সক্রিয় থাকে। যদি ইহারা শীতের সময় বাঁচিয়া থাকে, তবে ছয় মাসের বেশী সময় বাঁচে। এই মৌমাছি আকারে ক্ষুদ্রতম হয় এবং একটি মৌচাকের শতকরা আটানব্বইটি মৌমাছি কর্মী। ইহাদের হুল থাকে এবং আত্মরক্ষার চরম মুহূর্তে হুল ব্যবহার করে। হুল ফোটাইবার পরেই ইহারা মারা যায়। হুল মানুষের দেহ হইতে বাহির করিতে পারে না, হুল ভাঙিয়া যায় ফলে কর্মী মৌমাছি মারা যায়।

কর্মী মৌমাছি যতদিন বাঁচে ততদিনই কাজ করে। অতিরিক্ত পরিশ্রমেই তাহাদের মৃত্যু বেশী ঘটে। একটি মৌমাছি তাহার জীবদ্দশায় এক চামচ মধু সংগ্রহ করে। একটি কর্মী মৌমাছি তাহার জীবদ্দশায় তিনমাইল ব্যাপী স্থান 40,000 বার পরিক্রমা করে। মধুপ্রবাহ কালে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাহারা কম দিন বাঁচে। কিন্তু শীতকালে ইহাদের সৃষ্টি হইলে অধিক সময় বাঁচে।

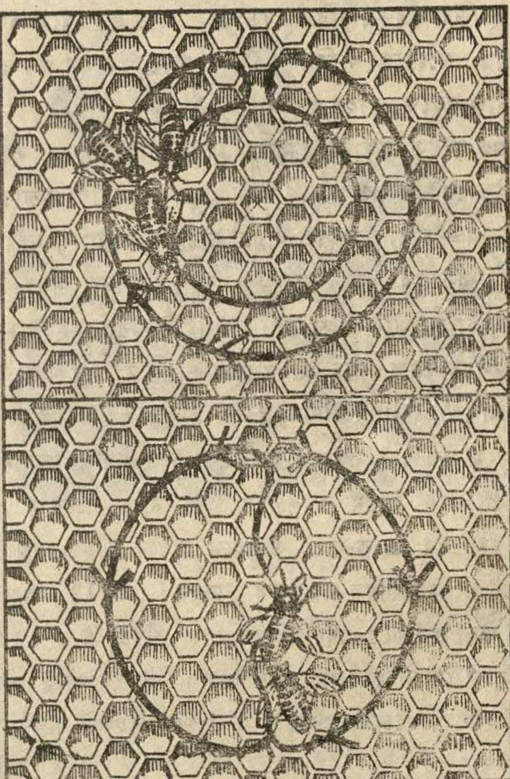
পুরুষ মৌমাছি (Drones) ঃ ইহারা রাণী মৌমাছির সঙ্গে প্রজননে অংশগ্রহণ করে। মৌচাকে ইহাদের সংখ্যা কর্মী মৌমাছি অপেক্ষা অনেক কম থাকে। সাধারণতঃ মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ইহাদের চাকে দেখা যায়। ইহাদের দেহ অপেক্ষাকৃত মজবুত হয়। ইহাদের দেহে রোমের পরিমাণ বেশী হয় এবং ইহারা অলস প্রকৃতির হয়।

ইহারা সাধারণতঃ সূর্যালোকে উড়ে তবে বিকালের দিকে উড়া পছন্দ করে। গ্রীষ্মের পর কর্মী মৌমাছিরা পুরুষ মৌমাছিকে মৌচাক হইতে তাড়াইয়া দেয়। খাদ্যাভাবে ও ঠাণ্ডায় পুরুষ মৌমাছি মারা যায়। শীতকালে কর্মীরা খাদ্য আহরণ করে না, সঞ্চিত খাদ্য খায়। এই সঞ্চিত খাদ্যে যাহাতে পুরুষ ভাগ বসাইতে না পারে সেইজন্য কর্মীরা এই সময় মৌচাকে পুরুষ মৌমাছি রাখা পছন্দ করে না। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিটি পুরুষ মৌমাছির পরিচর্যার জন্য 5-6টি কর্মী মৌমাছি থাকে। ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে না। কিন্তু খায় বেশী, আর রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া দিন কাটায়।

কর্মী মৌমাছির নৃত্য (Bee dance) ঃ

একদল মৌমাছি চাকের কাছাকাছি খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। খাদ্যের সন্ধান পাইলে বিভিন্ন নাচের ভঙ্গীতে (চিত্র 11) মৌচাকের কাছে উড়ে এবং সংগ্রাহক দলকে খাদ্যের ঠিকানা জানায়। এই নাচের ভঙ্গী বৃত্তাকার বা ইংরাজী '8' অক্ষরের ন্যায় হয়। খাদ্যের উৎস খুব নিকটে হইলে বৃত্তাকারে নৃত্য করে এবং উৎস দূরে হইলে ইংরাজী '8' অক্ষরের ন্যায় নৃত্য করে। মাধ্যাকর্ষণ রেখার সহিত নির্দিষ্ট কোণ করিয়া ইহারা নৃত্যের সমাপ্তি করে। ইহাতে খাদ্যের উৎসের দিক্ ও দূরত্ব অনুমান করিতে পারে। এই প্রকার কোণ-গঠন নৃত্য সূর্য ও খাদ্যবস্তুর মধ্যে অবস্থিত কৌণিক অবস্থানের নির্দেশ জ্ঞাপন করে। এই সূত্র অনুধাবন করিয়া সংগ্রাহক কর্মীরা খাদ্যের আহরণে বাহির হয়। এই বৃত্তাকার নৃত্যের সময় মনে করিতে হইবে খাদ্য 100 মিটার দূরত্বের মধ্যে আছে। একবার বৃত্তাকার পথে ঘুরিবার পর পুনরায় বিপরীত দিকে বৃত্তাকারে ঘোরে। এইভাবে দিকের পরিবর্তন করিয়া নাচিয়া চলে। ইহারা আহরিত খাদ্যকণা বা গাত্রস্থিত খাদ্যকণার মাধ্যমে কি প্রকার খাদ্য পাওয়া যাইবে তাহা সংগ্রাহক দলকে জানায়। '8' অক্ষরের ন্যায় বা অর্ধবৃত্তাকার নৃত্যে (tailwagging dance) সংগ্রাহক কর্মীরা দূরত্ব ও দিক্ বুঝিতে পারে। মৌচাকের সোজা উপরের দিকে নৃত্য করিলে মনে করিতে হইবে সূর্যের দিকে খাদ্যের উৎস আছে। নিচের দিকে নৃত্যের অর্থ খাদ্যের উৎস সূর্যের বিপরীত দিকে আছে। মৌচাকের সহিত কোণ করিয়া নৃত্য করিলে বোঝা যায় মৌমাছির সহিত সূর্যের কৌণিক অবস্থানে খাদ্য আছে। এই নৃত্যের ক্ষেত্রে খাদ্যের উৎস 100 মিটারের বেশী দূরত্বে

অবস্থান করে। কম সময় নৃত্য করিলে মনে করা হয় খাদ্যের উৎসের পরিমাণ কম। কিন্তু খাদ্যের উৎসের পরিমাণ অতিরিক্ত বেশী হইলে কর্মী মৌমাছিরা দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া নৃত্য করে। জন্মাইবার দশদিন পর হইতেই কর্মী মৌমাছিরা মৌচাক ছাড়িয়া খাদ্য অন্বেষণে বাহির হয়। দিক্ ও আলোর উজ্জ্বলতা দেখিয়া ইহারা দিক্ নির্ণয় করে। ইহারা শুধু স্থানটি চিনিয়া রাখে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মৌবাক্স কয়েক মিটার দূরে সরাইয়া রাখিলেই



চিত্র 11 : কর্মী মৌমাছির নৃত্য

ইহারা বাক্সে ফিরিতে পারে না। ইহারা এইভাবেই দিক্ ঠিক রাখিয়া চাক হইতে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে খাদ্য অন্বেষণে যায়। ইহারা এইভাবে

নিজেরা দিক্ নির্দিষ্ট রাখে এবং অন্য কর্মী মৌমাছিকে খাদ্যের উৎসের নির্দিষ্ট দিকের সন্ধান দেখায়। সূর্য ইহাদের যাত্রায় কম্পাসের কাজ করে।

কর্মী মৌমাছির নৃত্য অনেকদিন পূর্বে লক্ষ্য করা গিয়াছে। জার্মানীর অধ্যাপক Von Frisch এই নৃত্যের ভাষা প্রথম উপলব্ধি করেন।

মৌচাকের বিভিন্নকালীন অবস্থা (A year in the hive) :

শীতকালে মৌচাকের বা মৌবাক্সের কাছাকাছি কিংবা ফুলের ও ফলের বাগানে সচরাচর মৌমাছি দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে এবং বসন্তকালে ইহারা চাক ছাড়িয়া যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রায় জুন মাস পর্যন্ত অত্যধিক পরিমাণে খাদ্য অন্বেষণে বাহির হয়। আগষ্ট মাসের পর হইতে ইহারা সাধারণতঃ চাক হইতে বাহির হয় না।

শীতের শুরু হইতে ইহারা চাকের মধ্যে গায়ে গায়ে লাগিয়া বসিয়া থাকে। এইভাবে ইহারা দেহকে গরম রাখে। ইহারা অন্যান্য প্রাণীর মত শীতঘুম দেয় না। সারা শীতকাল ধরিয়া চাকে থাকিয়া সংগৃহীত মধু খায় এবং পরবর্তী বসন্তের জন্য অপেক্ষা করে। অনেক সময় প্রচণ্ড শীতে সূর্যালোকে মৌমাছির ঝাঁক লক্ষ্য করা যায়। ইহারা সেই সময় গ্রীষ্মকাল ভাবিয়া ভুল করিয়া চাক ছাড়ে এবং বেশীর ভাগই ঠাণ্ডায় মারা যায়।

সঙ্গম উড্ডয়ন (Wedding flight) :

রাণী মৌমাছির যৌনসঙ্গমের সময় সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস। রাণী চাকে বা প্রকোষ্ঠে সঙ্গমে অংশগ্রহণ করে না। প্রকোষ্ঠ হইতে রাণী হইবার তিন দিন পর প্রাক্-সঙ্গম উড্ডয়নে রাণীর সহিত অন্যান্য মৌমাছির পরিচিতি ঘটে। কয়েকদিন পর সঙ্গম উড্ডয়ন (চিত্র 12) শুরু হয়। চাক ছাড়িয়া রাণী উড়া শুরু করে এবং উহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ চাক হইতে বা অন্য চাক হইতে পুরুষ মৌমাছিরা যাত্রা শুরু করে। স্ত্রী মৌমাছি পুরুষ অপেক্ষা দ্রুত উড়ে, ফলে সবচেয়ে ক্ষমতাবান পুরুষ তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং প্রজনন কার্যে রত হয়।

অনেকের মতে একটি পুরুষ সঙ্গমে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় জানা যায় অন্ততঃ দশটি পুরুষ একটি স্ত্রী মৌমাছিকে সঙ্গম করিতে পারে। সঙ্গমের পর রাণী মৌমাছি চাকে ফিরিয়া আসে। রাণীর শুক্রধানীতে অসংখ্য শুক্রাণু জমা থাকে। এই শুক্রাণু সারা বৎসর ডিমগুলিকে নিষিক্ত করে। বৎসরান্তে কিছুদিনের জন্য ডিম পাড়া বন্ধ করে এবং সোয়ার্মিং-

এর সময় আবার চাক ছাড়িয়া উড়ে। শীতের শেষ হইতে শুরু করিয়া রাণী চাকের প্রতি কুঠুরীতে একটি করিয়া ডিম পাড়ে।



চিত্র 12 : সঙ্গম উড্ডয়ন

রাণী মৌমাছির এক সপ্তাহ বয়সকালে সঙ্গমে রত হয়। যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে, তবে রাণী চাক ছাড়িয়া বাহির হয় না। অনেকদিন বাহির না হইলে তাহারা আর উড়িতে সক্ষম থাকে না। সেক্ষেত্রে চাকের রাণী মৌমাছি চাকের কোন কাজে লাগে না। কর্মীরা নূতন রাণী তৈয়ারি করে অথবা মৌপালক মৌবাক্সের জন্য নূতন রাণী মৌমাছি সংগ্রহ করে।

সোয়ার্মিং (Swarming) :

বসন্তের শুরুতেই ব্রুড (Brood) পালন শুরু হয় এবং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে কলোনী সুগঠিত হয়। চাকে মৌমাছির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এই সময় চাকের নিচে ও পার্শ্বচাকে রাণীকুঠুরী তৈয়ারী হয়। যখন নূতন রাণী বাহির

হইবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখনই পুরাতন রাণী মৌমাছি অসংখ্য কর্মী মৌমাছি লইয়া নূতন চাক বাঁধিবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই উড়িবার পদ্ধতিকে সোয়ার্মিং বলে। বেশ কিছু সময় উড়িবার পর রাণী ও কিছু মৌমাছি কোন ঝোপে বা গাছে আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন কর্মী দিকে দিকে ছুটিয়া যায় স্থান নির্ধারণের জন্য। অনেক সময় এই স্থান নির্ধারণ করতে দুই দিন সময় লাগিয়া যায়। বেশ কিছু সময় এইভাবে উড়িয়া উপযুক্ত স্থান নির্বাচন হইলে কর্মীরা নূতন মৌচাক গঠন করে এবং রাণী ডিম পাড়া শুরু করে।

পুরাতন চাকে একাধিক রাণীর সৃষ্টি হয়। একটি রাণী সকল প্রতিপক্ষকে মারিয়া চাকের কর্তৃত্ব অর্জন করে। অনেক সময় একাধিক সৃষ্ট রাণী অন্য কর্মী লইয়া কলোনী ত্যাগ করে।

সোয়ার্মিং পদ্ধতি শেষ হইবার পর পুরাতন চাকের মৌমাছিরা মকরন্দ ও পরাগ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কলোনীর শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং অতিরিক্ত মধু সঞ্চয় হয়। গ্রীষ্মকালে মধু সংগ্রহ চলে এবং শীতের জন্য সঞ্চয় করে। নভেম্বর মাসে ব্রুড পালন বন্ধ থাকে। এই সময় কয়েকটি পুরুষ ও রাণীকে ব্রুড কোষে পালন করা হয়। প্রথম কুমারী রাণী কোষ হইতে বাহির হইয়া পুরুষের সহিত আকাশে মিলিত হইয়া চাকে ফিরিয়া আসে। চাকে ফিরিয়া আসিয়া পুরাতন রাণীমাতাকে আক্রমণ করে এবং চাক ছাড়িতে বাধ্য করে। যদি এই সময় মধুসংগ্রহ অক্ষুণ্ণ থাকে তবে এই পুরাতন চাক হইতে একাধিক সোয়ার্ম নির্গত হয়। যদি ঘটনাচক্রে নূতন রাণী না পাওয়া যায় এবং পুরাতন রাণী নষ্ট হয় তখন কিছু কর্মীব্রুডদের পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয়, যাহাতে যৌনাংগের বৃদ্ধি ঘটে। তবে এই কর্মী অনিষিক্ত ডিম পারে। ইহা হইতে শুধু পুরুষ মৌমাছি সৃষ্টি হয়, ফলে ধীরে ধীরে কলোনী নষ্ট হইয়া যায়।

মৌমাছির বিভিন্ন কাস্ট চিনিবার উপায় (Caste determination) :

1. **ডিম** (Egg) : সকল কাস্টের ডিমই একইপ্রকার দেখিতে হয়।

2. **লার্ভা** (Larva) : রাণী ও পুরুষ লার্ভা কর্মীলার্ভা হইতে আকারে বড় হয়।

3. **পিউপা** (Pupa) : চক্ষু দুইটি পুরুষের ক্ষেত্রে মাথার উপরে মিলিত হয়। কিন্তু কর্মী অথবা রাণী পিউপার চক্ষু বেশ দূরে অবস্থিত। পুরুষের

কুঠুরীর মুখ উভোতল ঢাকনা দ্বারা আবৃত থাকে এবং ঢাকনার কেন্দ্রে ছিদ্র থাকে।

পরিণত মৌমাছি (Adult) ঃ রাণী মৌমাছির উদর অংশ লম্বা এবং প্রান্তভাগে সূচালো হুল থাকে। রাণীর ডানা অপেক্ষাকৃত ছোট। কর্মী মৌমাছির উদরে দাগ থাকে এবং ত্রিভূজাকার ও কাঁটাযুক্ত হুল থাকে। পুরুষ মৌমাছির উদর অংশ কালো আয়তাকার এবং শেষাংশ ভোঁতা। পুরুষের হুল থাকে না। রাণী মৌমাছির বক্ষদেশ প্রসারিত হয়। কর্মীর জিহ্বা মকরন্দ শোষণে সাহায্য করে। কর্মী মৌমাছির পশ্চাৎপদে পোলেন ব্রাশ ও পোলেন বাস্কেট থাকে। ইহারা পরাগ বহনে সাহায্য করে। কর্মী মৌমাছির উদরের তলদেশে মোমগ্রন্থি থাকে। পুরুষ ও রাণী মৌমাছির পশ্চাৎপদ ও জিহ্বাতে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না এবং মোমগ্রন্থি থাকে না।

মৌমাছির চাষ পদ্ধতি (Method of Apiculture) ঃ

প্রাচীন কাল হইতেই মধুর ভেষজ গুণ সম্পর্কে মানুষের জানা আছে। তাই মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৌপালন করা হয়।

সাধারণ পদ্ধতি (Common process) ঃ ইহা অতি পুরাতন পদ্ধতি। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীরা চাকের কাচাকাছি আগুন জ্বালাইয়া ধোঁয়া দেয় ফলে মৌচাকের মৌমাছিরা চাক পরিত্যাগ করে। সেই সময় ধারালো অস্ত্র দিয়া চাকটি কাটা হয় এবং চাক পিষ্ট করিয়া মধু নিষ্কাশন করা হয়।

ইহাতে মধুতে বিভিন্ন নোংরা পদার্থ থাকে। এই মধুতে চাকের মৃত লার্ভা ও পিউপার দেহাবশেষ এবং পরাগরেণু মিশিয়া থাকে। মৌচাক ও মোম নষ্ট হয়।

দেশীয় পদ্ধতি (Indigenous method) ঃ আমাদের পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে, সুন্দরবন এলাকায়, বসিরহাট অঞ্চলে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা অঞ্চলে কাঠের বড় বাক্সে মৌমাছির চাষ করা হয়। কাঠের বাক্সটি বাড়ীর অন্ধকার স্থানে বা গাছের উপরে বাঁধিয়া রাখা হয়। এই বাক্সের মধ্যে দুইটি ছিদ্র থাকে, একটি বড় ও একটি ছোট। বড় ছিদ্রটিকে একটি দরজা দ্বারা বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ছিদ্রপথে চাক বাহিরে আনা হয়। ছোট ছিদ্র দ্বারা মৌমাছি যাতায়াত করে। এই কাঠের বাক্সে মৌমাছি চাক

তৈয়ারি করে। অনেক সময় কাঠের বাক্সের পরিবর্তে মাটির বড় পাত্র রাখা হয়।

পুরাতন চাকের পরিস্ফুরণশীল রাণী পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় আসিবার প্রাক্কালে পুরাতন রাণী কর্মী মৌমাছি সহ নূতন চাক গড়িবার উদ্দেশ্যে পুরাতন চাক ত্যাগ করে। এই মৌমাছি ঐ সকল পাত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নূতন চাক তৈয়ারি করে।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মধু ও মোমের জন্য মৌচাষ করা হয়। ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। তাহার কারণ বহুলোকের জীবিকার সংস্থান করে। যে স্থানে বিপুল হারে মৌমাছির চাষ করা হয়, তাহাকে মধুমক্ষীশালা বা Apiary বলা হয়।

ভারতীয় মৌমাছির চাষকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—প্রাকৃতিক বা দেশীয় পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম পদ্ধতি।

1. দেশীয় ও প্রাকৃতিক পদ্ধতি ঃ

এই পদ্ধতিতে মৌমাছি কলোনী করিবার কোন ব্যবস্থা থাকে না। শুধুমাত্র চাক খুঁজিয়া বাহির করিয়া মধু নিষ্কাশন করা হয়। Apis dorsata এবং Apis florea-এর মৌচাক হইতে এই পদ্ধতিতে মধু সংগ্রহ করা হয়। ইহারা সাধারণতঃ গভীর বনে-জংগলে চাক তৈয়ারি করে। ইহাদের Single comb bees বা **একক মৌচাক মধুমক্ষী** বলে।

একক মৌচাক-মৌমাছি ঃ

ইহাদের মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করা হয় কিন্তু মৌচাকের যত্ন ও পরিচর্যা করা হয় না। ফলে বৎসরের কোন এক সময়ে ইহারা পরিযান করে। মধুপ্রবাহ কালের ঠিক পরেই মধু ব্যবসায়ীরা চাক হইতে মধু সংগ্রহ করে। রাজ্য সরকারের বনদপ্তর প্রতি বৎসর এই মধুর নীলাম করে এবং ফলে ভাল রাজস্ব আয় হয়। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে এই ধরনের মধু সংগ্রহের জন্য চাষীরা গভীর বনে প্রবেশ করে।

Apis dorsata-র চাক হইতে সন্ধ্যার পরে বা গভীর রাত্রে মধু সংগ্রহ করা হয়। ঘুঁটে, কাঠ বা গন্ধকের ধোঁয়া দ্বারা মৌচাক হইতে মৌমাছি তাড়ান হয়। মধু সংগ্রাহক নিজেকে মোটা কাপড়ে আবৃত করে। শুধু চোখ দুইটি খোলা রাখে। এই ধোঁয়ায় মৌমাছিরা চাক ত্যাগ করে এবং

এই সুযোগে সংগ্রাহক ধারালো অস্ত্র দ্বারা চাক কাটিয়া লয়। চাকটি কাপড়ের ভিতর রাখিয়া পিষিয়া এবং নিংড়াইয়া মধু নিষ্কাশন করা হয়।

Apis florea-র চাক হইতে ভোরে মধু সংগ্রহ করা হয়। চাকে ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া মৌমাছিকে সরান হয়। চাকে উপরের অংশে মধু থাকে এবং নীচে ব্রুড থাকে। চাকের নিচের এই ব্রুড অংশটি কাটিয়া নিকটবর্তী ঝোপে রাখা হয়। চাকের উপরের মধুর প্রকোষ্ঠ অংশটি ছুরি দ্বারা কাটিয়া লওয়া হয়। ইহার পর চাকটি কাপড়ের ভিতর রাখিয়া পিষিয়া এবং নিংড়াইয়া মধু নিষ্কাশন করা হয়।

Apis indica-র চাষ গ্রামাঞ্চলে মৌপালকেরা করে এবং ইহাদের কলোনী গঠন করিবার জন্য মৌপালকেরা বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা করে। যথা—

(i) **প্রাকার** (Wall type): গ্রামাঞ্চলে মৌপালকেরা বাড়ীঘর তৈয়ারির সময় বাড়ীর দেওয়ালে বিভিন্ন ব্যাসের কুলুংগী নির্মাণ করে। এই কুলুংগীর ভিতর মৌমাছি চাক তৈয়ারি করে। মধুপ্রবাহ কালের পর কুলুংগী হইতে মৌচাক সংগ্রহ করা হয়।

(ii) **চলনশীল প্রাকার** (Movable type): এক মিটার লম্বা ও দুই মিটার ব্যাস বিশিষ্ট কাঠের গুড়ির ভিতর মৌচাক গঠনের উপযোগী করিয়া তোলা হয়। ইহা ছাড়া কাঠের বাক্স, মাটির কলসী ইত্যাদি মৌচাক তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। মধুপ্রবাহ কালের পরই মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করা হয়।

এই ধরনের মৌমাছি পালনে মৌমাছি চাক তৈয়ারি করিবে সে নিশ্চয়তা থাকে না। এই চাকে মৌমাছিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক পোকা দ্বারা মৌমাছি আক্রান্ত হয়। এই ধরনের মৌচাকে মধু চুরির সম্ভাবনা থাকে এবং নিষ্কাশিত মধু বিশুদ্ধ থাকে না।

2. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ:

এই পদ্ধতিকে **মুভেবল ফ্রেম হাইভ** বলে। 1851 খ্রীষ্টাব্দে ল্যাংষ্ট্রোথ এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হয়। যথা—

1. মুভেবল ফ্রেম (Movable frame); 2. চাকভিত্তি (Comb

foundation) ; 3. মধু নিষ্কাশক যন্ত্র (Honey extracting equipment) ; 4. সোয়ার্ম ধরিবার যন্ত্র (Swarm catching equipment)।

ইহা ছাড়া মৌমাছি পালনের জন্য মৌচারণ ভূমি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। মৌমাছি পালনের জন্য মৌমাছির রোগ ও প্রতিকার সম্পর্কেও জানা প্রয়োজন।

1. **মুভেবল ফ্রেম** (চিত্র 13) : ল্যাংস্ট্রোথ 1851 খ্রীষ্টাব্দে মৌমাছি পালনের জন্য বিশেষ ধরনের বাক্স আবিষ্কার করেন। এই বাক্সটি কাঠের তৈয়ারী। উপরে থাকে **মধু প্রকোষ্ঠ** (honey chamber) এবং নিচে থাকে **অপত্য প্রকোষ্ঠ** (brood chamber)। এই বাক্সের মধ্যে কাঠের ফ্রেম থাকে। এই কাঠের ফ্রেমে মৌমাছি বাসা তৈয়ারি করে। কাঠের ফ্রেম পৃথকভাবে কিনিয়া বাক্সে বসান যায়। একটি আদর্শ মৌবাক্স নিম্নলিখিত অংশ দ্বারা গঠিত।

(i) **স্ট্যাণ্ড** (Stand) : 15·24 সেন্টিমিটার হইতে 22·86 সেন্টিমিটার লম্বা কাঠের চার পায়াযুক্ত ফ্রেম স্ট্যাণ্ডের কাজ করে। এই স্ট্যাণ্ডের উপর বটমবোর্ড বসে।

(ii) **বটম বোর্ড** (Bottom board) : ইহা একটি সাধারণ কাঠের পাটাতন। পাটাতনটি 55·88 সেন্টিমিটার লম্বা, 40·60 সেন্টিমিটার চওড়া এবং 2·3 সেন্টিমিটার পুরু হয়।

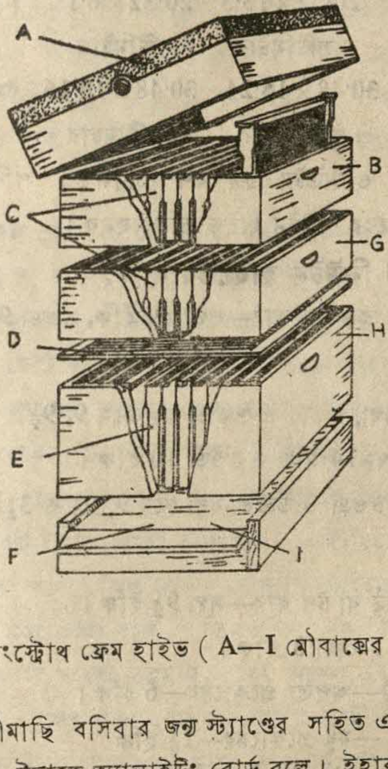
(iii) **অপত্য প্রকোষ্ঠ** (Brood chamber) : ইহা একটি আয়তাকার বাক্স। উপরে নীচে খোলা থাকে। বাক্সের প্রাচীর 2·3 সেন্টিমিটার কাঠ দ্বারা তৈয়ারী। বাক্সটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় যথাক্রমে 50·8 সেন্টিমিটার, 46·62 সেন্টিমিটার ও 28·3 সেন্টিমিটার হয়। অপত্য প্রকোষ্ঠে খাঁজ থাকে এবং এই খাঁজে কাঠের ফ্রেমগুলি লাগান যায়।

(iv) **ল্যাংস্ট্রোথ ফ্রেম** (Langstroth frame) : উপরের ও নিচের এবং দুই পার্শ্বের মোট চারিটি কাঠ লইয়া Langstroth frame গঠিত। উপরের ধার 48·26 সেন্টিমিটার দীর্ঘ, 2·54 সেন্টিমিটার চওড়া ও 2·3 সেন্টিমিটার মোটা। পাশের ধার 22·13 সেন্টিমিটার লম্বা ও 0·96 সেন্টিমিটার মোটা।

(v) **সুপার** (Super) : সুপার ও সুপারফ্রেমের আকার আয়তন ব্রুড চেম্বার ও ব্রুড ফ্রেম অনুযায়ী হয়।

(vi) **ইনার কভার** (Inner cover) ঃ ইহা একটি কাঠের পাটাতন, ব্রুড চেম্বার বা সুপারের আবরক হিসাবে কার্য করে।

(vii) **টপ কভার** (Top cover) ঃ বাক্সের ছাদটি ঢাল থাকে, যাহাতে বৃষ্টির জল ছাদে না জমে।



চিত্র 13 ঃ ল্যাংস্ট্রোথ ফ্রেম হাইভ (A—I মৌবাক্সের বিভিন্ন অংশ)

ইহা ছাড়া মৌমাছি বসিবার জন্য স্ট্যাণ্ডের সহিত একটি তির্যক বোর্ড লাগানো থাকে। ইহাকে অ্যালাইটিং বোর্ড বলে। ইহার ঠিক উপরে একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে মৌমাছি বাক্সে প্রবেশ করে। এই মৌবাক্সের সবচেয়ে নিচে থাকে স্ট্যাণ্ডসহ বটম বোর্ড, তাহার উপরে যথাক্রমে অপত্য-প্রকোষ্ঠ, মধু প্রকোষ্ঠ, সুপার, ইনার কভার এবং সবচেয়ে উপরে টপ কভার থাকে।

ল্যাংস্ট্রোথ ফ্রেম ছাড়াও ভারতবর্ষে আরও কয়েক ধরনের ফ্রেম প্রচলিত আছে। বিভিন্ন রাজ্যে ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। যথা—

	ব্রুডফ্রেমের মাপ	সুপার	ভারতে কি নামে পরিচিত
1. ব্রিটিশ স্ট্যাণ্ডার্ড—	35·56 × 21·1 সেন্টিমিটার	—	স্ট্যাণ্ডার্ড হাইভ
2. ডাডান্ট—	46·1 × 5·5 সেন্টিমিটার	46·1 × 15·5 সেন্টিমিটার	কুলু
3. নিউটন—	20·32 × 13·3 সেন্টিমিটার	20·32 × 6·1 সেন্টিমিটার	নিউটন হাইভ
4. ত্রিবাঙ্কুর—	30·48 × 15·24 সেন্টিমিটার	30·48 × 10·16 সেন্টিমিটার	টমসন হাইভ

ভারতে ল্যাংস্ট্রোথ ও নিউটন ফ্রেম বেশী প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গের সমতল-ভূমিতে ছোট আকারের নিউটন হাইভ সুবিধাজনক।

পশ্চিমবঙ্গে ছোট নিউটন হাইভের মাপ :

বাচ্চা ঘর বা ব্রুড প্রকোষ্ঠ—লম্বা 9 ইঞ্চি, চওড়া $9\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ও উচ্চতা $6\frac{1}{2}$ ইঞ্চি।

মধু প্রকোষ্ঠ—লম্বা, চওড়া ও উচ্চতা যথাক্রমে 9, $9\frac{1}{2}$ ও $2\frac{3}{4}$ ইঞ্চি।

বটম বোর্ড—লম্বা 14 ইঞ্চি ও চওড়া 10 ইঞ্চি।

ঢাকনি—লম্বা, চওড়া ও উচ্চতা যথাক্রমে 9, $9\frac{1}{2}$ ও $3\frac{1}{2}$ ইঞ্চি।

ফ্রেমের মাপ :

উপরের সরু কাঠ বা টপ বার—লম্বা $9\frac{1}{2}$ ইঞ্চি।

তলার সরু কাঠ —লম্বা 8 ইঞ্চি।

পাশের সরু কাঠ—অপত্য প্রকোষ্ঠের—6 ইঞ্চি।

—মধু প্রকোষ্ঠের—$1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি

বাক্সটি আধ ইঞ্চি পুরু কাঠ দ্বারা তৈয়ারী হয়।

মৌবাক্স একটি ছোট টেবিলের উপর রাখা হয়। এই টেবিলের উপরের অংশ তক্তা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে না ঢাকিয়া মাঝখানে ফাঁক রাখা ভালো, তাহা হইলে টেবিলের উপরে রাখা মৌবাক্সের তলায় বাতাস চলাচলের সুবিধা হয়। টেবিলের পায়াগুলি জলের পাত্রে রাখা হয়, যাহাতে মৌবাক্সে পিঁপড়ার উপদ্রব না হয়। মৌবাক্সের চারিপার্শ্বে বেশ খোলা জায়গা থাকা প্রয়োজন।

অন্যান্য আনুষংগিক সরঞ্জাম :

(i) **চাক ভিত্তি** (Foundation comb sheet) :

প্রকৃতিতে মৌমাছি তাহাদের মৌমোম দ্বারা কুঠুরী তৈয়ারি করে। এই কুঠুরী প্রবেশ পথের সমকোণে অথবা সমান্তরালভাবে অথবা তির্যকভাবে সাজান থাকে। কিন্তু মৌবাক্সের জন্য মোমের পাতলা পাতের উপর যন্ত্রের যাহায্যে মৌচাকের কুঠুরীগুলির তলদেশের আকৃতির অনুরূপ গর্ত করা হয়। ফাউণ্ডেশন কোম্বগুলিকে ফ্রেমে আটকাইয়া মৌবাক্সে রাখা হয়। এই পত্তনে পাশাপাশি কুঠুরীর তলদেশের মতো গর্ত থাকায় মৌমাছি মোম দ্বারা কুঠুরী তৈয়ারিতে সুবিধা হয়। এইজন্য তাহাদের মোম উৎপাদনের দরকার হয় কম।

(ii) **বিভাজন ফ্রেম বা ডামি** (Division board or Dummy) :

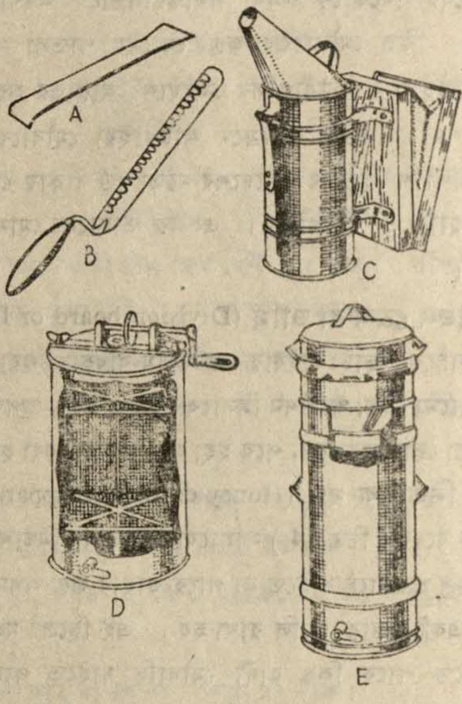
অপত্য প্রকোষ্ঠকে ছোট করিবার জন্য ডামি ব্যবহার করা হয়। ইহা একটি পাটা লাগানো ফ্রেম, পার্টিশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অপত্য প্রকোষ্ঠকে প্রথমে ডামি দ্বারা ছোট করা হয়, পরে ইহা সরাইয়া বড় করা হয়।

(iii) **মধু নিষ্কাশক যন্ত্র** (Honey extracting apparatus) :

মধু নিষ্কাশক যন্ত্রের (চিত্র 14) সাহায্যে বিশুদ্ধ মধু নিষ্কাশন করা যায়। রাণী যাহাতে মধু প্রকোষ্ঠে যাইতে না পারে তাহার জন্য অপত্য প্রকোষ্ঠ ও সুপারের মধ্যে একটি দস্তার জালি রাখা হয়। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া কর্মী যাতায়াত করিতে পারে কিন্তু রাণী মৌমাছি যাইতে পারে না। এই জালিকে Queen excluder বলে। তিন ধরনের মধু নিষ্কাশন যন্ত্র বিশেষ প্রচলিত, যথা—ফ্লেচার মডেল, রহমান ও সিং মডেল এবং টমসন মডেল। ড্রামের মধ্যে একটি জালের খাঁচা বসাইয়া যন্ত্রটি তৈয়ারী হয়। খাঁচার মধ্যে এক সেন্টিমিটার মোটা লোহার পাত থাকে এবং এই পাতের মধ্য দিয়া একটি কেন্দ্রীয় দণ্ড প্রবেশ করান থাকে। দণ্ডের উপরের দিকে একটি চাকা থাকে। এই চাকার সহিত পার্শ্বদেশে হাতলযুক্ত একটি চাকা গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকে। ড্রামের উচ্চতা 43 সেন্টিমিটার এবং ব্যাস 30 সেন্টিমিটার। ড্রামের তলদেশে একটি কল লাগান থাকে।

মধু প্রকোষ্ঠ হইতে ফ্রেম বাহির করিয়া দুই পার্শ্বের পাতলা সিল করা ঢাকনি ছুরি দ্বারা চাঁছিয়া যন্ত্রের জালের ফ্রেমের উপর রাখা হয়। একবারে চারটি ফ্রেম রাখা যায়। হাতল ঘুরাইলে খাঁচাটি ফ্রেম সমেত ঘোরে এবং

অপরকেন্দ্রে বলের ক্রিয়ায় চাকের কোষগুলি হইতে মধু ড্রামের নীচে জমা হয়। এই পদ্ধতিতে চাক অক্ষত থাকে এবং অক্ষত চাক পুনরায় মধু প্রকোষ্ঠে স্থাপন করা হয়।



চিত্র 14 : A—E মধু নিষ্কাশন যন্ত্রপাতি সমূহ

(iv) **ধোঁয়া দিবার যন্ত্র** (Smoker) : ইহা একটি ধোঁয়াদানি যাহা হাপরের সহিত লাগান থাকে। ইহার সাহায্যে ধোঁয়া দিয়া মৌচাক হইতে মৌমাছি তাড়ান হয়।

(v) **হাইভ টুল** (Hive tool) : ইহা একটি টাংগির ন্যায় ধারাল অস্ত্র। ইহার সাহায্যে ফ্রেম হইতে মৌআটা পরিষ্কার করা হয় এবং চাকের অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া ফেলা হয়।

(vi) **মৌ ব্রাশ** (Bee brush) : এই ব্রাশের সাহায্যেও মৌচাক হইতে মৌমাছি সরান হয়।

(vii) **মৌমাছি ধরার জাল** (Swarm catcher) : একটি লম্বা সরু

কাঠের আগায় একটি শক্ত তার গোল করিয়া আটকান হয়। মশারির জালের কাপড় ঐ গোল তারের ফ্রেমে লাগান হয়। এই গোল ফ্রেমের বিপরীত দিকে জালের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এই ধরনের জালে মৌমাছি ধরা হয়।

(viii) **রাণী ধরা খাঁচা** (Queen cage) : দিয়াশলাই বাক্সের মাপে ($2\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$) সূক্ষ্ম তারের জাল দিয়া একটি ছোট বাক্স তৈয়ারি করা হয়। এই খাঁচার পাঁচদিক বন্ধ এবং একটি প্রান্ত মাত্র খোলা থাকে।

ইহা ছাড়া চিনির পাত্র, মধু শোধনের সরঞ্জাম, জল ছিটাইবার পিচকারি ইত্যাদি সরঞ্জাম রাখা হয়।

মৌমাছি থেকে আত্মরক্ষার সরঞ্জাম :

(i) **মুখ ঢাকা জাল** (Bee vail) : এই মুখোশটি তারের জাল, কালো রঙের মশারি, নাইলন জাল ইত্যাদি দ্বারা তৈয়ারি করা হয়। এই জাল থাকায় মৌমাছি মধু সংগ্রহের সময় হুল ফোটাইতে পারে না।

(ii) **আচ্ছাদন পোশাক** (Overall) : জামাকাপড়ের উপর মোটা কাপড়ের একটি বড় আচ্ছাদন (Apron) চাপান হয়, ইহাতে মৌমাছি হুল ফোটাইতে পারে না।

(iii) **হাতের দস্তানা** (Gloves) : হাতের দস্তানা থাকিলে মৌমাছির হুল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

মৌমাছি সংগ্রহ :

মৌমাছি পালন করিতে হইলে মৌমাছির কলোনী কিংবা স্বাভাবিক মৌচাক হইতে মৌমাছি সংগ্রহ করা যায়। স্বাভাবিক মৌচাকের সন্ধান সহজে পাওয়া যায় না, সেজন্য কলোনী কেনাই ভাল।

মৌমাছি নির্ভরযোগ্য স্থান হইতে কেনা উচিত। মৌমাছি ও 5-6 খানি ডিমপূর্ণ চাক নেওয়া ভাল। একটি রাণী থাকিলেই চলিবে।

এক জায়গা হইতে অন্যস্থানে মৌমাছিপূর্ণ চাক আনিবার জন্য মৌমাছি আনার বাক্স ব্যবহার করা সুবিধাজনক। মৌমাছি আনিবার জন্য বিশেষ ধরনের মৌবাক্স পাওয়া যায়। এই বাক্সটি এমনভাবে তৈয়ারী যাহাতে মৌমাছিরা বাহিরে আসিতে না পারে। বাক্সের দুইপাশে এবং নীচের বটম বোর্ড বায়ু চলাচলের জন্য জাল দ্বারা ঢাকা গর্ত থাকে। বাক্সের ভিতরে চাকের ফ্রেম রাখার জায়গা থাকে। বাক্সে মৌমাছির চাক সমেত ফ্রেমকে

বসাইয়া ফ্রেমের দুইপাশ আঁটিয়া দেওয়া হয়। তারপর ঢাকনি বন্ধ করিয়া স্ক্রু আঁটিয়া বাক্স অন্যত্র লইয়া যাইতে হয়।

মৌবাক্স স্থানান্তর ঃ মৌমাছি যেখানে পালন করা হইবে সেখানে বাক্সটি আনিয়া রাখা হয়। তাহাদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেওয়া হয়, আনিবার সময় ঝাকুনিতে তাহাদের কষ্ট হয়। মৌমাছি আনিবার বাক্সে এক চামচ ঘন চিনির রস দিলে মৌমাছিদের মেজাজ ভাল থাকে।

কিছুক্ষণ পর ঐ মৌমাছি ভর্তি বাক্সটির পাশে একটি খালি মৌচাক রাখা হয়। এখন মৌমাছিগুলিকে ঐ বাক্স হইতে খালি মৌবাক্সে স্থানান্তরিত করা হয়।

মৌমাছির খাদ্যের ব্যবস্থা ঃ

প্রথম প্রথম মৌমাছিরা মধু সংগ্রহে বিশেষ আগ্রহী হয় না, সেইজন্য চিনির সিরাপ খাইতে দেওয়া হয়। প্রায় এক লিটার জলে দুই কিলো চিনি গুলিয়া ভালো সিরাপ তৈয়ারি করা হয়। ইহার মধ্যে এক গ্রাম থাইমল যোগ করিলে সিরাপ নষ্ট হয় না।

প্রথমেই এই মৌবাক্সে মৌমাছির সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না, কারণ তিন সপ্তাহের পূর্বে কর্মী মৌমাছি ডিম হইতে বাহির হয় না। রাণী প্রথমে বেশী ডিম পাড়ে না। সাধারণতঃ চাক আনিবার একমাস পর মৌমাছির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জন্মাইবার 16 দিন পর হইতে কর্মী মৌমাছি মকরন্দ ও রেণু সংগ্রহে ব্যস্ত হয় এবং চাক বৃদ্ধি করে। প্রায় কুড়ি দিন হইতে কর্মীরা চাক পাহাড়া দেয় এবং কলোনীকে রক্ষা করে। 21 দিন হইতে মৃত্যুকালীন পর্যন্ত কর্মীরা মকরন্দ ও রেণু সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে।

মৌচাক থেকে মৌমাছি সংগ্রহ (Collection of bees from hive) ঃ

বাড়ীর ভিতর দেওয়ালের ফাটলে, ঘরের মধ্যে এবং গাছের গর্তে মৌমাছিরা মৌচাক তৈয়ারি করে। এইরকম মৌচাক থেকে মৌমাছি সংগ্রহ করিয়া মৌমাছির বাক্সে রাখিয়া পালন করা হয়। মৌচাক হইতে মৌমাছি ধরিবার জন্য মুখঢাকা জাল, রাণী ধরা খাঁচা, আচ্ছাদন পোশাক ব্যবহার করা হয়।

মৌচাক ও মৌমাছি সংগ্রহের প্রণালী ঃ

দেওয়ালের ও গাছের গর্তে, খালি বাক্স প্রভৃতির মধ্যে মৌচাক হইলে সেখান হইতে মৌমাছি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। প্রথমে গর্তের মুখ ভাল

করিয়া ফাঁক করিয়া দিতে হইবে যাহাতে দস্তানাসমেত হাত প্রবেশ করান যায়। মুখে ঢাকা জাল, অ্যাপ্রন, দস্তানা থাকিলে মৌমাছির হুল ফোটাইবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রথমে রাণী ধরা খাঁচা দ্বারা মৌচাক হইতে রাণীকে ধরিতে পারিলে অন্য মৌমাছি ধরা সহজ হয়।

এখন চাকটি আস্তে আস্তে কাটা হয়, যাহাতে মৌমাছি নষ্ট না হয় বা চাক অযথা চোট না পায়। মৌচাকটিকে ধীরে বসাইয়া ফ্রেমের সঙ্গে সুতা দিয়া বাঁধা হয়।

মৌবাক্সের অপত্য কুঠুরী বটমবোর্ডের উপর পূর্বেই বসান হয়। মৌমাছি সমেত কাটা চাক ফ্রেমে বাঁধিয়া অপত্য কুঠুরীর ভিতর বসাইতে হইবে। তারপর খবরের কাগজ ভাঁজ করিয়া বাক্সটি ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

যদি রাণী এই চাকের সঙ্গে চলিয়া আসে, তাহা হইলে বাক্সের ঢাকনি বন্ধ করিয়া দরজা খুলিয়া বাক্সটিকে মৌচাকের কাছে রাখা হয়। ফলে যে সকল মৌমাছি বাইরে থাকে তাহারাও রাণীর গন্ধে বাক্সে প্রবেশ করে।

যদি রাণী না আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বেশীর ভাগ মৌমাছিই গর্তের চাকে থাকিয়া যাইবে। সেক্ষেত্রে পিচকারি দ্বারা জল স্প্রে করা হয়, ফলে মৌমাছিরা চাকে স্থির হইয়া থাকে। এখন একটি থলির সাহায্যে চাকসমেত মৌমাছিকে ধরিয়া আনা হয়।

মৌমাছি সংগ্রহের পরেও যদি অনেক মৌমাছি মৌচাকে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে যেখানে চাক ছিল সেইখানে দুই বা তার চেয়ে বেশী চাকযুক্ত ফ্রেম বসাইয়া দিলে তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই রাণীসমেত মৌমাছিগুলি ফ্রেমে বসিবে। তারপর ঐ ফ্রেম আনিয়া মৌবাক্সে স্থাপন করা হয়। যদি সঙ্গে সংগে ফ্রেমে মৌমাছি না বসে তবে নিচের দিকে এক সেন্টিমিটার ফাঁকা রাখিয়া গর্তের মুখ টিন বা মোটা কাগজ দিয়া আটকান হয়। এই উপায়ে কয়েকদিন পরে বাকী মৌমাছি সংগ্রহ করা হয়।

নূতন পরিবেশে মৌমাছিকে দুই-তিনদিন চিনির রস খাইতে দেওয়া হয়। চার-পাঁচদিনের মধ্যেই মৌমাছিরা চাকগুলিকে ফ্রেমের সহিত আটকাইয়া দেয় এবং সুতা কাটিয়া ফেলে।

এইভাবে মৌমাছি সংগ্রহ বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে করা হয়।

মৌমাছির পরিচর্যা (Proper care) :

আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনের সুবিধা এই যে বাক্স খুলিয়া ফ্রেমে

মৌমাছির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরীক্ষাকালে দেখা হয় রাণী মৌমাছি ঠিকভাবে ডিম পারিতেছে কিনা, ফ্রেমগুলিতে পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা এবং কোন ক্ষতিকারক পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা হয়।

মৌবাক্স অকারণে খোলা উচিত নয়। যে সময় মধুর আমদানী কম, সে সময় বাক্স নাড়াচাড়া করিলে মৌমাছি বাক্স ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। খুব ঠাণ্ডা, ঝড়-বৃষ্টির দিনে মৌমাছিদের বিরক্ত করা ঠিক নয়। যে সময় মৌমাছিরা কাজে ব্যস্ত থাকে সেইসময় চাক পরীক্ষা করা সুবিধাজনক।

পরীক্ষার সময় বাক্স আস্তে আস্তে খুলিতে হইবে। ফ্রেম খুব আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করা হয়। কোন জিনিস স্থির থাকিলে বা আস্তে নড়িলে মৌমাছি অনুভব করিতে পারে না। ফ্রেমের টপ্ বারের দুই প্রান্ত ধরিয়া ফ্রেম বাহিরে আনা হয়। ফ্রেমের বিপরীত দিক্ পরীক্ষা করিতে হইলে উপরের দিকে কাঠটিকে প্রথমে খাড়া (vertical) অবস্থায় আনিতে হইবে। তারপর টপ বারের খোঁটা (pivot) হিসাবে ফ্রেমটিকে ঘোরাইলে ফ্রেমের উভয়পিঠ ভালভাবে দেখা যায়।

আস্তে অস্তে পর্যবেক্ষণের কাজ করিলে হুল ফোটাইবার সম্ভাবনা থাকে না। মেলিটিন নামক প্রোটিনজাতীয় বিষাক্ত পদার্থ থাকায় হুল ফোটাইলে যন্ত্রণা হয়। হিষ্টামিন থাকায় ঐ স্থান ফুলিয়া ওঠে। হুল যদি চামড়ায় ঢুকিয়া থাকে তবে ছুরি দিয়া চাঁছিয়া তুলিয়া ফেলিয়া লাইকার অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করা হয়।

বসন্তকাল ফুলের ঋতু, মৌমাছিরা এই সময় সর্বদা ব্যস্ত, ফলে কুঠুরীগুলি শীঘ্র মধুতে ভরিয়া যায়। মধু প্রকোষ্ঠ ভরিয়া গেলে মৌমাছি চাক ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সেইজন্য অপত্য প্রকোষ্ঠের উপর মধু প্রকোষ্ঠ থাকিলে আরও একটি মধু প্রকোষ্ঠ স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে নূতন প্রকোষ্ঠ অপত্য প্রকোষ্ঠ ও প্রথম মধু প্রকোষ্ঠের মধ্যে স্থাপন করা হয়। এর পরেও যদি আরও বাড়তি মধু প্রকোষ্ঠ লাগে সেটিকে অপত্য প্রকোষ্ঠের উপর ও অন্য মধু প্রকোষ্ঠের নিচে বসাতে হবে।

যদি রাত্রে মৌমাছি দলবদ্ধভাবে মৌবাক্সের প্রবেশদ্বারের কাছে জড় হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বাক্সের ভিতর বায়ু চলাচলের অভাব হয়।

বসন্তের পরেই আসে গ্রীষ্মকাল, এই সময় কর্মীরা খাদ্য সংগ্রহ করে না। যতদিন মধু আহরণ বন্ধ থাকিবে ততদিন মৌমাছির খাদ্য বাক্সে রাখা হয়।

গরমের সময় মৌমাছির বাক্স গাছের ছায়ায় রাখা হয়।

বর্ষাকালে গাছে ফুল থাকে না, চিনির সিরাপ মৌমাছিদের দেওয়া হয়।

শীতকালে ঠাণ্ডায় মৌমাছিদের যাহাতে কষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি তাপ 50 ডিগ্রী ফারেনহাইটের নিচে থাকে, তাহা হইলে মৌমাছিদের রাত্রে গরম রাখিবার জন্য বাক্সের উপর চট চাপা দেওয়া হয়।

মৌমাছি কলোনীর উন্নতির ব্যবস্থা (Aspects for the development of bee colonies) :

মৌমাছির বাসায় উপযুক্ত সংখ্যক মৌমাছি থাকা দরকার। মৌমাছির সংখ্যা বেশী কমিয়া গেলে উপযুক্ত তাপের অভাবে ডিম ফুটিতে পারে না এবং উপযুক্ত ধাত্রী মৌমাছির অভাবে বাচ্চাদের খাদ্যাভাব হয়। মৌমাছির সংখ্যা কম হইলে মোম পোকা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ বাসায় ঢুকিয়া চাকের ক্ষতি করে।

প্রতি মৌবাক্সে অন্ততঃ 4/5-টি মৌমাছিপূর্ণ চাক থাকা আবশ্যক। কোন বাসায় মৌমাছির সংখ্যা কমিয়া গেলে অন্য মৌমাছিপূর্ণ বাসার সহিত মিশান হয়, ইহাকে মৌমাছি মিলানো (Uniting stock) বলে।

যে দুইটি মৌবাক্সের মৌমাছিদের মিলিত করিতে হইবে প্রথমে সেই বাক্স দুইটিকে রোজ একটু একটু সরাইয়া পাশাপাশি আনিতে হয়। দিনে দুই ফুটের বেশী সরান চলিবে না। মিলিত বাক্সে একাধিক রাণী থাকা চলিবে না। এইজন্য প্রথম মৌবাক্সের রাণীকে সরাইয়া দিতে হইবে। তারপর যে দ্বিতীয় বাক্সে রাণী আছে তাহার অপত্য প্রকোষ্ঠের ফ্রেমগুলির উপরে একখানি কাগজ দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। কাগজে একটি ছোট ছিদ্র থাকে। এই কাগজ চাপা অবস্থায় দ্বিতীয় বাক্সটির উপরে রাণীহীন মৌমাছি সমেত প্রথম বাক্সটির অপত্য প্রকোষ্ঠ বসাইয়া দিতে হয়। শেষে বাক্সের উপর যথারীতি ঢাক্না চাপা দিতে হয়।

উপরের প্রথম মৌবাক্সের মৌমাছিরা কাগজের ছিদ্রটি কাটিয়া বড় করে। ক্রমে উপরের ও নিচের মৌবাক্সের মৌমাছির গন্ধ একরকম হইয়া যায় এবং তখন দুইটি বাসার মৌমাছিদের মিলনে বাধা থাকে না। উপরের মৌবাক্স খালি হইয়া যায়, যদি কিছু থাকে তাদের ঝাড়িয়া নিচের বাক্সে পাঠান হয়।

গন্ধ শুঁকিয়া মৌমাছিরা নিজের বাসার মৌমাছিদের চিনিতে পারে। সেইজন্য কোন বাসার মৌমাছি অন্য বাসার মৌমাছির সঙ্গে মিলনের আগে

তাহাদের বিশেষ গন্ধ লোপ করা হয়।

নিম্নলিখিত উপায়ে মৌমাছির বিশেষ গন্ধ লোপ করা হয় ঃ

(i) জলের সঙ্গে সামান্য চিনি গুলিয়া পিপারমেন্ট তেল মিশান হয়। এই জল সূক্ষ্ম পিচকারির সাহায্যে সন্ধ্যাবেলায় দুইটি মৌবাক্সে স্প্রে করিয়া বাক্স দুইটিকে কাগজ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। ফলে দুইটি মৌবাক্সের একই গন্ধ হইবে।

(ii) ধূনার ধোঁয়ার সাহায্যে গন্ধ নষ্ট করা যায়। প্রথম একটি রাণীযুক্ত ও একটি রাণীহীন মৌবাক্স পাশাপাশি আনা হয়। দুইটি বাক্সেরই ফ্রেমগুলিকে কাগজ বা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। তারপরে দুইটি মৌবাক্সের বটম বোর্ডের জালতি দেওয়া ফাঁকের মাধ্যমে সামান্য ধোঁয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ অন্তর অল্প ধোঁয়া দিলে বাসার গন্ধ চলিয়া যায়। তারপর পূর্বের উপায়ে বাক্সকে মিলিত করা হয়।

মৌমাছির বাক্সে মৌমাছির সংখ্যা অতিরিক্ত হইলে কলোনী ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় এই কলোনী ভাগ করা হয়। কলোনী ভাগের জন্য মৌবাক্স এবং ফাউণ্ডেশন ফ্রেম দরকার।

প্রথমে মৌমাছিপূর্ণ বাক্সের পাশে খালি মৌবাক্স রাখা হয়। তারপর মৌমাছিপূর্ণ বাক্সের ঢাক্না খুলিয়া মধু প্রকোষ্ঠ সরাইয়া মধু ও পরাগযুক্ত একটি চাক এবং ডিম ও মৌমাছি সমেত দুইটি চাক খালি মৌবাক্সে রাখা হয়। রাণী যেন খালি বাক্সে না আসে। তারপর দুইটি মৌবাক্সের উপরই মধু প্রকোষ্ঠ বসাইয়া ঢাক্নি দেওয়া হয়।

কলোনী বিভাগের পরে পরিচর্যা ঃ

(i) মৌবাক্স বিভাগের পর সন্ধ্যার সময় চিনির রস দেওয়া হয়।

(ii) খালি চাকগুলি মৌমাছিতে পূর্ণ হইলে চাকগুলির মাঝে মাঝে ফাউণ্ডেশন ফ্রেম বসাইতে হয়।

(iii) নূতন মৌবাক্সে রাণী উৎপাদনে দেরী হয়, এইজন্যে একটি নূতন বাক্সে একটি রাণী মৌমাছি দিতে হয়। নূতন রাণী উৎপাদনের জন্যে অন্য মৌবাক্স হইতে একটি ভালো রাণীকুঠুরী সংগ্রহ করিয়া মৌবাক্সের চাকে আলপিন্ দ্বারা আটকাইয়া দেওয়া হয়।

নূতন মৌবাক্সে রাণীকুঠুরী না থাকিলেও কর্মী মৌমাছিরা মৌবাক্স হইতে আনীত ডিম হইতে রাণী উৎপাদন করে। এই উদ্দেশ্যে চাকের ধারে ধারে কর্মী মৌমাছি কতকগুলি রাণীকুঠুরী তৈয়ারি করে। এই কুঠুরীগুলির মধ্যে

মাত্র দুইটি কুঠুরী রাখিয়া বাকীগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হয়। রাণীকুঠুরী হইতে রাণী বাহির হইলে অপর কুঠুরী ভাঙিয়া দেওয়া হয়।

এই উপায়ে কলোনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

মৌমাছির বাক্স স্থানান্তর :

সময়ে সময়ে মৌমাছিসমেত বাক্স স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু একবারে 15 ফুটের বেশী দূরে সরাইলে মৌমাছি বাসা খুঁজিয়া পায় না। মৌমাছি পূর্বের স্থানে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, ক্লান্ত হইয়া মারা যায় অথবা অন্যত্র চলিয়া যায়। মৌবাক্স প্রতিদিন দুই ফুট করিয়া সরাইলে মৌমাছিদের বাসা চেনার অসুবিধা হয় না।

মৌবাক্স সন্ধ্যার পর সরানো উচিত। নূতন জায়গায় বসাইবার পর মৌবাক্সের দরজায় একটি 4″ × 2″ ইঞ্চি মাপের তক্তা হেলাইয়া রাখা হয়। তক্তার দুইধারে ফাঁক থাকে। মৌমাছিরা এই ফাঁক দিয়া যাতায়াত করে এবং নূতন জায়গায় আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারে।

রাণীহীন বাসায় রাণী প্রবর্তন :

অনেক সময় মৌবাক্স পরীক্ষার সময় রাণী নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়। মৌমাছির কলোনির অস্তিত্ব নির্ভর করে রাণী মৌমাছির উপর। সুতরাং যদি কোন কলোনীতে রাণীর অভাব হয়, তবে নূতন রাণীর ব্যবস্থা করা হয়।

একটি ডিমপ্রসবকারী রাণীকে খাঁচায় (queen cage) পোরা হয়। ঐ খাঁচাটি মধুপূর্ণ চাকের গায়ে আটকাইয়া রাখা হয়। নূতন অপরিচিত রাণীর গন্ধে মৌমাছিরা তাহাকে আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু জালের খাঁচার মধ্যে রাণী থাকে, ফলে খাঁচার মধ্যে রাণীর কোন ক্ষতি হয় না। দুই-তিনদিন পর মৌমাছিরা শান্ত হইয়া যায়, কয়েকদিনের মধ্যেই সকল মৌমাছি নূতন রাণীকে স্বীকার করিয়া লয়। তখন খাঁচা খুলিয়া রাণীকে মৌবাক্সে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ একদিন পরেই মৌমাছিরা নূতন রাণীকে গ্রহণ করে।

যদি রাণী মৌমাছি জোগাড় করা না যায় তাহা হইলে একটি রাণীকুঠুরী আনিয়া অপত্য প্রকোষ্ঠে বসাইয়া দিলে কর্মী মৌমাছি নূতন রাণী তৈরি করে।

কর্মী মৌমাছির মকরন্দ এবং পরাগ সংগ্রহ ও সঞ্চয় :

কর্মী মৌমাছি ফুল হইতে মকরন্দ (nectar) ও পরাগ রেণু (pollen grain)

সংগ্রহ করে। মকরন্দ ফুলের একপ্রকার মিষ্ট তরল, ইহার সাহায্যে ফুল পতঙ্গকে আকর্ষণ করে। কর্মী মকরন্দ শোষণ করিয়া মধুপাকস্থলীর মাধ্যমে বহন করিয়া আনিয়া মৌচাকের কুঠুরীতে জমা রাখে। পশ্চাতপদের রেণু-থলির মাধ্যমে কর্মী মৌমাছি রেণু বহন করে এবং মৌচাকের রেণুসঞ্চয়ী কুঠুরীতে জমা করে। এই কুঠুরীতে মাথা দিয়া হাতুড়ির মত আঘাত করিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাগপূর্ণ করে। লার্ভার কাছাকাছি রেণু জমা রাখে, কারণ লার্ভাকে পরাগরেণু খাইতে দেওয়া হয়।

সংগৃহীত মকরন্দ মৌমাছি ও বাচ্চাদের খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত মকরন্দ কুঠুরীতে সঞ্চয় করে। পরাগ মৌমাছির প্রধান প্রোটিন খাদ্যের উৎস। সরাসরি এই পরাগ লার্ভা খায় না। কর্মী মৌমাছি এই পরাগ খাওয়ায়। কর্মীর মস্তিষ্কে অবস্থিত গ্রন্থি হইতে এক ধরনের রস নিঃসৃত হয়, এই রস খাইয়া লার্ভা বড় হয় এবং পিউপাতে পরিণত হয়। কর্মী মৌমাছি মধু ও পরাগের মিশ্রণ লার্ভাকে খাওয়ায়।

অতিরিক্ত পরাগরেণু শীতকালের জন্য কুঠুরীতে সঞ্চয় করিয়া রাখে। পরাগের চারিদিকে মধুর আস্তরণ থাকে যাহাতে পরাগরেণু নষ্ট না হয়।

মধু (Honey) :

সংগৃহীত মকরন্দ হইতে মৌমাছি মধু তৈয়ারি করে। উদ্ভিদের মকরন্দ সুগন্ধি অর্ধতরল সুমিষ্ট পদার্থ, ইহাকে মৌমাছি ঘন পদার্থ মধুতে পরিণত করে। মৌমাছি মকরন্দ সংগ্রহ করিয়া মধুথলিতে (honey sac) সঞ্চয় করে। লালায় অবস্থিত হাইড্রেজ উৎসেচকের সাহায্যে এই মকরন্দ আর্দ্র বিশ্লেষিত হইয়া শর্করা গ্লুকোজ, লেভুলোজ ও ফ্রুকটোজে পরিণত হয়। কর্মী মৌমাছি চাকের একপ্রান্তে বিশ্রামকালে ঐ মকরন্দ উগ্‌রাইয়া জিহ্বাতে আনে, ইহাতে জল শুকাইয়া যায়। প্রায় কুড়ি সেকেণ্ড পরে আবার জিহ্বা মুখগহ্বরে প্রবেশ করে এবং পুনরায় বাহিরে আসে। এইভাবে যতক্ষণ না সমস্ত জলীয় অংশ দূরীভূত হয় ততক্ষণ এই ঘটনা চলে। এই মধুতে জলের পরিমাণ শতকরা কুড়িভাগ কিন্তু মকরন্দে শতকরা 40 হইতে 80 ভাগ জল থাকে। কুঠুরীতে মধু রাখিয়া কর্মী মৌমাছি মোম দ্বারা মুখ বন্ধ করে।

মধুর স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ফুলের মকরন্দের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ মধুপ্রবাহ কালে একই উৎস হইতে পুরুষ মৌমাছি মকরন্দ সংগ্রহ করে এবং স্বল্প মধুপ্রবাহকালে বিভিন্ন উৎস হইতে মকরন্দ সংগ্রহ করে।

মধুর রাসায়নিক গঠন (Chemical composition of honey) ঃ

মধুতে ডেক্সট্রোজ, লেভুলোজ নামক দুইটি সরল শর্করা থাকে, ইহার মধ্যে লেভুলোজ অন্যতম। ইহা ছাড়া মধুতে কিছু জটিল শর্করা, জল, খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদের রঙ্গিন কণা, অ্যাসিড, উৎসেচক, ভিটামিন এবং রেণু থাকে।

মধুর রাসায়নিক গঠন নিম্নরূপ ঃ

শর্করা ঃ গ্লুকোজ, সুক্রোজ, লেভুলোজ ও ডেক্সট্রিন।

খনিজ পদার্থ ঃ লৌহ, তাম্র, ম্যাংগানিজ, সিলিকা, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, গন্ধক, অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম যৌগ বিভিন্ন মাত্রায় পাওয়া যায়।

অ্যাসিড ঃ ফরমিক, অ্যাসিটিক, ম্যালিক, সাইট্রিক, সাকসিনিক অ্যাসিড।

রঙ্গিন কণা ঃ ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল, অ্যান্থোসায়ানিন এবং ট্যানিন। ইহা ছাড়া রেণু ও মৌ-মোম কণিকা পাওয়া যায়।

উৎসেচক ঃ ইনভারটেজ, ক্যাটালেজ, ডায়াসটেজ এবং ইনুলেজ।

ভিটামিন ঃ ভিটামিন A, ভিটামিন B কমপ্লেক্স, ভিটামিন H, ফলিক অ্যাসিড, নিকোটিনিক ও প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন C।

জল ঃ পরিপক্ক মধুতে শতকরা 18 হইতে 20 ভাগ জল থাকে।

মধুর খাদ্যমূল্য (Food value of honey) ঃ

Dr. Haydak (1938)-এর মতানুযায়ী 1·135 কিলোগ্রাম দুধ বা 1·658 কিলোগ্রাম ক্রিম পনির বা 340 গ্রাম মাংস বা 425 গ্রাম মাছ বা 10টি মুরগীর ডিম বা 425 গ্রাম মাছের খাদ্যমূল্যের সমান 200 গ্রাম মধু। পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে জানা যায় যে, এক পাউণ্ড মধুর খাদ্যমূল্য $3\frac{1}{2}$ পাউণ্ড গোলআলু বা $4\frac{1}{2}$ পাউণ্ড আঙ্গুর বা 3 পাউণ্ড কলা বা $7\frac{1}{2}$ পাউণ্ড ন্যাসপাতি বা 13 পাউণ্ড বাঁধাকপি বা 7 পাউণ্ড পীচফল বা 5 পাউণ্ড আপেলের খাদ্যমূল্যের সমান। মধুতে 365 UG ভিটামিন B, 368 UG ভিটামিন রাইবোফ্লেবিন, 18 MG ভিটামিন C, 254 UG প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড অথবা 0·6 MG নিকোটিনিক অ্যাসিডের ক্ষমতার সঙ্গে তুলনীয়। এক পাউণ্ড মধুতে $6\frac{1}{2}$ আউন্স লেভুলোজ (lavulose), $\frac{1}{2}$ আউন্স ডেক্সট্রোজ (dextrose) 9 গ্রাম সুক্রোজ (sucrose), 3 আউন্স জল, 1 গ্রাম লৌহ, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি থাকে।

মধু সংরক্ষণ (Honey storage) :

মধু অনেকদিন সঞ্চিত করিয়া রাখিলে গাঢ় বর্ণের হয় ও কেলাস দানা পড়ে। মধু যে ঘরে রাখা হয় তাহার তাপমাত্রা যেন 22 ডিগ্রী সেলেসিয়াসের উপর না ওঠে। বেশী তাপমাত্রায় লেভুলোজ ভাঙিয়া যায়, লৌহের বিক্রিয়া ঘটাইয়া মধুর বর্ণ গাঢ় করে। মধুতে যদি শতকরা কুড়ি ভাগের বেশী জল থাকে, তবে বাতাসে অবস্থিত ঈষ্ট মধুতে কোহল, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে। ইহাতে মধুর স্বাদ টক হয় এবং গাঁজিয়া ওঠে।

মধু সংরক্ষিত করিতে হইলে 71·1 ডিগ্রী সেলেসিয়াস তাপমাত্রায় আধঘণ্টা গরম করিয়া ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় বায়ুনিরোধক বোতলে ভরিয়া অপেক্ষাকৃত শীতলস্থানে বায়ুনিরোধক ঘরে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

শীতল আবহাওয়ায় খাঁটি মধু সমপ্রকৃতির কেলাস গঠন করে।

মধুর ব্যবহার (Uses of honey) :

(i) মধু সহজ পাচ্য, মধুতে সরল শর্করা আছে, সুতরাং ইহা বলকারক টনিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(ii) মধু রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈয়ারি করিতে সাহায্য করে।

(iii) অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য মধু খাওয়া ভাল।

(iv) পাঁউরুটি, বিস্কুট ও কেক তৈয়ারিতে মধুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

(v) মধু আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত হয়। নানা রোগের চিকিৎসায় মধু ব্যবহার করা হয়। মধু কোষ্ঠ পরিষ্কারক, রক্ত শুদ্ধকারক ও সর্দি-কাশির প্রতিরোধক। জিহ্বার ক্ষত, গলার ক্ষত, পোড়ার ক্ষত মধু ব্যবহারে উপশম হয়। ডায়াবেটিস ও এলার্জি রোগের ইহা মহৌষধ।

(vi) বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মধু ব্যবহার করা হয়।

(vii) মদ তৈয়ারিতে, বিভিন্ন লোশনে, গাভীর অধিক দুগ্ধ উৎপাদনে, রেসের ঘোড়ার শক্তি বৃদ্ধি করিতে, চিউইংগাম তৈয়ারি করিতে মধুর ব্যবহার হয়।

(viii) মধু বলবৃদ্ধিকারক, শক্তিশালী আদর্শ একটি টনিক।

মৌ-মোমের বৈশিষ্ট্য (Peculiarities of bee-wax) :

মৌ-মোমের বর্ণ হরিদ্রাভ হইতে কালচে ধূসর বর্ণের হয়। শীতল আবহাওয়ায় মৌ-মোম ভংগুর এবং দানাগুলি কেলাসবিহীন ধূলার ন্যায়।

ইহা জলে অদ্রবণীয় কিন্তু ইথার ও ক্লোরোফর্মে সম্পূর্ণরূপে দ্রবণীয়। 63-65 ডিগ্রী সেলেসিয়াস তাপমাত্রায় ইহা গলিতে শুরু করে।

মৌ-মোমের ব্যবহার (Uses of bee-wax) ঃ

মৌ-মোম হইতে বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈয়ারী হয়। মৌ-মোম হইতে মোমবাতি ও প্রসাধনী দ্রব্য তৈয়ারী হয়। ফ্রেসক্রীম, রুজ, অয়েন্টমেন্ট, লোশন, লিপষ্টিক পমেড, ভ্যানিশিং ক্রীম, জুতা পালিশ, ঘরের মেঝে পালিশ করিতে লুব্রিক্যান্ট হিসাবে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ইনসুলেটর হিসাবে, প্লাস্টিক ও মডেল শিল্পে, রং প্রস্তুতে, ভার্ণিস, কালি প্রস্তুতে ও জল নিরোধক বস্ত্র তৈয়ারি করিতে মৌ-মোম ব্যবহৃত হয়।

মৌমাছির রোগ, শত্রু ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Diseases of bee, natural enemies and controlling measure) ঃ

মৌমাছির শত্রু (Enemies) ঃ মৌমাছির শত্রুদের মধ্যে গ্রেটার ও লেসার মথ, মোমবিটল, বোলতা, কালো পিঁপড়া, ডেথহেড মথ ও পাখী উল্লেখযোগ্য।

(i) **গ্রেটার ও লেসার মথ** (Greater and lesser moth) ঃ ইহারা পিঙ্গল ধূসর বর্ণের এবং 10 হইতে 18 মিলিমিটার লম্বা হয়। স্ত্রী মথ আকারে বড় হয়। ইহারা মৌচাকের নিচে গর্ত করিয়া থাকে এবং চাকের মোম ভক্ষণ করিয়া মৌচাকের ক্ষতি করে। ইহাদের আক্রমণ ব্যাপক হইলে মৌমাছির বাসা ত্যাগ করে।

(ii) **মৌমোম-বিটল** (Wax beetle) ঃ ইহার বৈজ্ঞানিক নাম *Achroia grisella*। ইহারা মৌচাকে ডিম পাড়ে। লার্ভা ও পরিণত অবস্থায় মৌমোম ভক্ষণ করিয়া চাকের ক্ষতি সাধন করে।

(iii) **বোলতা** (Wasps) ঃ ইহারা বিভিন্ন প্রজাতির হয় এবং মৌচাকের ও মৌমাছির শত্রু। ইহারা পরিণত মৌমাছি, ডিম, লার্ভা ও পিউপা খাইয়া সম্পূর্ণ চাককে ধ্বংস করে।

(iv) **কালো পিঁপড়া** (Black ants) ঃ মৌচাক হইতে কালো পিঁপড়া মধু, রেণু প্রভৃতি খাইয়া কলোনীকে ধ্বংস করে।

(v) **উইপোকা** (Termites) ঃ মৌমাছি কাঠের বাক্সে পালন করা হয়। কাঠের বাক্সে ও টেবিলে উইপোকা লাগিলে মৌমাছির কলোনী নষ্ট হইতে পারে।

(vi) **ইঁদুর** (Rats) : ইঁদুর মৌবাক্সের ভীষণভাবে ক্ষতি করে। ইঁদুর দাঁত দিয়া বাক্স ও ফ্রেম কাটে। মৌমাছিরা ভয়ে চাক ত্যাগ করে।

(vii) **ব্যাঙ** (Toads and Frogs) : ব্যাঙ মৌবাক্সের দরজার কাছে বসিয়া মৌমাছি ধরিবার সুযোগ খোঁজে।

(viii) **মাকড়সা** (Spiders) : মাকড়সা যাহাতে মৌবাক্সে বা তাহার কাছাকাছি জাল বুনিতে না পারে তা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মাকড়সার জালে মৌমাছি আটকাইবার সম্ভাবনা থাকে।

(ix) **পাখী** (Birds) : অনেক পাখী মৌমাছি খায়, যেমন—ফিংগে।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Controlling measure) :

আক্রান্ত চাককে বাহির করিয়া মৌমাছিগুলিকে ঝাড়িয়া করিয়া ঐ চাক রোদে দিতে হয়। ঝাঁটার কাঠি বা সরু তার দ্বারা পোকাকে কুঠুরী হইতে বাহির করা হয়। মথের আক্রমণ হইতে চাককে রক্ষা করিবার জন্য গন্ধক ও ক্যালসিয়াম সায়ানাইডের ধোঁয়া দেওয়া হয়। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ইথিলিন ডাইক্লোরাইড ও মিথাইল ব্রোমাইডের মিশ্রণ প্রতি ঘনফুটে এক আউন্স হারে ধোঁয়া দিলে মথের ডিম ও লার্ভা ধ্বংস হয়।

বোলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য জলে দ্রবীভূত 1% গ্যামাক্সেন স্প্রে করিলে বা 10% ডি. ডি. টি গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে বোলতা মরে। ক্যাসিয়াম সায়ানাইড, 5% বেনজিনে হেক্সাক্লোরাইড বা 10% ডি. ডি. টি দ্রবণ স্প্রে করিয়া বোলতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পিঁপড়া ধ্বংস করিবার জন্য মাটিতে জলে গোলা গ্যামাক্সেন বা 0·1% অলড্রিন দেওয়া হয়। কিংবা 0·6% B. H. C দ্রবণ বা কার্বনডাইসালফাইডের দ্রবণ স্প্রে করা হয়।

উই ধ্বংস করিবার জন্য কাঠের জিনিসে টারমেক্স মাখান হয়। নিকটস্থ জমিতে উই হইলে 0·1% অলড্রিন জলে দ্রবীভূত করিয়া মাটিতে দিলে উই ধ্বংস হয়।

মৌমাছির রোগ (Diseases of bees) :

(i) *Nosema apis* নামক একপ্রকার আদ্যপ্রাণী নোসেমা রোগের কারণ। ইহাদের স্পোর খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে মৌমাছির দেহে প্রবেশ করে। বসন্ত ও শীতকালে এই রোগের প্রকোপ বাড়ে এবং কলোনীকে ধ্বংস করে।

(ii) *Acarapis woodi* নামক মাইট মৌমাছির শ্বাসনালীর অভ্যন্তরে ডিম পাড়ে, ফলে শ্বাসরোধে প্রচুর মৌমাছি মারা যায়।

(iii) *Bacillus apis cepticus* নামক ব্যাকটিরিয়া সেপ্টিসিমিয়া রোগের কারণ। ইহারা মৌমাছির শ্বাসনালীকে আক্রমণ করে এবং মৌমাছির মৃত্যু ঘটায়।

(iv) *Aspergillus* নামক ছত্রাক একধরণের ছত্রাক রোগ ঘটায়। ইহার আক্রমণে মৌমাছি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়।

(v) ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা মৌকলোনীর ডিম, লার্ভা ও পিউপা আক্রান্ত হয়। লার্ভার দেহ বর্ণহীন হয়, মারা যাইবার পর সাদা ও শক্ত হয়।

নিয়ন্ত্রণ (Control) : নোসেমা রোগের প্রতিষেধক নাই। একভাগ স্যাফ্রল তৈল, দুইভাগ নাইট্রোবেনজিন, দুইভাগ পেট্রল একত্রে মিশাইয়া কলোনীতে ছড়াইলে মাইটের আক্রমণ হইতে মৌমাছিকে রক্ষা করা যায়।

লার্ভা আক্রান্ত হইলে কলোনীকে পৃথক করাই শ্রেয়। কম আক্রমণে গন্ধকের বাষ্পস্নান দ্বারা কলোনীকে মুক্ত করা যায়।

চাষের কাজে মৌমাছির সাহায্য :

ফুলের পরাগসংযোগে মৌমাছি সাহায্য করে। শীতের মরশুমী ফুলের বিশেষত: অ্যাসটার, কর্ণফ্লাওয়ার ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। গ্রীষ্মকালীন ফুল গিলার্ডিয়া, ক্যারিওপসিস, পোর্টুলেকা, মেরিগোল্ড ও হোলিহকে রেণুর পরিমাণ কম সেইজন্য মৌমাছির সাহায্যে এইসকল ফুলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

আম, লেবু, শসা, লাউ, কুমড়া, পিঁয়াজ, মূলা ও সরিষার চাষে মৌমাছি ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া যায়। মৌমাছি ফুলের পরাগমিলনে সাহায্য করিয়া ফসল বাড়ায়। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে চাষীরা চাষের জমিতে মৌবাক্স রাখা পছন্দ করে। পরীক্ষায় দেখা যায়, এই বাগানে অন্য বাগানের তুলনায় ফলন বেশী হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চাষীরা মৌ-চাষ করে না, মৌ-পালকেরা অপর চাষীর জমিতে মৌবাক্স রাখিয়া আসে। এক্ষেত্রে উভয়েরই লাভ হয়, চাষীর ফলন বাড়ে এবং মৌপালকের মধু বেশী পরিমাণে সংগৃহীত হয়।

লাক্ষাচাষ (Lac culture)

সূচনা (Introduction) :

মানবকল্যাণের জন্য প্রকৃতির অসামান্য দান প্রাণী কর্তৃক সংগৃহীত বা উহাদের দ্বারা উৎপাদিত বস্তু। পতঙ্গ শ্রেণীর অনেক প্রাণী কর্তৃক উৎপাদিত অনেক বস্তুই মানুষের অনেক প্রয়োজনে লাগে। **লাক্ষা** (বা লাহা) নামে পরিচিত অতিপ্রয়োজনীয় বস্তু যাহা লাক্ষাপতঙ্গ কর্তৃক সৃষ্ট হয়। একপ্রকার প্রাকৃতিক রেজিন যাহা লাক্ষাপতঙ্গের দেহস্থিত কতকগুলি গ্রন্থি নিঃসৃত রস বিশেষ কয়েক প্রকার পোষক বা আশ্রয়তরুর নরম শাখায় বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া শুষ্ক হইয়া কঠিন এবং শক্ত হয়। এই কঠিন শক্ত বস্তুই **লাক্ষা** এবং উৎপাদনকারী **পতঙ্গ** বা **লাক্ষাকীটের** (Lac insect) বিজ্ঞানসম্মত নাম *Tachardia lacca.*

শুধুমাত্র ভারতেই নয়, বহু প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লাক্ষার উপযোগিতা ও ব্যবহার জানা ছিল। ভারতের পুরাণে, বেদে ও মহাভারতেও লাক্ষার উল্লেখ আছে। ইউরোপ, আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারতে আগত অগণিত সম্রাট, বাদ্‌শা এবং বণিকের ভ্রমণ কাহিনীতে লাক্ষার বহু উল্লেখ আছে।

লাক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার তথ্য ও বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা বেশ কিছুটা পরেই শুরু হইয়াছে। 1709 খ্রীষ্টাব্দে Father Tachard লাক্ষা উৎপাদনকারী এই কীটের সন্ধান পান। Kerr. (1782)-ই প্রথম এই লাক্ষাকীটের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য পরিবেশন করেন। পরবর্তীকালে Green (1922) এবং Chatterjee (1915) দ্বারা নতুন বৈজ্ঞানিক নামকরণ হয় এবং Glover (1938)-এর তথ্য হইতে এই কীটের জীবন ইতিহাস, পোষক উদ্ভিদ ও অন্যান্য বিশদ্ বিবরণ পাওয়া যায়।

লাক্ষা উৎপাদনের জন্য পোষক উদ্ভিদ ও লাক্ষাকীটের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিপালন ও লাক্ষাকীটের দেহস্থিত গ্রন্থি নিঃসৃত ক্ষরণ হইতে উৎপন্ন লাক্ষার পরিশোধন ইত্যাদি **লাক্ষাচাষ** (Lac culture) অন্তর্ভুক্ত।

প্রাণিজগতে লাক্ষাকীটের স্থান (Systematic position in animal kingdom) :

বাণিজ্যিক দিক থেকে *Tachardia lacca* (Kerr.) লাক্ষা উৎপাদনকারী কীটের অনেক প্রজাতির মধ্যে অন্যতম। সন্ধিপদ (Arthropoda) পর্বের অন্তর্গত এবং পতঙ্গ (Insecta) শ্রেণীভুক্ত কীটের প্রাণিসর্গে নিম্নোক্ত সারিতে অবস্থান—

বর্গ : (Order)—হেমিপ্‌টেরা (Hemiptera)
উপবর্গ : (Suborder)—হোমোপ্‌টেরা (Homoptera)
গোত্র : (Family)—ল্যাসিফেরিডি (Lacciferidae) বা ট্যাকারিডি (Tacharidae)
উপগোত্র : (Subfamily)—ট্যাকারডিনি (Tachardinae)
গণ : (Genus)—ট্যাকারডিয়া (Tachardia)
প্রজাতি : (Species)—ল্যাক্কা (Lacca)

লাক্ষাকীটের পোষক উদ্ভিদ (Host plants) :

লাক্ষাকীট পরজীবী হিসাবে বেশ কিছু নির্দিষ্ট উদ্ভিদের কোষরস শোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই জাতীয় উদ্ভিদগুলিকে লাক্ষাকীটের আশ্রয়তরু বলা হয়। নীচে বিশেষ কয়েক প্রকার প্রজাতির উদ্ভিদের উল্লেখ করা হইল যাহার উপর ইহারা ভালভাবে জীবনধারণ করিতে পারে।

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
1. কুসুম (Kusum)	*Schleichera oleosa*
2. পলাশ (Palas)	*Butea monosperma*
3. বের (Ber)	*Zizyphus mauritiana*
4. কুল (Kul)	*Zizyphus jujuba*
5. বাবুল (Babul)	*Acacia nilotica*
6. খয়ের (Khair)	*Acacia catechu*
7. অড়হড় (Arhar)	*Cajanus cajan*

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাক্ষা উৎপাদনের জন্য উপরিউক্ত আশ্রয়তরুগুলির মধ্যে কুসুম, পলাশ, কুল, অড়হড় এবং খয়ের উল্লেখযোগ্য। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে অন্যান্য যে আশ্রয়তরুগুলি লাক্ষা চাষের উপযোগী তাহাদের মধ্যে

ঘোণ্ট (Ghont)—*Zizyphus xylopyra*, পিপাল (Peepal)—*Ficus religiosa*, গুলার (Gular)—*Ficus glomerata* প্রভৃতির নাম করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে উপরিউক্ত আশ্রয় তরুগুলির মধ্যে কুল, পলাশ ও কুসুম ক্রমানুযায়ী প্রধান।

পোষক উদ্ভিদের উপরই লাক্ষার গুণ নির্ভর করে এবং লাক্ষদ্রব্যগুলি উচ্চমানের হয়।

লাক্ষাকীটের স্ট্রেনস (*Strains of lac insects*) :

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ দুই প্রকার বিশেষ স্ট্রেন সম্পন্ন লাক্ষাকীট দেখা যায় :—

(a) **কুসুম স্ট্রেন** (Kusum strain) : ইহারা শুধুমাত্র কুসুম উদ্ভিদেই বাস করে। অন্য পোষক উদ্ভিদে ইহাদের জীবনচক্রের সময়কাল পরিবর্তিত হয়। কুসুম স্ট্রেনের লাক্ষাকীট দ্বারা উৎপন্ন অগ্রহায়ণ মাসে 'আগহনী' ও জ্যৈষ্ঠ মাসে 'জ্যেঠুই' লাক্ষাফসল এবং ইহা হইতে মোট বৎসরে দুইবার লাক্ষা সংগ্রহ করা যায়।

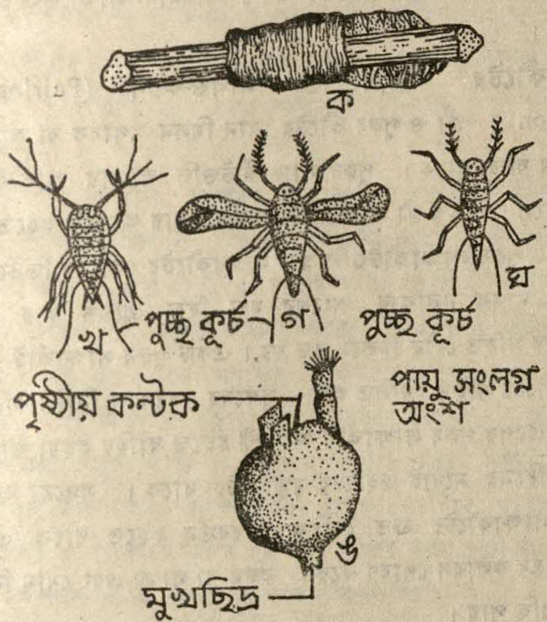
(b) **রঙ্গিনী স্ট্রেন** (Rangini strain) : ইহাদের জীবনচক্রও বৎসরে দুইবার আবর্তিত হয়। কুসুম উদ্ভিদ ব্যতীত অন্য সকল উদ্ভিদে প্রতিপালিত লাক্ষাকীটকে রঙ্গিনী স্ট্রেন বলা হয়। এই স্ট্রেনের লাক্ষাকীট দ্বারা উৎপন্ন বৈশাখ মাসে 'বৈশাখী' ও কার্তিক মাসে 'কাত্‌কী' লাক্ষাফসল। এই স্ট্রেন হইতেও বৎসরে দুইবার লাক্ষা সংগ্রহ করা যায়। উল্লেখযোগ্য, মহীশূরের এক প্রকার স্ট্রেনের জীবনচক্র বৎসরের একটু বেশী সময়ে তিনবার আবর্তিত হয়। ইহাদের উদ্ভিদ পোষকের নাম—*Shorea talura.*

লাক্ষাকীটের গঠন বৈচিত্র্য (Structural peculiarities) :

পূর্ণাঙ্গ লাক্ষাকীটের যৌনদ্বিরূপতা লক্ষ্য করা যায়। পুরুষ লাক্ষাকীট ও স্ত্রী লাক্ষাকীটের মধ্যে আকার, আকৃতি এবং দৈহিক অঙ্গের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির পার্থক্য লক্ষণীয়।

পুরুষ লাক্ষাকীট (Male lac insect) : লাল রঙের কীটগুলি দৈর্ঘ্যে 1·5 মিমি লম্বা হয়। দেহে ডানা থাকিতেও পারে অথবা ডানাবিহীন। দেহটি তিনটি অংশে বিভক্ত—মস্তক, বক্ষ এবং উদর। ইহাদের মুখে উপাঙ্গ না থাকায় কোন কিছু খাইতে সক্ষম হয় না। মস্তক অংশে একজোড়া শুঁড় ও একজোড়া চক্ষু বিদ্যমান। তিনজোড়া পদ বক্ষ অঞ্চলে থাকে। সুবৃহৎ

উদর অংশের শেষ খণ্ডে একজোড়া কডাল সিটা এবং আবরণযুক্ত জননঅঙ্গ বিদ্যমান।



চিত্র 15 : লাক্ষার আস্তরণ ও লাক্ষাকীট
ক. লাক্ষার আস্তরণ ; খ. ডানাবিহীন পুরুষ লাক্ষাকীট ;
গ. ডানাবিশিষ্ট পুরুষ লাক্ষাকীট ; ঘ. নিম্ফ ;
ঙ. স্ত্রী লাক্ষাকীট

স্ত্রী লাক্ষাকীট (Female lacinsect) : স্ত্রী লাক্ষাকীটগুলির দেহ সাধারণতঃ গোলাকার হয় এবং শরীরে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়া লাক্ষা উৎপন্নকারক রস নিঃসৃত হয়। ইহাদের গায়ে কাটা থাকে এবং পায়ু অঞ্চলে এনাল টিউবারকল্ (Anal tubercle) নামক একটি নলাকৃতি গঠন বিদ্যমান। মস্তক অংশে চক্ষু এবং বক্ষ অঞ্চলে ডানা থাকে না। নিম্ফের শুঙ্গ, পদ ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গবস্থায় নষ্ট হইয়া যায় তাহার কারণ স্ত্রী লাক্ষাকীটগুলি স্থান ত্যাগ করে না। আশ্রয়স্থলে ইহারা সংলগ্ন হইবার পর সেই স্থানেই বসবাস করে। সেই কারণেই এইসব উপাঙ্গগুলি

অপ্রয়োজনীয় হইয়া যায়। নিম্ফের দেহের উদর অংশের শেষ খণ্ডে এক-জোড়া কডাল সিটা থাকে।

স্ত্রী লাক্ষাকীটের দেহ হইতেই বেশী পরিমাণ লাক্ষা উৎপন্নকারী রস নিঃসৃত হয়।

লাক্ষাকীটের মিলন ও নিষিক্তকরণ (Pairing and fertilization) : স্ত্রী ও পুরুষ কীটের যৌন মিলন পোষক বা আশ্রয়বৃক্ষের নরম শাখায় ঘটিয়া থাকে। পুরুষ লাক্ষাকীটগুলি লাক্ষার আবরণী হইতে বাহিরে আসে। কিন্তু স্ত্রী লাক্ষাকীট কখনও উহার আবরণী হইতে বাহিরে আসে না। পুরুষ লাক্ষাকীটগুলি স্ত্রী লাক্ষাকীটের কোষের ভিতরে এনাল টিউবারকল্ নামক নলাকার অংশের মধ্য দিয়া প্রবেশ করে এবং স্ত্রী লাক্ষাকীটের সহিত যৌন মিলনে রত হয়। একটি পুরুষ লাক্ষাকীট একাধিক স্ত্রী লাক্ষাকীটের সহিত মিলিত হয়। সংগমের সময়কাল নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। এরপর পুরুষ লাক্ষাকীট আবরণী হইতে বাহির হইয়া আসে এবং 3 হইতে 4 দিনের মধ্যেই উহাদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সঙ্গমের অব্যবহিত পরই স্ত্রী লাক্ষাকীটের দ্রুত দৈহিক পরিবর্তন হইতে থাকে এবং বেশী পরিমাণ উদ্ভিদ কলারস শোষণ করে। রজন বা লাক্ষা এবং মোম নিঃসরণও দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়।

জীবনচক্র (Life cycle) : নিষিক্ত হইবার পর স্ত্রী লাক্ষাকীট ডিম প্রসব করিতে সক্ষম হয়। একটি নিষিক্ত স্ত্রী লাক্ষাকীট সাধারণভাবে 200-500 ডিম প্রসব করিতে পারে। ডিমগুলি পরিস্ফুটিত হইয়া সরাসরি নিম্ফে পরিণত হয় (চিত্র 15-ঘ)। নিম্ফগুলি মাতা লাক্ষাকীটের এনাল টিউবারকুলার ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসে। স্ত্রী লাক্ষাকীট প্রতি ঘণ্টায় 2 হইতে 14টি নিম্ফ প্রসব করে এবং সকালের দিকেই প্রসবের হার বেশী হয়। নিম্ফ নির্গত হইবার পরই মাতা লাক্ষাকীট মারা যায়।

নিম্ফগুলি ক্ষুদ্র এবং নরম দেহযুক্ত লাল বর্ণের হয়। ডিম্বাকৃতি অথবা নৌকাকৃতি বিশিষ্ট নিম্ফ লম্বায় $\frac{1}{2}$ মি.মি.-এর মত হয়। দেহটি মস্তক, বক্ষ এবং উদর অংশে বিভক্ত। মস্তক অংশে একজোড়া শুড়, একজোড়া চক্ষু ও একটি প্রবোসিস (proboscis) বা চোষক থাকে। তিনটি খণ্ডবিশিষ্ট বক্ষের প্রতি খণ্ডেই একজোড়া পা এবং শ্বসনের জন্য দুইজোড়া শ্বাসছিদ্র বিদ্যমান। উদরের পশ্চাদ অংশ সরু হয় এবং শেষ খণ্ডে একজোড়া দীর্ঘ কডাল সিটা থাকে।

নিম্ফগুলি অপরিণত পুরুষ বা স্ত্রী লাক্ষাকীট। ইহারা মাতা লাক্ষাকীটের এনাল টিউবারকুলার ছিদ্রপথে দলে দলে বাহির হয়।

এইরূপ দলে দলে নিম্ফ নির্গত হওয়াকে **সোয়ার্মিং** (swarming) বলে। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া এই নির্গমন চলিতে থাকে। ইহারা প্রথমে খুব সক্রিয় হইয়া হামাগুড়ি দেয় এবং বৃক্ষশাখায় উপযুক্ত আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

বৃক্ষের নরম শাখাই ইহাদের উপযুক্ত আশ্রয়স্থল। নিম্ফগুলি খুব কাছাকাছি শাখার উপর ও নিম্নতলে অবস্থান করে। এইখানে উপনীত হইয়া ইহারা কাণ্ডাভ্যন্তরে ইহাদের চোষক দ্বারা ফ্লোয়েম কলারস শোষণ করে এবং শেষে এই স্থলেই সংলগ্ন হইয়া জীবনযাপন করিতে থাকে। ইতোমধ্যে দেহত্বকের নীচে অবস্থিত লাক্ষাগ্রন্থি হইতে লাক্ষা বা রেজিন নিঃসৃত হয়। এই অবস্থায় ইহারা আর নড়াচড়া করে না। দেহাবস্থানের নিম্ন অঞ্চল, মুখ, পায়ু ও দুইটি শ্বাসছিদ্র ব্যতিরেকে দেহের সর্বত্রই লাক্ষাগ্রন্থি হইতে রেজিন নিঃসৃত হইয়া লাক্ষাকীটের দেহের বাহিরে আবরণ তৈয়ারি করে। রেজিন তরলাকারে নির্গত হয় এবং আশ্রয় তরুর নরম শাখায় জমিয়া বাতাসের সংস্পর্শে কঠিন ও শক্ত লাক্ষায় পরিণত হয়।

নিম্ফ সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইলে খোলস ত্যাগ করে এবং প্রচুর কলারস শোষণ করিতে থাকে। নিম্ফ যে রেজিন দ্বারা নিজেদের আবৃত করে উহাকে **লাক্ষা কোষ** (lac cell) বলে। পুরুষ ও স্ত্রী লাক্ষাকোষের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

পুরুষ লাক্ষাকোষ (Male lac cell) : লম্বাটে এবং সিগারেটের ন্যায়। দেহের সম্মুখ দিকে একজোড়া ব্রঙ্কাল ছিদ্র (Branchial aperture) এবং পশ্চাদ্ দিকে একটি বৃহৎ গোলাকার ছিদ্র বিদ্যমান। ঢাক্‌নাযুক্ত এই ছিদ্রপথেই পরিণত পুরুষ লাক্ষাকীট আবরণীযুক্ত কোষের বাহিরে আসে।

স্ত্রী লাক্ষাকোষ (Female lac cell) : ন্যাসপাতির ন্যায় অথবা গোলাকৃতি হয়। দেহের সম্মুখ দিকে একজোড়া ব্রঙ্কাল ছিদ্র এবং পশ্চাদ্ দিকে একটি এনাল ছিদ্র (Anal aperture) থাকে। বৃহৎ এই ছিদ্র হইতে লাক্ষাকীটের দেহস্থিত গ্রন্থি হইতে মোমের সাদা ফিলামেণ্ট বাহির হয়। এইগুলি স্ত্রী লাক্ষাকীটের জীবিতাবস্থা নির্দেশন করে এবং অতিরিক্ত রেজিন নিঃসরণের সময় বন্ধ হওয়া ছিদ্রের দ্বার নিয়ন্ত্রণ করে।

কলারস শোষণ করিয়া নিম্ফ বড় হইতে থাকে এবং ইতোমধ্যে নিজেদের কোষে তিনবার খোলস ত্যাগ করিয়া পরিণত পুরুষ বা স্ত্রী লাক্ষাকীটে রূপান্তরিত হয়। সাধারণতঃ পুরুষ ও স্ত্রী লাক্ষাকীটের জন্ম সংখ্যার অনুপাত 30 : 70 ; অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ লাক্ষাকীট বেশী সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করিতে পারে। ইহারাই নিম্ফ হইতে সর্বাগ্রে সৃষ্টি হয়। পরিণত পুরুষ লাক্ষাকীট লাক্ষা-আবরণী হইতে বাহির হইয়া মিলনের জন্য স্ত্রী লাক্ষাকীটের সংস্পর্শে যায়।

সম্প্রতি গবেষণায় জানা গিয়াছে যে **পার্থেনোজেনেসিস** (Parthenogenesis) লাক্ষাকীটে ঘটে না। স্ত্রী লাক্ষাকীটের দেহাভ্যন্তরে বিশেষ কুঠুরীতে ডিম প্রসব ঘটিয়া থাকে। স্ত্রী লাক্ষাকীটের দৈহিক সংকোচনের ফলেই এই কুঠুরী তৈয়ারী হয়।

উল্লেখযোগ্য, লাক্ষাকীটের এনাল ছিদ্র হইতে এক ধরনের আঠালো রস নিঃসৃত হয়। উহা Honey dew নামে পরিচিত এবং গাছের উপরের দিকের শাখায় ও পাতার উপরিতলে চট্‌চটে আবরণের সৃষ্টি করে। পিপীলিকা (Ants) ঐ আঠালো পদার্থের দিকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়।

লাক্ষা নিঃসরণ (Lac secretion) : পূর্বেই বলা হইয়াছে লাক্ষাকীটের দেহস্থিত কতকগুলি গ্রন্থি হইতেই নিঃসৃত রস যাহা বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া লাক্ষা রেজিনের সৃষ্টি করে। গাছের নরম শাখায় নিম্ফগুলি সংলগ্ন হইবার পরই এই নিঃসরণ শুরু হয়। প্রথম অবস্থায় এই ক্ষরণ খুব চক্‌চকে স্তর গঠন করে এবং পরে স্তর জমিয়া লাক্ষাকীটের শক্ত আবরণ তৈয়ারি করে। তৃতীয়বার খোলস বদলানোর পূর্ব পর্যন্ত পুরুষ লাক্ষাকীটগুলি রেজিন ক্ষরণ করে এবং তাহার পর রেজিন ক্ষরণ বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু স্ত্রী লাক্ষাকীট অনেক দিন ধরিয়া রেজিন ক্ষরণ করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ সকল লাক্ষাকোষ পাশাপাশি অবস্থান করে এবং একে অন্যের সহিত জুড়িয়া গাছের শাখায় একটি টানা **লাক্ষা-আবরণী** (Lac encrustation) তৈয়ারি করে (চিত্র 15-ক)।

লাক্ষার উপাদান (Composition) : রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রকৃতিজাত লাক্ষা নামক রেজিনে অ্যালুইরিক এবং জালারিক অ্যাসিড থাকে। ইহা ছাড়া প্রোটিন, শর্করা, লবণ (জলদ্রাব্য), তৈল (উদ্বায়ী), রঞ্জক এবং বালি পাওয়া যায়।

লাক্ষাচাষ পদ্ধতি (Method of lac cultivation) : অন্যান্য বিনষ্টকারী পতঙ্গের মত লাক্ষাকীটও পোষক উদ্ভিদের কলারস শোষণ করিয়া ক্ষতিসাধন করে ঠিকই কিন্তু উহাদের দেহস্থিত গ্রন্থি নিঃসৃত রস যাহা লাক্ষা নামক রেজিন সৃষ্টি করিয়া উহাদের দেহাবরণ তৈয়ারি করে। প্রকৃতিতে লাক্ষার এই আবরণী লাক্ষাকীটের প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

কিন্তু লাক্ষার এই আবরণীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। লাক্ষা ও লাক্ষাজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রতিবছর গড়ে প্রায় আট কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়। তাই যথোপযুক্তভাবে লাক্ষা চাষ প্রয়োজন। বিহারে রাঁচীর কাছে নামকুমে অবস্থিত গবেষণা সংস্থা (ইণ্ডিয়ান ল্যাক রিসার্চ ইনস্টিটিউট) কর্তৃক উন্নত প্রণালীতে লাক্ষাচাষ, লাক্ষার পরিশোধন ও ব্যবহার এবং লাক্ষাশিল্পবাণিজ্য বিষয়ক বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাক্ষাচাষ নিম্নোক্ত নির্ভরশীল পর্যায়গুলির অন্তর্ভুক্ত। যেমন, **পোষক উদ্ভিদের রোপণ, পরিচর্যা ও নিয়মিত ডাল ছাঁটা, লাক্ষাকীটের প্রতিপালন, পরিচর্যা ও নূতনভাবে আক্রান্ত করা, শত্রু ও খাদক পতঙ্গের দমন, ফসল কাটা ও লাক্ষা-সংগ্রহ** এবং **ব্যবসায়িক মূল্যায়ণ।**

পোষক উদ্ভিদের রোপণ, পরিচর্যা ও নিয়মিত ডাল ছাঁটা :

লাক্ষাকীটের আশ্রয় বৃক্ষগুলি প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করিতে সক্ষম অর্থাৎ খরা বা অতিবৃষ্টিতেও খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাই নিয়মিত পরিচর্যায় এই সব উদ্ভিদ ভালভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। জলসেচের ব্যবস্থা, প্রয়োজন অনুযায়ী জমিতে সার প্রয়োগ, নতুনভাবে উদ্ভিদের রোপণ ও তাহাদের রক্ষা করিতে পারিলেই বেশ সুফল পাওয়া যায়। কলম করিয়া কাটিং (cutting) পদ্ধতিতে অঙ্গজ জনন ঘটাইয়া নূতন উদ্ভিদ রোপণ করিতে হয়। রোপণ পদ্ধতির উপর এইসব উদ্ভিদের ভালভাবে বৃদ্ধি হয় এবং বহুল শাখাপ্রশাখাযুক্ত হয়। কলমগুলিকে একাধিক সারিতে এমনভাবে রোপণ করা হয় যে ঐ সারির গাছগুলিকে কাল্পনিক রেখায় যুক্ত করাইলে অসংখ্য ত্রিভুজ আকৃতির ন্যায় দেখা যায়। 3-4 বৎসর পর এইসকল উদ্ভিদের শাখাপ্রশাখা বিস্তার লাভ করে। তখনই ইহাদের ডাল ছাটা

(pruning) হয়। পোষক উদ্ভিদের শাখাপ্রশাখা সময়মত ও নিয়মমত ছাঁটিলে অধিক সংখ্যক নূতন শাখাপ্রশাখা উৎপন্ন হয় এবং লাক্ষাকীট এই-সব আশ্রয়স্থলে উপনীত হয়।

যে সমস্ত শাখা বা ডালের ব্যাসার্ধ 1 ইঞ্চির কম সেইসব ডালগুলিকেই ছাঁটিবার জন্য নির্বাচিত করা হয়। পোষক উদ্ভিদের শাখাপ্রশাখা ছাঁটিবার ফলে উদ্ভিদটিকে এমন উচ্চতা সম্পন্ন করা হয় যে নূতনভাবে নিম্ফগুলিকে আক্রান্ত করা যায়।

ইনঅকুলেশন (Inoculation) **বা আক্রান্ত করিবার পদ্ধতি :**

যে পদ্ধতিতে লাক্ষাকীটের আস্তরণ (স্ত্রী ও পুরুষ কীট সম্পন্ন) ছোট ছোট খণ্ডকে, **বীজ লাক্ষা** (Seed lac) নামে পরিচিত নতুন পোষক উদ্ভিদের বিভিন্ন নরম শাখায় বাঁধিয়া আক্রান্ত করা হয় তাহাকে **ইন-অকুলেশন বলে**। বহু বৎসরের পুরাতন উদ্ভিদের যে সকল শাখায় লাক্ষা-কীটের আস্তরণ আছে সেই সকল শাখাগুলিকে, কাটিয়া আনিয়া 6 ইঞ্চি মাপের ছোট ছোট টুকরা করা হয়। এই ছোট ছোট ডালই **ব্রুড লাক্ষা** (Brood lac)। এইবার ইহাদের ঠাণ্ডা পরিবেশে দুই সপ্তাহ ব্যাপী সুরক্ষা করিয়া নিম্ফ নির্গমনের পূর্ব মুহূর্তেই নতুন 3-4 বৎসরের উদ্ভিদের বিভিন্ন বিভিন্ন শাখায় **বীজলাক্ষা** সরু দড়ির সাহায্যে তিনরকম ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, আক্রান্ত করিবার জন্য সুস্থ লাক্ষাকীটের আস্তরণ-যুক্ত উদ্ভিদ শাখাগুলিকে বাছিয়া লওয়া হয়।

বীজলাক্ষা হইতে নিম্ফ বাহির হইয়া নতুন উদ্ভিদের প্রায় সকল শাখায় আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুড়িয়া বেড়ায়। এইবার নতুন আশ্রয়স্থলে উপনীত হইয়া কলারস শোষণ করিতে থাকে এবং রেজিন ক্ষরণ করিতে শুরু করে।

কৃত্রিম উপায়ে বীজ লাক্ষা আক্রান্ত করা হইলে লাক্ষা উৎপাদনের হার অধিক হয়।

লাক্ষা ফসল (Lac crops) **:**

লাক্ষাকীটের জীবনচক্র সাধারণভাবে বৎসরে দুইবার আবর্তিত হয়। কুসুম স্ট্রেন হইতে বৎসরে **আগাহনী** এবং **জৈ্যষ্ঠই** নামক দুইটি ফসল এবং রঙ্গিণী স্ট্রেন হইতে বৎসরে **বৈশাখী** এবং **কাত্‌কী** নামক দুইটি ফসল অর্থাৎ প্রতিবৎসরে চারিবার লাক্ষা ফসল উৎপন্ন হয়। লাক্ষা সংগৃহীত

মাসগুলির নামের হিন্দি প্রতিশব্দ হইতেই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। লাক্ষা ফসলগুলি নিম্নরূপ :—

A. **কুসুম লাক্ষা :** এই জাতীয় লাক্ষাকীটের (i) **'জ্যেঠুই'** ফসলের জন্য পৌষমাসের শেষ হইতে মাঘমাসের শুরুতেই কুসুম উদ্ভিদ বীজলাক্ষা দ্বারা আক্রান্ত করা হয়। লাক্ষা সংগ্রহ করা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং (ii) **'আগাহনী'** ফসলের জন্য আশ্রয় তরুতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাসের শুরুতে আক্রান্ত করিতে হয়। পৌষ মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝিতে ফসল তুলিতে হয়।

B. **রঙ্গিণী লাক্ষা :** কুসুম ব্যতীত অন্যান্য সকল উদ্ভিদগুলিতে (i) **'বৈশাখী'** ফসলের জন্য আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজলাক্ষা দ্বারা

কুসুমী				
	বীজ লাক্ষা লাগানোর সময়	পুরুষ লাক্ষা-কীটের নির্গমন সময়	ফসল সংগ্রহের সময়	সোয়ার্মিং-এর সময়
জ্যেঠুই	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মার্চ-এপ্রিল	জুন-জুলাই	জুন-জুলাই
আগাহণী	জুন-জুলাই	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
রঙ্গিণী				
বৈশাখী	অক্টোবর-নভেম্বর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	এপ্রিল-মে	জুন-জুলাই
কাত্কী	জুন-জুলাই	আগষ্ট	অক্টোবর-নভেম্বর	অক্টোবর-নভেম্বর

আক্রান্ত করা হয়। ফসল সংগ্রহ করা হয় পরের বছর এবং (ii) **'কাত্কী'**

ফসলের জন্য বীজলাক্ষা আক্রান্ত করা হয় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। সেই বছরেই লাক্ষা সংগ্রহ করা হয়।

ইংরাজী মাসের সময়পঞ্জী অনুযায়ী বীজলাক্ষার আক্রান্ত করিবার সময়কাল, ফসল সংগ্রহের সময়কাল, পুরুষ লাক্ষাকীটের নির্গমন সময়, স্ত্রী লাক্ষাকীট দ্বারা উৎপন্ন "সোয়ার্মিং নিম্ফ"-এর সময়কাল প্রভৃতি **ছকের** মাধ্যমে পূর্বের পৃষ্ঠায় আলোচিত করা হইল।

চারিটি লাক্ষা ফসলের মধ্যে **'বৈশাখী'** ফসলের উৎপাদনের পরিমাণই সবথেকে বেশী, শুধু তাহাই নয় এই লাক্ষাদ্রব্যগুলি খুবই উচ্চমানের হয়। ফসলভিত্তিক লাক্ষা উৎপাদনের হার (Rate of Production)—1. **'রঙ্গিনী'** (90%) (a) **বৈশাখী**—65%, (b) **কাত্‌কী**—25% এবং 2. **কুসুমী**—(10%)—(a) **জ্যেঠুই**—2·56%, (b) **আগাহনী**—7·44%।

লাক্ষা ফসল কাটা ও সংগ্রহ পদ্ধতি (Harvesting & lac collection) :

লাক্ষাকীটের দেহস্থিত গ্রন্থিনিঃসৃত ক্ষরিত রস উদ্ভিদের শাখায় কঠিন আবরণ হিসাবে জমা হয়। কোন ধারাল বস্তু দিয়া আক্রান্ত পোষক উদ্ভিদের শাখায় জমিয়া থাকা আবরণকে তুলিয়া লওয়া হয়। ছোট ছোট শাখা সমেত লাক্ষার আস্তরণকে **স্টিক লাক্ষা** (Stick lac) বলা হয়। লাক্ষার আস্তরণ নিম্ফ বাহির হইবার পূর্বমুহূর্তে কিংবা পরেও চাঁছা যায়। নিম্ফ বাহির হইবার পূর্বেই যদি সেই লাক্ষা ব্যবহারের জন্য তুলিয়া আনা হয় তবে সেই উৎপন্ন লাক্ষাকে **এরি লাক্ষা** (Ari lac) বলা হয়। সোয়ার্মিং-এর পরে যে লাক্ষা কাটিয়া আনা হয় সেই লাক্ষাকে **ফাঙ্কি লাক্ষা** (Phunki lac) বলা হয়। কাটিয়া ফেলা ব্রুড লাক্ষার (Brood lac) শাখাগুলি বাণ্ডিল করিয়া রাখা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে **বীজলাক্ষা** রূপে ব্যবহার করা হয় এবং বাকী শাখাগুলি হইতে **পরিত্যক্ত লাক্ষা** সংগ্রহ করা হয়।

ব্যবসায়িক লাক্ষার জন্য লাক্ষাচাষীরা পরিণত বৃক্ষের পরিত্যক্ত লাক্ষাই সংগ্রহ করে। লাক্ষা আস্তরণ সমেত এই সকল শাখাগুলি প্রথমে জলে ভালভাবে বেশ কয়েকবার ধৌত করা হয় এবং পরে রৌদ্রে শুকান হয়। তাহার পর ধারাল ছুরির দ্বারা ঐ আস্তরণ শাখা হইতে চাঁছিয়া চূর্ণ করা হয়। এই চূর্ণ আবরণী **দানাদার লাক্ষায়** পরিণত হয়। শুষ্ক দানাদার লাক্ষা একটি বড় পাত্রে কাপরের উপর রাখিয়া আগুনে গলান হয়। গলা

লাক্ষা কাপড়ের নীচে জমা হয় এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তুসকল **কিড়ী** (Kiri) কাপড়ের উপর থাকিয়া যায়। কাপড়ের নীচে সংগৃহীত গালা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিশুদ্ধ করিয়া ছাঁচে ফেলিয়া বিভিন্ন আকৃতির গালা তৈয়ারি করা হয়। শেষ পর্যায়ের এই পরিশুদ্ধ ছাঁচে উৎপাদিত লাক্ষাকেই ব্যবসায়িক সেলাক (Shellac) বলে। প্রয়োজনমত গলিত লাক্ষার সহিত পছন্দমত বিভিন্ন রঙ এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য মেশান হয়।

লাক্ষাকীটের শত্রু ও উহাদের দমন (Lac enemies and their control) ঃ

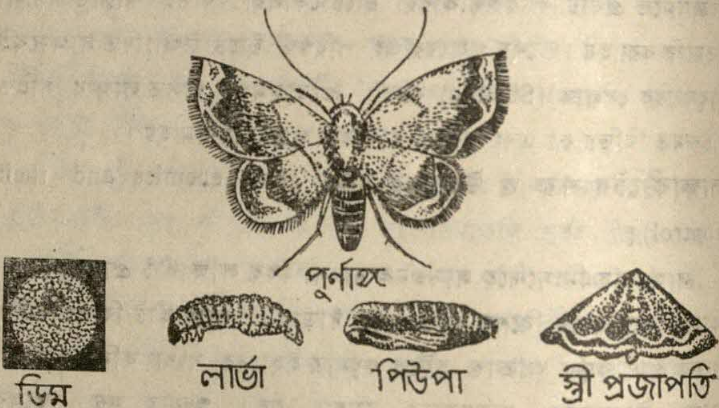
লাক্ষাচাষ নিঃসন্দেহে লাভজনক ব্যবসা কিন্তু লাক্ষাকীট প্রতিপালকদের কাছে সময়ে সময়ে বিশেষ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। লাক্ষাকীট বিভিন্ন শত্রু ও খাদক প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে শুধুমাত্র ইহাদের সংখ্যা কমিয়া যায় না, লাক্ষা উৎপাদনও দারুণভাবে ব্যাহত হয়। শুধুমাত্র অন্য পতঙ্গের আক্রমণেই 30-40% লাক্ষা ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়।

পতঙ্গ এবং অন্যান্য প্রাণী কর্তৃক লাক্ষাকীট আক্রান্ত হয়। নীচে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

1. **খাদক প্রাণী ও পরজীবী** (Predators and parasites) লাক্ষাকীটকে **খাদ্য** হিসেবে ব্যবহার করে কিছু কীটপতঙ্গ। এছাড়া এই কীটের জীবনবৃত্তান্তের বিভিন্ন দশায় বিভিন্ন কীট **পরজীবী** হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করে। পতঙ্গ খাদক দ্বারাই লাক্ষাকীট বেশী আক্রন্ত হয়।

(a) লাক্ষাকীটের প্রধান খাদক প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখ্য হইল দুইটি প্রজাতির মথ—সাদা বর্ণের (চিত্র 16) (i) *Eublemma amabilis* Moore (লেপিডপ্টেরা বর্গের নকটুইডি গোত্রের অন্তর্গত) এবং ধূসর বর্ণের (ii) *Holococera Pulverea* Meyr. (লেপিডপ্টেরা বর্গের ব্লাসটোবাসিডি গোত্রের অন্তর্গত)। এছাড়া গোত্র ক্রাইসোপোডির অন্তর্গত *Chrysopa* প্রজাতিকেও খাদকের ভূমিকায় লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের স্ত্রীমথগুলি লাক্ষাকীটের আস্তরণের কাছাকাছি ডিম পাড়ে। ডিম হইতে নির্গত লার্ভাগুলি একসাথে লাক্ষাকীট ভক্ষণ করে। ইহারা লাক্ষা আস্তরণেরও ক্ষতি করে। লার্ভা অবস্থায় লাক্ষা আস্তরণের মধ্যে সুরঙ্গের মত পথ তৈয়ারি করে এবং এইখানেই লার্ভা পিউপা দশায় পরিণত হয়। পূর্ণাঙ্গ মথ লাক্ষা আস্তরণের ফোকর দিয়া বাহিরে আসে। এইভাবেই ইহারা জীবনচক্র সমাধা করে।

(b) পতঙ্গ পরজীবীরা Chalcidoidea গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং প্রায় আটটি প্রজাতির Chalcidoids—*Coccophagus tschirchii*, *Erencyrtus*



চিত্র 16 : লাক্ষার শত্রু সাদা বর্ণের প্রজাপতি

dewitzii, *Eupelmus tachardiae*, *Marietta javensis*, *Parechthrodryinus clavicornis*, *Tachardiaephagus tachardiae*, *Tachardiaephagus tachardiae* var. *Somervilli* and *Tetrasticus purpureus*- লাক্ষাকীটের ক্ষতি করে। ইহারা লাক্ষাকোষের মধ্যে ডিম পাড়ে এবং ইহাদের লার্ভা নির্গত হইয়া লাক্ষাকীট খাইতে শুরু করে। এই সকল পরজীবী দ্বারা সমগ্র উৎপাদনের প্রায় 5-10% লাক্ষা ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

2. **পতঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য খাদক প্রাণী** (Animals other than insects) :

লাক্ষা ফসলের অন্যান্য ক্ষতিকারক প্রাণীদের মধ্যে কাঠবিড়ালী (Krishnaswami et al., 1957), ইঁদুর (krishnaswami et al., 1959) এবং বাঁদর (Gepulpure et al., 1963) বিভিন্নভাবে লাক্ষা ফসলের ক্ষতি করে বলে জানা গিয়াছে।

দমন (Control) : উপরিউক্ত লাক্ষাকীটের শত্রু ও খাদক প্রাণীর আক্রমণের হাত হইতে লাক্ষাকীট ও ফসল রক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত।

1. আক্রান্ত করিবার জন্য সুস্থ লাক্ষাবীজ নির্বাচন।

2. নিম্ফ নির্গমনের এক সপ্তাহ পূর্বেই লাক্ষাবীজ পোষক উদ্ভিদ হইতে কাটিয়া লওয়া উচিত। ইহাতে পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হইবার সুযোগ অনেক কম থাকে।

3. পরজীবী ও খাদক পতঙ্গ যে শাখায় দৃশ্যমান সেই মুহূর্তেই লাক্ষা ফসল কাটিয়া লইতে হবে এবং বাকী অন্যান্য অংশ নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। ফলে শত্রু পতঙ্গের প্রজননস্থল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

4. লাক্ষা ফসল তুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই জলের মধ্যে রাখিলে লাক্ষা আস্তরণের ভিতর থাকা শত্রু পতঙ্গের মৃত্যু হয়।

5. খাদক পতঙ্গ দমনে কোন কোন সময়ে কীটনাশক রাসায়নিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 0·05% এণ্ডোসালফন (Endosulfon) স্প্রে (spray) করিলে সুফল পাওয়া যায়।

জৈবিক নিয়ন্ত্রণ (Biological control): লাক্ষাকীটের পতঙ্গ পরজীবীদের হাইপার পরজীবী পতঙ্গ দ্বারা দমন করা যায় কিনা এখনও জানা যায়নি। তবে খাদকদের ক্ষেত্রে এক ধরনের পরজীবী পতঙ্গ দ্বারা দমন করার চেষ্টা করা হইতেছে। এই পরজীবির নাম *Bacilus thuringensis*। ইহারা লাক্ষা ফসলের কোনরকম ক্ষতিসাধন করে না।

লাক্ষা উৎপাদন এবং ব্যবসায়িক মূল্যায়ন (Production of lac and commercial evaluation):

পৃথিবীর লাক্ষা উৎপাদনশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। এই দেশের লাক্ষা উৎপাদনের বার্ষিক গড় পরিমাণ প্রায় 42 হাজার টন। পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের পরিমাণের 75 শতাংশেরও কিছু বেশী। এর পরই উৎপাদনের দিক্ হইতে থাইল্যাণ্ডের নাম করা যায়। ইহা ছাড়া অন্যান্য লাক্ষা উৎপাদনকারী দেশসমূহ হইল পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, বার্মা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও জাভা প্রভৃতি। ভারতের লাক্ষা উৎপাদক রাজ্যগুলির মধ্যে বিহার 55·5%, মধ্যপ্রদেশ 22%, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 10% ও মহারাষ্ট্রে 6% লাক্ষা উৎপন্ন হয়। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, কর্ণাটক এবং মাদ্রাজেও কিছু পরিমাণ লাক্ষা উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের লাক্ষা উৎপাদক অঞ্চলের প্রায় সবটাই এই রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম-উত্তর ও পশ্চিম সীমানা বরাবর বিহারের লাক্ষা উৎপাদক অঞ্চলগুলির সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। এই লাক্ষা বলয়ের একেবারে

উত্তরাংশে (জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার) সামান্য পলাশ প্রধানতঃ খয়ের, উত্তর ও মধ্যমবঙ্গে (পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের উত্তরাংশ) একমাত্র কুল এবং ইহার দক্ষিণে কুল ও পলাশ দুই রকমের আশ্রয়তরু প্রচুর জন্মায়। পুরুলিয়া জেলায় কুল ও পলাশ প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। কুসুম একমাত্র পুরুলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে লাক্ষা উৎপাদক জেলাগুলির মধ্যে পুরুলিয়ার স্থান প্রথম।

ভারতবর্ষের লাক্ষাশিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। কারণ এই দেশের লাক্ষা ও লাক্ষাজাত পণ্য প্রায় একশটি দেশে রপ্তানি করিয়া প্রতিবছর গড়ে প্রায় 13 কোটি টাকার মুদ্রা অর্জন হয়। দেশীয় গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েক হাজার মালিক শ্রমিক যুক্ত তো বটেই, এছাড়া একমাত্র কাঁচা লাক্ষার প্রাথমিক উৎপাদন পর্যায়ে বেশ কয়েক লক্ষ লাক্ষা চাষী নিযুক্ত রহিয়াছে।

লাক্ষার গুণাবলী ও ব্যবহার (Qualities & uses of lac) :

আমাদের পরিচিত প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম রেজিনের মধ্যে প্রকৃতিজাত লাক্ষার বহুমুখী গুণাগুণই সব থেকে বেশী লক্ষণীয়। যথা—দ্রাবকের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধগুণ (বিশেষতঃ হাইড্রোকার্বন জাতীয় দ্রাবক), বিদ্যুৎ অপরিবাহক, অভ্রের সহিত সংলগ্ন থাকিবার বিশেষ গুণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক পদার্থ নয়।

লাক্ষার নানারকম গুণাবলীর জন্যই ইহা প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। ইহার ব্যবসায়িক গুরুত্বও যথেষ্ট।

1. গ্রামোফোন রেকর্ড, 2. আসবাব পত্র, 3. মেঝের ফ্রেঞ্চ পালিশ, 4. ভার্ণিশ, 5. মাইক্যানাইট, 6. ল্যামিনেটেড-বোর্ড, 7. সিলিং ওয়াক্স ইত্যাদি তৈয়ারীতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত 8. ছাপার কালি, 9. চামড়ার জিনিসের শোভাবর্ধক আস্তরক, 10. টুপী তৈয়ারী, 11. খেলনা, 12. বোতাম, 13. জুতা পালিশ প্রভৃতি অনেক কাজেই লাক্ষার ব্যবহার হয়। চিত্রকলা ও পেন্ট-এ সেলাকের ব্যবহার—অ্যামোনিয়ায় দ্রবীভূত সেলাক, 14. উজ্জ্বল মাটির পাত্র নির্মাণ, 15. পুতুল তৈয়ারী,

16. চিত্রকলা সংরক্ষণ এবং 17. গৃহ-প্রাচীরের রঙ করিবার সময় যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

লাক্ষা চাষের উন্নতিসাধন (Improvement of lac culture) ঃ

'ভারতীয় লাক্ষা গবেষণাশালা' কর্তৃক লাক্ষা শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের —উন্নত প্রথায় লাক্ষাচাষ, আধুনিক উপায়ে লাক্ষা পরিশোধন ও বর্তমানে লাক্ষাজাত পণ্যের বহুবিস্তৃত ব্যবহারিক প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য জানা গিয়াছে। তবে সামগ্রিকভাবে লাক্ষা চাষের উন্নতিসাধন করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সব সময় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সেই বিষয়-গুলি নিম্নরূপ—

1. লাক্ষাকীটের আশ্রয়-বৃক্ষগুলির চাষ-আবাদ বাড়িয়ে গাছের সংখ্যা এবং মানের উন্নতিসাধন করা উচিত। ঐ সমস্ত বৃক্ষগুলিকে অন্য কীটের (উইপোকা, ককসিড্স (Coccids), বীটল (Beetle) প্রভৃতি) আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন।

2. কূপ পদ্ধতি (coup system) অবলম্বনে (অর্থাৎ পোষক উদ্ভিদকে একবার ব্যবহার করিয়া পরের বার চাষের সময় ব্যবহার না করা) লাক্ষা ফলন বাড়ানো যায়।

3. কুসুম ও রঙ্গিণী স্ট্রেন আলাদা স্থানে চাষ করা।

4. স্ব-আক্রান্ত যাহাতে না হইতে পারে সেদিকে নজর রাজা।

5. সুস্থ লাক্ষাবীজের ব্যবহার।

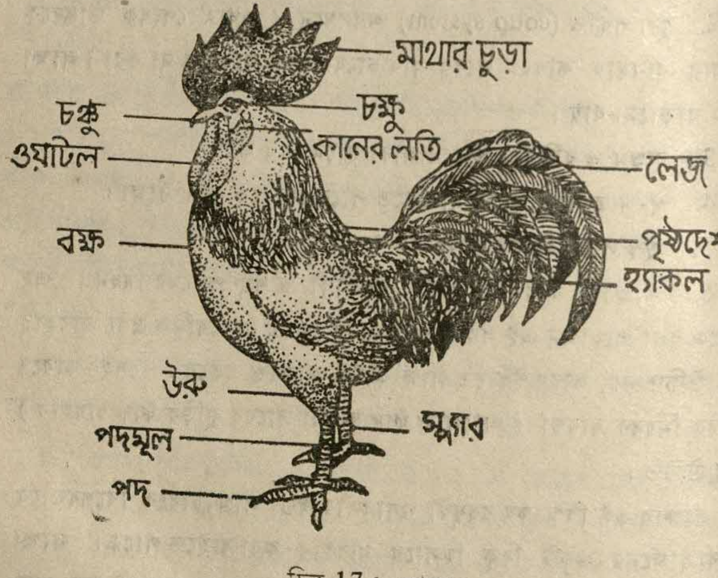
6. আক্রান্ত করিবার পূর্বেই পরজীবী ও শত্রু পতঙ্গের নিধন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন এই সব পতঙ্গ দমনের ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ ইহাতে লাক্ষাকীটও আক্রান্ত হইবে। সেই কারণে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (আলোক ফাঁদ অথবা তারের ঝুড়ির ফাঁদ ব্যবহার) করা উচিত।

লাক্ষার এই বিস্ময়কর বহুমুখী গুণাবলীর জন্য লাক্ষাচাষকে বিশেষভাবে অর্থোপার্জনের একটি দিক্ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। লাক্ষা ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন বেশী খরচের দরকার হয় না তেমনই অল্প সময় কাজে লাগিয়েও উন্নত প্রথায় আবাদ করিলেই নিয়মিতভাবে এবং লাভ-জনক পরিমাণে লাক্ষা ফসল পাওয়া যায়।

পোলট্রি (Poultry)

সূচনা (Introduction) :

অর্থকরী পক্ষীপালন বর্তমানে একটি প্রধান শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। পোলট্রি বলিতে আমরা প্রধানতঃ হাঁস ও মুরগী পালনকেই বুঝি। এই শিল্পের প্রসার একদিকে যেমন জনগণের পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দেয়, অপরদিকে তেমনি যুগপৎ বেকারী রোধ ও দেশের অর্থনীতি দৃঢ় করে। সকল গৃহপালিত উপকারী পক্ষীর মধ্যে মুরগীর চাষ সর্বাধিক। ভারতে পোলট্রি প্রতিপালন একটি কুটিরশিল্প রূপে ছিল। বর্তমানে দেশী ও বিদেশী মুরগীর চাষ করা হয়। গড়পড়তা বাৎসরিক একটি দেশী মুরগী যেখানে 60টি ডিম পাড়ে সেখানে আমেরিকায় বৎসরে একটি মুরগী গড়পড়তা ডিম পাড়ে



চিত্র 17 : মোরগ

227টি। ভারতে একটি মানুষের জন্য একবছরে মাত্র 11টি ডিম উৎপাদন হয়, সেক্ষেত্রে আমেরিকায় 352টি, কানাডায় 20টি, পশ্চিম জার্মানীতে 250টি এবং ব্রিটেনে 115টি। গড়পড়তা প্রতিটি লোকের জন্য বছরে 115টি ডিম পাওয়া

যায়। (FAO—Production year book 1961, Government of India Estimates—1971)।

পোলট্রি শিল্পে ভারতবর্ষে অন্ধ্রের স্থান প্রথম, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানে পাঞ্জাব, হরিয়াণা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পোলট্রি শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটিয়াছে।

মুরগী পালন

এক সময়ে পোলট্রি এবং ডিম উৎপাদন শুধু গ্রাম্য কর্মোদ্যোগ ছিল। মুরগী শখের নেশা হিসাবে মুরগী পালন করা হইত এবং প্রয়োজনীয় ডিমের চাহিদা মেটান হইত। মুরগীর মাংস খাদ্য হিসাবে একেবারেই অপ্রচলিত ছিল। বর্তমানে মুরগীর ডিম ও মাংসের জন্য নূতন নূতন শিল্প উদ্যোগ গড়িয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন জাতের মুরগী (The breeds of chicken) :

ব্রীড (Breed) : পৃথিবীর গৃহপালিত মুরগীগুলি উৎপত্তিগতভাবে ভারতের জংলী লাল মুরগী হইতে উদ্ভূত, কিন্তু দেশ ও জলবায়ু ভেদে ইহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আদি মুরগীর ব্রীডদের পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ও মধ্যভারত, হিমালয়ের তরাই অঞ্চল, আসাম, বার্মা, শ্রীলংকা, সুমাত্রা ও জাভা অঞ্চলে। বন্য চারিটি প্রজাতি হইতে ইহাদের সকল প্রজাতির সৃষ্টি।

(i) **গ্যালাস গ্যালাস** (Gallus gallus) বা **গ্যালাস বাঁকিভা** (Gallus bonkiva)—জংলী লাল মুরগী।

(ii) **গ্যালাস লাফাইটি** (Gallus lafayetti)—শ্রীলংকার জংলী মুরগী।

(iii) **গ্যালাস সোনেরাটি** (Gallus sonneratti)—ধূসর জংলী মুরগী।

(iv) **গ্যালাস ভেরিয়াস** (Gallus varius)—জাভার জংলী মুরগী।

স্ট্রেন (Strain) : একই জাতের নির্বাচিত মোরগ-মুরগীর নিয়মিত মিলনের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের মুরগীর সৃষ্টি করা হয়। সাধারণতঃ গবেষক বা উৎপাদন সংস্থার নামানুযায়ী স্ট্রেনের নামকরণ করা হয়।

ভ্যারাইটি (Variety) : একই প্রজাতির বিভিন্ন মুরগীর মধ্যে বর্ণ ও আকৃতির তারতম্য দেখা যায়। সেইজন্য বৈচিত্র্য অনুযায়ী তাহাদিগকে ছোট ছোট **ভ্যারাইটি**-তে ভাগ করা হয়।

শ্রেণী (Class) : কতকগুলি প্রজাতি বা ব্রীডের সমষ্টিকে **শ্রেণী** বলে। প্রধানতঃ পাঁচ ধরনের শ্রেণী আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে এক একটি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এখনও পর্যন্ত দুইশতর বেশী প্রজাতি ভ্যারাইটি মুরগীর সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ইহাদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা— **আমেরিকান, ভূমধ্যসাগরীয়, ইংলিশ, এশিয়ান** ও **ভারতীয়**।

পরপৃষ্ঠার সারণীতে মুরগীর শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

উক্ত সারণীর সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার প্রজাতি ও ভ্যারাইটি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা জন্মায়। বর্তমানে ঐসব প্রজাতিগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি প্রজাতির মুরগী হইতে লাভজনকভাবে ডিম ও মাংস পাওয়া যায়। তিনটি প্রজাতির নাম হইল **সিঙ্গল কোম্ব হোয়াইট লেগহর্ণ** (*Single combed white leghorn*), **রোড আইল্যাণ্ড রেড** (*Rhode island red*) এবং **হোয়াইট প্লাইমাউথ রক** (*White Plymouth rock*)। সমগ্র বিশ্বে পোলট্রি পাখীর শতকরা আশিভাগ হইল এই তিনটি প্রজাতি। ডিম উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ লেগহর্ণ, রোড আইল্যাণ্ড এবং মাংস উৎপাদনের জন্য ভারী জাতের প্লাইমাউথ রক মুরগীর চাষ করা হয়। অবশিষ্ট প্রজাতির মুরগী কম উৎপাদন বলিয়া লোকে উহাদের যত্নসহকারে পালন করিতেছে না, ফলে উহারা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

ওজন অনুসারে মুরগীর শ্রেণীবিভাগ :

ওজন অনুসারে মুরগীকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা—(i) হাল্কা ও ওজনে কম এবং (ii) ওজন ভারী। রোড আইল্যাণ্ড, সাসেক্স **ভারী-শ্রেণীতে** এবং লেগহর্ণকে **হাল্কা শ্রেণীতে** ভাগ করা যায়।

ডিমে তা দেওয়া অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ :

অনেক প্রজাতির মুরগী তা দিবার জন্য ডিমের উপর বসে না, তাহাদের **ননসিটার** (*Non-sitter*) মুরগী বলে। যেমন মিনর্কা, লেগহর্ণ ইত্যাদি। আমেরিকান জাতের মুরগী এবং দেশী মুরগী ডিমে তা দিবার জন্য ডিমের উপর বসে, তাহাদের **সিটার** (*Sitter*) বলে।

মুরগীর শ্রেণীবিভাগ

শ্রেণী (Class)	প্রজাতি (Breed)	ভ্যারাইটি (Variety)
(1) আমেরিকার প্রজাতি	রোড আইল্যাণ্ড রেড, রোড আইল্যাণ্ড হোয়াইট।	সিংগল কোম্ব, রোজ কোম্ব প্রভৃতি।
	প্লাইমাউথ রক	বারড, হোয়াইট, বাফ, সিলভার পেনসিলড্, ব্লু প্যাট্রিজ, কলম্বিয়ান প্রভৃতি
	ওয়ানডোট নিউ হ্যাম্পসায়ার	সিলভার ল্যাসড, গোল্ডেন ল্যাসড, হোয়াইট প্রভৃতি
(2) এশিয়ার প্রজাতি	ব্রহমা	বাফ, ব্ল্যাক, প্যাট্রিজ লাইট, ডার্ক ইত্যাদি।
	কোচিন	বাফ, হোয়াইট, ব্ল্যাক ইত্যাদি।
	ল্যাভসান	ব্ল্যাক, হোয়াইট ইত্যাদি।
(3) ইংলণ্ডের প্রজাতি	সাসেক্স	লাইট, রেড, স্পেকলেড প্রভৃতি।
	অষ্ট্রালর্প, অরপিংটন	বাফ, ব্ল্যাক, হোয়াইট, ব্লু প্রভৃতি।
(4) ভূমধ্যসাগরীয় প্রজাতি	লেগহর্ণ	সিঙ্গল কোম্ব: ডার্ক ব্রাউন, লাইট ব্রাউন, হোয়াইট, বাফ ইত্যাদি। রোজ কোম্ব: ব্ল্যাক, হোয়াইট প্রভৃতি।
	মিনর্কা	সিঙ্গল কোম্ব: ব্ল্যাক রোজ কোম্ব: ব্রাউন
(5) ভারতীয় প্রজাতি	আসীল, চিটাগং মালয় ঘগাস্	—

অর্থ নৈতিক গুরুত্ব অনুযায়ী মুরগীর শ্রেণীবিভাগ :

অর্থনৈতিক উপযোগিতার ভিত্তিতে মুরগীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) **ডিমপাড়া মুরগী** (Laying breed) **:** যে সকল মুরগী হইতে বেশী পরিমাণে ডিম পাওয়া যায়, তাহাকে **ডিমপাড়া মুরগী** বলে। যেমন—মিনর্কা, লেগহর্ণ।

(ii) **খাওয়ার মুরগী** (*Table breed*) **:** এই মুরগী সাধারণতঃ মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন—আসীল, চাটগেঁয়ে মুরগী, রোড আইল্যাণ্ড, প্লাইমাউথ রক, ও লাইট সাসেক্স।

(iii) **ডিমপাড়া এবং খাওয়ার মুরগী** (*Dwal breed*) **:** যে সকল জাতের মুরগী হইতে ডিম ও মাংসের উৎপাদন উভয়ই তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট হয়, তাহাকে *Dwal breed* বলে। যেমন—নিউ হ্যাম্পশায়ার, সাসেক্স, অস্ট্রালপ, রোড আইল্যাণ্ড ও প্লাইমাউথ রক প্রভৃতি।

বিভিন্ন জাতের মুরগীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Descriptive account of breeds) **:**

(A) **আমেরিকান ব্রীড** (American breed) **:**

(i) **রোড আইল্যাণ্ড রেড :** আমেরিকার রোড আইল্যাণ্ড দ্বীপে 1857 খ্রীষ্টাব্দে এই প্রজাতিটির সৃষ্টি করা হয়। লাল বর্ণের মালয় গেম (Malay game), লেগহর্ণ এবং এশিয়া মহাদেশের মুরগীর প্রজাতির মিলন ঘটাইয়া এই প্রজাতির সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এই প্রজাতির মোরগ ও মুরগীর দেহের সাধারণ ও জনপ্রিয় রঙ গাঢ় খয়েরী লাল, তবে ফিকে লাল বা তামাটে লাল বর্ণের হইতে পারে। ডানার অগ্রভাগে, লেজের পালকে এবং গলার পালকে কালো রঙের দাগ দেখা যায়। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ চওড়া ও চ্যাপ্টা। দেহচর্ম হলুদ এবং পা দুইটি বেশ সুগঠিত ও ফিকে হলুদ বর্ণের হয়। কানের লতি লাল বা ফিকে হলুদ বর্ণের হয় এবং আকারে ছোট হয়। ঝুঁটির তারতম্য অনুযায়ী ইহারা **'একক ঝুঁটিওলা'** ও **'গোলাপ ঝুঁটিওলা'** হয়।

ইহারা ভারী জাতের প্রজাতি বলিয়া মাংস উৎপাদনকারী প্রজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। ইহারা কষ্টসহিষ্ণু এবং সকল জলবায়ু সহ্য করিতে পারে। যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ইহাদের পালন করা যায় এবং বাচ্চার দ্রুত বৃদ্ধি হয় বলিয়া ব্যবসার পক্ষে লাভজনক। মোটামুটি

ডিম পাড়ে, সেইজন্য ডিম ও মাংস উভয় উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়। ইহাদের Dwal breed বলা যাইতে পারে।

(ii) **প্লাইমাউথ রক** (Plymouth rock) : 1849 খ্রীষ্টাব্দে বোষ্টন শহরে পোলট্রি প্রদর্শনীতে সর্বপ্রথম এই প্রজাতির সাক্ষাৎ মেলে। ইহার দৈহিক গঠন ও আকারের জন্য ডিম ও মাংস উৎপাদনে ইহারা সক্ষম। এই প্রজাতির মোরগ ও মুরগীর দেহ লম্বা, বক্ষদেশ বেশ চওড়া। এই প্রজাতির একক ঝুঁটি আছে। ইহাদের পালকের বর্ণ ধূসর সাদাটে। প্রত্যেক পালকে সাদা ও কালো রঙের ডোরা দাগ থাকে। মোরগের দেহের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা উহার পৃষ্ঠদেশে ও লেজের দিকে সরু সরু ডোরা দাগ দেখা যায়। মুরগীর জংঘার পালকের উপর কালো রঙের ফুটকি থাকে।

বারড্ প্লাইমাউথ রক নামক জাতিটি ডোমিনিক ও ব্ল্যাক কোচিন নামক দুইটি পৃথক জাতের মোরগ ও মুরগীর মিলন ঘটাইয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। পালকের বর্ণের তারতম্য অনুসারে সাত রকমের প্লাইমাউথ রক আছে, যথা— Barred, White, Buff, Silver pencilled, Blue, Partridge এবং Colombian. বারড্ প্লাইমাউথ রক প্রজাতির বেশী চাষ করা হয় এবং দেখিতে সুন্দর বলিয়া অনেকেই পালন করেন। ইহারা আকারে বড় হয় এবং প্রচুর ডিম দেয়। মোরগের ওজন $4\text{-}4\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম ও মুরগীর ওজন $3\text{-}3\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম হয়।

(ii) **নিউ হ্যাম্পশায়ার** (New Hampshire) : রোড আইল্যাণ্ড প্রজাতির একটি ভ্যারাইটি। 1930 খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ার অঞ্চলে এই ভ্যারাইটির সৃষ্টি হইয়াছে। অস্বাভাবিক কষ্টসহিষ্ণুতার জন্য ইহাদের চাষ বর্তমানে বহুল প্রচলিত।

পালকের বর্ণ বাদামী ও তামাটে হয়। ইহাদের একক ঝুঁটি আছে। মুরগীদের গলার নীচের পালকে কালো দাগ আছে। লেজের প্রধান পালকগুলি কালো কিন্তু পালকের কিনারাগুলি বাদামী লাল বর্ণের হয়।

এই মুরগী বেশ বড় আকারের এবং ধূসর বর্ণের ডিম পাড়ে। পূর্ণাঙ্গ মুরগীর ওজন প্রায় 3 কিলোগ্রাম ও মোরগের ওজন 4 কিলোগ্রাম। ভারতে এই মুরগীর চাষ কম হয়, তবে বর্তমানে দিল্লী, গুজরাট বা অন্যত্র সরকারী ব্যবস্থাপনায় এই মুরগীর চাষ শুরু করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রজাতি (English breed) :

(i) **সাসেক্স** (Sussex) : প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের সাসেক্স অঞ্চলে মাংস উৎপাদনের জন্য এই প্রজাতি সৃষ্টি করা হইয়াছিল। দেহ লম্বা ও চওড়া স্কন্ধদেশ এই প্রজাতির বৈশিষ্ট্য। ইহাদের বক্ষদেশ বেশ পুষ্ট ও দৃঢ়। ইহাদের ঠোঁট, জংঘা ও পায়ের আঙুল রঙীন।

ইহাদের তিনটি ভ্যারাইটির চাষ করা হয়—

(a) **লাইট সাসেক্স** : ইহাদের পালকের বর্ণ সাদা কিন্তু ঘাড় ও লেজের পালক অল্প কালো। মাথার ঝুঁটি ছোট ও একক। দেহ লম্বা ও সুগঠিত। কানের লতি লাল ও ছোট হয়। গ্রীষ্মকালে ভারতে এই জাতের মুরগী বেশী সংখ্যক ডিম পাড়ে। মুরগীর ওজন $3\text{-}3\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম এবং মোরগের ওজন $3\frac{1}{2}\text{-}4\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম হয়।

(b) **রেড সাসেক্স** : এই মোরগ ও মুরগীর দেহের বর্ণ গভীর লাল এবং লেজের পালক কালো বর্ণের।

(c) **স্পেকলেড সাসেক্স** : ইহাদের দেহের বর্ণ লালচে এবং প্রতিটি পালকে সাদা ফুটকি থাকে। মোরগের ঘাড়ে উজ্জ্বল লাল বর্ণের পালক থাকে ও পালকে কালো দাগ লম্বালম্বিভাবে থাকে।

(ii) **অরপিংটন** (Orpington) : ইংলণ্ডের কেন্ট নামক অঞ্চলে এই প্রজাতিটির উদ্ভব হয়। ইহাদের দেহ লম্বা। ইহাদের বক্ষদেশ সুগঠিত এবং পৃষ্ঠদেশ চওড়া। ওজনে ভারী বলিয়া ইহারা মাংস উৎপাদনের জন্য বিবেচিত হয়। ডিম উৎপাদনে ইহারা খারাপ নহে। পূর্ণবয়স্ক মোরগের ওজন প্রায় 5 কিলোগ্রাম এবং মুরগীর ওজন চার কিলোগ্রাম হয়। ইহার চারিটি ভ্যারাইটি আছে, যথা—বাফ, ব্ল্যাক, হোয়াইট এবং ব্লু। তার মধ্যে অরপিংটন বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই জাতটি বাফ কোচিন, ডার্ক ডর্কিংস এবং গোল্ডেন স্প্যাঙ্গলেড হামবার্গ নামক তিনটি জাতের সংমিশ্রণে উদ্ভব হইয়াছে।

(iii) **অষ্ট্রালর্প** (Australorp) : অষ্ট্রেলিয়াতে ব্ল্যাক অরপিংটন জাতি হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। ডিম ও মাংস উৎপাদনে সক্ষম বলিয়া Dwal breed বলা হয়। ভারতের অনেক সরকারী সংস্থায় এই মুরগীর চাষ করা হয়। এই প্রজাতির পৃষ্ঠদেশ লম্বা এবং দেহটি সম্মুখভাগ হইতে পশ্চাতে ঢালু। ইহার ঝুঁটি একক, দেহের পালকের বর্ণ বেশ উজ্জ্বল সবুজ আভাবিশিষ্ট

কালো। ইহদের ঠোঁট, জংঘা ও আঙুল কালো বর্ণের। অষ্ট্রালর্প মোরগের সহিত লেগহর্ণ মুরগীর প্রজনন ঘটাইয়া **'অষ্ট্রোহোয়াইট'** নামক ডিম উৎপাদনকারী সংকর মুরগীর সৃষ্টি করা হইয়াছে। ডিম উৎপাদনের জন্য ভারতে ব্যাপকভাবে এই জাতের মুরগী চাষ করা হয়। পূর্ণাঙ্গ অষ্ট্রালর্প মোরগের ওজন 4 কিলোগ্রাম ও মুরগীর ওজন 3 কিলোগ্রাম।

ভূমধ্যসাগরীয় প্রজাতি (Mediterranean breed) :

ইতালীতে লেগহর্ণ, মিনর্কা, স্পানিশ অংকোনা ও আনডালুসিয়ান প্রভৃতি প্রজাতির মধ্যে লেগহর্ণ সবচেয়ে বেশী পরিচিত। এই প্রজাতির মুরগী প্রচুর পরিমাণে ডিম পাড়ে।

(i) **লেগহর্ণ** (Leg horn) : ইতালির লেগহর্ণ নামক স্থলে এই প্রজাতির আদি বাসস্থান। ইহা পৃথিবীর সবচেয়ে ডিম উৎপাদনকারী (Laying breed) মুরগী। এই প্রজাতির মুরগী সাদা, কালো ও ধূসর বর্ণের হয়। তবে সাদা জাতের লেগহর্ণ ডিম পাড়ার জন্য খুবই জনপ্রিয়। এই প্রজাতির মোরগ ও মুরগী আকারে ছোট, চঞ্চল ও কর্মঠ হয়। লেগহর্ণের বিভিন্ন জাতের সকলেরই ঠোঁট, পা, পায়ের আঙুল, গাত্রচর্ম হলুদ বর্ণের হয়। ইহাদের ঠোঁট শক্ত ও ধারালো, মাথার ঝুঁটি একক ও লাল বর্ণের হয়। মোরগের ঝুঁটি বড় ও সম্পূর্ণরূপে খাড়া। ঝুঁটির কিনারা করাতের ন্যায় ও পাঁচটি কাটা দাগযুক্ত। কানের লতি খুব বড় ও ফিকে হলুদ বর্ণের হয়। লেগহর্ণের দেহ ত্রিভুজাকার, স্কন্ধের দিক চওড়া এবং লেজের দিক সরু। পৃষ্ঠদেশ অপেক্ষাকৃত লম্বা ও চওড়া। মোরগের লেজের পালক পৃষ্ঠদেশের উপর 45° ডিগ্রী কোণে অবস্থিত। ডানার পালকগুলি বড়। লেগহর্ণ মুরগী খুব চঞ্চল প্রকৃতির। ইহারা কখনও ডিমে তা দেয় না, মুরগী বৎসরে 200-250টি ডিম পাড়ে। বাচ্চা অবস্থায় বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত বলিয়া নরম ও কচি মাংসের জন্য লেগহর্ণ বাচ্চা বাজারে বিক্রয় করা লাভজনক। ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে এই জাতের মুরগীর চাষ হয়। আর্দ্র ও পাহাড়ী অঞ্চলে ইহাদের চাষ সাধারণতঃ হয় না, কারণ এই আবহাওয়া ইহারা সহ্য করিতে পারে না।

(ii) **মিনর্কা** (Minorca) : স্পেনদেশের মিনর্কা দ্বীপ এই প্রজাতির আদি বাসস্থান। লম্বা বলবান দেহ, বড় ঝুঁটি, লম্বা ও ঝোলা ওয়াটল এবং বড় ও সাদা বর্ণের কানের লতি থাকে। মোরগের কালো মুখের দুইপার্শ্বে বড় বড় সাদা বর্ণের ঝোলা লতি থাকে। ইহাদের লেজ বড় এবং পৃষ্ঠদেশের

উপর বাঁকিয়া থাকে। ইহাদের ঠোঁট, পায়ের জংঘা ও আঙুল কালো বর্ণের হয়। শরীরের উপর পালকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট ও গাত্রচর্ম সাদা।

এই প্রজাতির মুরগীর ডিম আকারে বড় হয়। চঞ্চল প্রকৃতির বলিয়া ডিমে তা দেয় না। ইহারা গরম সহ্য করিতে পারে না, ঠাণ্ডা বা ছায়াবৃত স্থান পছন্দ করে।

এশিয়াটিক প্রজাতি (Asiatic breed) ঃ

(i) **ব্রহ্মা** (Brahma) ঃ ভারতের ব্রহ্মপুত্র নদের সন্নিহিত অঞ্চলে ব্রহ্মা প্রজাতির আদি বাসস্থান। এশিয়াটিক প্রজাতির মধ্যে ব্রহ্মা ও কোচিন দুইটি প্রজাতি আমেরিকাতে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু পরে উন্নত ধরনের আমেরিকান প্রজাতির সৃষ্টিতে ইহাদের গুরুত্ব হ্রাস পায়।

এই প্রজাতির পাখী আকারে ও ওজনে বড় হয়। দেহ ঘন পালকে ঢাকা, মাথায় মটর ঝুঁটি এই প্রজাতির বৈশিষ্ট্য। প্রধানতঃ মাংসের জন্য ইহাদের চাষ করা হয়। পালকে ঢাকা জংঘা পুষ্ট, গাত্রচর্ম হলুদ এবং কানের লতি লাল। পূর্ণাঙ্গ পাখীর ওজন 4 হইতে 5 কিলোগ্রাম। ব্রহ্মার তিনটি ভ্যারাইটি আছে। যথা—

(a) **লাইট ব্রহ্মা** ঃ রঙ ও বিরাট চেহারার জন্য ইহারা খুবই জনপ্রিয়। লেজের পালকগুলি কালো কিন্তু মুরগীর লেজের অগ্রভাগের কয়েকটি পালক সাদা বর্ণের। ঠোঁট, জংঘা ও আঙুল হলুদ বর্ণের হয়।

(b) **ডার্ক ব্রহ্মা** ঃ মোরগের পালকগুলি সবুজাভ কালো বর্ণের, পালকের কিনারা সাদা এবং গলার সামনের পালকগুলি কালো। মুরগীর মাথা ও গলার উপরের দিকটা রূপালি ধূসর বর্ণের। ডানার বর্ণ ধূসর। লেজ কালো বর্ণের কিন্তু লেজের মাথার দুইটি পালক ধূসর বর্ণের।

(c) **বাফ ব্রহ্মা** ঃ দেহের বর্ণ সাদা, জংঘার পালকের বর্ণ হাল্কা হলুদ। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য লাইট ও ডার্ক ব্রহ্মার মত।

ভারতীয় প্রজাতি (Indian breed) ঃ

(i) **আসীল** (Aseel) ঃ ভারতীয় প্রজাতি, 'আসল' শব্দ হইতে ইহার সৃষ্টি। পশ্চিমবাংলা, হায়দ্রাবাদ ও ভিজিয়াল গ্রাম অঞ্চলে এই মুরগী পাওয়া যায়। ইহাদের গঠন বলিষ্ঠ ও দৃঢ়, পা ও গলা লম্বা এবং মাথা চওড়া। কপালের হাড় উঁচু, কানের লতি ছোট, মাথায় মটর ঝুঁটি থাকে।

লেজ ছোট, মাটির দিকে ঝুলিয়া থাকে। ডিম খুব ছোট ও খয়েরী বর্ণের হয়। সংখ্যায় প্রচুর ডিম দেয়।

(ii) **চাটগেঁয়ে** (Chittagong) ঃ চট্টগ্রাম ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে এই জাতের মুরগী দেখা যায়। চট্টগ্রামে বেশী পাওয়া যায় বলিয়া চাটগেঁয়ে নামকরণ করা হইয়াছে। এই মুরগীর বৃদ্ধি দ্রুত হয় বলিয়া খাওয়ার মুরগী হিসাবে গণ্য করা হয়। মাথায় মটর ঝুঁটি থাকে, কানের লতি এবং গলার মাংসল উপাঙ্গ (wattle) ক্ষুদ্র এবং লাল বর্ণের হয়। ইহাদের গলা লম্বা এবং দেহের তুলনায় পা অনেক বড় ও মোটা। বুকের খাঁচার পালকগুলি ঘন সন্নিবেশিত, ডানা কাঁধ হইতে প্রসারিত থাকে এবং উঁচুতে অবস্থান করে।

(iii) **ঘগাস** (Ghagus) ঃ এই মুরগীরা বড় জাতের ও বলিষ্ঠ হয়। খাওয়ার মুরগী হিসাবেই ইহারা বেশী প্রচলিত। ঘগাসের মাথায় একক মটর ঝুঁটি থাকে। গলার মাংসল উপাঙ্গ এবং কানের লতি ছোট হয়। ইহাদের কণ্ঠনালী শিথিল ও ঢলঢলে হয়। এই জাতের মুরগীদের পা লম্বা, সোজা দৃঢ় হয়। পালকের বর্ণ লাল পিংগল, বাদামী কালো ও ধূসর বর্ণের হয়।

সংকর ও বর্ণ সংকর মুরগী (Hybrid and cross breed chickens) ঃ

বিভিন্ন খাঁটি জাতের বা একই জাতের নির্বাচিত বংশধারার মধ্যে মিলন ঘটাইয়া বিভিন্ন ব্রীডের উন্নতিসাধন করা হয়। ডিমের উদ্দেশ্যে হাইব্রিড স্ত্রীর বাচ্চা পুলেট এবং মাংসের জন্য ব্রয়লার হাইব্রিড পাওয়া যায়। খাঁটি ব্রীডের অধিক ডিম উৎপাদনকারী মুরগীর বিভিন্ন বংশধরদের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া সংকর স্ত্রী শাবক বা পুলেট উৎপাদন করা হয়। যেমন—হাইলাইন, ব্যবকক 300, স্টারক্রশ 288 এবং থর্ণবার 808। মুরগীর মধ্যে মিলন ঘটাইয়া এমন সংকর শাবক করা হয় যে নয় সপ্তাহ বয়সেই ওজন প্রায় তিন কিলোগ্রাম হয়। ইণ্ডিয়ান রিভার ও স্টারব্রো প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

উর্বর ডিম ও বাওয়া ডিম (Fertile egg and non-fertile egg) ঃ

মোরগের সঙ্গে মিলনের পর যে সকল ডিম হয়, কেবলমাত্র সেইগুলির ভিতরেই ভ্রূণ জন্মায়। এইরূপ ডিমকে **উর্বর ডিম** বলে। মোরগের সঙ্গে মিলন ব্যতিরেকে মুরগী যে ডিম পাড়ে, তাহাতে ভ্রূণ জন্মায় না। এই ডিমকে **বাওয়া ডিম** বলে। নব উৎপাদিত সকল ডিমই হয় উচ্চমানের, তবে বন্ধ্যা

বা বাওয়া ডিম খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা সমীচীন। বাওয়া ডিমে খাদ্যমূল্য বেশী থাকে। উর্বর ডিমে গর্ভাধান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপাকীয় ক্রিয়া শুরু হয়, ফলে ডিমে সঞ্চিত খাদ্য ব্যয়িত হয়। কিন্তু বাওয়া ডিমে সেই সম্ভাবনা থাকে না, ফলে খাওয়ার জন্য এই ডিম তুলনামূলক শ্রেয়।

সাধারণ ডিম ও পোলট্রি ডিম: চরিয়া খাওয়ার মুরগীর ডিমের খাদ্যমূল্য পোলট্রির মুরগীর ডিম অপেক্ষা কম। চরিয়া খাওয়া মুরগী সকল খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় না, ফলে ডিমে প্রোটিন খাদ্যের মান তুলনামূলক কম হয়। পোলট্রিতে মুরগীকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে সকল খাদ্যগুণ সমন্বিত পরিপূরক খাদ্য দেওয়া হয়। ফলে ইহাদের সৃষ্ট ডিমে প্রোটিনের অনুপাত বেশী থাকে।

মোরগের প্রয়োজন: উর্বর ডিম পাইতে হইলে 10-12টি মুরগীর সহিত একটি করিয়া স্বাস্থ্যবান ও তেজী মোরগ রাখিতে হইবে। প্রথম দিন প্রথম খোঁয়াড়ে 10টি মুরগীর সহিত মোরগটি ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় দিন ঐ মোরগটিকে আরেকটি খোঁয়াড়ে 10টি মুরগীর সহিত রাখিতে হইবে। তৃতীয় দিন ঐ মোরগকে আর একটি খোঁয়াড়ে 10টি মুরগীর সহিত ছাড়িয়া দিতে হইবে। চতুর্থ দিন মোরগকে পৃথক করিয়া বিশ্রাম দেওয়া হয়। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে একাধিক মুরগীর জন্য একটি মোরগ রাখিলেই চলে। গতানুগতিকভাবে একটি খোঁয়াড়ে একটি মোরগ অনেকদিন রাখিলে প্রজনন ব্যাহত হয়। সেইজন্য একটি মোরগকে বিভিন্ন খোঁয়াড়ে রাখা হয়।

ডিম ফুটাইবার ডিম নির্বাচন ও উহার যত্ন ও পরিচর্যা:

মোরগের সঙ্গে মিলনের পর যে ডিম উৎপন্ন হয়, সেগুলির ভিতরেই ভ্রূণ থাকিতে পারে। এইরূপ ডিমকে **উর্বর ডিম** বলে। মোরগের সঙ্গে মিলন-বিহীন ডিমকে **বাওয়া ডিম** বলে।

উর্বর ডিম পাইতে হইলে 10-12টি মুরগীর সহিত একটি সবল ও তেজী মোরগ রাখিতে হইবে। মুরগীর ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইতে 21 দিন সময় লাগে। সাধারণভাবে তা দিয়া বা ইনকিউবটর যন্ত্রের সাহায্যে 21 দিনে ভ্রূণ পরিণত হয়। বর্তমানে পোলট্রি শিল্পে কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটাইয়া বাচ্চা তুলিবার পদ্ধতি খুব জনপ্রিয়। কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোটানো যন্ত্রের নাম **ইনকিউবেটর**। ডিম ফুটাইবার জন্য ডিমের নির্বাচন, যত্ন ও পরিচর্যার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

ডিম নির্বাচন (Selection of eggs) : ডিম ফুটাইবার জন্য উত্তম আকৃতি বিশিষ্ট উর্বর ডিম নির্বাচিত করিতে হইবে। প্রতিটি ডিমের মধ্যে সাদা অ্যালবুমেন ও হলুদ কুসুমের অনুপাত 2 : 1 হয়। ডিমের বর্ণ, খোলার গঠন দেখিয়া বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ডিম নির্বাচন করা হয়। গ্রীষ্মকালে ডিম পাড়িবার তিন দিনের মধ্যে ডিম বসাইতে হয় এবং শীতকালে সাত হইতে দশ দিনের ডিম বসাইবার জন্য নির্বাচন করা যাইতে পারে। 55^{0} ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় সংরক্ষিত করিলে ডিম ভাল থাকে। সকালে পাড়া ডিম অপেক্ষা বিকালে পাড়া ডিমে বাচ্চা তাড়াতাড়ি হয়। সারা বৎসরই ডিম সংগ্রহ করিয়া বাচ্চা তোলা যায়, তবে পশ্চিমবঙ্গে শীতকাল ও বসন্তকালই ডিম বসাইবার প্রকৃষ্ট সময় অর্থাৎ অক্টোবর হইতে মার্চ মাসের মধ্যে যে বাচ্চা বাহির হয়, তাহাকে পালন করা সহজসাধ্য হয়। প্রচণ্ড গরমে বা শীতে মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন করা হয় না।

ডিম হইতে বাচ্চা উৎপাদন :

সাধারণতঃ দুইপ্রকার পদ্ধতিতে ডিম হইতে বাচ্চা উৎপাদন করা হয়—

(i) **স্বাভাবিক উপায়ে মুরগীর সাহায্যে ডিম ফোটানো :** ডিমে তা দিবার জন্য যে মুরগী নির্বাচন করা হয়, তাহা যেন সবল হয় এবং নির্বাচিত মুরগী যেন পালক না ছাড়ে (moulting) সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ডিমে মুরগী বসাইবার পূর্বে গ্যামাক্সিন মাখাইয়া উকুন বা অন্যান্য পোকা নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। গৃহস্থের বাড়ীতে টিন, কাঠের বাক্স, ঝুড়িতে তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় মুরগীকে দুইবার পরিষ্কার জল দেওয়া, প্রচুর পরিমাণে দানাশস্য ও লাইমষ্টোন গুঁড়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। মুরগী যাহাতে মাঝে মাঝে ডিম ছাড়িয়া বাহির হয় তা লক্ষ্য করা উচিত, কারণ ডিমে বাতাস পাইলে বৃদ্ধি ভাল হয়। তা দিবার সময় মুরগী নূতন ডিম প্রসব করিলে তাহা সরাইয়া লওয়া উচিত। একটি দেশী মুরগী আট-দশটি ডিমে একসঙ্গে তা দেয়।

স্বাভাবিক উপায়ে ডিম ফুটাইবার অসুবিধা আছে। বাচ্চা হইতে 21 দিন সময় লাগে। এই দীর্ঘ সময় ধরিয়া সকল মুরগী বসা পছন্দ করে না এবং ডিম ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। ফলে ডিমগুলি নষ্ট হয়। এই সময় মুরগী ডিম পাড়ে না, ফলে আর্থিক ক্ষতি হয়। ইহা ছাড়া মুরগীর বসার দোষে ডিম নষ্ট হয়।

(ii) **কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোটানো ঃ** বর্তমানে ইনকিউবেটরে ডিম ফোটানো হয়। অনেক উন্নত ধরনের ইনকিউবেটরের সৃষ্টি হইয়াছে।

কৃত্রিম উপায়ে ডিমে তা দেবার মূলনীতি ঃ

নিম্নলিখিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া ইনকিউবেটরে ডিম ফোটানো হয়।

(i) ইনকিউবেটরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (100°F-104°F) নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। 102°F তাপমাত্রা ডিম ফুটানর উপযুক্ত তাপমাত্রা।

(ii) কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানর জন্য ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে ইনকিউবেটরে নির্দিষ্ট আদ্র'তা (46% হইতে 52%) নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

(iii) উপযুক্ত বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, ক্রমশ দিন বেশী হইলে বেশী পরিমাণে বিশুদ্ধ বাতাসের প্রয়োজন। 21 দিনের সময় প্রথম দিন অপেক্ষা 100 গুণ বেশী বাতাস চলাচল প্রয়োজন।

(iv) ডিম বসাইবার পর নিয়মিতভাবে ডিম ঘোরানো আবশ্যক। প্রথম দিকে প্রতিদিন 4 হইতে 6 বার, পরের দিকে আট ঘণ্টা অন্তর ডিম ঘোরানো আবশ্যক। 18 দিন পর ডিম ঘোরানো হয় না।

(v) ইনকিউবেটরের উপযুক্ত পরিচর্যা প্রয়োজন যাহাতে ইহা বীজাণুমুক্ত হইতে পারে।

(vi) ইনকিউবেটর যে ঘরে রাখা হয়, সেই ঘরের তাপমাত্রা 65°F-70°F আবশ্যক।

কৃত্রিম উপায়ে ডিমে তা দেওয়ার সুবিধা ঃ

কৃত্রিম উপায়ে ডিমে তা দেওয়ার সুবিধাগুলি নীচে আলোচনা করা হইল।

(i) একসঙ্গে ইনকিউবেটরে অনেক বাচ্চা উৎপাদন সম্ভব হয়।

(ii) বছরের যে কোন সময় প্রয়োজনমত বাচ্চা তোলা যায়।

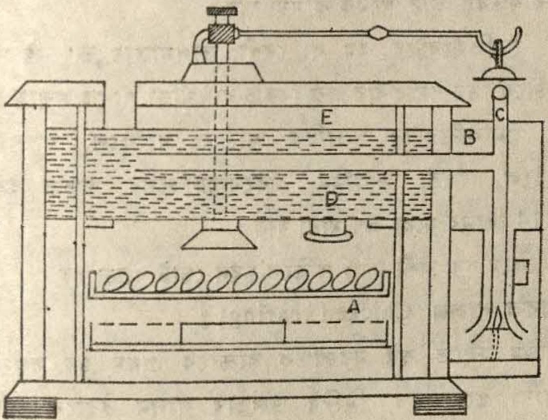
(iii) মুরগী ঠিকমত ডিমে তা দেয় কিনা তাহা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না।

(iv) মুরগীর দেহ হইতে কোন রোগ বাচ্চার দেহে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

(v) একসঙ্গে অনেক বাচ্চা পাওয়া যায় এবং নষ্ট হয় না বলিয়া আর্থিক দিকেও লাভজনক।

ইনকিউবেটর (Incubator) ঃ

এই যন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত তাপ ও আর্দ্রতায় ডিম রাখিয়া বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। ছোট ইনকিউবেটরে 150টি পর্যন্ত ডিম রাখা যায়। সাধারণতঃ দুই ধরনের ইনকিউবেটর আছে, যথা—উষ্ণ জলের ট্যাঙ্কযুক্ত ইনকিউবেটর এবং উষ্ণ বায়ুযুক্ত ইনকিউবেটর। জল ও বায়ুকে উষ্ণ করিবার জন্য কেরোসিন বাতি বা ইলেকট্রিক হীটারের তাপ ব্যবহার করা হয়। সেই অনুযায়ী ইনকিউবেটর দুই ধরনের বলা যাইতে পারে, যথা—**কেরোসিন বাতির ইনকিউবেটর** (চিত্র 18) ও **ইলেকট্রিক ইনকিউবেটর।**



চিত্র 18 : কেরোসিন ইনকিউবেটর

ডিম হইতে অল্পসংখ্যক বাচ্চা উৎপাদন ও ডিমের ভিতর ভ্রূণের মৃত্যুর কারণ ঃ

বিভিন্ন কারণে ডিম হইতে কম সংখ্যক বাচ্চা উৎপাদন হয়, দুর্বল ও ছোট শাবক হয় বা ডিমের ভিতর ভ্রূণ বিনষ্ট হয়। নীচে কারণগুলি আলোচনা করা হইল।

(i) কম বয়সের মুরগীর ডিমের বাচ্চা উৎপাদনের হার বেশী। প্রথম বৎসরের ডিম হইতে বাচ্চা উৎপাদনের হার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ অপেক্ষা বেশী হয়।

(ii) ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় মোরগ-মুরগীর প্রজননে সৃষ্ট ডিম হইতে বাচ্চা উৎপাদনের হার কম হয়।

(iii) রোগগ্রস্থ মুরগীর ডিমের বাচ্চা উৎপাদনের হার কম, মুরগী পরিপূরক খাদ্য না পাইলে উপযুক্ত ডিম পাড়ে না। ফলে বাচ্চা উৎপাদনের হার কমিয়া যায়।

(v) 55°F হইতে 60°F তাপমাত্রায় সংরক্ষিত এক সপ্তাহ বয়সের ডিমের বাচ্চা উৎপাদনের হার বেশী।

(v) সতর্কতার সহিত ইনকিউবেটরে ডিম না ঘোরাইলে অন্তঃস্থ ভ্রূণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(vi) ইনকিউবেটরে প্রয়োজনের তুলনায় কম বায়ুচলাচল করিলে বাচ্চা উৎপাদনের শতকরা হার অনেক কমিয়া যায়।

(vii) ইনকিউবেটরে কম বা বেশী তাপমাত্রায় ভ্রূণ নষ্ট হয়। ইহা ছাড়া ভুলভাবে ডিম বসাইবার জন্য বিকৃত বা খোঁড়া শাবক জন্মায়।

(viii) ইনকিউবেটরে অত্যধিক আর্দ্রতা থাকিলে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্য খারাপ হইলে, অথবা ভিটামিন রাইবোফ্লেভিনের অভাব হইলে ডিম বসাইবার 14 দিনের মধ্যে ভ্রূণ মারা যায়।

(ix) ডিমে খুব বেশী তাপ পড়িলে দুর্বল ছোট বাচ্চা হয়।

মুরগী শাবক পালন (Chicken rearing) :

(i) ডিম হইতে সৃষ্ট নবজাতক বাচ্চাকে প্রথম ছয় সপ্তাহ নির্দিষ্ট উষ্ণতায় রাখা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পালন করাকে **ব্রুডিং** বলে। কৃত্রিম উপায়ে ব্রুডারে বাচ্চাদের তাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়—

মুরগী শাবকের বয়স	ব্রুডারের তাপমাত্রা
0-1 সপ্তাহ	93°-95°F
1-2 সপ্তাহ	88°-90°F
2-3 সপ্তাহ	83°-85°F
3-4 সপ্তাহ	78°-80°F
4-5 সপ্তাহ	75°F
5-6 সপ্তাহ	70°F

(ii) বিশ্বস্ত **হেচারী** হইতে উপযুক্ত নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান একদিনের বাচ্চা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। রোগাক্রান্ত মুরগী বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী।

(iii) ব্রুডারের মধ্যে উপযুক্ত বায়ুচলাচল প্রয়োজন। বাচ্চার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে বেশী পরিমাণে বাতাস চলাচল প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখিতে হইবে এই বাতাসের আর্দ্রতা যাহাতে বেশী না হয়। আর্দ্রতা বেশী হইলে বাচ্চারা অসুস্থ হইয়া পড়ে।

(iv) ব্রুডার এবং পোলাট্রি ফার্মের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়।

(v) ব্রুডারের ভিতরে খাবারের জায়গা ও জলের পাত্র এমন বড় হওয়া প্রয়োজন যাহাতে অনেকগুলি বাচ্চা স্বচ্ছন্দে খাদ্যগ্রহণ ও জলপান করিতে পারে। একসঙ্গে অনেক বাচ্চা অল্প জায়গায় থাকিলে খাদ্যগ্রহণের সময় আহত হয়।

(vi) ব্রুডার যাহাতে শুষ্ক থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইয়ে। ভিজা ব্রুডারে বাচ্চা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়।

(vii) ব্রুডারের বাচ্চাদের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। যথা—

(a) সতর্কতার সহিত খাদ্য খাওয়াইলে বাচ্চাদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে অনেক বাচ্চা মারা যায়। ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইবার পরই উহাদের খাদ্য ও জল সরবরাহ করিতে হইবে।

(b) বাচ্চারা ঠিকমত খাদ্য পাইতেছে কিনা, তাহাদের নির্দিষ্ট উত্তাপ দেওয়া হইতেছে কিনা এবং সুস্থ আছে কিনা তাহার উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

(c) ব্রুডারের বাহিরে বেশীক্ষণ থাকা উচিত হইবে না, অবশ্য বাচ্চা বড় হইলে বেশী সময়ের জন্য বাহিরে যাওয়া চলিতে পারে।

(d) ডিম হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা 10 হইতে 14 দিনের মধ্যে বাচ্চাদের ঠোঁট কাটিয়া দিতে হইবে।

(e) দক্ষ লোকের মাধ্যমে পোলট্রি ফার্মে পুরুষ ও স্ত্রী বাচ্চা পৃথক করা প্রয়োজন।

(f) বাচ্চারা যাহাতে রোগাক্রান্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

(viii) ব্রুডারের মেঝেতে বিছাইবার জন্য বিভিন্ন রকম লিটার ব্যবহার করিতে হইবে। কাঠের গুঁড়া, খড়কুটা, গম খড়ের টুকরা, বাদামের খোলা, ইক্ষুর ভূষা ইত্যাদি লিটার ব্যবহার করা হয়, তাহার মধ্যে কাঠের গুঁড়াই সর্বোৎকৃষ্ট লিটার।

(ix) ব্রুডার হাউস এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উপযুক্ত সূর্যালোক পায়। গ্রীষ্মকালে ব্রুডারের উপর উপযুক্ত আচ্ছাদনের প্রয়োজন। ব্রুডারের মধ্যে বাচ্চাদের তাপ দেওয়ার জন্যে সারারাত্রি আলো জ্বালাইবার ব্যবস্থা থাকে। প্রথম 7-8 সপ্তাহ সারারাত্রি আলো জ্বলে। প্রতি 200 বর্গফুট মেঝের জন্য 15 ওয়াটের একটি বৈদ্যুতিক বাতির প্রয়োজন। ব্রুডার হাউস জীবাণুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন, সেইজন্য জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়া পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ছয় সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য মাথাপিছু এক বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন।

(x) বেজী, শৃগাল, ইঁদুর, চিল, বাজ ইত্যাদি ক্ষতিকারক জন্তু মুরগীর বাচ্চা খায়, সেইজন্য ব্রুডার হাউস এমনভাবে তৈয়ারি করিতে হইবে যাহাতে ঐ সকল ক্ষতিকারক পশু-পক্ষী প্রবেশ করিতে না পারে।

বাচ্চা পালন পদ্ধতি

সাধারণতঃ, 7-8 সপ্তাহ পর্যন্ত বাচ্চাকে ব্রুডারে রাখা হয়। বাচ্চা পালন পদ্ধতিকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(1) মুরগীর দ্বারা নবজাত বাচ্চা পালন ঃ

দেশী মুরগী নিজেরাই ডানার নিচে বাচ্চাদের রাখিয়া উপযুক্ত তাপ দিতে সক্ষম হয়। একটি দেশী মুরগী এইভাবে একসঙ্গে প্রায় 20টি বাচ্চাকে ডানার নীচে রাখিতে পারে। সাধারণতঃ কাঠের বাক্স বাচ্চা পালনের জন্য তৈয়ারি করা হয়। বাক্সের যে কোন দিকে জাল থাকে এবং একটি বড় দরজা থাকে। এই বাক্সের মধ্যে মুরগী বাচ্চাদের লইয়া অবাধে বিচরণ করিতে পারে। উপযুক্ত স্থানে রাখা হয় যাহাতে কোন ক্ষতিকারক প্রাণী আসিতে না পারে। ঐ বাক্সকে একটি ঘেরা উন্মুক্ত স্থানে রাখিলে মুরগী প্রয়োজনে বাচ্চাদের লইয়া খোপের বাহিরে বিচরণ করিতে পারে। বাচ্চাদের জন্য এবং মা মুরগীর জন্য খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাধারণতঃ চাউলে ক্ষুদ, ভাঙ্গা ভুট্টা বা গমের ছোট দানা, রুটি ও ভাত বাচ্চাদের খাওয়ানো যাইতে পারে। সবুজ ঘাস, নটে শাক, পালং শাক ইত্যাদি খাওয়াইতে হইবে। বাচ্চার বয়স 6 হইতে 10 সপ্তাহ হইলে আর মা মুরগীর সহিত রাখিবার প্রয়োজন হয় না।

(ii) কৃত্রিম উপায়ে তাপের সাহায্যে নবজাত বাচ্চা পালন ঃ

পোলট্রি ফার্মে প্রধানতঃ ক্রডার হাউস বা বাচ্চা রাখার তাপ খোপ আছে। বাচ্চার সংখ্যানুযায়ী ক্রডার ঘর তৈয়ারি করিতে হয়। একটি বড় হলঘরে প্রাচীর বা তারজালি দিয়া ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা হয়, এক একটি ঘরে 150-200 বাচ্চা পালন করা হয়। বর্তমানে কম বাচ্চার জন্য কেরোসিন বাতির ক্রডার এবং বেশী সংখ্যক বাচ্চার জন্য বৈদ্যুতিক বাতি দ্বারা উত্তপ্ত ক্রডার তৈয়ারি করা হয়।

সাধারণ বাক্সের মত এই ক্রডার ঘরের চতুর্দিক এবং উপরে বন্ধ থাকিবে, শুধু একদিকে দরজা থাকিবে। বাক্সের মধ্যে বাতাস চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে এবং বাক্সের ছাদে বৈদ্যুতিক বাতি বা মেঝেতে কেরোসিনের বাতি থাকে। একটি 2 ফুট × 2 ফুট × 1 ফুট বাক্সে এক সপ্তাহের 50টি বাচ্চা পালন করা যায়।

বাক্সের মেঝেতে তারজালির উপর বিচালী রাখা ভাল। দিনের বেলায় বাচ্চাদের বিচরণের জন্য ক্রডার সংলগ্ন একটি **বিচরণক্ষেত্র** বা **রাণ** রাখা হয়। এই রাণে আসিয়া বাচ্চারা ছোটাছুটি করে, খাদ্য ও জল গ্রহণ করে এবং রাণে বাচ্চাদের গায়ে রৌদ্র ও বাতাস লাগিতে পারে। 6 ফুট × 2 ফুট × 1 ফুট রাণে 50টি বাচ্চা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। রাণ এবং ক্রডারের সংযোগস্থলে একটি দরজা থাকে। ক্রডারে প্রথম সপ্তাহের প্রতিটি বাচ্চার জন্য 7 বর্গ ইঞ্চি জায়গার প্রয়োজন, অর্থাৎ এক বর্গফুট ক্রডারে 20টি বাচ্চা রাখা যাইতে পারে। ক্রডারের তাপমাত্রা কম বা বেশী একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে। ক্রডারের তাপমাত্রা হ্রাস পাইলে বাচ্চারা তাপের উৎসের সংলগ্নে বসিবার জন্য চেষ্টা করিবে। ইহাতে দুর্বল বাচ্চা অসুস্থ হইয়া পড়ে কারণ তাহারা স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে এবং উৎসের নিকটে যাইতে পারে না। ক্রডারের তাপমাত্রা বেশী হইলে বাচ্চারা হাঁপাইতে থাকে ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। যদি ক্রডারের তাপমাত্রা ঠিক থাকে, তবে ক্রডারের মধ্যে যে কোন জায়গায় বসিয়া আরামে বিশ্রাম করে।

ক্রডারের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের বাচ্চাদের বিভিন্ন তাপমাত্রায় রাখা হয়। এই তাপমাত্রা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। প্রথম কয়েকদিন বাচ্চারা খুব রোগা ও কোমল থাকে বলিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। গ্রীষ্মকালে 2-3 সপ্তাহ এবং শীতকালে 5-7 সপ্তাহ পরিমাণমত তাপ

দেওয়া আবশ্যক। প্রথম সপ্তাহে 95°F তাপমাত্রা থাকে, পরের প্রতি সপ্তাহে 5°F হিসাবে তাপমাত্রা কমাইতে হইবে।

ঠাণ্ডা মেঝের হাত হইতে বাচ্চাকে রক্ষার জন্য ব্রুডার ঘরের মেঝেতে প্রায় 2 ইঞ্চি পুরু কাঠগুঁড়া, খড়ের টুক্‌রা বা গমের গুঁড়া বিছাইয়া দিতে হয়। এই খড় পানীয় জল ও বাচ্চাদের মলমূত্র শোষণ করিয়া ব্রুডার ঘরকে শুষ্ক রাখে।

ব্রুডারে বাচ্চাদের ব্যবস্থাপনা :

ব্রুডারে বাচ্চা রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

(i) ব্রুডারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।

(ii) ব্রুডার ঘরের মেঝে শুষ্ক থাকা প্রয়োজন, মেঝেতে উপযুক্ত লিটার বিছানো প্রয়োজন।

(iii) ব্রুডার ঘরে উপযুক্ত বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(iv) বাচ্চাদের পরিপূরক খাদ্য, সবুজ শাকসব্জী, ঘাস ইত্যাদি দেওয়া প্রয়োজন।

(v) খাদ্যের ও পানীয়ের পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

(vi) পাত্রে সর্বদা খাদ্য ও জল থাকা প্রয়োজন নচেৎ বাচ্চারা লিটার ভক্ষণ করিবে।

(vii) কেরোসিন বাতি বা বৈদ্যুতিক বাতির চারিপার্শ্বে তারজালি দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে বাচ্চারা আলোর উৎসের কাছে না যাইতে পারে।

(viii) বাচ্চাদের 4-5 সপ্তাহ বয়স হইতেই দাঁড়ে বসিবার শিক্ষা দিতে হইবে। ব্রুডার ঘরে দাঁড়ের ব্যবস্থা করিলে লিটার বাহিত রোগের সংক্রমণ বন্ধ করা যায়।

(ix) ব্রুডার ঘরকে নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে।

নবজাত বাচ্চার খাদ্য :

বাচ্চাদের ব্রুডারে স্থানান্তরিত করার পরই বিশেষভাবে প্রস্তুত পরিপূরক খাদ্য খাওয়ানোই শ্রেয়। ইহার সহিত ভুট্টা ও গম ছোট আকারে ভাঙিয়া খাইতে দেওয়া হয়। খাবারের পাত্র ছোট হইলে বাচ্চারা একসঙ্গে অনেকে খাদ্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়, ইহার ফলে দুর্বল বাচ্চা পর্যাপ্ত খাদ্য পায় না। তাহা ছাড়া জায়গা কম থাকিলে বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। জলের জন্য ফোয়ারা জল পাত্রের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

নবজাত বাচ্চাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য প্রোটিন খাদ্যের প্রয়োজন। চাল, ক্ষুদ, গম, ভুট্টা ইত্যাদি খাদ্যে পুষ্টির অভাব হয় বলিয়া বাচ্চাদের মাখনতোলা দুধ খাওয়ানো হয়। ইহাছাড়া ছাগল-ভেড়ার নাড়িভূড়ি ছোট ছোট টুকরা করিয়া ভালভাবে ধুইয়া একঘণ্টা পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। তারপর ঐ মাংস শর্করা খাদ্যের সহিত মিশাইয়া বাচ্চাদের দেওয়া হয়। এইভাবে খাদ্যের প্রতি যত্নবান হইলে, ছয়মাসেই বাচ্চা প্রায় দুই কিলোগ্রাম ওজনের হয়।

কাঁচা শাক-সব্জী, ঘাস ইত্যাদি ভিটামিন 'এ'র জন্য বাচ্চাদের প্রতিদিন খাওয়ানো হয়। শরীরের গঠন ও অস্থির বৃদ্ধির জন্য ঝিনুক, শামুকের খোলকচূর্ণ খাদ্যের সহিত দেওয়া হয়। ইহা দেহের ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করে।

অপেক্ষাকৃত বড় বাচ্চা পালন ঃ

বড় বাচ্চাদের অর্থাৎ আট সপ্তাহ পর বাচ্চাদের আর গরমের প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থায় স্ত্রী পাখীকে **পুলেট** (Pullet) এবং পুরুষ পাখীদের **ককরেল** (Cockrail) বলে। এইবার বাচ্চা হইতে পূর্ণাঙ্গ বয়স পর্যন্ত একই ঘরে মুরগীদের পালন করা হয়। ছয় সপ্তাহের বেশী বয়সের প্রতিটি বাচ্চার জন্য মেঝেতে অন্ততঃ দুই বর্গফুট পরিমাণ জায়গা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে বড় পাখীকে পালন করা হয়, তাহা পরে আলোচিত হইয়াছে।

আট সপ্তাহ বয়সের বাচ্চাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ পাখীর বাহ্যিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই সময় পুরুষ পাখীদের সরাইয়া অন্যত্র রাখিতে হয় অথবা বিক্রীর ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রজননের জন্য 10-12টি মুরগী প্রতি একটি পুরুষ পাখী রাখিয়া বাকিগুলি বিক্রী করাই লাভজনক।

আজকের বড় পোলট্রি ফার্মে একদিনের বাচ্চারই লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তি অবসারণী দেখিয়া পুরুষ ও স্ত্রী পাখী চিহ্নিত করিতে পারেন। একদিনের বাচ্চার পুরুষের ক্ষেত্রে অবসারণীর নিকট ক্ষুদ্রকায় পুরুষাঙ্গ থাকে। বর্তমানে শুধুমাত্র স্ত্রী বাচ্চা কিনিবার চাহিদা বেশী, কারণ উৎপাদন ও বিক্রীর জন্য মুরগী পালন করিলে পুরুষ পাখীর কোন প্রয়োজন থাকে না।

মুরগী পালনের পদ্ধতি :

জমির পরিমাণ ও মূলধন নিয়োগের সামর্থ্য অনুসারে মুরগী পালনের তিন রকমের পদ্ধতি আছে। যথা—**স্বচ্ছন্দ বিচরণ পদ্ধতি** (Free range system), **সীমাবদ্ধ জমিতে অর্ধস্বাধীনভাবে মুরগী পালন** (Semi intensive system) এবং **আবদ্ধ অবস্থায় মুরগী পালন বা নিবিড় পদ্ধতি** (Intensive system)। নিবিড় পালন পদ্ধতিতে দুইভাবে মুরগী পালন করা হয়। যথা—**বিচালি বিছানো স্থানে বা ঘরে মুরগী পালন** (Deep litter system) এবং **খাঁচাঘরে মুরগী পালন** (Battery system)।

স্বচ্ছন্দ বিচরণ পদ্ধতি (Free range system) :

যদি মূলধন কম থাকে, কিন্তু প্রচুর জমি থাকে, তবে এই পদ্ধতিতে মুরগী চাষ করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে বিরাট জায়গায় মুরগী চরাইবার ব্যবস্থা থাকে বলিয়া **স্বচ্ছন্দ স্বাধীন বিচরণ পদ্ধতি** বলে। ইহা গ্রাম বাংলার ও ভারতের গ্রামাঞ্চলে অনেক পুরাতন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে গৃহস্থের মুরগী দিনের বেলায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহারা বাড়ীর উঠানে, মাঠে, রাস্তায় ঘুরিয়া দিনের শেষে গৃহস্থের বাড়ীতে নিজস্ব আস্তানায় আশ্রয় নেয়।

এইভাবে মুরগী পোষার সুবিধা এই যে মুরগীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা গৃহস্থকে করিতে হয় না। মুরগীগুলি পথে ফেলা উচ্ছিষ্ট খাদ্য, ঘাস, পোকা ইত্যাদি খায়। এই মুরগী পালনে মুরগী বাড়ীর যে কোন নির্জন স্থানে, খড়ের গাদায়, কাঠের বাক্সে বা ভাঙ্গা টালির আস্তানায় থাকে, ফলে উপযুক্ত গৃহনির্মাণের খরচা হয় না। এই পদ্ধতিতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া মুরগীর চাষের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বড় বাগান থাকিলে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে একসঙ্গে দুই-তিন হাজার পর্যন্ত মুরগী পালন করা যাইতে পারে। মুরগী দিনের বেলায় অবাধে বাগানে চরিয়া বেড়ায় এবং বাগানের পোকা, ঘাস ইত্যাদি খায়। ফলে ইহাদের জন্য খাদ্যের পরিমাণ কম করা হইলেও চলে। বাগানের ভিতর মুরগীকে রাত্রে রাখিবার জন্য ঘর তৈয়ারি করা হয়। একটি বড় ঘর অপেক্ষা অনেকগুলি ছোট ঘর থাকা শ্রেয়।

এই পদ্ধতির অসুবিধা মুরগী যেখানে-সেখানে ডিম পাড়ে, ফলে ডিম সংগ্রহে অসুবিধা হয়। বাগানে উপযুক্ত বেড়া বা উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা না থাকিলে মুরগী চুরি যাইবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া ভাম,

কুকুর, শৃগাল ইত্যাদি ক্ষতিকারক জন্তু মুরগী মারিয়া ফেলে, সুতরাং সেদিকেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সীমাবদ্ধ জমিতে অর্ধস্বাধীনভাবে মুরগী পালন পদ্ধতি (Semi intensive System) :

এই পদ্ধতিতে দুই-তিন বিঘা জমিতে মুরগী চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মুরগীকে তারজালির মধ্যে রাখা হয়। ছোট জমি জাল দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যেই মুরগীর বিচরণ সীমাবদ্ধ করা হয়। সে জমির মধ্যে দোচালা ত্রিভুজাকৃতি ঘরের মধ্যে মুরগীগুলিকে রাত্রে রাখা হয়।

এই দোচালা খুব বড় করা হয় না। প্রতিটি মুরগীর জন্য মেঝেতে 3-4 বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন এবং ঘরের বাইরে চরিবার জায়গা অন্ততঃ মুরগী প্রতি 150-200 বর্গফুট থাকা বাঞ্ছনীয়। মুরগীর সংখ্যা হিসাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। প্রতিটি দোচালায় 10 হইতে 12টি মুরগী রাখা হয়।

সমস্ত বাগান তারের জাল দ্বারা ঘিরিয়া লওয়া প্রয়োজন। বেড়ার উচ্চতা অন্ততঃ 6 ফুট রাখা হয়। তারের জালের পরিবর্তে বাঁশের দরমা দেওয়া যাইতে পারে। সীমাবদ্ধ স্থানে মুরগী পালনের অসুবিধা এই যে কয়েক বৎসর পর মল দ্বারা জমি দূষিত হয়। এইজন্য জমির মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মাটি জমিতে ফেলা হয়। তাহাছাড়া বছরে একবার চূণ ছড়াইয়া দিলে রোগের জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়। জমিতে চূণ প্রয়োগের পূর্বে মুরগীকে সরাইয়া লওয়া হয়। চূণ প্রয়োগের পনের দিন পরে মুরগীকে আবার জীবাণুমুক্ত জমিতে ফিরাইয়া আনা হয়।

নিবিড় পদ্ধতিতে মুরগী পালন (Intensive System) :

বর্তমানে স্বচ্ছন্দ বিচরণ পদ্ধতিতে বা সীমাবদ্ধ জমিতে অর্ধস্বাধীনভাবে মুরগী পালন করা হয় না। শহরাঞ্চলে বড় ফাঁকা জায়গা পাওয়া সম্ভব হয় না, ফলে স্বচ্ছন্দ বিচরণ পদ্ধতিতে চাষ করা সম্ভব হয় না। কম জায়গায় সীমাবদ্ধ জমিতে এই পদ্ধতিতে চাষ করা যায়, কিন্তু শহরাঞ্চলে অল্প জায়গা যোগাড় করা কষ্টসাধ্য। সেইজন্য শহরতলীতে এমনকি গ্রামাঞ্চলে দিবারাত্র আবদ্ধ করিয়া মুরগী পালন পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। এই আবদ্ধ স্থানে মুরগী পালন পদ্ধতিকে **নিবিড় পদ্ধতি** বলে। নিম্নে তিন ধরনের নিবিড় পদ্ধতিতে চাষের পদ্ধতি উল্লেখ করা হইয়াছে।

1. ডিপলিটার পদ্ধতিতে মুরগী পালন :

জন্তুর বিছানাকে ইংরাজীতে **লিটার** বলে। মেঝেতে বিচালি বিছানো ঘরের মধ্যে মুরগীরা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে এবং নিয়মিত ডিম পাড়ে। মেঝেতে বিচালি, কাঠের গুঁড়া, ধানের তুষ, গমের ভূষি ইত্যাদি বিছাইয়া আবদ্ধ ঘরের মধ্যে মুরগী পালনের পদ্ধতিকে **ডিপলিটার সিস্টেম** (Deep litter system) বলে।

এই পদ্ধতিতে মুরগী চাষের জন্য জমির খুব কম প্রয়োজন হয়। প্রায় 1000 মুরগী পালনের জন্য এক একর জমিই যথেষ্ট। প্রায় 15 ফুট লম্বা 10 ফুট চওড়া অর্থাৎ 150 বর্গফুট ঘরে 40-50টি মুরগী পালন করা যায়। এই প্রকার চাষ আবদ্ধ ঘরে হয় বলিয়া বিচরণ ক্ষেত্র বা রাণের প্রয়োজন হয় না। একটি মুরগীর জন্য গড়ে 3 হইতে 4 বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন। আবদ্ধ ঘরে আলো-বাতাস চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই প্রকার ঘরের দেওয়ালগুলি ইট অথবা মাটি দ্বারা নির্মাণ করা হয়। 6 হইতে 8 ফুট চারিদিকে দেওয়াল তুলিয়া ছাদ দেওয়া হয়। লোহা-সিমেন্টের স্থায়ী ছাদ দেওয়া হয় বা প্রয়োজনে ছাদে অ্যাসবেস্টস, টিন, টালি ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে ছাদকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য ছাদে খড়, নারকেলপাতা, তালপাতা, চট ইত্যাদি চাপান হয়। ঘরের দক্ষিণ দিক্ সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয় না। নীচের দিকে মাটি বা ইটের দেওয়াল কিছুটা তুলিয়া পরবর্তী উচ্চতায় তারজালি লাগান হয়। ফলে ঘরে ভালভাবে আলো প্রবেশ করে এবং বাতাস চলাচল করিতে পারে। ইহাছাড়া প্রতি-পার্শ্বের দেওয়ালে জানালা থাকে, জানালায় তারজালি লাগান হয়। একদিকে বড় দরজা রাখা হয়।

ঘরের মেঝে কংক্রীট ঢালাই করিয়া পাকা করা হয় নচেৎ ইঁদুর, ছুঁচো মাটিতে গর্ত করিয়া মুরগীর ক্ষতি করিবে। ঘরের মেঝেতে খড়, বিচালি, ধানের তুষ, গমের ভূষি ও কাঠের গুঁড়া বিছানো হয়। এই স্তরের গভীরতা 6 হইতে 8 ইঞ্চি হয়। মুরগীরা দিবারাত্র ঐ লিটারের উপর বিচরণ করে এবং মলমূত্র ত্যাগ করে। মুরগী পা দিয়া সকল সময় লিটারকে আঁচড়ায় ফলে উপরের মল নীচের দিকে চলিয়া যায় এবং বিচালি ও কাঠের গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত হয়। এই লিটার কিছুদিনের মধ্যেই পচিতে শুরু করে ফলে অল্প তাপের সৃষ্টি হয়। লিটার যাহাতে শুষ্ক থাকে এবং রাসায়নিক ক্রিয়াকে

অব্যাহত রাখিবার জন্য অন্ততঃ সপ্তাহে একবার করিয়া লিটারকে নাড়াচাড়া করিয়া দিতে হইবে। লিটার অতিমাত্রায় সিক্ত হইলে প্রতি বর্গফুট হিসাবে 500 গ্রাম সুপার ফসফেট ছড়াইয়া দিতে হয়। এই মল-মিশ্রিত লিটার উত্তম কম্পোষ্ট সারে পরিণত হয়। এই সময় এই লিটার আবদ্ধ ঘর হইতে তুলিয়া সার হিসাবে বাজারে বিক্রয় করা হয় এবং মেঝেতে নূতন লিটার যোগ করা হয়।

ডিপলিটারের পরিচর্যা ও সতর্কতা :

(i) ডিপলিটারের পরিচর্যার জন্য মেঝে প্রতিদিন পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

(ii) লিটার যেন কখনও সিক্ত না থাকে, তা লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। যদি লিটারের কোন বিশেষ অংশ নষ্ট হয় বা ভিজিয়া যায়, তবে ঐ লিটার সরাইয়া নূতন লিটার যোগ করিতে হইবে।

(iii) সপ্তাহে 2-3 দিন অন্তর একটি লাঠি দিয়া লিটারকে ভালভাবে নাড়াচাড়া করিতে হইবে, যাহাতে উপরের মলমূত্র নীচে চলিয়া যায়। লিটার সিক্ত থাকিলে প্রতি বর্গফুট লিটারের হিসাবে 500 গ্রাম কলিচূর্ণ যোগ করিতে হইবে।

(iv) লিটারের গভীরতা ছয় হইতে আট ইঞ্চি হওয়া প্রয়োজন।

(v) বৎসরে একবার অন্ততঃ পুরাতন লিটার অপসারণ করিয়া নূতন লিটার দিতে হইবে। অবশ্য এই সময় পুরাতন লিটারের এক-তৃতীয়াংশের সহিত নূতন দুই-তৃতীয়াংশ লিটার মেশানো যাইতে পারে।

(vi) ঘরে যাহাতে পোকার উপদ্রব না হয় সেইজন্য দেওয়ালে 10% ডি. ডি. টি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(vii) যদি নূতন লিটারে বাচ্চা মুরগী রাখা হয়, তবে প্রথম দুইমাস অন্ততঃ সপ্তাহে দুইদিন ইহাদের 'অ্যান্টি কক্সিডিয়া' জীবাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

ডিপলিটার পদ্ধতির সুবিধা :

নিম্নলিখিত কারণে ডিপলিটার পদ্ধতিতে মুরগীর চাষ করা হয়।

(i) **মুরগীর নিরাপত্তা :** স্বাধীন চারণ বা স্বচ্ছন্দ বিচরণ পদ্ধতি কিম্বা সীমাবদ্ধ জমিতে অর্ধস্বাধীনভাবে মুরগীর চাষ করিলেও নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে না। শৃগাল, ভাম, বেজী, ইঁদুর, কুকুর মুরগীকে

ধ্বংস করিতে পারে। কিন্তু ডিপলিটার পদ্ধতিতে মুরগী সকল সময়ই আবদ্ধ স্থানে থাকে, ফলে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা থাকে।

(ii) **খাদ্যের উৎস :** ছয়মাস পরে লিটারই খাদ্যের উৎস হিসাবে কাজ করে। লিটার হইতে প্রোটিন ও রাইবোফ্লেবিন ভিটামিন পাওয়া যায়। খাদ্যের সঙ্গে প্রোটিন ও ভিটামিন পাইলে মুরগীর ডিম উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। এই ডিমের মধ্যে পুষ্ট ভ্রূণের সৃষ্টি হয়।

(iii) **রোগ প্রতিরোধ :** শুকনো ডিপলিটারে মুরগী রাখিলে কক্সিডিওসিস ও ক্রিমি রোগের সম্ভাবনা কম থাকে। ফাঁকা জায়গায় মুরগীকে চরিতে দিলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। মুরগী যে কোন নোংরা উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য খায় ফলে রোগের প্রকোপ বাড়ে। এই নিবিড় পদ্ধতিতে মুরগীপালক উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করে, ফলে পরজীবীর আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। বিশেষতঃ বাচ্চাদের রোগের প্রাদুর্ভাব কমে।

(iv) **মূল্যবান সার :** ডিপলিটারে ব্যবহৃত লিটার পুরাতন হইলে উত্তম সাররূপে বাজারে বিক্রয় হয়। এই পরিত্যক্ত লিটারে শতকরা তিনভাগ নাইট্রোজেন, দুইভাগ ফসফরাস, দুইভাগ পটাশ পাওয়া যায়। এই সারের চাহিদা বর্তমানে অনেক বেশী, ফলে এক বৎসর বাদে লিটার অপসারিত করিলেও মুরগীপালক কিছু পয়সা পায়।

(v) **তাপমাত্রা বজায় রাখা :** লিটার একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখে। গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া খুব গরম হইলেও লিটার ঠাণ্ডা থাকে। আবার শীতকালে খুব ঠাণ্ডায় লিটার মুরগীদের উষ্ণ রাখে। এই লিটার তাপের কুপরিবাহী, ফলে চরম তাপমাত্রা হইতে রক্ষা করে।

(vi) **ডিম সংগ্রহ :** আবদ্ধ স্থানে মুরগী চাষ করায় সহজেই ডিম সংগ্রহ করা যায়। কোন মুরগী কিভাবে অর্থাৎ কি পরিমাণে ডিম দেয় তা অনুমান করা যায়। ডিমের সংখ্যা বা গুণগত মান হ্রাস পাইলে সেইমত মুরগীর পরিচর্যা করা যায়।

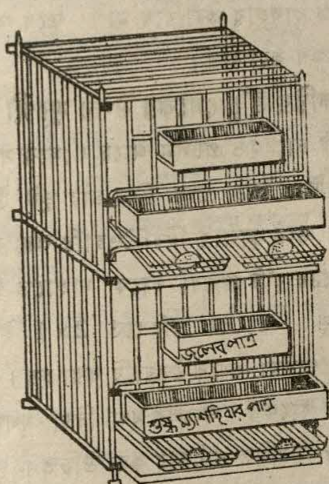
(vii) **মুরগীর উপযুক্ত পরিচর্যা :** আবদ্ধ স্থানে মুরগী চাষ করায় মুরগীর প্রতি যত্ন নেওয়া যায়। মুরগী অসুস্থ বা দুর্বল তাহা সহজেই ধরা পড়ে এবং উপযুক্ত পরিচর্যা করা সম্ভব হয়। ফাঁকা স্থানে মুরগী চাষ করিলে প্রতিটি মুরগীর প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না। মুরগীর কোন রোগ হইলে তাহা অন্য মুরগীতে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে অসুস্থ

রোগগ্রস্ত মুরগীকে আলাদা করিয়া রাখিয়া পরিচর্যা করা হয়।

সর্বোপরি ডিপলিটার পদ্ধতিতে অনেক মুরগী একসঙ্গে চাষ করা লাভজনক এবং শারীরিক পরিশ্রম অনেক কম। ফাঁকাস্থানে মুরগী চাষে রাত্রে সকল মুরগী আস্তানায় ফিরিয়াছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা একটি পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ এবং মুরগী হারাইবার সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু নিবিড় পদ্ধতিতে শুধুমাত্র পরিপূরক খাদ্য ও জলের যোগান দেওয়া ছাড়া অন্য কোন শারীরিক পরিশ্রম নাই। মাঝেমধ্যে লিটার নাড়াচাড়া করিতে হয় এবং বৎসরান্তে পুরাতন লিটার ফেলিয়া নূতন লিটার যোগ করিতে হয়। এই পদ্ধতিতে মুরগীর উত্তমরূপে পরিচর্যা করা যায় ফলে ব্যবসার দিকেও লাভজনক।

.2. খাঁচাঘরে মুরগী পালন পদ্ধতি :

ডিপলিটার পদ্ধতিতে মুরগী পালনের জন্য উপযুক্ত জমি সকল সময় পাওয়া যায় না। সেইক্ষেত্রে খাঁচার মধ্যে মুরগী রাখিয়া নিবিড় পদ্ধতিতে মুরগী পালন করা যায়। এই পদ্ধতিতে এক একটি ছোট খাঁচায় একটি করিয়া মুরগী রাখা হয় এবং বাক্সের উপর বাক্স দুই-তিনটি সারিতে রাখা হয় (চিত্র 19)।



চিত্র 19 : মুরগীর ব্যাটারী খাঁচা

খাঁচার মেঝে প্রায় 16 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট হয় এবং উচ্চতা হয় 17 ইঞ্চি। খাঁচার মেঝেতে মজবুত তারের জাল সামনের দিকে ঢালু করিয়া লাগান থাকে এবং সামনে জালটি 6 ইঞ্চি বাহির হইয়া থাকে। মুরগী খাঁচার

ভিতর ডিম পারিলে সহজেই গড়াইয়া বাহিরে আসে। খাঁচার তলদেশে টিন বা কাঠ পাতা থাকে, ফলে জালের মধ্য দিয়া বিষ্ঠা ঐ অংশে পড়ে। খাঁচার সামনে খাদ্যের পাত্র ও তাহার উপর জলের পাত্র ফ্রেমের সহিত আটকানো থাকে। খাঁচার সামনে একটি জালের ছোট দরজা থাকে।

খাঁচাটি লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম দ্বারা তৈয়ারি করা ভাল, তাহা হইলে পোকার উপদ্রব হয় না এবং কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতে অসুবিধা হয় না। আলোকযুক্ত যায়গায় এবং উপযুক্ত বাতাস চলাচল করিতে পারে এমন জায়গায় খাঁচাগুলি রাখা হয়। খাঁচার মধ্যে পরিচর্যা ভাল হয় এবং ডিম অপচয় হয় না। কিন্তু মুরগীর কোন শারীরিক পরিশ্রম না হওয়ায় মেদবহুল হইয়া পড়ে ফলে তাড়াতাড়ি ডিম পাড়া বন্ধ করে।

খাঁচার মধ্যে উপযুক্ত খাদ্যের সরবরাহ থাকা উচিত, খাদ্যে ভিটামিন A, D, কডলিভার তৈল, ঈষ্ট, গুঁড়া দুধ থাকা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে শামুক, ঝিনুকের খোলক, কাঁচা টাটকা শাকসব্জী, মাছের গুঁড়া খাদ্যের সহিত দেওয়া হয়। এই ঘরের মুরগী কখনও নিষিক্ত ডিম পাড়ে না, ফলে বাচ্চা ফুটাইবার কাজে ব্যবহার করা যায় না। তবে অনিষিক্ত বা খাওয়া ডিমকে বেশীদিন সংরক্ষণ করা যায়।

3. জালের বা জাফরির উঁচু মেঝের উপর মুরগী পালন :

মাচার উপর মুরগী চাষেরও প্রচলন আছে। মেঝে সম্পূর্ণ জালের তৈয়ারী হয়। এই মেঝে মাটি হইতে প্রায় তিন-চার ফুট উঁচুতে থাকে। এই জালের মেঝে মোটা তার ঝালাই দিয়া তৈয়ারি করা হয়। মাচার নীচে আড়াই ফুট অন্তর কাঠের খুঁটি দেওয়া থাকে যাহাতে জালের মেঝে নিচের দিকে ঝুলিয়া না পড়ে। জালের পরিবর্তে 2 × 1 ইঞ্চি কাঠ এক ইঞ্চি অন্তর ফ্রেমের উপর লাগাইয়া মেঝে তৈয়ারি করা হয়। বাহির হইতে খাদ্য ও জল দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। জালের মধ্য দিয়া মলমূত্র মাটিতে পড়ে। মলমূত্র নোংরা ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত।

পোলট্রি ফার্মের স্থান নির্বাচন (Selection of place for Poultry farm)

পোলট্রি ফার্মের স্থান নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে মুরগীরা যেন খুব স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত বড় জায়গা বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন। পোলট্রি ফার্মের জমি যেন উঁচু ও শুষ্ক হয়, বর্ষাকালে

যেন জমিতে জল না জমে সেইভাবে জমি নির্বাচন করা উচিত। ঈষৎ ঢালু জমি পোলট্রি ফার্ম স্থাপনের বিশেষ উপযোগী। বাসস্থানে গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা ও শীতকালে গরম থাকা আবশ্যক। মুরগীর ঘরে যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারে এবং বাতাস চলাচল করে সেইভাবে স্থান নির্বাচন করা উচিত। বাসস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব দিক খোলা থাকা প্রয়োজন।

মুরগীর বাসস্থানের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মুরগীর বাসস্থানের চারিপার্শ্বে গাছ লাগাইয়া পরিবেশকে শীতল করিতে হইবে। মুরগীর জন্য যদি বিচরণক্ষেত্র রাখা হয়, তবে বিচরণক্ষেত্রের মাঝে মাঝে বড় গাছ থাকা প্রয়োজন যাহাতে মুরগীরা প্রয়োজনে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারে।

বিশেষতঃ অনুর্বর অঞ্চলে যেখানে চাষ করা সম্ভব হয় না, সেই সকল পতিত জমি কমমূল্যে ক্রয় করিয়া স্বাধীন বিচরণ পদ্ধতিতে মুরগীর চাষ অর্থাৎ পোলট্রি ফার্ম করা যাইতে পারে। অল্প মূলধনেই এই ফার্ম নির্মাণ করিতে পারিলে ইহা একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হইবে।

মুরগীর বাসগৃহ (Nests) ঃ

মুরগীর রাত্রিবাসের জন্য নানা আকারের ঘর নির্মাণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থের বাড়ীর মুরগী দিনের বেলায় মাঠে, খোলা উঠানে, বাগানে চরিয়া বেড়ায় এবং রাত্রে বাড়ীতে কোন নির্জন স্থানে আশ্রয় লয়। ফলে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। চাষের পদ্ধতি, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং মুরগীর জাতের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন ধরনের বাসগৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

আদর্শ বাসগৃহ নির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলি লক্ষ্য করা উচিত।

(i) মুরগীর সংখ্যার অনুপাতে ঘরের আকৃতি নির্ভর করে। একটি মুরগীর জন্য অন্ততঃ 4 বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন। এক একটি ঘরে 15 হইতে 25টির বেশী মুরগী রাখা উচিত নয়, খুব বড় ঘরে 150টি পর্যন্ত মুরগী একসঙ্গে রাখা যাইতে পারে। খুব লম্বা ঘরকে 20 ফুট অন্তর প্রাচীর তুলিয়া ছোট ছোট খোপে ভাগ করা হয় এবং প্রতি খোপে মুরগী রাখা হয়।

(ii) গ্রীষ্মকালে ঘর ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য প্রয়োজনে ঘরের ছাউনির

উপর খড় বিছাইয়া দিতে হইবে। জানালাতে ভিজা চট বা খসখস টাঙাইতে হইবে।

(iii) ঘর সর্বদা উঁচু মাটির উপর নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে বর্ষায় জল না জমে।

ঘর প্রতি মুরগীর সংখ্যা	ঘরের ক্ষেত্রফল		মাথাপিছু মুরগীর স্থান (বর্গফুট হিসাবে)	
	হাল্কাজাত	ভারীজাত	হাল্কাজাত	ভারীজাত
25	88	100	$3\frac{1}{2}$	4
100	300	350	3	$3\frac{1}{2}$
200	500	600	$2\frac{1}{2}$	3
500	1000	1250	2	$2\frac{1}{2}$

(iv) ক্ষতিকারক প্রাণী যাহাতে অনিষ্ট না করে সেইভাবে বাসগৃহকে সুরক্ষিত করিতে হইবে।

(v) উষ্ণতা ও পশ্চিমী বাতাসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দরজা, জানালা সবসময় পূর্বদিকে ও দক্ষিণদিকে রাখা হয়।

(vi) বাসগৃহ এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে ঘর সহজেই পরিষ্কার করা যায় এবং স্প্রে করিয়া ঘর জীবাণুমুক্ত করা যায়।

বড় স্থায়ী দোচালা ঘর ঃ ইহা ছোট দোচালা ত্রিভুজ ঘরের মতো, কিন্তু একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করা যায় না। এই দোচালা ঘরের মধ্যে খাদ্যের ও জলের পাত্র রাখা হয়।

ঢালু ছাদযুক্ত ঘর ঃ দেওয়ালের উপর ঢালু ছাদ ঢালাই করা হয়। এই প্রকার ছাদ নির্মাণে খরচা বেশী পড়ে। এই প্রকার ঘর এক জায়গায় স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা যায় অথবা ছোট আকৃতির ঘর তৈয়ারি করিয়া একস্থান হইতে অন্যত্র সরানো যায়।

ইহা ছাড়াও কম্বিনেশন টাইপ, মণিটার অথবা সেমি মণিটার টাইপ ঘর আছে।

চালা ঘর ঃ যে কোন প্রকার আবহাওয়াতে এই প্রকার ঘর উপযুক্ত। ইহার ছাদ খড়, টালি, অ্যাসবেস্টস, টিন, এমনকি সিমেন্ট দ্বারা ঢালাই করিয়া তৈয়ারি করা যাইতে পারে। এইপ্রকার ঘর খুব হাল্কা, ছোট ও

মজবুত। ইহাকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সহজেই সরানো যায়। এই প্রকার ঘর দেখিতে কতকটা পিরামিডের মতো। সীমাবদ্ধ জমি ঘিরিয়া মুরগী পালন করিতে হইলে ছোট ছোট পিরামিডাকৃতি দোচালা ত্রিভুজ ঘর তৈয়ারি করা হয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং উচ্চতা যথাক্রমে 8 ফুট, 6 ফুট 5 ফুট বিশিষ্ট দোচালা ত্রিভুজ ঘরে 16টি মুরগী অনায়াসে রাখা যায়।

কাঠ বা লোহার ফ্রেম করিয়া অ্যাসবেস্টস বা করোগেটেড টিন দ্বারা ছাউনি দিয়া দোচালা ঘর তৈয়ারি করা হয়। ঘরের সামনে, পিছনে ও মেঝেতে $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ফাঁক বিশিষ্ট তারের জাল থাকে। মুরগী বসিবার জন্য মেঝেতে প্রায় 1 ফুট উঁচুতে 2 ইঞ্চি চওড়া কাঠের দাঁড় রাখা হয়। মুরগী সাধারণতঃ রাত্রে এই দাঁড়ের উপর বসিয়া থাকে।

মুরগীর খোঁয়াড়ের সাজসরঞ্জাম ঃ

পোলট্রি ফার্ম করিতে হইলে মুরগীর খাদ্যের পাত্র, জলের পাত্র, ডিম পাড়ার ফাঁদ বাক্স, দাঁড় ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সরঞ্জাম আবশ্যক।

(i) **মুরগীর বাসগৃহে দাঁড় ঃ** মুরগীর 8 সপ্তাহ হইলেই দাঁড়ে বসা পছন্দ করে। দাঁড়ের উপর মুরগী বসিলে পা, দেহ, পালক ইত্যাদি পরিষ্কার থাকে। ঘরের মেঝে হইতে প্রায় 18 ইঞ্চি উপরে কাঠের সরু দাঁড় থাকে। দাঁড়গুলি বাহিরে আনিবার ব্যবস্থা থাকে, মাঝে মাঝে দাঁড়কে পরিষ্কার করা ও জীবাণুমুক্ত করা হয়। একটি দাঁড় হইতে অপর দাঁড়ের দূরত্ব এক ফুট হইবে। দাঁড়ে বসিবার জন্য প্রত্যেক মুরগীর 10 ইঞ্চি জায়গা প্রয়োজন। মুরগীর সংখ্যা অনুযায়ী দাঁড়ের দৈর্ঘ্য করা হয়।

(ii) **খাদ্যের পাত্র বা হপার ঃ** মুরগী ও বাচ্চাদের খাদ্য দেওয়ার জন্য হপার দেওয়া হয়। মাটিতে খাবার দিলে খাদ্যের অপচয় হয়। মুরগী খাদ্য হপারে দিলে মুরগীদের খাদ্যসংগ্রহে সুবিধা হয়। একটি হপারের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ এক ফুট হয় এবং একটি হপারে চারিটি মুরগীর খাইবার ব্যবস্থা থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি মুরগীর জন্য তিন ইঞ্চি জায়গার প্রয়োজন হয়। মুরগীর সংখ্যা অনুযায়ী হপারের সংখ্যা বা দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। হপারগুলি সাধারণতঃ 10 ইঞ্চি চওড়া ও 6 ইঞ্চি গভীরতা বিশিষ্ট হয়।

বিভিন্ন পোলট্রিতে নানাধরণের হপার ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় হপারে খাদ্য দেওয়া হয়। মুরগী খাইতে শুরু করিলে খাদ্য পড়িতে আরম্ভ করে।

(iii) **পানীয় জলের পাত্র :** মুরগীর জন্য পরিস্রুত জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে নচেৎ নিম্নমানের ডিম পাওয়া যাইবে। মুরগীর জন্য বিশেষ জলপাত্রের ব্যবস্থা করিতে হয়, যাহাতে পাত্রে ময়লা না পড়ে। সর্বদা জলের পাত্র পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন, ইহাতে মুরগী রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। জলের পাত্র মুরগী নোংরা করে সেইজন্য **ফোয়ারা জলপাত্র** ব্যবহার করা হয়। প্রতি একশত মুরগীর জন্য প্রতিদিন 15-30 লিটার জলের প্রয়োজন। ডিমপাড়া মুরগী বেশী জলপান করে, সেক্ষেত্রে 50 লিটার জলের প্রয়োজন হয়।

(iv) **কাঁকর, চূণাপাথর ও শামুক-ঝিনুকের খোলক রাখিবার পাত্র :**

মুরগীর উত্তম পরিপাকের জন্য নিয়মিত কাঁকড়ের টুকরা পরিবেশন করা হয়। শামুক, ঝিনুকের খোলক, চূণাপাথর, ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ করে। স্বয়ংক্রিয় হপারে পৃথকভাবে কাঁকর ও খোলক রাখা হয়।

(v) **বালির পাত্র :** মুরগীরা গায়ে বালি মাখে, ইহাকে বালিস্নান বলে। মুরগীরা এইভাবে গা পরিষ্কার করে। গায়ে উকুন বা পোকা থাকিতে পারে না। খোঁয়ারের কাছে পৃথক পাত্রে বালির পরিবর্তে কয়লা বা ঘুঁটের ছাই রাখা যায়। বালি বা ছাইএর সঙ্গে সালফারের গুঁড়া ও তামাক পাতার গুঁড়া মিশাইয়া দেওয়া ভাল। ইহাতে মুরগীর ত্বকে কোন ক্ষত হয় না বা ত্বকে পরজীবী আক্রমণের ভয় থাকে না।

(vi) **ডিম পাড়ার বাক্স :** ডিমপাড়ার বাক্স খোঁয়াড়ের এমন জায়গায় রাখা হয় যাহাতে সহজেই ডিম সংগ্রহ করা যায়। ডিম পাড়ার বাক্স এমন হয় যাহাতে সহজে বাতাস চলাচল করিতে পারে। যেখানে শুধু ডিম উৎপাদন করা হয় তাহাকে **পেন বাক্স** এবং যেখানে বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ডিম সংগ্রহ করা হয় তাহাকে **ডিম পাড়ার ফাঁদ বাক্স** বলে।

প্রতি পাঁচ-ছয়টি মুরগীর জন্য একটি ডিম পাড়িবার বাক্সের প্রয়োজন। ডিম পাড়িবার বাক্স হিসাবে কাঠের বাক্স, মাটির হাঁড়ি, পুরাতন পাত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ডিম পাড়ার বাক্সের ভিতর অন্ধকার থাকে। এই বাক্সের দরজা এমনভাবে থাকে যে মুরগী দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিলে দরজা বন্ধ হইয়া যায়। মুরগীপালক দরজা খুলিয়া মুরগী বাহির করিয়া ডিম সংগ্রহ করে, ইহাতে কোন্ মুরগী ডিম পাড়ে সংগ্রাহক তাহা জানিতে

পারে। ডিম পাড়িবার বাক্সে বালি, খড়কুটা বিছাইয়া দিলে মুরগী তাহাতে স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ে এবং ডিম আঘাতে নষ্ট হয় না।

মুরগীর খাদ্য (Food)

মুরগীকে ঠিকমত খাদ্য ও পানীয় দেওয়া মুরগীপালকের সবচেয়ে বড় কাজ। খাদ্য দেওয়ার উপর মুরগীর দেহের বৃদ্ধি ও ডিম পাড়ার ক্ষমতা নির্ভর করে। মুরগীকে ঠিকমত সুষম খাদ্য সরবরাহ করিলে মুরগীর স্বাস্থ্য বজায় থাকে এবং নীরোগ থাকে। শর্করা, চর্বি, প্রোটিন খাদ্য, লবণ, ভিটামিন, সবুজ টাটকা সব্জী ইত্যাদি মুরগীকে খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয়। আজকাল মুরগীর খাদ্য ম্যাশ বাজারে পাওয়া যায়। ম্যাশে গমের ভুষি, ধান, চাল, ভুট্টা, চালের ক্ষুদ, ধানের তুষ, চিটে গুড়, তরকারীর খোসা সিদ্ধ, ডাল চূর্ণ, খইল, সিদ্ধ মাছ, মাংস, শুকনা মাছ, গুঁড়া দুধ, কলমী, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ টুকরা, সজিনা, নিম ইত্যাদির কচি পাতা, ইষ্ট, শার্কলিভার তৈল ও পেনিসিলিনের পরিত্যক্ত অংশ ইত্যাদি থাকে। প্রসবী মুরগীদের ভূষি জাতীয় খাদ্য কম দিতে হয়। ইহাদের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকা প্রয়োজন। এই খাদ্যে ভিটামিন এ, ডি, সি, অজৈব খনিজ পদার্থ ইত্যাদি থাকে। ছকের মাধ্যমে মুরগীর ক্ষেত্রে খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদান, কার্য এবং খাদ্যের প্রধান উৎস আলোচিত হইল।

মুরগীর ক্ষেত্রে খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদানের কার্যাবলী ও উৎস

খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদান	কার্য	খাদ্যের প্রধান উৎস
(i) জল	পরিপাক, খাদ্যবস্তু ও দূষিত পদার্থের বাহক, শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।	জল, দুগ্ধ, কচি সবুজ ঘাস, শাকসব্জী।
(ii) শর্করা	তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে।	খাদ্যশস্য এবং খাদ্যশস্যের উপজাত কণা।
(iii) চর্বি	তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে।	ঐ

খাদ্যের পুষ্টিকর উৎপাদন	কার্য	খাদ্যের প্রধান উৎস
(iv) প্রোটিন	দৈহিক বৃদ্ধি ও পেশীর ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ, ডিম গঠন, শক্তির উৎপাদন।	শুকনো মাছের গুঁড়া, মাংসের টুকরা, সিদ্ধ দুধ, সয়াবীন চূর্ণ, ভুট্টা, তুলা-বীজ চূর্ণ ও খইল ইত্যাদি।
(v) খনিজ পদার্থ	অস্থিগঠন, ডিম উৎপাদন, ডিমের শক্ত খোলক গঠন।	শুকনো মাছের গুঁড়া, মাংসের টুকরা, দুধ, হাড়ের গুঁড়া, শামুক ও ঝিনুকের খোলক চূর্ণ, চুণাপাথর ও লবণ।
(vi) ভিটামিন A	বৃদ্ধি ও অপুষ্টিজনিত ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করে।	শুকনো লুসার্ণ চুর্ণ, সবুজ ঘাস, ভুট্টা চূর্ণ, যকৃত তৈল ইত্যাদি।
(vii) থায়ামিন (B_1)	স্নায়ুবৈকল্য দূর করা, ক্ষুধা বৃদ্ধি, পরিপাক ক্রিয়ার উন্নতি।	ঘাস, দানাশস্য, গমের ভূষি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, আলফা আলফা চূর্ণ।
(viii) ভিটামিন D	ডিম হইতে বাচ্চা উৎপাদনের হার এবং ডিম উৎপাদনের সংখ্যা ও গুণগত মান বৃদ্ধি, রিকেট প্রতিরোধ, ডিমের খোলক শক্ত করা।	ঈষ্ট, অতিবেগুনী রশ্মি, হাঙরের যকৃতের তৈল, সূর্যালোক।
(ix) ভিটামিন E	জননতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি।	ঘাস, দানাশস্য, ভূষি, আলফা আলফা।
(x) রাইবো-ফ্লেবিন (B_2)	ডিম হইতে বাচ্চা উৎপাদনের হার এবং ডিম উৎপাদনের সংখ্যা ও গুণগত মান বৃদ্ধি।	ঘাস, লুসার্ণ চূর্ণ, শুকনো মাছের গুঁড়া, দুধের উপ-জাত দ্রব্য, ঈষ্ট প্রভৃতি।

খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদান	কার্য	খাদ্যের প্রধান উৎস
(xi) প্যান্টো-থেনিক অ্যাসিড	ডিমের গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, চর্মরোগ প্রতিরোধ, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি।	ঐ
(xii) কোলিন	বৃদ্ধি, অস্থি গঠন, ডিম উৎপাদন ইত্যাদি।	দানাশস্য, গমের ভূষি, সয়াবীন চূর্ণ, মাছের গুঁড়া, মাংসের টুকরা, দুধের উপজাত দ্রব্য।
(xiii) ভিটামিন B_{12}	বৃদ্ধি ও ডিম হইতে বাচ্চার উৎপাদনে ক্ষমতা বৃদ্ধি।	মাছের গুঁড়া, লিটার, দুধ ইত্যাদি।

মুরগীর শর্করা জাতীয় খাদ্য :

মুরগীর খাদ্যের শতকরা 75-80 ভাগই শর্করা জাতীয় খাদ্য। এই জাতীয় খাদ্য দামে অপেক্ষাকৃত সস্তা। দেহের যাবতীয় শক্তি শর্করা খাদ্য হইতে সংগৃহীত হয়। সকল প্রকার দানাশস্যকে শর্করা খাদ্য বলে। নিম্নে কয়েকটি শর্করা প্রধান খাদ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

(i) **ভুট্টা :** ভুট্টার শক্তি সরবরাহ করিবার ক্ষমতা বেশী। ইহাতে সেলুলোজ, প্রোটিন কম থাকিলেও শর্করা ও চর্বি জাতীয় উপাদানে পরিপূর্ণ থাকে। হলুদ ভুট্টাই মুরগীর খাদ্যে বেশী ব্যবহার করা হয়। কারন ইহাতে ভিটামিন 'A' বেশী থাকে এবং ইহার হলুদ বর্ণ ডিমের হলুদ বর্ণকে ঠিক রাখিতে সাহায্য করে। সাদা ভুট্টায় ভিটামিন 'A' থাকে না।

(ii) **যব :** অন্যান্য দানাশস্যের সঙ্গে যব মিশাইয়া মুরগীর খাদ্য তৈয়ারি করা যাইতে পারে। যবে ভিটামিন 'A' থাকে না, সেইজন্য যবমিশ্রিত খাদ্যে ভিটামিন 'A' যোগ করিতে হয়। যবমিশ্রিত খাদ্য দিলে পাখীর ঠোকরানো ও পালক মোটা রোগ হয় না।

(iii) **যই :** মুরগীর রেশন তৈয়ারি করিতে যই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত

হয়। এই ষইতে প্রোটিন ও ম্যাংগানিজ থাকে। ষইমিশ্রিত খাদ্য খাওয়াইলে অন্য পাখীর পালক খোঁটা বা ঠোকরানো রোগ হয় না।

(iv) **চাউল ও চাউলের কুঁড়া:** চাউলে প্রোটিনের পরিমাণ কম থাকে, শর্করার পরিমাণ থাকে বেশী।

ধানের কুঁড়া বলিতে আমরা চালের সূক্ষ্ম খোসাকে বুঝি। চাউলকে ভালভাবে ছাঁটিলে সূক্ষ্ম কুঁড়া পাওয়া যায়। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, ফ্যাট ও প্রোটিন থাকে। চালের কুঁড়া টাটকা হইলে মুরগীর খাদ্যে ইহার পরিমাণ শতকরা 50 ভাগ দেওয়া যাইতে পারে।

(v) **জোয়ার:** ভুট্টার চেয়ে জোয়ারে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী থাকে। শর্করা খাদ্যের উপাদান হিসাবে জোয়ার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(vi) **ঝোলাগুড়:** চিনিকলের উপজাত হিসাবে ঝোলাগুড় পাওয়া যায়। মুরগীর খাদ্যে শতকরা 10 ভাগ ঝোলাগুড় মিশ্রিত করা যায়। ঝোলাগুড়ে পটাসিয়াম, প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড, রাইবোফ্লেবিন, নিয়াসিন ও কোলিন থাকে।

(vii) **গমের ভুষি:** গমের ভুষি মুরগীর খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। ভুষির মধ্যে ভিটামিন B, E, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আছে। ইহা সহজপাচ্য ও মুখরোচক।

মুরগীর প্রোটিন জাতীয় খাদ্য:

খইলের মধ্যে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পাওয়া যায়। খইলের মধ্যে বাদামের খইল, সরিষার খইল, তিল খইল, তিসির খইল, তুলাবীজের খইল, নারিকেলের খইল, রেপসীডের খইল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ পিষিয়া তৈল বাহির করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে **খইল** বলে। বিভিন্ন খইলে শতকরা 19 হইতে 40 ভাগ প্রোটিন থাকে। মুরগীর খাবারে খইল মিশাইলে উহাদের বৃদ্ধি ভাল হয় এবং ডিম উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বাদামের খইলে 46·3% প্রোটিন, 8% স্নেহপদার্থ, অল্প পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি থাকে। সরিষার খইল পশুখাদ্য হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয়। মুরগীর খাদ্যে শতকরা 5 হইতে 10 ভাগ সরিষার খইল

ব্যবহার করা হয়। মুরগীর খাদ্যে বাদাম ও তিল খইল সমপরিমাণে মিশান হয়। তুলাবীজের এবং তিসির খইল ব্যবহার করা উচিত নয়। সয়াবীন চূর্ণও মুরগীর খাদ্যের একটি প্রধান প্রোটিন খাদ্য উপাদান। ভাটিখানার উপজাত হিসাবে **ঈষ্ট** উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের ভাল উৎস। রাইবোফ্লেবিন, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, কোলিন, থায়ামিন ঈষ্টের মধ্যে থাকে, ফলে ঈষ্ট মিশ্রিত খাদ্য খাওয়াইলে মুরগীর বৃদ্ধি ভাল হয় এবং ডিম পাড়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মুরগীর খাদ্যে শতকরা 5 ভাগ পেনিসিলিয়াম মাইসিলিয়ামের চূর্ণ ব্যবহার করিলে খাদ্যের গুণাগুণ অনেক উন্নত হয়।

শুষ্ক রক্ত চূর্ণ, শুকনা মাছের গুঁড়া, মাংসের অবশিষ্টাংশ, দুগ্ধের উপাজাত বস্তু, হাঁস মুরগীর ডিম ফোটানোর পর ডিমের খোলার অবশিষ্টাংশ, রেশম ফ্যাক্টরীর অবশিষ্টাংশ ও মুরগীর খামারের বিভিন্ন উপজাত বস্তু খাদ্য হিসাবে মুরগীকে দেওয়া হয়।

শুকনা রক্তচূর্ণের মধ্যে শতকরা 75 ভাগ প্রোটিন থাকে। মাছের গুঁড়াতে শতকরা 50-55 ভাগ প্রোটিন থাকে। মাছের গুঁড়া একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যবস্তু, ইহাতে ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন B_{12}, রাইবোফ্লেবিন থাকে। মাছের গুঁড়াতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, ফসফরাস থাকে। মুরগীর খাদ্যে শতকরা 5 ভাগ মাছের গুঁড়া থাকা প্রয়োজন।

মাংসের অবশিষ্টাংশে শতকরা 55 ভাগ প্রোটিন থাকে। ছাগল, গরু, ভেড়া, মহিষের অন্ত্র, চামড়া প্রভৃতি শুকাইয়া মাংসের গুঁড়া তৈয়ারি করা হয়। পশুর হাড়, শিং, ক্ষুর ইত্যাদি চূর্ণ করিয়া হাড়ের গুঁড়া তৈয়ারি করা হয়। মাংসের অবশিষ্টাংশ ও হাড়ের গুঁড়াতে শতকরা 4 ভাগ খনিজ লবণ থাকে। হাড়ের গুঁড়াতে ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম থাকে।

দুগ্ধ উপজাতের মধ্যে লস্যি, ছানার জল, গুঁড়া দুধ খাওয়ানো যাইতে পারে। মুরগীর খাদ্যে চা-খড়ি, চুণাপাথর, ঝিনুক, শামুকের খোলা, ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট, রক ফসফেট ও সুপার ফসফেট যোগ করা হয়। বর্তমানে বাজারে খনিজ পদার্থের মিশ্রণ পাওয়া যায়।

অ্যান্টি বায়োটিক্স (Antibiotics) :

অ্যান্টিবায়োটিক্সের মধ্যে অরোমাইসিন, টেরামাইসিন, পেনিসিলিন, ব্যাসিট্রেসিন, ক্লোরোমাইসিটিন, স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মুরগীর বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য এই ঔষধগুলির যে কোন একটি বা দুইটি মুরগীর

খাদ্যের সহিত স্বল্প পরিমাণে মিশাইয়া দেওয়া হয়। জীবাণুঘটিত বা ভাইরাস ঘটিত রোগ নিরাময়ের জন্য এই ঔষধগুলি বেশী মাত্রায় খাওয়ানো হয়। এক মেট্রিক টন মুরগীর খাদ্যের সহিত 5 গ্রাম প্রোকেইন পেনিসিলিন মিশাইয়া খাওয়াইলে বাচ্চাদের বৃদ্ধির হার শতকরা 10 হইতে 15 ভাগ বৃদ্ধি পায়।

ব্রয়লার মুরগীর প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান ঃ

কেবলমাত্র মাংস উৎপাদনের জন্য যে মুরগীর চাষ করা হয়, তাহাকে **ব্রয়লার** (Broiler) বলে। ডিমপাড়া মুরগী অপেক্ষা ব্রয়লার মুরগী পালন অনেক সহজ। 10 হইতে 12 সপ্তাহের বাচ্চাকে বিক্রয় করা হয়।

ব্রয়লার মুরগীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের তালিকা

	খাদ্য উপাদান		0-6 সপ্তাহ ব্রয়লার বাচ্চার খাদ্য	6 সপ্তাহ বয়সের পর ব্রয়লার বাচ্চার খাদ্য
(1)	অশোধিত প্রোটিন (শতকরা ওজন)		22	19
(2)	অশোধিত অংশ (crude fibre)	"	6	6
(3)	খনিজ পদার্থ	"	10	10
(4)	অ্যাসিডে অদ্রবীভূত খনিজ পদার্থ	"	3·5	3·5
(5)	ক্যালসিয়াম	"	1·0	1·0
(6)	ফসফরাস	"	0·8	0·8
(7)	ম্যাঙ্গানিজ (মি.গ্রা. প্রতি কিলোগ্রামে)		60	60
(8)	লৌহ	"	40	40
(9)	তামা	"	4	4
(10)	আয়োডিন (মি.গ্রা. প্রতি কিলোগ্রামে)		1·0	1·0
(11)	দস্তা	"	4	4
(12)	ভিটামিন B_{12}	"	0·01	0 01
(13)	বায়োটিন	"	40	40
(14)	প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড	"	12	12

খাদ্য উৎপাদন	0-6 সপ্তাহ বয়লার বাচ্চার খাদ্য	6 সপ্তাহ বয়সের পর বয়লার বাচ্চার খাদ্য
(15) রাইবোফ্লেবিন (মি.গ্রা. প্রতি কিলোগ্রামে)	5	5
(16) থায়ামিন ”	6	6
(17) ভিটামিন A (I. U/কিলোগ্রাম)	6,000	6,000
(18) ভিটামিন D_3 (”)	600	600
(19) ভিটামিন E (মি.গ্রা. প্রতি কিলোগ্রামে)	20	20

বিভিন্ন বয়সের মুরগীর খাদ্য (শতকরা হিসাবে)

খাদ্য	বাচ্চা 0-8 সপ্তাহ	8 সপ্তাহ	ব্রয়লার 0-6 সপ্তাহ	ব্রয়লার 6-10 সপ্তাহ	ডিমপাড়া মুরগী
(i) প্রোটিন (উদ্ভিজ্জ)	30	16	22	22	15
(ii) প্রোটিন (প্রাণিজ)	5	5	10	5	3
(iii) দানাশস্য চাল, ধান, ভুট্টা, জোয়ার, কুঁড়া	46	50	58	64	54
(iv) বার্লি, গমের ভূষি, কুঁড়া	10	18	—	—	17
(v) চুণাপাথর, ফসফেট, ম্যাঙ্গানিজ, হাড় গুঁড়া, লবণ, ট্রেসএলিমেন্ট	3	4	3	3	5
(vi) ঈষ্ট, অ্যান্টিবায়োটিক্স, ঝোলাগুড়, বারসীম, লুসার্ণ পাতাচূর্ণ, সিম্থেটিক ভিটামিন	6	6	7	6	6

মুরগী হইতে ভাল সংখ্যক ডিম উৎপাদন করিতে হইলে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। নিচের সারণীতে খাদ্যের উপর ডিম উৎপাদনের মাত্রা কিভাবে নির্ভর করে তাহা দেখান হইয়াছে।

বাৎসরিক ডিম উৎপাদন	শরীর রক্ষার জন্য বাৎসরিক খাদ্য পাউণ্ডে	ডিমের জন্য বাৎসরিক খাদ্য পাউণ্ডে	খাদ্যের মোট পরিমাণ পাউণ্ডে	প্রতি ওজনের অনুপাত পাউণ্ডে
80	64·00	7·14	71·14	10·67
120	64·00	10·69	74·69	7·47
160	64·00	14·24	78·24	5·87
200	64·00	17·81	81·81	4·91

এই সারণীতে দেখা যাইতেছে ডিম উৎপাদনের জন্য ও শরীর রক্ষার জন্য বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

মুরগীকে একই সঙ্গে দানাশস্য ও গুঁড়াখাদ্য খাওয়ানো হয়। এই পদ্ধতিতে মুরগীকে বিভিন্ন অনুপাতে দানাশস্য ও গুঁড়া-খাদ্য দেওয়া হয়। বাড়ন্ত বাচ্চাকে প্রথম কয়েক সপ্তাহ শুধুমাত্র গুঁড়া খাদ্য খাওয়ানো হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়া খাদ্য ও দানাশস্যের খাদ্য বিভিন্ন অনুপাতে মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হয়। কি অনুপাতে খাদ্য দেওয়া হইবে তাহার একটি সারণি নিচে দেওয়া হইল।

মুরগীর বয়স (প্রতি সপ্তাহে)	6	8	10	12	14	16	18	20
দানাশস্যের পরিমাণ (শতকরা হিসাবে)	5	10	20	30	40	50	60	70
গুঁড়া খাদ্যের পরিমাণ (শতকরা হিসাবে)	95	90	80	70	60	50	40	30

মুরগীর ডিমপাড়া, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, নীরোগ থাকা ইত্যাদি সকল কিছুই নির্ভর করে মুরগীর খাদ্যের পরিমাণ, গুণগত মাণ এবং খাদ্যে সকল কিছু প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানের উপর।

মুরগীর রোগ ব্যাধি—প্রতিরোধ ও চিকিৎসা
(Diseases of fowl—prevention and treatment)

মুরগী পালনের একটি প্রধান সমস্যা ইহাদের বিভিন্ন রোগ। বিভিন্ন রোগে প্রতি বছর পোলট্রি ফার্মের অনেক মুরগী মারা যায়, ফলে আর্থিক ক্ষতি হয়। তাহাছাড়া বাকী মুরগী রোগাক্রান্ত হয় এবং তাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না। এই সকল মুরগীর ডিম ভাল হয় না, ডিম উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস পায়। মুরগীর কতকগুলি রোগ আছে, যাহা দ্রুত ছড়াইয়া দুই-তিনদিনের মধ্যে অনেক মুরগীকে মারিয়া ফেলে।

দূষিত খাদ্য, জল, মাটির সংস্পর্শে সাধারণতঃ মুরগী রোগাক্রান্ত হয়। পোলট্রির অপরিষ্কার সরঞ্জাম, মাছি বা অন্যান্য পতঙ্গ রোগ সৃষ্টিতে এবং বিস্তারের সাহায্য করে। নিম্নলিখিতভাবে রোগগুলি আলোচনা করা যাইতে পারে।

(A) **অসংক্রামক রোগ** (Non-infectious disease) ঃ

(i) **খাদ্যের অভাবজনিত রোগ ঃ** অনেক সময় উপযুক্ত খাদ্য ও ভিটামিনের অভাবে মুরগীর দেহের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, ডিম উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। যেমন ভিটামিনের অভাবে বাচ্চা দুর্বল হয়। খাদ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব হইলে রিকেট্স রোগ হয় ও ডিমপাড়া মুরগীর ডিমের খোলা পাতলা হইয়া যায়।

(ii) **বদ অভ্যাসজনিত রোগ ঃ** রাক্ষুসে প্রবৃত্তি, পালক খোঁটা ইত্যাদি বদঅভ্যাসজনিত রোগ।

(iii) **পালনের দোষজনিত রোগ ঃ** মুরগীকে অসমতল মেঝেতে রাখিলে মুরগীর পায়ের তলায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

(iv) **প্রজনন সংক্রান্ত রোগ ঃ** অনেক সময় জরায়ুতে ডিম আটকাইয়া মুরগী রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

(B) **সংক্রামক রোগ** (Infectious disease) ঃ

ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, ক্রিমি, ইত্যাদি সংক্রামক রোগের সৃষ্টি করে। রোগাক্রান্ত পাখী হইতে সুস্থ পাখী রোগাক্রান্ত হইতে পারে। এই জাতীয় রোগকে সংক্রামক রোগ বলা হয়। মুরগীর নিম্নলিখিত সংক্রামক রোগগুলি প্রধানতঃ দেখা যায়।

(i) **ব্যাক্টিরিয়াজনিত রোগ ঃ** ফাউল কলেরা, ক্ষয়রোগ, ব্যাসিলারি হোয়াইট ডায়েরিয়া সংক্রামক সাদা উদরাময়।

(ii) **প্রাণীজাতীয় রোগ ঃ** ককসিডিওসিস (Coccidiosis)।

(iii) **ভাইরাস ঘটিত রোগ ঃ** রাণীক্ষেত, ফাউল পক্স, পক্ষাঘাত ইত্যাদি।

(iv) **কৃমি রোগ ঃ** অন্ত্রে, কণ্ঠনালীতে কৃমি থাকে, গায়ে পোকা লাগিয়াও মুরগী রোগাক্রান্ত হইতে পারে।

ভাইরাস ঘটিত রোগ—রাণীক্ষেত (Ranikhet) or (New Castle) ঃ

ইহা একটি প্রধান ভাইরাস ঘটিত সংক্রামক রোগ। ভারতের উত্তরে 1927 সালে রাণীক্ষেতে এই রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব হয়। বর্তমানে রাণীক্ষেত রোগকে শ্বাসযন্ত্রের রোগের মধ্যে ধরা হয় বলিয়া **নিউমো এনকেফালাইটিস রোগ** বলে।

রোগের লক্ষণ ঃ মুরগীর বয়স অনুসারে এই রোগের বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। তিন-চার সপ্তাহ বয়সের বাচ্চাদের এই রোগ হইলে তাহদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। বাচ্চাটি হাঁ করিয়া প্রশ্বাস নিতে থাকে এবং দম বন্ধ হওয়ার মতো অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্বাস লইতে থাকে। রোগগ্রস্ত হইবার কয়েকদিনের মধ্যে বাচ্চা মুরগী ঘাড় ও মাথা ঘুরাইয়া চোখ আধবোজা অবস্থায় ঝিমাইতে থাকে। নাক, মুখ দিয়া লালা নির্গত হয়, আহার বন্ধ করে এবং হঠাৎ মরিয়া যায়। বেশী বয়সের মুরগীর রোগ যতই বাড়িতে থাকে স্নায়ুদৌর্বল্য দেখা যায়। রোগাক্রান্ত মুরগীর পা ও ডানায় পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা যায় এবং গলা ঝুলিয়া পরে ও পা অবশ হইয়া যায়। এই অবস্থায় খাদ্যনালী আক্রান্ত হয় এবং মল ঘন সাদা চুণের মতো সাদা মল ত্যাগ করে। অবশেষে চার-পাঁচদিনের মধ্যে মুরগী মারা যায়। বাচ্চাদের মধ্যে শতকরা 90 ভাগ এই রোগে মারা যায়।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ঃ

রাণীক্ষেত ভ্যাকসিন:প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সদ্যজাত বাচ্চাদের রাণীক্ষেত ভ্যাকসিন এবং 3 মাস পরে সাধারণ রাণীক্ষেত ভ্যাকসিন দিলে সারা জীবন রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। রাণীক্ষেত রোগে টেট্রাসাইক্লিন কিংবা 1 গ্রাম হস্টাসাইক্লিন পাউডার এক লিটার পানীয় জলে দ্রবীভূত করিয়া সেবন করাইলে উপকার পাওয়া যায়। পানীয় জলে

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশাইয়া পান করাইলে রোগের বিস্তার বন্ধ হয়। এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে একদিনের বাচ্চাকে রাণীক্ষেত একস্ট্রেইন নেজাল ভ্যাকসিন ড্রপারে লইয়া নাকের ছিদ্রে একফোঁটা দিতে হয়। বাচ্চা শ্বাস টানার সময় ভ্যাকসিন টানিয়া লয়।

বসন্ত রোগ (Pox)ঃ বসন্ত একটি ভাইরাস বাহিত ব্যাধি। বাচ্চা ও বয়স্ক পাখীর একটি সংক্রামক রোগ। বাচ্চাদের এই রোগ হইলে মারা যায়। বয়স্ক পাখীর চোখে ও কাছাকাছি ছোট ছোট ফুসকুড়ির মত দেখায়। মুরগীর মাথা, মুখ, ঝুঁটি, গলার ফুল ও দেহের যে সকল অংশে পালক থাকে সেখানে বসন্তের গুটি দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে মুরগীর ডিম পাড়ার হার কমিয়া যায়। শীতকালে মুরগীদের মধ্যে এই রোগ বেশী দেখা যায়। বয়স্ক মুরগী এই রোগে সাধারণতঃ মারা যায় না।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসাঃ ফাউল পক্স ভ্যাকসিন ও পিজিয়ন পক্স ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। 4-5 সপ্তাহের বাচ্চাকে ফাউল পক্স ভ্যাকসিন দিতে হয় এবং প্রতিবছর গ্রীষ্মকালের পূর্বে পুনরায় ঐ ভ্যাকসিন দিতে হইবে। সাধারণ পাখীর উরুর পালক তুলিয়া ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়।

নবজাত বাচ্চার এই ভ্যাকসিন সহ্য হয় না। তাই পায়রার বসন্তের ভ্যাকসিন অর্থাৎ পিজিয়ন পক্স ভ্যাকসিন যে কোন বয়সের মুরগীকে বৎসরের যে কোন সময়ে দেওয়া যাইতে পারে। রোগ দেখা দিলে গুটিগুলিতে টিংচার আয়োডিন লাগাইলে সুফল পাওয়া যায়। হস্টাসাইক্লিন পাউডার অর্ধগ্রাম, অর্ধলিটার জলে দ্রবীভূত করিয়া এক ঘণ্টা পর পর এক চামচ করিয়া খাওয়াইলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মারেকের রোগ (Marek's disease)ঃ

মারেকের রোগে মুরগীর স্নায়ু, চোখ, যকৃত, প্লীহা বা যে কোন অঙ্গ আক্রান্ত হইতে পারে এবং আক্রমণের অঙ্গ অনুযায়ী রোগকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(i) **প্যারালিটিক ফর্ম**ঃ ইহাকে ফাউল প্যারালিসিস বা পক্ষাঘাত নামে অভিহিত করা হয়। এই রোগে স্নায়ু আক্রান্ত হয়, বিশেষতঃ ডানা, পা ও ঘাড়ের শক্তি কমিয়া যায়। অসুস্থ মুরগী পা সামনে ছড়াইয়া শুইয়া থাকে বা ঘাড় মুড়িয়া শুইয়া থাকে এবং ডানা ঝুলিয়া পড়ে।

(ii) **অকুলার ফর্ম**ঃ ইহাতে চক্ষু আক্রান্ত হয়। এই রোগে চক্ষু

ঘোলাটে বা সাদা হয় এবং চোখের মণি কুঁচকাইয়া যায় এবং অবশেষে মুরগী দৃষ্টিশক্তি হারায়।

(iii) **টিউমার ফর্ম:** এই রোগে মুরগীর যকৃত, প্লীহা, বৃক্ক প্রধানতঃ আক্রান্ত হয়। যকৃত পাঁচ গুণ আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে পারে। যকৃতে সাদা সাদা গোল দাগ দেখা যায় এবং হৃদপিণ্ড, ডিম্বাশয়ের উপর দাগ পড়িতে পারে।

(iv) **অসটিওপেট্রোটিক ফর্ম:** এই রোগে প্রধানতঃ মুরগীর জঙ্ঘার অস্থি আক্রান্ত হয়, অস্থি মোটা হয়, মুরগী চলিতে পারে না।

(v) **লিউকেমিক ফর্ম:** এই রোগে মুরগীর রক্ত আক্রান্ত হয়, রক্ত তরল হয় এবং রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা: টার্কি পাখীর হার্পিস ভাইরাস দ্বারা তৈয়ারী মারেকের ভ্যাকসিন দ্বারা রোগ প্রতিরোধ করা হয়। এই ভ্যাকসিন ব্যবহারে শতকরা 70 ভাগ রোগ হ্রাস পায়। যে হ্যাচারি হইতে বাচ্চা ক্রয় করা হয়, সেখান হইতে **মারেকের রোগ** নাই এই মর্মে গ্যারান্টি লওয়া মুরগীপালকের স্বার্থেই প্রয়োজন।

এনকেফালোমাইলিটিস (Encephalomylitis)**:** এই রোগ স্নায়ু-তন্ত্রকে আক্রমণ করে, ফলে মুরগী হাঁটিতে পারে না। এই রোগের আক্রমণস্থল মস্তিষ্ক। রোগাক্রান্ত হইলে মস্তিষ্ক সুস্পষ্টভাবে কাঁপিতে থাকে। এই রোগ মুরগীর এক হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যে হয়।

প্রতিষেধক: এই রোগের সন্তোষজনক চিকিৎসা পদ্ধতি নাই। মুরগী এই রোগে আক্রান্ত হইলে অন্য মুরগীদের নিকট হইতে সরাইয়া লওয়া প্রয়োজন।

ল্যারিঙ্গো ট্রাকিয়াইটিস (Larnyngo-tracheitis)**:** এই রোগ স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে আক্রমণ করে। এই রোগে মৃত্যুর হার অনেক বেশী। প্রশ্বাসের সময় মুখ নিম্নমুখী হয় এবং মুখ বন্ধ থাকে। নিঃশ্বাসের সময় মাথা উপরের দিকে করিয়া মুখ খুলিয়া নিঃশ্বাস লয়। নিঃশ্বাসের সময় গলায় শব্দ হয়, চোখ ও নাক দিয়া জল ঝরিতে থাকে।

মুরগীর পায়ুর শ্লেষ্মাঝিল্লীতে টিকা বুলাইয়া দেওয়া হয়। মুরগীর 4 মাস পূর্বেই টিকা দেওয়া উচিত। টিকা উঠিলে মুরগীর পায়ুর মুখ ফুলিয়া উঠিবে। পায়ুর শ্লেষ্মাঝিল্লী লালভাব হইবে এবং পায়ুর মুখে রক্তের সহিত শ্লেষ্মা দেখা

যাইবে। হস্টাসাইক্লিন জলীয় দ্রবণ বা আলফা থিয়াজল বড়ি এই রোগে উপকার দেয়।

আদ্য প্রাণীঘটিত রোগ (Protozoan diseases) :

ককসিডিওসিস (Coccidiosis) : তিনমাস পর্যন্ত মুরগীদের এই রোগে মৃত্যুর হার বেশী। এই রোগ ককসিডিয়া নামক ক্ষুদ্র আদ্যপ্রাণী সৃষ্টি করে। ককসিডিয়ার আটটি প্রজাতির মধ্যে দুইটি প্রজাতি বিশেষভাবে মুরগীর অন্ত্রের ক্ষতের সৃষ্টি করে, যথা—আইমেরিয়া টেনেলা, আইমেরিয়া নেকাট্রিক্স। এই রোগ সাধারণতঃ আট হইতে দশ সপ্তাহ বয়সের মুরগীতে দেখা যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় আক্রান্ত হইলে 5 হইতে 7 দিনের মধ্যে মুরগী মারা যায়।

এই রোগে আক্রান্ত বাচ্চা চোখ বুজিয়াই ঝিমাইতে থাকে। দেহের পিছনে ভর করিয়া মাথা উপরে তুলিয়া বসে। পায়ে জোর থাকে না, হাঁটিতে পারে না। এই রোগে মুরগী খাওয়া বন্ধ করে এবং জলের মত পাতলা মল ত্যাগ করে। মলে রক্তের ছিট থাকে। বড় মুরগীর এই রোগ সারিয়া গেলেও জীবাণু নির্গত হইয়া রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। সেইজন্য রোগাক্রান্ত বা সদ্য সারিয়া ওঠা মুরগীকে পৃথক আস্তানায় রাখা হয়।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা : মুরগীর খাদ্যের সহিত প্রতি কিলোগ্রামে 0·5 গ্রাম বাইফুর‍্যান সাপ্লিমেন্ট বা 0·5 গ্রাম এম্বাজিনপ্রিমিক্স খাওয়ানো হয়। যে কোন একটি ঔষধ পর পর তিনদিন দুই সপ্তাহ খাওয়াইলে এই রোগ আক্রমণের ভয় থাকে না। এই রোগে আক্রান্ত মুরগীকে বা প্রতিষেধক হিসাবে পরপৃষ্ঠায় লিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ব্ল্যাক হেড : এই রোগ হিস্টোমোনাস মিলিয়াগ্রিডিস (*Histomonas meleagridis*) নামক আদ্যপ্রাণী দ্বারা সৃষ্ট হয়। এই রোগের অন্য নাম এণ্টেরোহেপাটাইটিস।

জীবাণুঘটিত রোগ (Germ diseases) :

(i) **বটুলিজম** (Botulism) : **ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম** (*Clostridium botulinam*) নামক জীবাণু দ্বারা এই রোগের সৃষ্টি হয়। পচা মাংস, শস্য, টিনের পাত্রে রাখা সব্জী হইতে মুরগীর এই রোগ হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে মুরগী চলিতে পারে না, ডানা ঝুলিয়া পড়ে। এখনও পর্যন্ত এই রোগের সঠিক চিকিৎসা নাই।

বিভিন্ন ঔষধ

ঔষধের নাম	চিকিৎসার জন্য (প্রতি লিটার জলে)	রোগ প্রতিরোধের জন্য (প্রতি চার লিটার জলে)
(i) এস্বাজিন জলীয় দ্রবণ	4 মিলিলিটার	4 মিলিলিটার
(ii) বাইফুর‍্যান বড়ি (জলে দ্রবণীয়)	একটি	একটি
(iii) সালফাডিমিডিন সোডিয়াম দ্রবণ 16%	10 মিলিলিটার	10 মিলিলিটার
(iv) সালফেট দ্রবণ	4 "	4 "
(v) কোড্রিন্যাল	4 গ্রাম	4 গ্রাম
(vi) ফুরাজল	$\frac{1}{2}$ গ্রাম	$\frac{1}{2}$ গ্রাম

(ii) **কলেরা** (Fowl cholera) ঃ **প্যাসটিউরেলা অ্যাভিসিডা** (*Pasteurella avicida*) নামক জীবাণু দ্বারা এই রোগ ঘটিয়া থাকে। এই জীবাণু রক্তে মিশিয়া সেপ্টিসিমিয়া বা রক্ত দূষিত করে। আক্রান্ত মুরগীর মলের সহিত বীজাণু পড়িয়া নূতন মুরগীকে আক্রমণ করে। এই রোগে ঘন ঘন জলের মত মল ত্যাগ করে। প্রথম অবস্থায় মলের বর্ণ হলুদ থাকে এবং পরে সবুজ হয়। এই রোগে মুরগী খুব দুর্বল হইয়া পড়ে, মাথা গুঁজিয়া ঝিমায়, শ্বাসকষ্ট হয়। খাওয়া বন্ধ করে, জল পিপাসা বাড়ে। এই অবস্থায় মুরগী মাটিতে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে, ডানা ঝুলিয়া পড়ে, দিন তিনেকের মধ্যেই মুরগী মারা যায়। এই রোগে মুরগী অনেকদিন পর্যন্ত ভুগিতে পারে, সেক্ষেত্রে মুরগী দুর্বল হয়, ওজন হ্রাস পায়, পাতলা মলত্যাগ করে, ডানা ও পায়ের সন্ধিস্থল ফুলিয়া ওঠে।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ঃ এই রোগের আক্রমণ বাড়িলে পানীয় জলে 0·1 শতাংশ শক্তিযুক্ত সোডিয়াম সালফামেথাজিন খাওয়াইলে মৃত্যুর হার হ্রাস পায়। মুরগীর খাদ্যের সহিত এক শতাংশ শক্তিযুক্ত সালফা থিয়াজল মিশাইলে কলেরা আয়ত্তে আনা যায়। প্রতি 15 কিলোগ্রাম খাদ্যের সহিত 5 গ্রাম সালফা কুইনোক্সালিন এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।

এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মুরগীর আবাসস্থল রোগ-বীজাণুনাশক ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার করিতে হয়।

টাইফয়েড (Fowl typhoid) ঃ স্যালমোনেলা গ্যালিনেরাম (*Salmonella gallinarum*) অথবা শিজিলা গ্যালিনেরাম (*Shigella gallinarum*) নামক জীবাণু দ্বারা এই রোগ হয়। এই রোগে মুরগীর জ্বর হয়, জল পিপাসা পায় এবং বারে বারে পাতলা মলত্যাগ করে। মুরগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে, মাথা ঝুলিয়া পড়ে এবং খাওয়া বন্ধ করে। প্রায় দু'সপ্তাহের পর মুরগী মারা যায়।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ঃ আক্রান্ত মুরগীকে অন্যত্র সরাইয়া লইতে হয় যাহাতে খাদ্য, জল, লিটার দূষিত না হয়। মুরগী এই রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হইলে মারিয়া ফেলিয়া পুঁতিয়া ফেলা হয়। সালফা জাতীয় ঔষধ মৃত্যুর হার কমায়।

(iv) **করিজা** (Coryza) ঃ **হিমোফিলাস গ্যালিনোরাম** (*Hemophilus gallinarium*) নামক জীবাণু দ্বারা এই রোগ ঘটিয়া থাকে। এই রোগে নাক মুখ দিয়া জল পড়ে ও পরে শ্বাসনালী আক্রান্ত হয়। মুখ ও মাথা ফুলিয়া উঠে এবং মুরগীর শ্বাসকষ্ট পরিলক্ষিত হয়। চোখের পাতা ফুলিয়া ওঠে ও পাতা বন্ধ হইয়া যায়।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ঃ এই রোগে আক্রান্ত মুরগী প্রথমেই পৃথক করা প্রয়োজন যাহাতে সুস্থ মুরগীতে রোগের বিস্তার না হয়। আট মিলিলিটার সালফেট দ্রবণ একলিটার জলে গুলিয়া দুই চামচ করিয়া তিনবার খাইতে দিতে হইবে। টেরামাইসিন (তরল), হষ্টাসাইক্লিন পাউডার, সুবামাইসিন ও অরিওমাইসিন বড়ি জলে গুলিয়া খাওয়াইলে উপকার পাওয়া যায়। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইলে মুরগীর ওজনের কিলোগ্রাম প্রতি 56 মিলিগ্রাম স্টেপটোমাইসিন এক মিলিলিটার জলে গুলিয়া পেশীর মধ্যে ইনজেকশন করিতে হয়।

(v) **যক্ষা** (Tuberculosis) ঃ **মাইক্রোব্যাকটিরিয়াম অ্যাভিয়াম** (*Microbaaterium avium*) নামক জীবাণু দ্বারা এই রোগ ঘটে। এই রোগের লক্ষণ সহজে ধরা পড়ে না, খুব ধীরে ধীরে মুরগীর ক্ষতি হয়। মুরগীর ওজন কমে এবং ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

প্রতিষেধক ঃ এই রোগ নিরাময়ের কোন ঔষধ নাই।

(vi) **পুলোরাম** (Pullorum) **ঃ স্যালমোনেলা পুলোরাম** (*Salmonella pullorum*) নামক জীবাণু পুলোরাম রোগের কারণ ঘটায়। এই জীবাণু মুরগীর ডিম্বাশয়কে আক্রমণ করে, কখনও কখনও অন্ত্রে পাওয়া যায়। জীবাণু ডিম্বাশয়কে আক্রমণ করে বলিয়া ডিমের মধ্যে জীবাণু যায়। এই ডিম হইতে সৃষ্ট বাচ্চা পুনরায় পুলোরাম রোগের বিস্তার করে। এই রোগে শতকরা 100টি মুরগীই মারা যায়। আক্রান্ত মুরগীর একদিনের বাচ্চা এই রোগ অন্য মুরগীদের ছড়ায়। বাচ্চা মুরগীর তিন সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। পরিণত মুরগীর হঠাৎ বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আক্রান্ত মুরগীর মল পাতলা ও আঠালো হয়। মল মলদ্বারের পালকে আটকাইয়া যায়।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ঃ বাচ্চা মুরগীর খাদ্যে নেফটিন মিশাইয়া দিলে রোগ প্রতিরোধ হয়। রোগের শুরুতে চার লিটার জলে 30 মিলিলিটার সালফেটের জলীয় দ্রবণ পর পর দুইদিন মুরগীকে খাইতে দিলে রোগ সারিয়া যায়। এই ঔষধ এক চামচ করিয়া দিনে 4/5 বার দেওয়া যাইতে পারে। টেরামাইসিন (তরল), হস্টাসাইক্লিন পাউডার, অরিওমাইসিন পাউডার ও সালফা মেথাজিন এই রোগে উপকার দেয়।

কৃমিজাতীয় রোগ (Worm's diseases) **ঃ** মুরগী মাটি হইতে খুঁটিয়া বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সংগ্রহ করে। ফলে কেঁচো, বিভিন্ন ধরনের পোকা মুরগীর অন্ত্রে প্রবেশ করে। এই সকল পোকা বিভিন্ন পরজীবী বহন করে এবং মুরগীকে আক্রান্ত করে। স্বচ্ছন্দে বিচরণ পদ্ধতির মুরগী চাষে এই রোগের প্রকোপের সম্ভাবনা বেশী কিন্তু ডিপলিটার পদ্ধতি ও ব্যাটারী খাঁচায় এই রোগের সম্ভাবনা কম।

(i) **ছোট গোল কৃমি** (Small round worms) **ঃ** এই গোল কৃমি ছোট সরু চুলের ন্যায়, মুরগীর অন্ত্রে বা পাকস্থলীতে (crop) বাস করে বলিয়া **ক্রপ ওয়ার্ম** ও (crop worm) বলা হয়। এই কৃমির আক্রমণে মুরগীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয় এবং ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ইহারা খাদ্যগ্রহণে অনিচ্ছুক হয়।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ঃ চিকিৎসা দ্বারা রোগের সাময়িক উপশম হয়। এই রোগে এক ঘন সেন্টিমিটার কার্বন টেট্রাক্লোরাইড অথবা টেট্রাক্লোরেথিন দ্বারা চিকিৎসা করিলে রোগ সারে।

(ii) **বড় গোল কৃমি** (Large round worms) **ঃ** সাধারণতঃ ছয়

মাস বয়সের বেশী মুরগী **অ্যাসকেরিডিয়া গ্যালি** (*Ascaridia galli*) নামক বড় গোল কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। মুরগীর ক্ষুদ্রান্ত্রে এই কৃমি পাচিত ও অর্ধপাচিত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে।

কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হইলে বাহ্যিক লক্ষণ সহজে প্রকাশ পায় না। সাধারণতঃ ইহাদের খাদ্যগ্রহণে অনীহা দেখা যায়, বৃদ্ধি হ্রাস পায়, ডিম উৎপাদন হ্রাস পায় এবং রক্তহীনতার লক্ষণ দেখা যায়। মাথার ঝুঁটি, ওয়াটল, পালক প্রভৃতি রঙীন অংশ অপেক্ষাকৃত ফ্যাকাশে হইয়া যায়।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা : পাইপারেজিন নামক ঔষধ জলে গুলিয়া মুরগীকে খাওয়ানো হয়। এই ঔষধ বাজারে অ্যান্টিপার লিকুইড, ভার্মেক্স লিকুইড, পাইপারেক্স পাউডার ও ভার্বান পাউডার ইত্যাদি নামে পাওয়া যায়। এক লিটার জলে 5 মিলিলিটার অ্যান্টিপার মিশাইয়া 7টি পাখীকে খাওয়ানো হয় বা ভার্মেক্স লিকুইড প্রতি লিটার জলে 12 মিলিলিটার মিশাইয়া 100টি মুরগীকে খাওয়ানো হয়।

তামাক পাতার জল খাওয়াইয়া অনেক সময় কৃমি ধ্বংস করা হয়। এক লিটার জলে 60 গ্রাম তামাক পাতা 4 ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকা পরিষ্কার জল মুরগীকে খাওয়ানো হয়।

(iii) **সিকাল ওয়ার্ম** (Caecal worms) **: হেটেরাকিস গ্যালিনি** (*Heterakis gallinae*) নামক কৃমি মুরগীর সিকামে দেখা যায়। এই কৃমি সরাসরি পোষকের ক্ষতি করে না, কিন্তু ব্ল্যাকহেড ও এন্টেরোহেপাটাইটিস রোগের জীবাণু বহন করে।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা : এই কৃমি দ্বারা মুরগী আক্রান্ত হইলে 1 ঘনসেন্টিমিটার ডিনোপোডিয়াম তৈল ও 5 ঘনসেন্টিমিটার অলিভ তৈল মিশ্রিত করিয়া এক কিলোগ্রাম ওজনের কমে মুরগীদের পায়ুতে পিচকারী দ্বারা প্রবেশ করান হয়। ওজন বেশী হইলে ঔষধের পরিমাণ সেই অনুসারে বাড়ানো হয়। 0·5 গ্রাম শক্তিযুক্ত ফেনোথিয়াজিন ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় অথবা প্রতিষেধক হিসাবে 500 গ্রাম ম্যাশের সহিত 50 গ্রাম ফেনোথায়াজিন মিশ্রিত করা হয়।

(iv) **গেপ ওয়ার্ম** (Gape worms) **:** ইহা একটি পরজীবী গোলকৃমি। মুরগীর কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালীকে আক্রমণ করে এবং মুরগীর শ্বাসকষ্ট হয়। আক্রান্ত মুরগীরা বাতাস লইবার জন্য মাথা নাড়াচাড়া করে। এই

কৃমির বৈজ্ঞানিক নাম **সিনগ্যামাস ট্রাকিয়া**। ইহারা সকল সময় জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। পুরুষ কৃমি অপেক্ষা স্ত্রী কৃমি আকারে বড় হয়।

শ্বাসনালীতে বাস করিয়া রক্তক্ষরণ করে এবং রক্ত শোষণ করে। গলায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়, শ্বাসনালী হইতে আঠাল পদার্থ নিঃসৃত হয়। মুরগীর কাশি হয়, গলা লম্বা করিয়া প্রশ্বাস লইতে চেষ্টা করে। এই সময় মুখ খুলিয়া বাতাস গ্রহণ করে, পরবর্তী পর্যায়ে শ্বাসনালী বন্ধ হইয়া মুরগী মারা যায়।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ঃ আক্রান্ত মুরগীকে একটি বন্ধ বাক্সে রাখিয়া বেরিয়াম অ্যান্টিমনিল টারটারেট পাউডার মিশ্রিত বাতাস ঘরে চালনা করা হয়। প্রশ্বাসের সহিত এই পাউডার মুরগীর শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে এবং গেপ ওয়ার্ম ধ্বংস করে। 5 হইতে 10 মিনিটকাল বাক্সে খুব অল্প পরিমাণে পাউডার বাতাসের সহিত স্প্রে করা হয়। একটি বন্ধ পাত্রে অ্যান্টিমণি ও বেরিয়াম ট্রারট্রেটের পাউডার লইয়া রোগাক্রান্ত বাচ্চাকে শুঁকান হয়। একটি পালকের ডগায় তার্পিন তৈল মাখাইয়া বাচ্চার গলার ভিতর প্রবেশ করাইলে বাচ্চার কাশি হয় এবং পালকের সহিত কৃমি বাহির হইয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকে।

মুরগীর বহিঃস্থ পরজীবী (External parasites) :

(i) **উকুন** (Lice) : মুরগী দেহের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের উকুন হয়। ইহারা মাত্র দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে। উকুন মাথায়, ঘাড়ে, পাখা ও ত্বকে হয়। সাধারণতঃ উকুনের দেহ চ্যাপ্টা ও বর্ণ হলুদ হয়। ছোট ছোট পা দ্বারা সমস্ত দেহে ঘুরিয়া বেড়ায়। মুরগীর উকুন হইলে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় ও ঠোঁট দ্বারা সমস্ত দেহ চুলকায়। উকুন চামড়া কামড়াইয়া রক্ত শোষণ করায় ত্বক পুরু ও খসখসে হয়। পালকের গোড়ায় উকুনের সাদা ডিম দেখা যায়।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ঃ 7 ভাগ 5% গ্যামাক্সিন বা ডি. ডি. টি. 10 ভাগ কাঠের ছাইএর সহিত মিশাইয়া মুরগীর গায়ে মাখান হয়। এই গুঁড়া পাউডার আঙুলে করিয়া ভালভাবে দেহের সর্বত্র লাগান হয়। দুই সপ্তাহ পর পর এইভাবে ঔষধ লাগাইতে হয়। মুরগীর বসিবার দাঁড় তিন সপ্তাহ অন্তর 40% শক্তিযুক্ত নিকোটিন সালফেট দ্বারা শোধন করা হয়। একটি পাত্রে বালি ও কাঠের গুঁড়া রাখিয়া মুরগীর বালিস্নানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উকুন দ্বারা আক্রান্ত পাখীকে 5 লিটার জলে এক আউন্স সোডিয়াম ক্লোরাইড অথবা সোডিয়াম ফ্লুওসিলিকেট দ্রবণযুক্ত অল্প গরম জলে ডুবাইয়া চিকিৎসা করা হয়। এই দ্রবণে প্রশমিত এক আউন্স সাবান মিশাইলে ইহার কার্যকারিতা বাড়ে। সমস্ত দেহ এবং যত্নসহকারে কয়েক সেকেণ্ড মাথাটি দ্রবণে ডুবাইতে হইবে।

(ii) **লাল মাইট** (Red mites)ঃ ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **ডারম্যানিসাস গ্যালিনি**। এই পরজীবী দেখিতে আলপিনের মত এবং ফ্যাকাশে ধরনের। ইহারা দিনের বেলায় দেওয়াল, ফাটল ইত্যাদির মধ্যে থাকে, রাতে মুরগীর গায়ে রক্ত শোষণ করে। যেখানে লাল মাইট বাস করে, সেখানে কালো ও সাদা ফুটকির মত দেখায়। এই মাইটের আক্রমণে মুরগীরা অস্থির হইয়া ওঠে ও রক্তাল্পতা দেখা যায়। মুরগীর বৃদ্ধি হ্রাস পায়, এমনকি মারা যাইতে পারে।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ঃ ছাইএর সহিত 5% গ্যামাক্সিন বা ডি. ডি. টি. পাউডার মিশাইয়া মুরগীর গাত্রে মাখাইয়া লাল মাইট ধ্বংস করা হয়। মুরগীর বাসার দেওয়াল, বসিবার দাঁড় 50% ডি. ডি. টি. গোলা জল স্প্রে করিয়া ধৌত করিয়া দিলে লাল মাইট মরিয়া যায়।

(iii) **ট্রপিকাল ফাউল মাইট বা ফেদার মাইট** (Feather mites)ঃ

এই পরজীবীর বৈজ্ঞানিক নাম *Bdellonyssus bursa*। এইপ্রকার মাইট পাখীর মলদ্বারের পালকের নীচে ডিম পাড়ে এবং স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে। এই পোকার উপদ্রব বেশী হইলে মুরগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ঃ

ছাইএর সহিত 5% গ্যামাক্সিন বা ডি. ডি. টি. পাউডার মিশাইয়া মলদ্বারের চারিপাশে লাগাইলে পোকা নষ্ট হয়।

(iv) **এটুলি বা টিক** (Ticks) ঃ

ইহাদের আকার উকুনের চেয়ে বড়, বাদামের মতো। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **আরগাস পারসিকাস**। টিক দিনের বেলায় দেওয়ালের ফাটলে, বাক্সে, বসিবার দাঁড়ে লুকাইয়া থাকে, রাতে বাহির হইয়া মুরগীর রক্ত খায়। ইহাদের আক্রমণে মুরগী অস্বস্তি বোধ করে, ওজন কমে এবং রক্তাল্পতা দেখা দেয়। এই টিকের প্রভাবে জ্বর হয়। টিক একধরনের জীবাণু বহন করে।

রোগাক্রান্ত মুরগী ঘাড় গুঁজিয়া ঝিমাইতে থাকে। কয়েকদিন ধরিয়া পাতলা মলত্যাগ করে ও পরে মারা যায়।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা : কেরোসিন বা ডি. ডি. টি. পাউডার জলে গুলিয়া টিককে মারা হয়।

(v) **ছারপোকা** (Bed bug) :

ছারপোকা রাতে মুরগীকে আক্রমণ করে, দিনের বেলায় পাঁচ শতাংশ ডি. ডি. টি.-র সহিত কেরোসিন মিশাইয়া স্প্রে করিয়া মুরগীর আবাসস্থল হইতে ছারপোকা বিনষ্ট করা হয়।

(vi) **ফ্লি** (Flea) : ইহারা ডানাবিহীন এক ধরনের চ্যাপ্টা পোকা, কালো ও খয়েরী বর্ণের হয়। ইহারা মুরগীর রক্ত শোষণ করে, সাধারণতঃ ঝুটি, ওয়াটল ও চোখের চারিদিকে থাকে।

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা : 5% গ্যামাক্সিন বা ডি. ডি. টি পাউডার ছাইএর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়া লাগাইলে ফ্লি নষ্ট হইয়া যায়।

সংক্রামক রোগ নিরাময়ের উপায় :

(i) সদ্যজাত বাচ্চার নাসারন্ধ্রে রাণীক্ষেত এবং স্ট্রেইন ভ্যাকসিন প্রয়োগ করিতে হইবে। 5 সপ্তাহ বয়সে ফাউল্ পক্স ভ্যাকসিন ও আট সপ্তাহ বয়সে রাণীক্ষেত R2B ভ্যাকসিন দিতে হয়। নবজাত বাচ্চাদের মারেকের ভ্যাকসিন দিতে হয়।

(ii) বাচ্চার প্রথম সপ্তাহে প্রতি এক কিলোগ্রাম খাদ্যের সহিত আট গ্রাম **নেকটিন**-50 মিশাইয়া 7 দিন খাওয়ানো হয়।

(iii) বাচ্চার দ্বিতীয় সপ্তাহে এক লিটার জলে বাইফুরাম বড়ি গুলিয়া 7 দিন খাওয়াইতে হয়।

(iv) রোগগ্রস্ত মুরগীকে আবাসস্থল হইতে সরাইয়া পৃথক রাখা হয়।

(v) সংক্রামক রোগে মুরগী মারা গেলে ব্লিচিং পাউডার মাখাইয়া পুঁতিয়া ফেলা দরকার।

(vi) জলের সঙ্গে কার্বলিক অ্যাসিড শতকরা পাঁচভাগ মিশাইয়া খামার পরিষ্কার করা হয়।

(vii) খাদ্য ও পানীয়ের পাত্র দশভাগ জলে একভাগ লাইসল মিশাইয়া শোধন করা বাঞ্ছনীয়।

(viii) মুরগীকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা উচিত। আলো বাতাস

উপযুক্ত পাইবার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ভিজা ও স্যাঁতসেতে পরিবেশে বিভিন্ন ব্যাধির সৃষ্টি হয়। খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন।

(ix) খাদ্যের ও পানীয়ের পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করিতে হইবে।

(x) মুরগীকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করিতে হইবে।

(xi) মুরগীর খামারে প্রবেশের পূর্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, হাত-পা ধুইয়া পরিচালকের খামারে প্রবেশ করা উচিত।

(xii) প্রতিদিন মুরগীর প্রতি নজর দিতে হইবে, রুগ্ন বলিয়া মনে হইলে সঙ্গে সঙ্গে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। এই অসুস্থ মুরগীকে রোগের লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

হাঁস পালন

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পোলট্রি হইল হাঁস পালন। হাঁস সাধারণতঃ শুষ্ক স্থান পছন্দ করে না, জলজ বাসভূমি বেশী পছন্দ করে। ভারতে প্রতি বৎসরে 401·4 মিলিয়ন হাঁস উৎপন্ন হয়। একটি হাঁস বৎসরে 50-60 টির বেশী ডিম দেয় না। হাঁসের ডিম মুরগীর ডিম অপেক্ষা ভারী ও ওজনে প্রায় 70-85 গ্রাম হয়। উপযুক্ত খাদ্য ও পরিচর্যার দ্বারা হাঁস হইতে বেশী ডিম উৎপাদন সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে প্রধানতঃ হাঁস চাষ দেখা যায়, তবে পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন সরকারী খামারে হাঁস পালনের উন্নতিকরণের চেষ্টা চলিতেছে। হাঁস কষ্টসহিষ্ণু, ফলে মুরগীর মতো বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না।

হাঁসের বিভিন্ন ব্রীড (The Breeds of Duck) ঃ

সাধারণতঃ হাঁসকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা—ডিম উৎপাদনকারী হাঁস, মাংস উৎপাদনকারী হাঁস ও শোভাবর্ধক হাঁস। ভারতে প্রধানতঃ ডিম প্রসবকারী হাঁসের চাষ করা হয়। হাঁসের মাংসের গন্ধ ভাল নয়, সেইজন্য মাংসের জন্য ইহা চাষ করা হয় না।

ভারতীয় ব্রীডের মধ্যে প্রধান হইল **সিলেট মীটা ও নাগেশ্বরী**। ভারতীয় রাণার, খাঁকি ক্যাম্পবেল এই দুইটি অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের ব্রীড ভারতের জলবায়ুতে ভালভাবেই পালন করা যায়। ইহা ছাড়াও মিনিকস (Minikos) এবং সাদা পিকিন (White Pekin) দুইটি উন্নত ধরনের ব্রীডের চাষ ভারতে করা হইতেছে।

(i) **সিলেট মীটা** (Sylet mete) ঃ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এই দেশী হাঁসের চাষ করা হয়। ইহাদের গাত্রবর্ণ ঈষৎ বাদামী এবং ঠোঁট হলুদ বর্ণের হয়। পালকে কালো বর্ণের ছিট্ ছিট্ দাগ থাকে। চোখের বর্ণ হয় হলুদ। ইহাদের ডিম পাড়িবার হার তুলনামূলকভাবে কম।

(ii) **নাগেশ্বরী** (Nageswari duck) ঃ আসামের কাছাড় জেলায় ও সিলেটে এই হাঁসের চাষ করা হয়। ইহাদের দেহের বিশেষতঃ পিঠের দিকের

বর্ণ কালো, গলা ও বুক সাদা বর্ণের হয়। বৎসরে 80 হইতে 150টি ডিম পাড়ে।

(iii) **খাঁকি ক্যাম্পবেল** (Khaki Campbell) : Mrs. campbell নামক এক ভদ্রমহিলা **রোয়ান** (*Roan*) হাঁসের সহিত দেশী সাদা হাঁসের প্রজনন ঘটাইয়া একটি সংকর হাঁস সৃষ্টি করেন। পরে 1901 খ্রীষ্টাব্দে এই সংকর হাঁসের সহিত **মুলার্ড** (Mullard) নামক হাঁসের প্রজনন ঘটাইয়া এই নূতন জাতের হাঁস সৃষ্টি করা হয়। তাঁহার নামানুসারেই হাঁসটির **'খাঁকি ক্যাম্পবেল'** নাম দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেশী হাঁস আকারে ছোট, বৎসরে 50-60টির বেশী ডিম পাড়ে না। সেই তুলনায় ক্যাম্পবেল আকারে বড় এবং বৎসরে 200টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে।

ইহাদের দেহের বর্ণ খাঁকি বা ধূসর। ক্যাম্পবেলের দেহ ভারী ও বলিষ্ঠ হয়, ওজন দুই হইতে আড়াই কিলোগ্রাম হয়। খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস দেখিতে সুন্দর হয়। ইহাদের গলার বর্ণ বাদামী আভাযুক্ত কালো এবং পা দুইটি লাল বর্ণের হয়। ইহাদের দেহের সম্মুখভাগ গোলাকার, পৃষ্ঠদেশ চওড়া ও সমতল। পেট বড় ও অল্প ঢালু, ডানা বলিষ্ঠ, পা মাঝারি ধরনের, পা দুইটি কিছুটা দূরে অবস্থিত। ইহাদের চক্ষু উজ্জ্বল, ঠোঁট মাঝারি এবং দৃঢ়। হাঁস ভীতু কিন্তু এই হাঁস সাহসী ও বেশী কষ্টসহিষ্ণু।

ইহারা জল ছাড়াও স্থলে বহুদিন জীবিত থাকে এবং প্রচুর ডিম পাড়ে। সুতরাং শুষ্ক গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এই হাঁস পালনে বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই হাঁসের ব্যবসা লাভজনক, কম পরিচর্যাতেও একটি হাঁস বছরে 150 হইতে 200টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়িবার জন্য ইহারা নির্জন স্থান পছন্দ করে। কারণ নির্জন স্থান ব্যতিরেকে হাঁস ডিম পাড়ে না। প্রতিটি ডিমের ওজন 60 হইতে 90 গ্রাম হয়।

(iv) **ইণ্ডিয়ান রাণার** (Indian Runner) : ভারতে এই প্রজাতির আদি বাসস্থান, তাই ইহাকে **'ইণ্ডিয়ান রাণার'** নাম দেওয়া হইয়াছে।

এই হাঁসের গাত্রবর্ণ দুধের মত সাদা এবং দেখিতেও সুন্দর হয়। ইহাদের দেহের গড়ন বলিষ্ঠ ও মজবুত। দেহের ওজন দুই হইতে আড়াই কিলোগ্রাম হয়। ঠোঁট দৃঢ় ও মাঝারি, গলা লম্বা ও গোলাকার, হাঁটিবার সময় গলা উঁচু করিয়া হাঁটে। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ চওড়া ও সমতল। পেট অংশটি স্ফীত,

পা দুইটি দৃঢ় এবং কিছুটা দূরে অবস্থিত। ডানা বেশ বড় হয়। এই হাঁস বছরে 200টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে, ডিমের ওজন ক্যাম্পবেলের মতই 60-90 গ্রাম হয়।

হাঁসের ফার্ম (Farm) :

জল জমে না এইরকম উঁচু জমিতে হাঁস পালন করা হয়। হাঁস মাঠে চরিতে বা জলাশয়ে সাঁতার কাটিতে ভালবাসে। সংকীর্ণ ছোট জায়গায় ইহারা থাকা পছন্দ করে না। জলাশয় সমেত বাগান হাঁস চাষের পক্ষে উপযোগী। ফার্মের চারিদিকে ঘিরিয়া রাখা প্রয়োজন যাহাতে হাঁস বাহিরে যাইতে না পারে। জলা জায়গায় হাঁস পালন করিলে হাঁসগুলি ইচ্ছামত জলজ উদ্ভিদ, শামুক, গুগলি ইত্যাদি খায়। রাত্রিবাসের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের প্রয়োজন। প্রতি হাঁসের জন্য চার বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন। হাঁসের ঘরের প্রাচীর 4/5 ফুটের বেশী উঁচু হয় না। ঘরের ছাদে করোগেটেড টিন, অ্যাসবেসটস্, টালি, খড়ের ছাউনি ইত্যাদি চাপান দেওয়া হয়। ঘরের চালা বেশ ঢাল রাখিয়া দেওয়ালের বাহিরে থাকা প্রয়োজন নতুবা বৃষ্টির জলের ছাঁট প্রবেশ করিবে। মেঝে শুষ্ক যাহাতে থাকে তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজনে ঘরের মেঝে সিমেন্টের করা যায়, তাহাতে পরিষ্কার করার সুবিধা হয়। ঘরের মেঝেতে চার ইঞ্চি পুরু লিটার বিছানো যাইতে পারে।

পুরুষ ও স্ত্রী হাঁসের পার্থক্য

পুরুষ হাঁস	স্ত্রী হাঁস
(i) ডানা ও পা বেশী নাড়াচাড়া করে।	(i) অপেক্ষাকৃত শান্ত
(ii) গলার স্বর কর্কশ ও অস্পষ্ট।	(ii) গলার স্বর স্পষ্ট।
(iii) লেজের উপরের অংশের পালক কোঁকড়ান হয়।	(iii) লেজের পালকগুলি কোঁকড়ান নহে।
(iv) পিউবিস অস্থি চওড়া।	(iv) পিউবিস অস্থি চওড়া।

হাঁসের খাদ্য (Food) : হাঁস ছাড়া থাকিলে নিজেরাই খাদ্য সংগ্রহ

করে। হাঁস ফাঁকা জায়গায় বা পুকুরে থাকিলে পোকা, ঘাস, জলজ উদ্ভিদ, শামুক, গুগলি ইত্যাদি খায়।

হাঁস মুরগীর মতই দানাশস্য বা তণ্ডুলজাতীয় শস্য খায়। কিন্তু মুরগীর মতো শুকনা খাবার খুঁটিয়া খাইতে পারে না। হাঁসের খাদ্য জলে ভিজাইয়া নরম করিয়া দিতে হয়। গেঁড়ি, গুগলি, শামুক হাঁসের প্রিয় খাদ্য। শামুক, গুগলি ইত্যাদি জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ধানের কুঁড়ার সহিত মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হয়। হাঁস মুরগী অপেক্ষা বেশী খায়। প্রতিটি হাঁসকে দিনে দুইশত গ্রাম খইল, ভুষি, গেঁড়ি সিদ্ধ ইত্যাদি দেওয়া হয়। মাছ, ভাত, সব্জী যে কোন উচ্ছিষ্ট খাদ্যই হাঁস খায়। খাদ্যের সহিত মালটি-ভিটামিন বড়ি দেওয়া ভাল। হাঁস বদ্ধস্থানে রাখিলে খাদ্যের পরিমাণ বেশী লাগে। কিন্তু চরিবার সুযোগ থাকিলে কম পরিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। চরিবার সুযোগ থাকিলে দিনে 60 গ্রামের বেশী পরিপূরক খাদ্য লাগে না।

নিম্নলিখিত অনুপাতে বিভিন্ন খাদ্য মিশাইয়া হাঁসের ম্যাশ তৈয়ারি করা হয়।

গমের ভুষি—	35 ভাগ
বাদাম খইল—	37 ভাগ
ধানের ক্ষুদ—	25 ভাগ
খাদ্য লবণ—	1 ভাগ
খনিজ লবণ—	1 ভাগ
	মোট 100 ভাগ

ডিম সংগ্রহ, ডিম উৎপাদন, ডিম ফোটানো ঃ

হাঁস সাধারণতঃ শেষ রাত্রিতে ডিম পাড়ে। প্রতিদিন 100টা হাঁস থেকে গড়ে প্রায় 85টি ডিম পাওয়া যায়। সাধারণতঃ জলে নামিবার বা মাঠে চরিবার পূর্বেই ডিম সংগ্রহ করিয়া হাঁস ছাড়া হয়।

দেশী হাঁস বৎসরে 50-60টি ডিম দেয় তবে বিশেষভাবে পরিচর্যা করিলে 200টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। খাঁকি ক্যাম্পবেল ও ইণ্ডিয়ান রাণার বৎসরে 200-300 ডিম পাড়ে।

স্ত্রী হাঁস ছয়মাস বয়স কাল হইতে ডিম দিতে শুরু করে। প্রতি দশটি স্ত্রী হাঁসের জন্য তিনটি পুরুষ হাঁস রাখিলেই চলে। পুরুষ হাঁসের প্রজনন

কাল এক বছর হওয়া উচিত। হাঁস সাধারণতঃ ডিমে তা দিতে চায় না, সেইজন্য মুরগী দ্বারা ডিমে তা দেওয়ান হয়। একটি মুরগী 6-7টি হাঁসের ডিমে তা দিতে পারে। হাঁসের ডিম ফোটানর জন্য ইনকিউবেটর যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ইনকিউবেটরে 39° ডিগ্রী সেলেসিয়াস তাপমাত্রা রাখা হয়। হাঁসের ডিম ফুটিয়া বাচ্চা হইতে 28 দিন সময় লাগে এবং মুরগীর সময় লাগে মাত্র 21 দিন।

বাচ্চা পালন ও হাঁসের পরিচর্যা ঃ

বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হইলে উপযুক্ত তাপের প্রয়োজন হয়। বাচ্চা জন্মাইবার প্রথম একদিন কোন খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রথম সপ্তাহে নরম ভাত জলের সহিত মিশাইয়া পাতলা করিয়া বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়। এই খাদ্যের সহিত পিঁয়াজকুঁচি দেওয়া হয়। প্রয়োজনে চামচে করিয়া বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে সাধারণ খাদ্য দেওয়া হয়। খাদ্যের সহিত পাতা-শাক দেওয়া যাইতে পারে।

সকালে হাঁস ছাড়িবার পূর্বে ম্যাশ খাওয়াইতে হয়। বাসার কাছে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট পাত্রে প্রতিদিন খাদ্য দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পূর্বে হাঁস ঘরে তোলার আগে আবার ম্যাশ খাওয়ানো হয়। এই খাদ্যের লোভে ঠিক সন্ধ্যার পূর্বেই হাঁস বাসায় ফিরিয়া আসে। হাঁস বাহির হওয়ার পর ঘর ফিনাইল দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। ঘরের ভিতর পাত্রে জল রাখিবার ব্যবস্থা থাকে। হাঁস পালনের জন্য জলাশয় না থাকিলে খোলা জায়গায় বড় জলের চৌবাচ্চা করা প্রয়োজন।

কোন হাঁস অসুস্থ হইলে পৃথক রাখিবার বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

হাঁসের রোগ ও চিকিৎসা (Diseases and treatment) ঃ

হাঁসেরা জলাশয়ে সাঁতার কাটিতে বেশী পছন্দ করে। উপযুক্ত খাদ্য ও কালো জমিতে ও পুকুরে চরিবার বিশেষ সুযোগ পাইলে হাঁসের বিশেষ কোন রোগ হয় না। হাঁসের মুরগীর মত সংক্রামক রোগ অনেক কম হয়।

(i) **যকৃতের রোগ (Liver disease) ঃ** খাদ্যের অনিয়ম হইলে ও খাদ্য পরিপাক না হইলে হাঁসের যকৃতের রোগ হয়। এই রোগে মলের বর্ণ হয়। হাঁস ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে, হাঁসটি ঠিকমত চলিতে পারে না, ফলে মারা যায়। স্ত্রী হাঁসের ডিম পাড়া বন্ধ হয়।

রোগের প্রথম অবস্থায় দিনে দুইবার কালমেঘ্ ও গুলঞ্চ পাতা বাটা,

খাওয়াইলে উপকার হয়। এই সময় হাঁসকে চরিতে না দিয়া সহজ পাচ্য খাদ্য যোগান দিতে হয়। জলে মিশানো মাঠা তোলা দুধে চিনি মিশাইয়া গেঁড়ি, গুগলি ভাঙিয়া খাইতে দেওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে চালের খুদ, আনাজের খোলা ও ভাতের ফেন ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হয়।

(ii) **হাঁসের প্লেগ** (Plague) : ইহা ভাইরাস বাহিত ব্যাধি। সাধারণতঃ বেশী বয়স্ক হাঁসের এই রোগ হয়। এই রোগে নাক দিয়া জল পড়ে, চোখের পাতা ফুলিয়া ওঠে, চোখ লাল হয়। মাথা ফুলিয়া যায়, প্রায়ই পেটের রোগ হয়। মলের বর্ণ সবুজ হয়, পরে পক্ষাঘাত হয় এবং ডানা ঝুলিয়া পড়ে। দুই-তিনদিনের মধ্যেই হাঁস মারা যায়। হাঁসকে প্লেগ রোগের প্রতিষেধক টীকা দেওয়া প্রয়োজন।

(iii) **অজীর্ণ রোগ** (Indigestion) : এই রোগে হাঁস খাওয়া পরিত্যাগ করে, কালচে বর্ণের জলের মত মলত্যাগ করে। কয়েকদিন রোগ ভোগের পর হাঁস দুর্বল হইয়া পড়ে।

এক কাপ জলে এক চামচ ইপসম লবণ মিশ্রিত করিয়া দিনে তিন-চার চামচ করিয়া পরপর সাতদিন খাওয়াইতে হইবে।

একটি সালফা গুয়ানিডিন ট্যাবলেট চূর্ণ করিয়া তার সহিত তিনগুণ চিনি বা গ্লুকোজ মিশাইতে হইবে। ঐ চূর্ণ এককাপ জলে গুলিয়া তিন-চার বার খাওয়াইতে হইবে। একটি এন্টেরোগুয়ানিডিন ট্যাবলেট চূর্ণ করিয়া চারগুণ গ্লুকোজ মিশাইয়া চারিভাগ করিয়া একভাগ প্রতিবার জলে গুলিয়া দিনে তিন-চার বার সেবন করাইলে উপকার হয়। টেরামাইসিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, অ্যাক্রোমাইসিন ট্যাবলেট একটি করিয়া খাওয়াইলে রোগের উপশম ঘটে।

(iv) **ক্র্যাম্প** (Cramp) : এই রোগে হাঁসের দেহ স্থূল হয়, আক্রান্ত হাঁসেরা চলাফেরা করিতে পারে না। এই রোগে আক্রান্ত হইলে হাঁসের ঝিমুনি ভাব আসে।

হাঁসকে গরম জলে ভালভাবে স্নান করাইতে হইবে। স্পিরিট ও তার্পিন তৈল দ্বারা দেহ মালিশ করা হয়। এক চামচ কডলিভার তৈল জলে মিশ্রিত করিয়া দিনে অর্ধচামচ করিয়া দুই-তিনবার হাঁসকে খাওয়ান হয়।

(v) **ক্ষয়রোগ** (Pthysis) : ইহা একটি সংক্রামক রোগ। দিনের পর দিন হাঁস অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং মারা যায়।

(vi) **চোখের জল পড়া ও ছানি (Cataract) :** এই রোগে হাঁসের চোখ দিয়া জল পড়ে, চোখের পাতা বন্ধ হইয়া যায়।

গরম জলের সহিত পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট মিশাইয়া চোখ ধুইয়া দিলে উপকার হয়। গরম জলে বোরিক পাউডার দিয়া সেঁক করিলে চোখ ভাল থাকে।

(vii) **হাঁসের কলেরা (Cholera) :** বয়স্ক হাঁসের এই রোগ দেখা যায়। এই রোগ হইলে হাঁস পাতলা সবুজ বা খয়েরী বর্ণের মলত্যাগ করে। রোগাক্রান্ত হইবার দুই-তিনদিনের মধ্যে হাঁস মারা যায়। কলেরা ভ্যাকসিন প্রয়োগ করিলে হাঁসের প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়।

(viii) **হাঁসের অ্যাসপারজিলেসিস (Aspergillasis) :** ইহা একটি ছত্রাকজনিত ব্যাধি। এই রোগে শ্বাসযন্ত্র আক্রান্ত হয় ও হাঁসের মৃত্যু ঘটে।

মৎস্যচাষ (Pisciculture)

সূচনা (Introduction) :

মানুষের দৈহিক প্রয়োজনীয় প্রোটিনের 75 শতাংশ প্রাণী হইতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে অধিকাংশ মানুষই মাছকে বিশেষ পছন্দ করে এবং খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের চাহিদা অনুযায়ী মাছের সরবরাহ অনেক কম। শুধু পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক 1500 লক্ষ মণ মাছের প্রয়োজন সেখানে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব উৎপাদন ও বিভিন্ন স্থান হইতে সরবরাহ একত্র করিলে প্রায় 800 লক্ষ মণের বেশী মাছ হয় না। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয়। আমাদের দেশে কয়েক দশক পূর্বে মাত্র বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্যচাষ শুরু হইয়াছে। শিক্ষার অভাব এবং প্রযুক্তিবিদ্যা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিতে মাছ চাষীদের খুব অনীহা তবুও বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছ চাষ শুরু হইয়াছে। আশা করা যায় শীঘ্রই এই চাষের উন্নতি হইবে এবং প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করিতে পারিবে। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে মৎস্যচাষ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রে চাষীদের উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া হয়। এই মৎস্যচাষকে উন্নত করিতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মৎস্যচাষ পদ্ধতি, ধীবর ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিধিসম্মত প্রশিক্ষণ এবং সরকার কর্তৃক অর্থলগ্নী ও বাজার তৈয়ারি করা প্রয়োজন।

মৎস্যচাষ কাহাকে বলে ?

যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছের প্রজনন, পালন, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে ধরা হয়, তাহাকে **মৎস্যচাষ** বলে। এখন মৎস্যচাষ বলিতে শুধু খাদ্য উপযোগী মৎস্যের পালন ও সংরক্ষণ বোঝায় না। মৎস্য ছাড়াও ছোট বড় চিংড়ী, কাঁকড়া প্রভৃতি সন্ধিপদ প্রাণী, ঝিনুক, গুগলি, সেপিয়া প্রভৃতি কম্বোজ পর্বের প্রাণী, হাঙর, শংকরমাছ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে তিমি, ডলফিন প্রভৃতির লালন, প্রজনন ও সংরক্ষণ মৎস্য চাষের মধ্যে পড়ে। সুতরাং আধুনিক অর্থে মৎস্য চাষের সংজ্ঞা—

"মানুষের খাদ্য হিসাবে জলে বসবাসকারী সকল প্রাণীর

বিবেচনা প্রসূত আহরণ, পালন, সংখ্যা বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার আধুনিকীকরণ ও সংরক্ষণই প্রকৃতপক্ষে মৎস্যচাষ।"

মৎস্যচাষের সার্থকতা নির্ভর করে জলের বৈশিষ্ট্যের উপর। যেমন—মিষ্টি বা লবণাক্ত জল, জলের ক্ষারত্ব ও অম্লতা, জলের দ্রবীভূত গ্যাস ও জৈব পদার্থ। মাছের বৃদ্ধির উপযোগী খাদ্য, জীবনচক্র, স্বভাব, প্রজনন কাল ও স্থান, পরিযাণ ক্ষমতা ও জলে বসবাসকারী অন্য প্রাণীর সংখ্যা, শত্রু সংখ্যা ও মাছের রোগ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যও জানা প্রয়োজন। মাছের সংরক্ষণ ব্যবস্থা, মাছ ধরা, জালের উন্নতিকরণ, দ্রুত যানবাহনের ব্যবস্থা, সমবায় সমিতি স্থাপন, মৎস্যজীবীর কল্যাণ সাধন এবং যাহাতে ডিমভর্তি স্ত্রী মাছ ও বাচ্চা মাছ না ধরা হয় সেইবিষয়ে সরকারী আইন ও পরামর্শদান প্রভৃতিও মৎস্যচাষের আওতায় পড়ে।

খাদ্য মৎস্য (Food fishes) কাহারা ?

মৎস্যচাষ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করিতে হইলে প্রথমেই জানিতে হইবে খাদ্য হিসাবে কোন মৎস্যগুলি বেশী প্রচলিত। অবশ্যই প্রয়োজনে সকল মাছকেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় যদি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়। তবুও যে সকল মাছ সুস্বাদু, সেগুলি মানুষ খাইতে বেশী পছন্দ করে। সুতরাং এই সকল মৎস্যের চাষেরই অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশী।

মিষ্টি জলের মাছ (Fresh water fishes) ঃ

কার্প জাতীয় মাছের খাদ্যমূল্য ও ব্যবসায়িক মূল্য সর্বাধিক। বড় বড় কার্পের মধ্যে **রুই** (*Labeo rohita*), **কাতলা** (*Catla catla*), **কালবাউস** (*Labeo calbasu*), **মৃগেল** (*Cirrhina mrigala*), **কুর্চিবাটা** (*Labeo gonius*) এবং ছোট কার্পের মধ্যে **সরপুঁটি** (*Barbus stigma*), **সাধারণ পুঁটি** (*Baubus ticto*) প্রধান। এই সকল মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে উহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব, খাদ্য, রোগ-প্রতিকার এবং জীবনচক্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরিণত অবস্থায় কার্প জাতীয় মৎস্য নিরামিষাশী। **কাতলা** জলের উপরিতলের, **রুই** জলের মধ্যতলের এবং **মৃগেল** নিম্নতলের খাদক। সকল কার্প জাতীয় মৎস্য **অসটিকথিস** ও **সাইপ্রিনিফরমিস** বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন ধরনের জিওল মাছের খাদ্যমূল্য ও ব্যবসায়িক মূল্যও কম নয়। ইহাদের মধ্যে **শিঙি** (*Heteropneustis fossilis*), **কই** (*Anabas testudi-*

neus), **মাগুর** (*Glarius batrachus*) বিশেষভাবে প্রচলিত। ব্যবসায়িক দিক হইতে **শোল** (*Ophicephalus striatus*), **বোয়াল** (*Wallogonia attu*), **শাল** (*Ophicephalus morvlius*), **ল্যাটা** (*Ophicephalus punctatus*), **চিতল** (*Notopterus chitala*), **ফলুই** (*Notopterus notopterus*), **মৌরালা** (*Ambypharingodon mola*), **বেলে** (*Glossogobius goiris*) ও **ত্রিচোখা** (*Aplycneliun panchax*) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নদীর মোহনায় মাছের মধ্যে বিশেষ করিয়া সুন্দরবনের খাঁড়িতে সুস্বাদু **ভেটকি** (*Lates calcarifer*), **খয়রা** (*Gadusia chapra*), **ভাঙর** (*Mugil tade*), **পার্শে** (*Mugil parsia*), **ট্যাংরা** (*Mystus sp.*), **তপসে** (*Polinemus sp.*), **ইলিশ** (*Hilsa ilisha*), **আড়** (*Arius sp.*) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সামুদ্রিক মাছের মধ্যে **পমফ্রেট** (*Stromateus*), **পায়রাচাঁদা** (*Scatophagus*), **ম্যাকারেল** (*Somber*), **বোম্বেডাক** (*Harpodon*), **রিটা** (*Rita*) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সামুদ্রিক মৎস্যের চাষও কয়েক দশক ধরিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু ভারতের মানুষের তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। সামুদ্রিক মাছের চাষের উন্নতি ঘটিলেও অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ সেরকম বৃদ্ধি পায় নাই। জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে মৎস্যের যোগান অনেক কম। অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষে উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবের জন্য চাহিদার তুলনায় মৎস্যের চাষ অনেক কম।

মৎস্যচাষের শ্রেণীবিভাগ ও সংজ্ঞা :

মাছ জলে বাস করে। সমুদ্র, নদী, নালা, ভেড়ী, হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি মাছের বাসস্থান। এই আবাসস্থলের উপর ভিত্তি করিয়া মাছ চাষকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ (Inland fisheries) **:**

সমুদ্র ব্যতীত দেশে নদী, নালা, খাল, বিল, হ্রদ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থানে যেখানে মাছ চাষ করা হয় সেই সকল জলাশয়ই অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষের অন্তর্ভুক্ত। অন্তর্দেশীয় মৎস্য চাষ লবণাক্ত ও মিষ্টি জলে হয়। মিষ্টি জলের মৎস্য চাষ নিম্নলিখিত ধরনের হয়।

নদীতে মৎস্য চাষ (Riverine system) **:**

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, কৃষ্ণা, কাবেরী ও গোদাবরী এই পাঁচটি নদীতে

মৎস্যচাষ

1. অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ (Inland fisheries)
   - স্বাদু জলের মৎস্যচাষ (Fresh water fishery)
     - নদীতে মৎস্যচাষ (Riverine System)
     - হ্রদ বা বড় জলাশয়ে চাষ (Lake and large reservoir fishery)
     - পুকুরে মাছ চাষ (Pond fishery)
       - কার্প জাতীয় মাছের চাষ (Major carp fishery)
         - সাধারণ চাষ (Common culture)
         - নিবিড় মিশ্র চাষ (Composile culture)
         - প্রণোদিত জনন (Induced breeding)
       - জিওল মাছ চাষ (Jeol fish culture)
   - লবণাক্ত জলের মৎস্যচাষ (Brakish water fishery)
     - ভেড়ী (Bherry)
     - খাড়ি (Estuarin)
2. সামুদ্রিক মৎস্য চাষ (Marine fisheries)
   - সমুদ্র উপকূলবর্তী চাষ (Coastal fishery)
   - গভীর সমুদ্রে চাষ (Deep sea fishery)

প্রকৃতপক্ষে মৎস্য চাষ করা হয় না, কিন্তু মৎস্য ধরা হয়। বৎসরের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে এই নদীতে বড় কার্প জাতীয় মৎস্যের ডিম ও ফ্রাই পাওয়া যায়। মৎস্যচাষীরা এইগুলি জালের সাহায্যে ধরিয়া পুকুরে লালনপালন করিয়া বাজারে বিক্রী করে। গঙ্গা নদী হইতে প্রধানতঃ **রুই, কাতলা, কালবোশ, চিতল, ইলিশ, বোয়াল, ট্যাংরা** ও **চিংড়ী** প্রভৃতি পাওয়া যায়।

কৃষ্ণা, কাবেরী নদীতে :

এই সব নদীতে **কুর্চে বাটা, মৃগেল,** কাতলা, ট্যাংরা, **সিলোনিয়া, বোয়াল** ও কিছু **ইলিশ** পাওয়া যায়। চিংড়ীও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল নদীর তীরে কৃত্রিম স্পোর্ট গ্রাউণ্ড তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই স্পোর্ট গ্রাউণ্ডগুলি সাধারণতঃ ঢালযুক্ত এবং বর্ষাকালে এই গ্রাউণ্ডগুলি জলে ডুবিয়া যায়। বড় কার্প এবং অন্যান্য মৎস্য এই স্পোর্টিং গ্রাউণ্ডেই স্পনিং (Spawning) কার্য সমাধান করে। মৎস্য চাষীরা এই সকল স্থান হইতে ডিম এবং ধানী পোনা সংগ্রহ করে।

ব্রহ্মপুত্র নদীতে :

সাধারণতঃ পাহাড়ী এলাকার মধ্যে প্রবাহিত নদী, তাই এখানে বড় কার্প পাওয়া যায় কম। **সরলপুঁটি, স্বর্ণপুঁটি, বোয়াল, চিতল, ট্যাংরা** খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

গোদাবরী নদীতে :

রুই মাছ পাওয়া যায় না, তবে **কুর্চে বাটা, মৃগেল, কাতলা, ট্যাংরা** ইত্যাদি মাছই প্রধান।

হ্রদ ও জলাধার (Lakes & Reservoir) **:**

প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট হ্রদ এবং মনুষ্য সৃষ্ট বৃহদাকার জলাশয় মৎস্য সঞ্চয়ের আধার। আমাদের দেশে হ্রদের সামগ্রিক আয়তন প্রায় 0·72 মিলিয়ন হেক্টর। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক হ্রদগুলির মধ্যে পালনি পর্বতের কোদাই কানাল, শেভারয় পর্বতের ইয়ারকুড, নীলগিরি পর্বতের উটি এবং মণিপুরের লকগেট হ্রদ উল্লেখযোগ্য। বড় নদীতে বাঁধ দিয়া বিরাট জলাশয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই সকল জলাশয়ে নদী বাহিত মৎস্য আসিয়া সঞ্চিত হয়।

পুকুরে মৎস্য চাষ (Pond fishery) **:**

পুকুর দুই ধরনের হয়, যথা—মিষ্টি জলের পুকুর ও লবণাক্ত জলের পুকুর।

স্বাদু জলের পুকুরে প্রকৃতপক্ষে মৎস্য চাষ হয় এবং লবণাক্ত জলে চাষ কম হয়।

পুকুরের জল, উর্বরতা ও ফলন :

এই কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে পুকুরে মাছ তেমন বাড়িতেছে না, মাছের মাথা মোটা হইয়া যাইতেছে। এর উত্তরে একটা কথাই বলা যায়, পুকুরের পরিবেশ মাছের পক্ষে অনুকূল নয় এবং পুকুরে মাছের খাদ্যের অভাব হইতেছে। মাছের খাদ্যের চাহিদা দুইভাবে মিটিতে পারে—প্রথমতঃ পুকুরেই তৈরী মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যে ও দ্বিতীয়তঃ পুকুরে মাছের পরিপূরক খাদ্যের পরিবেশন। মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈয়ারী হওয়ার মূলে আছে পুকুরের উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা। গুণগত দিক হইতে পুকুরগুলিকে চারভাগে ভাগ করা যায়।

1. **অফলা পুকুর :** নূতন কাটা পুকুর, পুকুরের নীচে বালি ও কাঁকর বেশী থাকিলে কিংবা বহুদিনের ব্যবহার করা মজা পুকুর ও প্রচুর পাঁক জমা পুকুর মাছ চাষের পক্ষে অযোগ্য।

2. **কম ফলনশীল পুকুর :** খুব গভীরভাবে কাটা পুকুরে ও আগাছায় ভর্তি পুকুরে মাছের ফলন ভাল হয় না। এই পুকুরে কাদা ও পলির ভাগ শতকরা 10 ও 20 ভাগের কম। পুকুরে অতিরিক্ত মাছ থাকিলে কিংবা জিওল মাছ থাকিলে, সেই পুকুরকে কম ফলনশীল পুকুর বলে।

3. **সাধারণ ফলনশীল পুকুর :** এই পুকুর বেশী গভীর হয় না এবং সূর্যের আলো জলের নীচে মাটিতে পৌঁছায়। পুকুরের মাটি কালো ও কাদা জাতীয়। এই পুকুরে আগাছা ও জিওল মাছ থাকে না।

4. **বেশী ফলনশীল পুকুর :** এই পুকুর বেশী গভীর নয় এবং সূর্যের আলো জলের নীচে মাটিতে পৌঁছায়। এই পুকুরের মাটিতে কাদা, পলি ও বালির পরিমাণ যথাক্রমে 10, 20 ও 70 ভাগ। এই মাটির জল ধারণ ক্ষমতা ভাল। এই পুকুরে বাহির হইতে জল নেওয়ার ও পুকুর হইতে জল বাহিরে ফেলার ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার।

পুকুরের জলের ভৌত অবস্থা :

পুকুরের জলের ভৌত অবস্থা সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হইল।

(i) **পুকুরের গভীরতা :** জলের গুণ পুকুরের গভীরতার উপর নির্ভর করে। পুকুরের জলের গভীরতা বেশী হইলে সূর্যের আলো তলদেশে

পৌঁছাইতে পারে না। আবার গভীরতা কম হইলে জল গরম হইয়া যায়। 1·5 থেকে 2 মিটার পর্যন্ত জলের গভীরতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ii) **জলের উত্তাপ ঃ** জলের উত্তাপের উপর মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। শীতকালে পুকুরের জল ঠাণ্ডা থাকে, গরমকালে জল গরম থাকে। শীতের সময় পুকুরে মাছের বৃদ্ধির হার গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে জানা যায় শীতের দিনে মাছের বৃদ্ধি মাসে 10-12 গ্রাম হয়। কিন্তু একই রকম খাদ্যে গ্রীষ্মের দিনে ঐ মাছের বৃদ্ধি প্রতি মাসে প্রায় 30 গ্রাম হয়। শীতকালে পুকুরের জল 20° সেলেসিয়াসের নীচে থাকে এবং গ্রীষ্মকালে 34° সেলেসিয়াস অপেক্ষা বেশী হয়। জলের উত্তাপ মাছের বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

(iii) **জলের অস্বচ্ছতা ঃ** পুকুরের তলায় কাদা ও পাঁকের পরিমাণ বেশী হইলে জল বেশী ঘোলা দেখায়। প্লাংকটন বেশী থাকিলে জল অস্বচ্ছ হয় তবে প্লাংকটন থাকিলে মাছের ফলন ভাল হয়। জল অস্বচ্ছ হইলে সূর্যের আলো ভালোভাবে প্রবেশ করিতে পারে না।

(iv) **আলো ঃ** পুকুরে যাহাতে ভালোভাবে সূর্যের আলো পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। পুকুরের পাড়ে অনেক গাছপালা থাকিলে পুকুরে আলো পড়ে না, ফলে জলে মাছের স্বাভাবিক খাদ্য তৈয়ারী হয় না এবং মাছের বৃদ্ধিও কম হয়। ইহা ছাড়া পুকুরের উপরিতলে কচুরিপানা, ঝাঁঝি, পাতা শেওলা ইত্যাদি থাকিলে আলো জলের গভীরে প্রবেশ করিতে পারে না। অবশ্য পুকুরের পাড়ে কিছু গাছ থাকা ভাল যাহাতে গ্রীষ্মকালে গাছের ছায়া জলকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা রাখিতে পারে।

পুকুরের জলের রাসায়নিক অবস্থা

পুকুরের জলে যে সমস্ত গ্যাস দ্রবীভূত থাকে, তাহাদের মধ্যে বেশী প্রয়োজন অক্সিজেন। বেশীর ভাগ মাছই পুকুরের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উপর একান্তই নির্ভরশীল। জিওল মাছ অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে বাতাসের অক্সিজেন কিছু পরিমাণে গ্রহণ করে। জলের উপরিভাগে বায়ুমণ্ডল থেকে জলে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় জলজ উদ্ভিদ জলে অক্সিজেন ত্যাগ করে। তবে, তুলনামূলকভাবে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলে অক্সিজেন বেশী পরিমাণে আসে। জলের তলদেশের জৈব

পদার্থও কিছু পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে। জলজ উদ্ভিদও শ্বসনের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করে। কাজেই মাছের পক্ষে অপরিহার্য অক্সিজেন তুলনামূলকভাবে অনেক কমিয়া যায়। পুকুরের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দিনের বেলায় বেশী থাকে, রাতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক কম। মেঘলা দিনেও জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে।

জলে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ বেশী হইলে বা জলে উদ্ভিদের পচন শুরু হইলে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া যায়। জলে অক্সিজেনের পরিমাণ বজায় রাখিবার জন্য জলে একসঙ্গে বেশী জৈব সার দেওয়া হয় না। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 5 ppm বা তাহা অপেক্ষা বেশী থাকা ভাল। ppm (parts per million) কথাটির অর্থ হইল প্রতি দশ লক্ষ ভাগ জলে কত ভাগ অক্সিজেন আছে। অর্থাৎ প্রতি লিটার জলে কত মিলিগ্রাম অক্সিজেন আছে।

পুকুরের জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত থাকে। জলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেশী হইলে মাছের শ্বাসগ্রহণে অসুবিধা হয়। জলে 6 ppm-এর বেশী কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকিলে মাছের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বসনক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয় এবং পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়।

মোট এলকালিনিটি :

মাছ চাষের জন্য জলের ক্ষারত্ব জানা প্রয়োজন। ইহা যেমন হাইড্রক্সাইড অবস্থায় থাকিতে পারে, তেমন কার্বনেট, বাইকার্বনেট অবস্থায় থাকে। ইহা ppm দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পুকুরের জলের মোট ক্ষারত্ব 100 ppm হইতে 250 ppm-এর মতো হয়। পুকুরের জলে ক্ষারত্ব বৃদ্ধি পাইলে মাছের উৎপাদন হার বৃদ্ধি পায়।

জলের pH ক্রম :

জলের pH জানা না থাকিলে উপযুক্ত মাছ চাষ করা সম্ভব নয়। বিশুদ্ধ জলের pH ক্রম 7। সমস্ত অ্যাসিডের দ্রবণের pH ক্রম 7-এর নীচে এবং সমস্ত ক্ষারীয় দ্রবণের pH ক্রম 7-এর উপরে থাকে।

সাধারণতঃ পুকুরের জলের pH ক্রম 7-এর নীচে যায় না। পুকুরে জৈব সারের ব্যবহারে তাৎক্ষণিক pH ক্রম নামিয়া যায়, আবার চুণ প্রয়োগ

করিয়া pH ক্রম বৃদ্ধি করা হয়। pH ক্রম বেশী হইলে পুকুরের জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায় না।

জলে অন্যান্য দ্রবীভূত গ্যাস :

জলে দ্রবীভূত অবস্থায় অ্যামোনিয়া গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে থাকিতে পারে। ময়লা জল, মল-মূত্র ইত্যাদি জলে মিশিলে অ্যামোনিয়া গ্যাসের (NH_3) সৃষ্টি হয়। বেশী অ্যামোনিয়ার উপস্থিতিতে জলে পচা গন্ধ হয়।

পুকুরের জল অতিমাত্রায় দূষিত হইলে হাইড্রোজেন সালফাইডের (H_2S) উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

জলে দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ :

জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন কঠিন পদার্থ জলের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করে। পুকুরে উৎপাদন শক্তি বজায় রাখিবার জন্য ফসফরাস থাকা প্রয়োজন। প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত পচনশীল বস্তু হইতে ফসফরাস জলে মেশে এবং ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। মানুষের মূত্রে, পয়ঃপ্রণালী বাহিত জলে, জৈব সারে, মাটিতে ও জলে ফসফেট থাকে। ফসফেটের পরিমাণ জলে বৃদ্ধি পাইলে জলে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের বৃদ্ধির হার দ্রুত হয়। জলে ফাইটোপ্ল্যাংকটন বৃদ্ধি পাইলে মাছের বৃদ্ধির পরিমাণ অনেকগুণ বাড়ে। এছাড়াও জলে বিভিন্ন ধরনের দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ থাকে।

পুকুরের তলাকার মাটি :

পুকুরের নীচের মাটিতে বালির ভাগ বা কাঁকর বেশী থাকিলে এই রকম পুকুরে মাছের উৎপাদন ভাল হয় না। পুকুরের তলায় এঁটেল মাটি থাকিলেও মাছের উৎপাদন ভাল হয় না। পুকুরের নীচে নরম কাদা বা পলিমাটি থাকিলে উৎপাদন ভালো হয়। পুকুরের তলায় বেশী পরিমাণে জৈব পদার্থ জমা হইলেও উৎপাদন হ্রাস হয়। সাধারণতঃ যে সব অঞ্চলে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা আছে, সেই অঞ্চলের পুকুরের উৎপাদন শক্তি ভাল হয়। যে অঞ্চলের জমি অনুর্বর সেখানে পুকুরের উৎপাদন শক্তি কম হয়।

পুকুরে চাষ উপযোগী মাছ ও খাদ্য

কাতলা মাছ (*Catla catla*)

কাতলা মাছ ভারতের নদীর মাছ। কাতলা পুকুরের জলের উপরিতলের

খাদ্য গ্রহণ করে। কাতলা মাছ ছোট্ট অবস্থায় ছোট প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং পরিণত অবস্থায় শৈবাল, প্ল্যাংকটন ও খোলসযুক্ত অতি ক্ষুদ্র প্রাণী খায়। বদ্ধ জলাশয়ে কাতলা মাছের প্রজনন হয় না, বর্ষাকালে স্রোত-যুক্ত নদীতে প্রজনন হয়।

রুই (*Labeo rohita*)

ইহা নদীর মাছ। পুকুরের জলের মাঝামাঝি অংশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। রুই মাছ শাকাশী মাছ। ছোট অবস্থায় ইহারা জুপ্ল্যাংকটন এবং বড় অবস্থায় প্ল্যাংকটন ও জলজ উদ্ভিদের কচি অংশ খায়। ইহারা স্রোত-বিহীন জলে প্রজনন করে না, বর্ষাকালে নদীর জলে প্রজনন করে।

মৃগেল (*Cirrhina mrigala*)

মৃগেল নদীর মাছ। এই মাছ পুকুরের তলার খাদ্য অন্বেষণ করে। ইহারাও শাকাশী মাছ। ছোট অবস্থায় জুপ্ল্যাংকটন খায় এবং পরিণত অবস্থায় শৈবাল, প্ল্যাংকটন, পচা জলজ উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহাবশেষ খায়। রুই, কাতলার মত ইহারা স্রোতবিহীন জলে প্রজনন করে না।

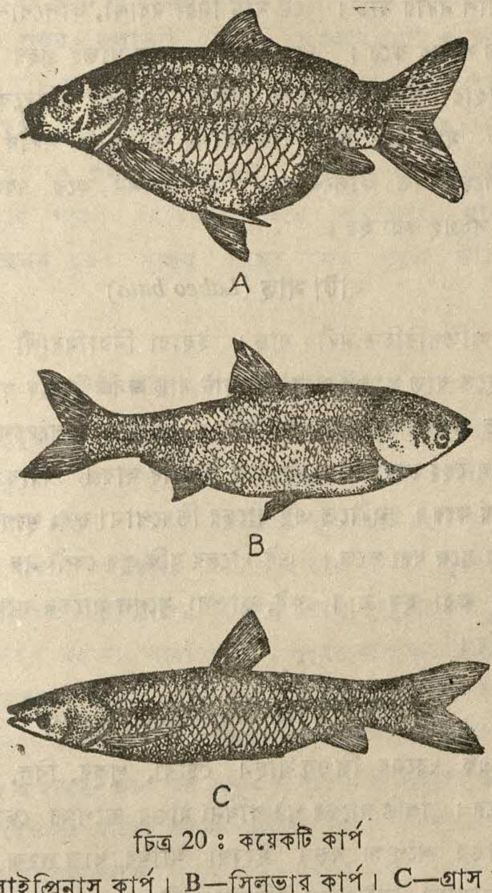
গ্রাস কার্প (*Ctenopharyngoden idella*)

গ্রাস কার্প চীন ও রাশিয়ার নদীর মাছ (চিত্র 20C)। চীনদেশের এই মাছ হংকং থেকে এদেশে আনা হয়। এই মাছের পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত নাম ঘেসো রুই। এই ঘেসো রুই শাকাশী মাছ। ইহারা ছোট অবস্থায় শৈবাল ও জুপ্ল্যাংকটন খায়, বড় অবস্থায় জলজ উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই মাছের বৃদ্ধির জন্য বাইরের খাদ্যের কোন আবশ্যকতা থাকে না, শুধুমাত্র পুকুরে জলজ উদ্ভিদের উপযুক্ত পরিমাণ থাকা বাঞ্ছনীয়। বদ্ধ জলাশয়ে এই মাছের প্রজনন হয় না। প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতিতে এই মাছের ডিমপোনা সংগৃহীত হয়। এই মাছের মুখের উপরের চোয়াল (Jaw) নীচের চোয়াল অপেক্ষা বড়।

সিলভার কার্প (*Hypophthalmichthys molitrix*)

এই মাছের দেশীয় নাম রুপালি রুই, চীন ও রাশিয়ার নদীর মাছ (চিত্র 20B)। জাপান হইয়া এই মাছ আমাদের দেশে আসিয়াছে। এই

মাছ রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের সঙ্গে একসঙ্গে চাষ করা হয়। এই মাছের নীচের চোয়াল (Jaw) উপরের চোয়াল অপেক্ষা বড়। ইহারা কাতলা মাছের মতো জলের উপরিতলের খাদ্য সংগ্রহ করে। এই মাছ ছোট অবস্থায় শৈবাল খায় ও পরিণত অবস্থায় ফাইটোপ্ল্যাংকটন, পচা জলজ উদ্ভিদ ও তাহাদের অবশিষ্টাংশ খায়। বদ্ধ জলাশয়ে সিলভার কার্পের প্রজনন হয় না, প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতিতে ডিমপোনা সংগৃহীত হয়। বিদেশী মাছের মধ্যে সিলভার কার্পের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশী।



চিত্র 20 : কয়েকটি কার্প

A—সাইপ্রিনাস কার্প। B—সিলভার কার্প। C—গ্রাস কার্প।

সাইপ্রিনাস কার্প (*Cyprinus carpio*)

সাইপ্রিনাস কার্প (চিত্র 20A) বিদেশী মাছ। সারা পৃথিবীতে এই

মাছের চাষ করা হয়। ভারতের সকল প্রদেশেই এই মাছের চাষ করা হয়। রুই, মৃগেল, কাতলা মাছের সঙ্গে একই জলাশয়ে চাষ করা হয়। ইহারা পুকুরের তলদেশের খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু এই মাছটি সর্বভুক। এই মাছ বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে। বর্ষাকালে ও শীতের শেষে এই মাছের প্রজনন শুরু হয়।

কালবোশ মাছ (*Labeo calbasu*)

কালবোশ নদীর মাছ। এই মাছ নিরামিষাশী, কালবোশ পুকুরের তল-দেশের খাদ্য সংগ্রহ করে। তবে এই মাছ সকল খাদ্যই গ্রহণ করে। ছোট অবস্থায় ইহারা জলজ উদ্ভিদ ও সঞ্চিত পচা জলজ উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। মাছ বড় হইলে তলদেশের পরিত্যক্ত পদার্থ খায়। রুই, কাতলা মাছের মত কালবোশ নদীতে প্রজনন করে এবং নদী হইতে ডিমপোনা সংগ্রহ করা হয়।

বাটা মাছ (*Labeo bata*)

বাটা অতিপরিচিত নদীর মাছ। ইহারা নিরামিষাশী মাছ, পুকুরের তলদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। ছোট মাছ জলজ উদ্ভিদ খায়। পরিণত মাছ গলিত জলজ উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ, পুকুরের তলদেশের জৈব পদার্থ, কাদামাটি, মাছের চারাপোনা, শৈবাল ইত্যাদি খায়। বর্ষাকালে বাটা মাছ প্রজনন কার্য করে। নদীতে এই মাছের ডিমপোনা রুই, মৃগেল ও কাতলার ডিমপোনার সঙ্গে ধরা পড়ে। এই মাছের বৃদ্ধি খুব বেশী নয় বলিয়া পৃথক-ভাবে চাষ করা হয় না। রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের সঙ্গে একই পুকুরে চাষ করা হয়।

শিঙি মাছ (*Heteropneustis fossilis*)

ইহা এক ধরনের জিওল মাছ। ডোবা, পুকুর, বিল, জলাভূমি সর্বত্র অবস্থান করে। শিঙি মাছের পৃষ্ঠ পাখনা মাগুর অপেক্ষা ছোট এবং পায়ু পাখনা মাগুর অপেক্ষা বড়। ইহারা আমিষ খাদ্য পছন্দ করে। ছোট অবস্থায় জলাশয়ের ছোট জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী খায়। পরিণত অবস্থায় কীট-পতঙ্গ, তাহাদের শূককীট, মূককীট ও পুকুরের তলদেশের জৈব পদার্থ খায়। পরিপূরক খাদ্য হিসাবে শুকনা মাছের গুঁড়া, ধানের কুড়ো, ভিজানো খোল

ইত্যাদি খায়। এরা গোবরও খায়। বর্ষাকালে শিঙি মাছ পুকুরে, ধানক্ষেতে, পুকুরের ধারের গর্তে প্রজনন করে। বর্ষাকালে জলের স্রোতে নিকটবর্তী জলাশয়ে যায়। ইহাদের ডিমগুলি জলজ উদ্ভিদের গায়ে লাগিয়া থাকে। ডিম পাড়ার 24 ঘণ্টার মধ্যেই ডিমপোনা বাহির হইয়া আসে।

মাগুর মাছ (*Clarius batrachus*)

জিওল মাছের মধ্যে মাগুর মাছ অন্যতম। ইহারা জলকাদামাটির মাছ। ডোবা, বিল, পুকুর, জলাভূমি ইত্যাদি যে কোন ছোট জলাশয়ে অবস্থান করে। শিঙি মাছ অপেক্ষা মাগুর মাছের পৃষ্ঠ পাখনা অনেক লম্বা। মাগুর মাছ পুকুরের তলদেশের পচা পাতা, জলজ উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ খায়। পরিপূরক খাদ্য হিসাবে শুকনা মাছের গুঁড়া, ধানের কুড়ো, সরিষার খোল, গোবর ইত্যাদি খায়। বর্ষাকালে পুকুরে, ধানক্ষেতে, মাগুর মাছের স্বাভাবিক প্রজনন হয়। মাগুর মাছের ডিম জলজ উদ্ভিদের সঙ্গে লাগিয়া থাকে।

কই মাছ (*Anabas testudineus*)

ডোবা, পুকুর, খাল, বিল, ছোট জলাজায়গা, ধানক্ষেতের বড় গর্ত ইত্যাদি জলাভূমিতে কই মাছ থাকে। ইহাদের খাদ্যাভাস অনেকটা শিঙি ও মাগুর মাছের মত। কই মাছ ছোট অবস্থায় ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী খায়। পরিণত অবস্থায় পতঙ্গ, তাহাদের শূককীট, মূককীট, শৈবাল, পচা জলজ উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ, সন্ধিপদ প্রাণী, পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত জৈব পদার্থ খায়। কই মাছ সাধারণতঃ যে পুকুরে বাস করে সেখানে প্রজনন করে না। বর্ষাকালে জলের স্রোতে অন্য পুকুর, বিল, ধানক্ষেতে চলিয়া যায় এবং প্রজনন কার্য করে। বর্ষাকাল শুরু হওয়ার পূর্বে যে বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির সময় কই মাছ প্রজননের জন্য অন্য পুকুর বা জলাশয়ে পরিযান করে। বৃষ্টির জলপূর্ণ আধারেও কই মাছের প্রজনন ঘটানো যায়। ইহাদের ডিম ছোট, স্বচ্ছ, জলতলে ভাসিয়া থাকে।

ল্যাটা মাছ (*Ophicephalus punctatus*)

ল্যাটা মাছ অতি পরিচিত মাছ। ডোবা, পুকুর, খাল, বিল, জলাভূমি,

ধানক্ষেত ইত্যাদি সকল জলাশয়ে ন্যাটা মাছ বাস করে। ন্যাটা মাছ আমিষপ্রিয় ও মৎস্যভূক মাছ। ছোট অবস্থায় ইহারা ছোট জলজ প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, বড় হইলে জলজ সন্ধিপদ প্রাণী, ক্ষুদ্র শামুক, কীটপতঙ্গ, তাহাদের শূককীট, মূককীট, মাছের ডিমপোনা, ধানীপোনা এবং ছোট মাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। প্রজননের সময় বর্ষাকাল। এই সময় পুকুরের বা জলাশয়ের ধারে ইহারা ছোট বাসা তৈয়ারি করে। কই মাছের মত এই মাছ বর্ষার শুরুতেই অন্য জলাশয়ে প্রজননের জন্য পরিযান করে। 24-40 ঘন্টার মধ্যে ডিম হইতে ডিমপোনা বাহির হইয়া আসে।

ট্যাংরা মাছ (*Mystus sp.*)

ট্যাংরা মাছ পশ্চিমবঙ্গে সকল ছোট জলাশয়ে অবস্থান করে। এই মাছকে পুকুরে চাষ করা হয় না। ইহারা আমিষপ্রিয় মাছ, ন্যাটা মাছের মতই ইহারা খাদ্য পছন্দ করে। বর্ষাকালে খাল, পুকুর, বিল, নদীতে প্রজনন করে। ট্যাংরা মাছের ডিম জলজ উদ্ভিদের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

বোয়াল মাছ (*Wallagonia sp.*)

বোয়াল মাছ আমাদের দেশের নদীর অন্যতম প্রধান মাছ। বোয়াল মাছ মৎস্যভূক, তাই পুকুরে চাষ করা হয় না। বোয়াল মাছ খুব বড় হয় এবং শক্তিশালী। বোয়াল মাছের মুখ বেশ বড় ও দাঁত যথেষ্ট শক্ত, ফলে মাছকে আক্রমণ করিতে পারে। রাত্রেই ইহারা খাদ্যের অন্বেষণ করে। এই মাছ গলিত প্রাণীকেও খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ইহারা বর্ষাকালে নদী ও নদীপ্লাবিত অঞ্চলে প্রজনন করে। বোয়াল মাছ সাধারণতঃ পুকুরে চাষ করা হয় না। কারণ ইহারা চারাপোনা, ধানীপোনাকে ধ্বংস করে। তবে বড় নদী, খাল বা জলাশয়ে চাষ করা হয়।

চিতল মাছ (*Notopterus chitala*)

ভারতবর্ষের বড় বড় নদী হইতে চিতল মাছ ধরা হয়। চিতল মাছ আমিষপ্রিয়, মৎস্যভূক মাছ। ছোট মাছই এই মাছের প্রধান খাদ্য, সেইজন্য পুকুরে বা অন্য মাছের সঙ্গে জলাশয়ে চিতল মাছের চাষ করা হয় না।

চিতল মাছ বর্ষাকালে নদীতে প্রজনন করে। ডিমগুলি জলের নীচে কোন আধারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই মাছের জনিতৃ যত্ন আছে।

ফলুই মাছ (*Notopteurs notopterus*)

ফলুই চকচকে রূপালী বর্ণের মাছ, বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিবার অতিরিক্ত শ্বসনযন্ত্র আছে। পুকুর, নদী, খাল, বিল সর্বত্র ফলুই মাছ থাকে। ইহারা আমিষপ্রিয় মাছ। পোকা, ছোট জলজ সন্ধিপদ প্রাণী ও ছোট মাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ছোট অবস্থায় ছোট জলজ প্রাণী খায়। বর্ষাকাল এই মাছের প্রজনন সময়। পুকুর বা জলাশয়ে স্ত্রী ফলুই কোন শক্ত আধারে ডিম পাড়ে। ডিম হইতে ডিমপোনা বাহির হইতে প্রায় সাতদিন সময় লাগে।

তিলাপিয়া মাছ (*Tilapia mossambica*)

তিলাপিয়ার দেশজ প্রচলিত নাম আমেরিকান রুই। তিলাপিয়া মাছ সর্বভূক। ছোট অবস্থায় ইহারা জুপ্ল্যাংকটন এবং বড় হইলে ফাইটোপ্ল্যাংকটন, জলের পোকা, সঞ্চিত জৈব পদার্থ খায়। ইহারা অন্যান্য মাছের ডিমপোনাকে ধ্বংস করে। পুকুরে বাহির হইতে পরিবেশন করা ধানের কুঁড়ো, খোল, পচা ফল, পাতা, খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ খায়। তিলাপিয়ার প্রজনন সারা বৎসর হয়। স্ত্রী মাছগুলি ডিম মুখে ধরিয়া রাখে। ইহাদের মুখের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া ডিমপোনা হয়। ডিমপোনা কিছুটা বড় হইলে মুখ হইতে বাইরে আসিয়া জলে পড়ে। এই মাছের প্রজননের হার অনেক বেশী এবং চাষেরও খরচ কম।

ইলিশ মাছ (*Hilsha ilisha*)

ইলিশ মাছ সমুদ্র উপকূলবর্তী মাছ, উপকূল হইতে ভারতের প্রধান নদী-সমূহে প্রবেশ করে। ইলিশ মাছ নিরামিশাষী—প্ল্যাংকটনভোজী। প্রজনন কালে সমুদ্র উপকূল হইতে নদীতে আসে। সাধারণতঃ লবণাক্ত জলে বাস করিলেও প্রজনন কালে ইহারা মিঠা জলে আসে। ইলিশ মাছ বৎসরের দুই সময়ে প্রজনন করে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষা শুরু হইলে ইলিশ মাছ নদীতে প্রবেশ করে। শীতকালে ডিসেম্বর, জানুয়ারী মাসে নদীতে ইলিশ মাছের প্রজনন হয়। প্রজননের পরেই ছোট চারা

ইলিশ মাছ সমুদ্রের দিকে পরিযান করে। সমীক্ষায় জানা যায় যে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হুগলী নদীতে ইলিশ মাছের প্রজনন হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলে সাধারণতঃ শীতকালে ইলিশ মাছ ধরা হয় এবং জুলাই মাস হইতে শীতের শুরু পর্যন্ত নদীতে ইলিশ ধরা হয়।

পুকুরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সার ও খাদ্য

পুকুরে স্বাভাবিক উৎপাদন শক্তি থাকা সত্ত্বেও সার প্রয়োগ করা হয় এবং পরিপূরক খাদ্য পরিবেশন করা হয়। পুকুরে সাধারণতঃ দুই ধরনের সার প্রয়োগ করা হয়, **রাসায়নিক সার ও জৈব সার**।

রাসায়নিক সার ঃ

মাছের অধিক ফলনের জন্য বর্তমানে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়। তার মধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সার সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হইয়াছে।

(i) **অ্যামোনিয়াম সালফেট ঃ** অ্যামোনিয়াম সালফেটে শতকরা 20·6 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এই সারের প্রয়োগে জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুত হয়, তবে জলে অম্লতার প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইলে চূণ প্রয়োগ করিতে হয়।

(ii) **ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ঃ** ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটে শতকরা 20·5 ভাগ নাইট্রোজেন আছে। ইহার প্রয়োগে জলের অম্লতা বৃদ্ধি পায় না।

(iii) **সুপার ফসফেট ঃ** পুকুরে খুব সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করা হয়। এই ফসফেট জলে দ্রবীভূত হয়, ইহাতে ফসফেটের পরিমাণ শতকরা 16 ভাগ থাকে।

(iv) **ইউরিয়া ঃ** ইউরিয়াতে শতকরা 45 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। যাবতীয় নাইট্রোজেন সারের মধ্যে ইউরিয়ার গুণাগুণ সর্বাধিক। ইউরিয়া প্রয়োগে জলে অম্লতা কম বৃদ্ধি পায়।

(v) **মিউরেট অফ পটাসিয়াম** (50%) ঃ এই সার প্রয়োগে পুকুরে শৈবাল বাড়ে, তবে পুকুরে এই সার সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হয় না।

চূণের ব্যবহার ও উপকারিতা ঃ

পুকুরে চূণের প্রয়োগ বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রচলিত। চূণের ক্যালসিয়াম অতি প্রয়োজনীয় প্রদার্থ। মাটিতে আম্লিক ভাব বেশী হইলে উৎপাদন ভাল

হয় না। চুণের প্রধান কাজ পুকুরের তলাকার মাটি ও পুকুরের অ্যাসিড দূর করা। চুণের অন্যান্য উপকারিতা নীচে আলোচনা করা হইয়াছে।

(i) চূণ প্রয়োগে জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, ফলে ব্যবহার-যোগ্য নাইট্রোজেন বাড়ে।

(ii) চূণ প্রয়োগে পুকুরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, ফলে জলের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(iii) জলে বেশীমাত্রায় চূণ প্রয়োগে ফসফেট বেশী পরিমাণে ব্যবহার করা যায়। অম্লধর্মী মাটিতে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম থাকে, তাহা ফসফেটকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু চূণ দেওয়ার ফলে ইহাদের দ্রবীভূত হইবার ক্ষমতা কমিয়া যায়, ফলে ফসফেট আবদ্ধ অবস্থা হইতে কিছুমাত্রায় উপযোগী হয়।

(iv) চূণের প্রয়োগে পটাশিয়ামের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ চূণ বেশী ব্যবহৃত হইলে পটাশিয়ামের সঞ্চয় মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

(v) চূণ জলাশয়ের বিষাক্ত গ্যাসের ক্ষমতাকে নষ্ট করে।

(vi) চূণ জলে মাছের ক্ষতিকারক পোকাকে ধ্বংস করে।

(vii) চূণ প্রয়োগে উপকারী জীবাণুর সজীবতা বৃদ্ধি পায়।

(viii) চূণ জলকে পরিষ্কার করে।

জল ও মাটির pH নির্ধারণ করিয়া চূণ দেওয়ার পরিমাণ ঠিক করা হয়। সাধারণভাবে জল প্রশম হয়, সেই ক্ষেত্রে পুকুরে বিঘা প্রতি 30 থেকে 40 k.g. চূণ প্রয়োগ করা যায়। তবে মাটিতে বা জলে অম্লতা বেশী হইলে চূণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। বর্ষার প্রারম্ভে চূণ মাটিতে যোগ করা হয় এবং লাঙল দ্বারা মাট চষিয়া চূণ ভালভাবে মিশাইয়া দেওয়া হয়। জল আছে এমন পুকুরে চূণ প্রয়োগ করিবার জন্য চূণ পুকুরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া দিতে হয়। জলে দ্রবীভূত চূণও পুকুরে যোগ করা হয়। তবে সাময়িকভাবে পুকুর হইতে জলজ উদ্ভিদ পরিষ্কার করিয়া চূণ দেওয়া উচিত।

জৈব সার ঃ

বর্তমানে রাসায়নিক সার পুকুরে ব্যবহার করিলেও জৈব সারের প্রয়োগ বহুল প্রচলিত। জৈব সারের মধ্যে মহুয়া খইল ও গোবর প্রধান। জৈব সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী থাকে।

(i) **সরিষার খইল ও মহুয়ার খইল ঃ** মাছের অধিকতর ফলনের

জন্য সরিষার খইল ও মহুয়ার খইল ব্যবহার করা হয়। সরিষার খইলে নাইট্রোজেন 4·8%, ফসফেট 2·0% ও পটাশ 1·3% থাকে। সরিষার খইল পুকুরের সারের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং মাছের পরিপূরক খাদ্য হিসাবে কাজ করে। অনেক সময় সরিষার খইলকে গোবরের সহিত মিশাইয়া জলে মিশান হয়। সরিষার খইল গুঁড়ো করিয়া জলের উপরিতলে ছড়াইয়া দেওয়া হয়, ইহা মাছের পরিপূরক খাদ্য হিসাবে কাজ করে।

মহুয়া খইল মাছ চাষে বিশেষ করিয়া নার্শারী পুকুরে ডিমপোনা হইতে ধানীপোনা উৎপাদনে বিশেষ অপরিহার্য। মহুয়া খইল জলে পচিয়া পুকুরের জলে নাইট্রোজেন ও ফসফেটের সামান্য পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে। মহুয়া খইলের ব্যবহারে জলে জলজ প্রাণীর সংখ্যা বাড়িয়া যায়। মহুয়া খইলে নাইট্রোজেন 2·51%, ফসফেট 0·80% ও পটাশ অক্সাইড 1·8% ভাগ থাকে। যে পুকুরে মাছ আছে, সেই পুকুরে মহুয়া খইলের ব্যবহার নিষিদ্ধ, শুধুমাত্র নার্শারী পুকুরে ব্যবহার করা হয়।

(ii) **গোবর সার:** গোবরে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ আছে। গোবর ও গোমূত্রে নিম্নলিখিত জিনিসের শতকরা পরিমাণ লেখা হইয়াছে।

	পটাশ	ফসফরাস	নাইট্রোজেন
গোমূত্র	1·40	অল্প পরিমাণে	1·00
গোবর	0·10	0·20	0·30

কাঁচা অবস্থায় গোবর পুকুরে যোগ করা হয়। গোবর মাটিতে গর্ত করিয়া কিছুদিন রাখিয়া দিলে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের মাত্রা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, পরে তাহা পুকুরে যোগ করা হয়।

(iii) **গোবর গ্যাস প্লান্ট:** গোবর গ্যাস প্লান্ট নিষ্কাশিত সারে নাইট্রোজেন শতকরা 1·2 থেকে 1·5 ভাগ থাকে। সুতরাং কাঁচা গোবর, বা জমানো গোবর অপেক্ষা নিষ্কাশিত সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী থাকে। গোমূত্র মাছের পুকুরে ব্যবহার কম হয়। গোবর জাতীয় সার মাছের পুকুরে দিলে, গোবর জীবাণুর সাহায্যে পচে, ফলে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ জলে মেশে। গোবর পুকুরপাড়ে গর্ত করিয়া নালার সাহায্যে পুকুরে যোগ করা হয়।

(iv) **সবুজ সার:** বর্ষার প্রারম্ভে শুষ্কভূমিতে ধনিচা চাষ করা হয়।

পুকুর বর্ষাকালে জলে পূর্ণ হইলে ধনিচা জলে পচে, জলে সারের সুফল আনে। অনেক অঞ্চলে শুকনা পুকুরে পুঁইশাক চাষ করিয়া পুকুরে সারের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ মেস্তা পাট পচাইয়া জলে ফসফেটের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। প্রায় এক বিঘা ক্ষেত্রফল ও এক মিটার গভীর পুকুরে 500-600 কিলোগ্রাম মেস্তা পচাইলে পুকুরে সারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(v) **কম্পোষ্ট সার**ঃ ঘাস, গাছের পাতা, কচুর শাক, কচুরিপানা, ঝাঁঝি, শেওলা প্রভৃতি একটি গর্তের মধ্যে গোবরের সঙ্গে পচান হয়। এই রকম জৈব পদার্থ পচাইয়া যে সার তৈয়ারী হয়, তাহাকে কম্পোষ্ট সার বলে। ভাল করিয়া পচান কম্পোষ্ট সার মাছ চাষের জন্য পুকুরে ব্যবহার করা হয়। কম খরচে কম্পোষ্ট সার তৈয়ারি করা যায় এবং পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

পুকুরে মাছের বৃদ্ধির জন্য পরিপূরক খাদ্য ঃ

পুকুরে মাছের বৃদ্ধির হার বাড়াইবার জন্য জলে পরিপূরক খাদ্য নির্দিষ্ট সময়ে পরিমাণমত যোগ করা হয়। পুকুরে অনেক মাছ একসঙ্গে চাষ করিলে পুকুরে মাছের খাদ্যাভাব ঘটে। সার প্রয়োগে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, আবার উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের জন্য পরিপূরক খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

পরিবেশন করা খাদ্য প্রধানতঃ দুই ধরনের হয়, যথা—উদ্ভিদজাত খাদ্য ও প্রাণিজাত খাদ্য। পুকুরে সাধারণ মাছের জন্য উদ্ভিদজাত খাদ্য ব্যবহার করা হয়, তবে প্রাণিজ খাদ্যও প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। প্রাণিজ খাদ্যের মধ্যে শুকনা মাছ, মাছের গুঁড়া, ফিশমিল, শামুকের মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। নার্শারী পুকুরে ধানীপোনা চাষ করিবার জন্য ফিশমিল ব্যবহার করা হয়। পুকুরে জিওল মাছের পরিপূরক খাদ্য হিসাবে ফিশমিল, শুকনা মাছ, কেঁচো, শামুকের মাংস ও রেশম পোকার পরিত্যক্ত গুটি ব্যবহার করা হয়।

উদ্ভিদজাত খাদ্য হিসাবে সরিষার খইল, বাদামের খইল, চালের কুঁড়ো, ভাঙা গম, ময়দা, আটা, ডালগুঁড়ো ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

খাদ্যের পরিমাণ ও খাদ্য পরিবেশনের পদ্ধতি ঃ

জলের উপরিতলে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কয়েকদিন এইভাবে খাদ্য পরিবেশনের ফলে এই খাদ্যের সঙ্গে মাছের পরিচিতি ঘটে।

পরিপূরক খাদ্যের যোগানের উপর মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। খাদ্যের পরিমাণ সাধারণভাবে প্রথম ক্ষেত্রে পুকুরের মাছের আনুমানিক ওজনের শতকরা দুই-তৃতীয়াংশ হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শতকরা পাঁচভাগের চারভাগ হয়।

অনেক ক্ষেত্রে এই খাদ্য কোন পাত্রে, বাঁশের ঝুড়িতে করিয়া পরিবেশন করা হয়। সাধারণতঃ সকালে খাদ্য পরিবেশন করা শ্রেয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য দেওয়া হয়, লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে প্রয়োজন অতিরিক্ত খাদ্য জলে না মেশে। তাছাড়া কয়েকদিন অন্তর কয়েকটি মাছকে ধরিয়া ওজন করিয়া অনুমান করা যায় যে মাছের বৃদ্ধি উপযুক্ত হইয়াছে কিনা? এইজন্য প্রতিমাসে নির্দিষ্ট দিনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মাছের দৈর্ঘ্য, ওজন নির্ধারণ করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখা হয়, ফলে মাছের বৃদ্ধির অনুমান করা যায়।

সাধারণতঃ খাদ্যের সঙ্গে মাছের আনুপাতিক বৃদ্ধির হার নির্ভর করে। ধরা যাউক যে কোনও ছোট পুকুরে 5 কিলোগ্রাম চারাপোনা ছাড়া হইয়াছে এবং বৎসরের শেষে 50 কিলোগ্রাম হইয়াছে। তাহা হইলে এক বৎসরে মাছের ওজনের বৃদ্ধি 45 কিলোগ্রাম হইয়াছে। ধরা যাউক এই পুকুরে 225 কিলোগ্রাম খাদ্য পরিবেশন করা হইয়াছে, অর্থাৎ 1 কিলোগ্রাম বৃদ্ধির জন্য $\frac{225}{45}=5$ কিলোগ্রাম খাদ্যের প্রয়োজন হইয়াছে। পুকুরে খাদ্য পরিবেশন করিয়া মাছ বড় করিবার প্রথা বিশেষ প্রচলিত নহে, তবে মিশ্র চাষের পক্ষে খাদ্য পরিবেশন করা অপরিহার্য। মাছের পরিপূরক খাদ্য ব্যবহার করিলে উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী মাছ চাষ কেন্দ্রে পরিপূরক খাদ্য পুকুরে যোগ করা হয়।

নার্শারী বা আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনার চাষ ঃ

ধান চাষের মতো মাছ চাষের ক্ষেত্রে আঁতুড় পুকুর (Nursery tank) তৈয়ারি করা প্রয়োজন। ডিমপোনা হইতে ধানীপোনা উৎপাদন করিবার পুকুরকে ইংরাজীতে Nursery tank বলে। ডিম হইতে সদ্য ফোটা দুই-তিনদিনের পোনাকে **ডিমপোনা** বলে। আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনা লালন করা হয়, আঁতুড় পুকুর তৈয়ারি করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখা হয়।

(i) পুকুরের যাবতীয় আগাছা পরিষ্কার করা হয়।

(ii) জলে মহুয়া খইল প্রয়োগ করিয়া চুনো ও মাছ খেকো মাছ মারিয়া ফেলা হয়।

(iii) জাল দিয়া পুকুরের যাবতীয় পোকা ও ছোট প্রাণী, কম্বোজ, কাঁকড়া ইত্যাদি তুলিয়া ফেলা হয়।

(iv) মাছের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস করিবার জন্য পুকুরের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য পুকুরে চুণ প্রয়োগ করা হয়।

(v) পুকুরের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়।

(vi) আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনা ছাড়িবার 24 ঘণ্টা পূর্বে তেলের ও সাবানজলের মিশ্রণ ছড়াইয়া হাঁসপোকা বা তাঁতপোকা মারিয়া ফেলা হয়।

(vii) ডিমপোনা ছাড়িবার পর প্রতিদিন পরিপূরক খাদ্য আঁতুড় পুকুরে প্রয়োগ করা প্রয়োজনীয়।

আঁতুড় পুকুরে আগাছা পরিষ্কার ঃ

পুকুরে যদি শৈবালের পরিমাণ বেশী থাকে, তখন জলের উপর গুঁড়ি পানার আস্তরণ দেওয়া হয়। গুঁড়ি পানার অভাবে টোপা পানা দিয়েও জলের উপরের স্তর ঢাকিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে সূর্যের আলো জলের গভীরে প্রবেশ না করিতে পারে। সূর্যের আলোর অভাবে জলের শৈবাল মারা যায়। আস্তরণ দেওয়ার 10-15 দিন পরে ও ডিমপোনা ছাড়িবার পূর্বে ঐ আস্তরণ তুলিয়া ফেলা হয়।

মহুয়া খোলের ব্যবহার ঃ

আঁতুড় পুকুর তৈয়ারি করিবার জন্য মহুয়া খইল ব্যবহার করা হয়। মহুয়া খইলের পরিমাণ ঠিকমতন হইলে পুকুরের যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংস হইয়া যায়। মহুয়া খইল প্রথমে জলে বিষক্রিয়া শুরু করে, পরে মহুয়া খইল সার হিসাবে কাজ করে এবং সেই সময়ে পুকুরে যথেষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণী উৎপন্ন হয়। মহুয়া খইল ব্যবহার করিয়া মাছখেকো মাছেদের ধ্বংস করা হয়, অনেক পোকাও মারা যায়। $7\frac{1}{2}$ বিঘার ও আধ মিটার গভীর পুকুরে 1,250 কিলোগ্রাম মহুয়া খইল দিতে হয়। অর্থাৎ এক কিলোলিটার জলে 250 গ্রাম মহুয়া দরকার, সেইভাবে কিউবিক লিটারকে 0·250 কিলোগ্রাম দ্বারা গুণ করা হইলে মহুয়া খইলের পরিমাণ জানা যায়।

মহুয়া খইল প্রয়োগের ফলে মাছ, গেঁড়ি, গুগলি মারা যায় এবং জলকে উৎপাদনশীল করে। জাল দ্বারা মাছ ও পোকামাকড় তুলিয়া ফেলা হয়।

সাধারণতঃ মহুয়া খইল প্রয়োগের 15-20 দিনের জল স্বাভাবিক ও উৎপাদনশীল হয়।

জৈব সার প্রয়োগ :

আঁতুড় পুকুরে উর্বরতা বাড়াইবার জন্য গোবরই জৈব সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। 1 কাঠার পুকুর তৈয়ারি করিবার জন্য বছরে 50 কিলোগ্রাম গোবরের প্রয়োজন হয়। একটি 6 কাঠার পুকুর হইতে যদি চারিবার ধানীপোনা উৎপাদন করা হয়, তবে প্রথমে 25 কিলোগ্রাম গোবর পুকুরে দেওয়া হয়, পরের তিনবারে 10 কিলোগ্রাম করিয়া গোবর জলে যোগ করা হয়।

রাসায়নিক সার প্রয়োগ :

পুকুরে গোবর সার প্রয়োগে জলের অম্লত্ব বাড়ে ও মাছের রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। চূণ প্রয়োগ করিলে জলের অম্লতা হ্রাস পায় এবং জীবাণু মারা যায়। পুকুরের মাটিতে জমা দূষিত গ্যাস দূর করিবার জন্য চূণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জলের pH-এর উপর নির্ভর করিয়া জলে চূণ যোগ করা হয়। জলের pH যদি 6·5 থেকে 7·5 হয় তবে 1 কাঠা পুকুরে বছরে প্রায় $1\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম চূণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

এছাড়া আঁতুড় পুকুরে ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, ম্যাঙ্গানিজ সালফেট, প্রয়োগ করা হয়। ইউরিয়া মাটির সঙ্গে মেশাইয়া ডেলা করিয়া জলে ফেলা হয়। সুপার ফসফেট, ম্যাঙ্গানিজ সালফেট জলে দ্রবীভূত করিয়া পুকুরের জলে প্রয়োগ করা হয়।

পোকা মারিবার পদ্ধতি :

আঁতুড় পুকুরে পোকা ডিমপোনা ধ্বংস করে। ঘন চটজাল পুকুরে ফেলিয়া অনেক কীটপতঙ্গ তুলিয়া ফেলা হয়। হাঁসপোকা ও অন্যান্য ছোট পোকা মারিবার জন্য সাবান ও তেলের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। এই সকল পোকারা বাতাস হইতে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করিবার জন্য জলের উপরের স্তরে ভাসিয়া উঠে। সাবান, জল ও তেল ভালভাবে মিশাইয়া জলের উপর যোগ করা হয়। এই মিশ্রণ পুকুরের জলের উপর একটি আস্তরণ সৃষ্টি করে ফলে ঐ সকল পোকারা জলের উপরিতল হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে না, ফলে পতঙ্গ মারা যায়। কেরোসিন তেল দ্বারা জলের উপরিভাগ ঢাকিয়াও পতঙ্গ বিনাশ করা হয়। গ্যামাক্সিন্ খুব সামান্য পরিমাণে 0·2 ppm জলে প্রয়োগ করিয়াও পতঙ্গ মারা যায়।

হেক্টর প্রতি 18 কিলোগ্রাম কাপড়কাচা সাবান গরম জলে দ্রবীভূত করিয়া সাবানের জল তৈয়ারি করা হয়। 54 কিলোগ্রাম উদ্ভিজ্জ তৈল সাবান জলের সহিত মিশাইয়া জলের উপরিভাগে প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে রেড়ীর তৈল, তিসির তৈল, হাইস্পীড ডিজেল তৈল ব্যবহার করা হয়। সাবানের বদলে বাজারের কমদামের গুঁড়া সাবান ব্যবহার করা হয়।

ডিমপোনা ছাড়িবার পরিমাণ ঃ

প্রতি বিঘা নার্শারী পুকুরে দুইলাখ হইতে চারলাখ ডিমপোনা ছাড়া হয়। পুকুরে স্বাভাবিক খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া ডিমপোনার পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো হয়। একই পুকুরে একসঙ্গে অনেক ডিমপোনা না ছাড়িয়া বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দুই-তিনবার ডিমপোনা ছাড়া হইলে অধিক পরিমাণে ধানীপোনা উৎপাদন করা হয়। দ্বিতীয়বার ডিমপোনা ছাড়িবার পূর্বে পুকুরে গোবর সার প্রয়োগ করিয়া পুকুরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা হয়। যে পাত্রে ডিমপোনা আনা হয় সেই পাত্রটি কিছুক্ষণ আঁতুড় পুকুরে ডুবাইয়া রাখা হয়, যাহাতে পাত্রের জল ও পুকুরের জলের তাপের সমতা আসে। এছাড়া দিনের বেলায় পুকুরের ডিমপোনা ছাড়া হয় না, সন্ধ্যার পূর্বে ডিমপোনা ছাড়া হয়।

পরিপূরক খাদ্যের ব্যবহার ঃ

ডিমপোনা চাষ করিবার জন্য পরিপূরক খাদ্যের ব্যবহার প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ চালের কুঁড়া, বাদাম খোলের গুঁড়া ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বাদাম, সরিষা, নারকেলের খইল, চালের গুঁড়া, ডালের গুঁড়া, ফিশমিল বাড়তি খাদ্য হিসাবে পরিবেশন করা হয়। চালের কুঁড়ার বদলে গমের ভূষি, যব বা বাজরার ভূষিও ব্যবহার করা হয়। কুঁড়া বা গুঁড়া খুব মিহি কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া হয়, যাহাতে ডিমপোনারা সহজেই খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে।

সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গায় শুঁটকি মাছের গুঁড়া সুলভে পাওয়া যায়, ফলে ঐ খাদ্য আঁতুর পুকুরে প্রয়োগ করা হয়। বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে রেশম সুতার জন্য পলু পোকার চাষ করা হয়। সুতা কাটিবার পর এই পোকা শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া ডিমপোনাকে খাওয়ানো চলে।

মাছের খাদ্যের সঙ্গে কোবাল্ট ক্লোরাইড মেশাইলে ডিমপোনার বাঁচার

হার বৃদ্ধি পায়। প্রতি দুইলক্ষ ডিমপোনার জন্য প্রতিদিন দুই গ্রাম কোবাল্ট ক্লোরাইড পুকুরে যোগ করা হয়। দুই বা তিনদিন বয়সের ডিমপোনার ওজন হয় 0·0014 গ্রাম অর্থাৎ দুইলক্ষ ডিমপোনার ওজন হয় 280 গ্রাম। এই সময় ডিমপোনার খাদ্যের চাহিদা অনেক বেশী ফলে প্রথম পাঁচদিন শরীরের ওজনের চারগুণ খাদ্য দেওয়া হয়, অর্থাৎ প্রথম পাঁচদিন 280 × 5 = 1 কিলোগ্রাম 120 গ্রাম খাদ্য দেওয়া হয় এবং পরের পাঁচদিন আটগুণ খাদ্য 280 × 8 = 2 কিলোগ্রাম 240 গ্রাম খাদ্য প্রতিদিন পুকুরে দেওয়া হয়। পুকুরে উৎপাদন ক্ষমতা বেশী হইলে খাদ্যের পরিমাণ কম করা যাইতে পারে। 25 লিটার জল ছাঁকিয়া যদি 1 ঘন সেন্টিমিটার পরিমাণ প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ কণা পাওয়া যায় তাহা হইলে বোঝা যাইবে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা ভালো।

ডিমপোনাকে দশদিন এইভাবে খাওয়ানোর পর তাহারা ধানীপোনায় পরিণত হয়। পরের দুই-একদিন কোনও পরিপূরক খাদ্য দেওয়া হয় না এবং আঁতুড় পুকুর হইতে তুলিয়া ফেলা হয়। খুব গরমের দিনে বা বর্ষাকালে ধানীপোনা সংগ্রহ না করাই ভালো, ধানীপোনা তোলার উপযুক্ত সময় ভোরবেলা।

ধানীপোনা তোলার পর আঁতুড় পুকুরে আবার গোবর সার দেওয়া হয়। গোবর সার দেওয়ার সাতদিন পর চুণ দিয়া পুকুর সংস্কার করিয়া তাহার সাতদিন পর সাবানজল ও তৈলের মিশ্রণ পুকুরে যোগ করা হয়। ইহার পর চটজাল টানিয়া পোকা অপসারিত করিয়া ডিমপোনা ছাড়িবার উপযুক্ত পরিবেশ করা হয়। এইভাবে একই পুকুরে আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে দেশী ও বিদেশী পোনামাছের ডিমপোনার চারবার চাষ করা হয়। তবে প্রথম বারের হার আঁতুড় পুকুরে কম পরিমাণে ডিমপোনা ছাড়া হয়। শীতের সময়ে এই আঁতুড় পুকুরে আমেরিকান রুই মাছের ডিমপোনার চাষ করা হয়।

পালন পুকুর তৈয়ারী ও ধানীপোনার চাষ

আঁতুড় পুকুরে উৎপাদিত ধানীপোনা উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার ফলে প্রায় 15 দিনের মধ্যে দৈর্ঘ্যে 20 মি. মি. হইতে 25 মি. মি. হইতে পারে। আঁতুড় পুকুরে ধানীপোনা বেশীদিন রাখা হইলে মারা যায় এবং বাড়েও না।

এই ধানীপোনাকে অপেক্ষাকৃত বড় পালন পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়। ধানীপোনার চাষে তিনমাস মাত্র সময় লাগে। পালন পুকুর এক বিঘার মধ্যে হলেই ভালো হয় এবং 4 ফুট হইতে 5 ফুট পর্যন্ত জল থাকা উচিত। পালন পুকুর প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলা উচিত—

(i) পুকুরের আগাছা ও শৈবাল পরিষ্কার করা।

(ii) মহুয়া খইল প্রয়োগ করিয়া যাবতীয় জীবদের ধ্বংস করা হয় এবং গ্রীষ্মকালে পুকুরের জল শুকাইয়া যাইলে গোবর সার প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়।

(iii) চুণ দ্বারা পুকুর সংস্কার করা।

(iv) জাল টানিয়া জলাশয়ের পতঙ্গ মারিয়া ফেলা।

(v) ভোরবেলা বা সন্ধ্যাবেলা পুকুরে ধানীপোনা ছাড়া।

(vi) ধানীপোনা ছাড়িবার পরে নির্দিষ্ট সময়ে পুকুরে সার প্রয়োগ।

(vii) পালন পুকুরে প্রতিদিন পরিপূরক খাদ্যের পরিবেশন।

(viii) নির্দিষ্ট সময়ে পালন পুকুর হইতে উৎপাদিত চারাপোনা মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করা বা বিক্রী করা।

আঁতুড় পুকুরের ন্যায় পালন পুকুরেও সার প্রয়োগ করিতে হয়। এখানেও চুণ প্রয়োগ আঁতুড় পুকুরের মত, মহুয়া খইলের পরিমাণও এক রকম। গোবর সারের পরিমাণও একপ্রকার। পুকুরে প্রতিমাসে পরিমাণমত গোবর সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়। বিঘা প্রতি পুকুরে 8 কিলোগ্রাম সুপার ফসফেট, 8 কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং 200 কিলোগ্রাম গোবর সার প্রয়োগ করা হয়।

পালন পুকুরে ধানীপোনা ছাড়িবার পূর্বে রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের কি অনুপাত আছে, তাহা জানিয়া লওয়া হয়। প্রতি 100 ধানীপোনাতে রুই, কাতলা ও মৃগেলের অনুপাত 40 : 30 : 30 হওয়া প্রয়োজন। পালন পুকুরে কত পরিমাণ ধানীপোনা ছাড়া হইবে তাহা নির্ভর করে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতার উপর। সাধারণভাবে বিঘাপ্রতি 20,000 হইতে 50,000 ধানীপোনা ছাড়া হয়।

প্রতিদিন পালন পুকুরে ধানীপোনার ওজনের শতকরা তিনভাগ খাদ্য দিতে হয়। একটি ধানীপোনার (25 মিলিমিটার) ওজন প্রায় 0·3 গ্রাম হয়, সেই হিসাবে প্রতিদিন প্রতিটি ধানীপোনার জন্য 0·009 গ্রাম খাদ্য

দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং 20,000 ধানীপোনার ওজন হইবে 6000 গ্রাম, অর্থাৎ শতকরা তিনভাগ খাদ্য 180 গ্রাম প্রতিদিন পরিপূরক খাদ্য হিসাবে পালন পুকুরে দেওয়া হয়। মাছ বা পলুর গুঁড়া, কুঁড়া, ভূষি ও খইল পরিপূরক খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রতিমাসে জাল টানিয়া মাছের ওজন দেখিয়া মাছের খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ ধানীপোনা বাড়িয়া যদি এক গ্রাম হয়, তবে 20,000 ধানীপোনার ওজন হইবে 20 কিলোগ্রাম। এই 20,000 ধানীপোনার ওজনের শতকরা তিনভাগ হিসাবে প্রতিদিন 600 গ্রাম পরিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই খাদ্যের মধ্যে কুঁড়ো বা ভূষি 300 গ্রাম ও 300 গ্রাম খইল লাগে। পলু বা মাছের গুঁড়া ব্যবহার করিলে প্রতিটি খাদ্য 200 গ্রাম করিয়া প্রয়োজন হয়। আবার তৃতীয় মাসের গোড়ায় জাল টানিয়া মাছের গড় ওজন দেখিয়া লইয়া একই নিয়মানুযায়ী ওজনের শতকরা তিনভাগ হিসাবে খাদ্যের যোগান দেওয়া হয়। ধানী-পোনার যদি কোন রোগ না হয় ও সঠিকভাবে পরিপূরক খাদ্য দেওয়া হয় তাহা হইলে ধানীপোনা 100 মিলিমিটার হইতে 150 মিলিমিটার চারা-পোনায় রূপান্তরিত হয়।

বর্ষাকালে বাইরের নোংরা জল পালন পুকুরে মিশিয়া জলকে দূষিত করে এবং শীতকালে মাছ কম খাদ্য গ্রহণ করায় দুর্বল হইয়া পড়ে। শীতকালে প্রতি কিলোগ্রাম পরিপূরক খাদ্যের জন্য একগ্রাম ঈষ্টের বড়ি ব্যবহার করা হয়। ঈষ্টের বড়ি সামান্য গরম জলে গুলিয়া লইয়া পরিপূরক খাদ্যের সহিত মিশাইয়া পালন পুকুরে দেওয়া হয়।

আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র ও আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ দেশীপোনা, সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্প চাষ করিবার পর পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত তৃতীয়বারে আমেরিকান রুই-এর ধানীপোনা ছাড়া হয়। মাঘ ও ফাল্গুন মাস হইতেই মাছের দৈর্ঘ্যের ও ওজনের বৃদ্ধি ঘটে। তৃতীয় ফলন তুলিবার পর পালন পুকুরে বড় মাপের (এক কিলোগ্রামে 50টি) মাগুর মাছ ছাড়িয়া দিলে বৈশাখ মাসের শেষে ভাল ফলন পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার ধানীপোনা চাষ করিবার জন্য পালন পুকুর তৈয়ারি করিতে হয়।

মজুত পুকুরে মাছ চাষ

এক বিঘা হইতে পনের বিঘা পর্যন্ত পুকুরে মাছ চাষ করা হয়।

সাধারণতঃ সমস্ত বৎসর পুকুরে জল থাকে এমনকি গ্রীষ্মকালেও জলের গভীরতা তিন-চার ফুটের বেশী হয়। চারিদিকে বাঁধ থাকে, এই রকম আয়তনের পুকুরে মাছ চাষ করা হয়। মজুত পুকুরে মাছ চাষের উদ্দেশ্য হইল কম সময়ে বেশী পরিমাণে খাওয়ার উপযুক্ত মাছ উৎপাদন করা। গড়ে এক কিলোগ্রাম ওজনের মাছকে খাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হয়। প্রতি বৎসর সময় মত পুকুরে চারাপোনা ছাড়া হয়, যত্ন ও পরিচর্যা সহকারে মজুত পুকুরে চাষ করা হয়। মজুত পুকুরে মাছ ছাড়িবার পূর্বে পুকুরের সংস্কার প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে এই মজুত পুকুরে ডিমপোনা বা ধানী-পোনা ছাড়া হয়, কিন্তু সেইক্ষেত্রে মাছ বড় হয় না। কারণ পুকুরের মৎস্য-ভুক মাছেরা ডিমপোনা বা ধানীপোনাকে ধ্বংস করে।

মজুত পুকুর পরিচালন ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলা উচিত—

(i) কায়িক পরিশ্রমে ও ঘেসো রুইকে কাজে লাগিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা হয়।

(ii) পদ্ম, শালুক, কচুরিপানা, টোপাপানা, ঝাঁঝি ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়।

(iii) ছোট মজুত পুকুরে বিঘা প্রতি 350 কিলোগ্রাম মহুয়া খইল প্রয়োগ করিয়া মৎস্যভুক মাছ ধ্বংস করা হয়।

(iv) বিঘা প্রতি বছরে 40 কিলোগ্রাম চুণ দ্বারা পুকুর সংস্কার করা হয়। প্রথম মাসে 20 কিলোগ্রাম এবং বাকি পরের দশ মাসে 2 কিলো-গ্রাম করিয়া চুণ দিতে হয়। শেষ মাসে চুণ লাগে না।

(v) মহুয়া খইল প্রয়োগ না করিয়া রাসায়নিক সার ও জৈব সার প্রয়োগ করিয়া মজুত পুকুরের উর্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। প্রথম মাসে বিঘা প্রতি 1,000 কিলোগ্রাম এবং পরের দশ মাসে বিঘা প্রতি 100 কিলোগ্রাম গোবর সার প্রয়োগ করা হয়। প্রতিমাসে 4 কিলোগ্রাম করিয়া দশ মাসে মোট 40 কিলোগ্রাম ইউরিয়া জলে যোগ করা হয়।

বিঘা প্রতি চারাপোনা 5 সেন্টিমিটারের মত 1000 থেকে 2000 সংখ্যায় ছাড়া যায়। 10 সেন্টিমিটারের মত চারাপোনা 600 থেকে 1000 সংখ্যায় ছাড়া যাইতে পারে। মজুত পুকুরে কাতলা, রুই ও মৃগেল মাছের চারাপোনা ছাড়া হয়, তাহাদের অনুপাত হয় 40 : 30 : 30।

এই মজুত পুকুরে মাছের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পরিপূরক খাদ্য পরিবেশন করিতে হয়। এই খাদ্যের পরিমাণ হয় মাছের ওজনের শতকরা তিনভাগ। যেমন, ধরা যাক মজুত পুকুরে 20 কিলোগ্রাম চারাপোনা ছাড়া হইয়াছে, তাহা হইলে শতকরা তিনভাগ খাদ্যের ওজন হইবে 600 গ্রাম। এই 600 গ্রাম পরিপূরক খাদ্য প্রতিদিন পুকুরে দেওয়া হয়, এই খাদ্যের মধ্যে 300 গ্রাম সরিষার খইল ও 300 গ্রাম ধানের কুঁড়া থাকে। মাছের ওজন বৃদ্ধি পাইলে সেই অনুপাতে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইতে হয় তবে শীতকালে দেহের ওজনের শতকরা 2 ভাগ খাদ্য দেওয়া হয়।

পুকুরে মাছ ছাড়িবার পর প্রতিমাসে বা নির্দিষ্ট সময়ে পুকুরে জাল ফেলিয়া মাছের দৈর্ঘ্য, ওজন ও স্বাস্থ্য নির্ধারণ করা হয়। মাছ কোন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে কিনা বা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা হয়।

সাধারণভাবে মজুত পুকুরে একর প্রতি 450 কিলোগ্রাম মাছ পাওয়া যায়। কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী বাহিত ময়লা জলের ভেড়ীতে একর প্রতি উৎপাদন 1000 কিলোগ্রাম হয়। সাধারণতঃ কাতলা মাছের বৃদ্ধি ভাল হয়, মৃগেল মাছের বৃদ্ধি অনেক কম হয়।

সাধারণভাবে কোন পুকুরে এক বৎসরে বিঘাপ্রতি 150 কিলোগ্রাম মাছের উৎপাদন সম্ভব হয়। যে চারাপোনা ছাড়া হয়, তাহাদের গড় ওজন 20 গ্রাম, এই মাছের এক বছরে ওজন হইবে 520 গ্রাম। অর্থাৎ মাছের 500 গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। একটি মাছের যদি 500 গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে 150 কিলোগ্রাম মাছ উৎপাদনের জন্য $\frac{150 \times 1000}{500} = 300$টি চারাপোনা প্রয়োজন হয়। পুকুরে চারাপোনা কিছু মারা যায়, সেইজন্য শতকরা 10টি চারাপোনা অর্থাৎ 150 কিলোগ্রাম মাছ উৎপাদনের জন্য 330টি চারাপোনা ছাড়া প্রয়োজন।

কিন্তু প্রতি 100টি চারাপোনাতে রুই 30, কাতলা 40 ও মৃগেল 30টি থাকে। সেই অনুপাতে মৃগেল, রুই ও কাতলার ওজন হইবে 7·5 কি. গ্রা. + 11·25 কি. গ্রা. + 20 কি. গ্রা. = 38·75 কিলোগ্রাম। এই 100টি মাছের ওজনকে, মোট উৎপাদনের ওজন দ্বারা ভাগ করা হয়। যে মাছের চারাপোনার সংখ্যা জানিবার প্রয়োজন, তাহার আনুপাতিক হার দিয়া গুন করিলে সেই মাছের চারাপোনার সংখ্যা জানা যাইবে। যেমন কাতলার

আনুপাতিক সংখ্যা $(150 \div 38 \cdot 75) \times 40 = 155$। ইহার সঙ্গে শতকরা দশভাগ বৃদ্ধি পাইলে সংখ্যা দাঁড়ায় 170।

পুকুরে মিশ্র মাছ চাষ (Composite fish culture)

আমাদের দেশে রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছ একত্রে চাষ করিয়া প্রতি একরে 450 কিলোগ্রাম মত উৎপাদন হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় মাছ চাষ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা (CIFRI) 1972 সালে মিশ্র মাছ চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হয়। মিশ্র মাছ চাষের উদ্দেশ্যই হইল কম জলাশয় হইতে বেশী মাছ তোলা।

বর্তমানে মিশ্র মাছ চাষ পদ্ধতিতে রুই, কাতলা, মৃগেল এই তিন রকম দেশীয় মাছের সঙ্গে তিনটি বিদেশী মাছ যাহা সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও সাইপ্রিনাস কার্প মোট ছয় ধরনের মাছ একই পুকুরে চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যপকভাবে জৈব সার, অজৈব সার ও বাড়তি খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

সাধারণতঃ একই পুকুরে রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের চাষ বহুল প্রচলিত। কাতলা মাছ জলের উপরিতল হইতে খাদ্য অন্বেষণ করে, রুই মাছ পুকুরের মাঝামাঝি জলের খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মৃগেল মাছ পুকুরের তলদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। এই তিনটি মাছ পুকুরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, ফলে পুকুরের সকল অংশের স্বাভাবিক খাদ্য কাজে লাগে। খাদ্য সংগ্রহে এই তিনটি মাছ পরস্পরের প্রতিযোগী নহে। তথাপি এই তিনটি দেশীয় মাছের সঙ্গে তিনটি বিদেশী মাছ একত্রে পুকুরে চাষ করা হয়। এই তিনটি মাছ বিদেশী হইলেও সহজেই পুকুরে বাড়ে এবং স্বাদও গ্রহণযোগ্য। সর্বোপরি রুই, কাতলা ও মৃগেলের সহিত বসবাসে কোন বিরোধ দেখা যায় না।

জলের উপরের স্তরের উদ্ভিদকণা খায় সিলভার কার্প আর প্রাণীকণা খায় কাতলা, রুই মাঝখানের স্তরের খাদ্য খায়। গ্রাস কার্প বা ঘেসো রুই জলের আগাছা খায়। মৃগেল ও আমেরিকান রুই জলের নীচের স্তরের খাদ্য ও পুকুরের মাটির সঙ্গে লাগিয়া থাকা উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ খাদ্য খায়।

আমেরিকান রুই পুকুরের পোকাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। সর্বোপরি এই তিনটি বিদেশী মাছের বৃদ্ধির হার অনেক বেশী ফলে মাছ চাষ বেশ লাভজনক।

সাধারণতঃ একবিঘা বা তার বড় পুকুরে মিশ্রচাষ করা হয় এবং জলের গভীরতা দুই মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বাভাবিক উর্বরতা আছে, এমন পুকুরে মিশ্রচাষ করা হয়। রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ করিয়া বা যে কোন ভাবেই অতিরিক্ত জলজ উদ্ভিদ ও আগাছা বিনাশ করা হয়। মজুত পুকুরে মাছ ছাড়িবার পূর্বে মহুয়া খইল প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিয়া সকল মৎস্যভূক মাছ ধ্বংস করা হয়।

মিশ্রচাষের পুকুরে সার প্রয়োগ :

মিশ্রচাষের পুকুরে প্রথমে হেক্টর প্রতি 300 কিলোগ্রাম চুন প্রয়োগ করা হয়। সার প্রয়োগের নির্দিষ্ট মাত্রা ও নির্দিষ্ট সময় আছে। প্রথম মাসে হেক্টর প্রতি 5000 কিলোগ্রাম গোবর, 75 কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট ও 50 কিলোগ্রাম সুপার ফসফেট প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তী দ্বিতীয় মাস হইতে 11 মাস পর্যন্ত প্রতিমাসে হেক্টর প্রতি 2000 কিলোগ্রাম গোবর, 75 কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট ও 50 কিলোগ্রাম সুপার ফসফেট যোগ করা হয়। প্রয়োজনে ইউরিয়া যোগ করা হয়। পুকুরে অতিরিক্ত শৈবালের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে অজৈব সার দেওয়া বন্ধ করা হয়।

পুকুরে চারাপোনা ছাড়িবার হার ও অনুপাত :

প্রথমবার সার প্রয়োগের তিন সপ্তাহ পর মজুত পুকুরে চারাপোনা ছাড়া হয়। সাধারণতঃ 100 মিলিমিটার থেকে 150 মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের চারাপোনা মিশ্রচাষের পুকুরে ছাড়া হয়। হেক্টর প্রতি 5000-7000 চারাপোনা পুকুরে চাড়া হয়। মিশ্রচাষের পুকুরে সাইপ্রিনাস কার্প বাদ দিয়ে মাগুর মাছের চারা ছাড়িয়া ভাল উৎপাদন করা সম্ভব হয়। বিঘা প্রতি 2500 মাগুরের চারা ছাড়া হয়।

পরিপূরক খাদ্য পরিবেশন :

মিশ্রচাষের পুকুরে মাছের ওজনের শতকরা একভাগ হইতে তিনভাগ খাদ্য পরিবেশন করা হয়। যেমন পুকুরে 1000 চারামাছ ছাড়া হইলে, আনুপাতিক গড় ওজন 30 গ্রাম হইলে মাছের মোট ওজন হয় 30 কিলোগ্রাম। এই ওজনের তিন শতাংশ হারে খাদ্যের পরিমাণ হইবে 900

গ্রাম। প্রতিদিন মিশ্রচাষের পুকুরে এই পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। এইভাবে প্রতিমাসে মাছের ওজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া পরিপূরক খাদ্য যোগান দেওয়া হয়।

পরিপূরক শুকনো খাদ্য জলের উপরিতলে ছড়াইয়া দেওয়া হয় অথবা খাদ্য জলে মিশাইয়া ডেলা করিয়া জলের মধ্যে কোন পাত্রে বা ঝুড়িতে দেওয়া হয়। এই পাত্র প্রতিদিন তুলিয়া পুনরায় খাদ্য দেওয়া হয়। এই পাত্রে খাদ্য দিলে মাছ কি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে তা অনুমান করা যায়। গ্রাস কার্পের জন্য মিশ্রচাষের পুকুরে দড়ির মাচায় জলজ উদ্ভিদ রাখা হয়। নিয়মিত জলজ উদ্ভিদ পরিবেশন না করিলে গ্রাস কার্পের বৃদ্ধি হয় না।

পুকুরে প্রতিমাসে জাল দিয়া মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়। সাধারণতঃ মিশ্রচাষের পুকুরে একবছরে মাছ বিক্রয় উপযোগী হয়। মিশ্র-চাষের পুকুরে মৃগেল মাছের বৃদ্ধি ভাল হয়, কারণ এই চাষে প্রচুর জৈব সার পুকুরে দেওয়া হয়। ফলে পুকুরের তলদেশে পর্যাপ্ত খাদ্য পাইয়া মৃগেল মাছের বৃদ্ধি বেশী ঘটে।

মিশ্রচাষ পদ্ধতিতে ব্যয় বেশী হয়, এছাড়া বিদেশী মাছের চারাপোনা সংগ্রহ ব্যয়বহুল। এই প্রথায় মাছ চাষে যেমন বেশী খরচা হয় তেমনি উৎপাদনও বেশী হয়, ফলে মিশ্র মাছ চাষের ব্যবসা লাভজনক।

তিলাপিয়া মাছ চাষ

বহু প্রাচীন কাল হইতে তিলাপিয়া প্রজাতির মাছগুলি মানুষের খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হইত। মিশরের এক সমাধিগাত্রে (প্রায় 2500 খ্রীঃ পূঃ) তিলাপিয়া মাছের বিবরণ পাওয়া যায়। মনে করা হয় যে নিকট প্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলিতে বহুকাল থেকেই তিলাপিয়া চাষ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। 1920 সালে কেনিয়াতে প্রথম পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়। সাম্প্রতিক কালে তিলাপিয়া জাভা, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়ায় নোনা জলের পুকুরে চাষ করা হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা সংস্থা দ্বারা 1952 সালে তিলাপিয়া ব্যাঙ্কক থেকে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য এদেশে আনা হয়।

তিলাপিয়া মাছ চাষের কয়েকটি সুবিধা :

(i) এই মাছ কষ্টসহিষ্ণু, সহজে প্রতিকূল অবস্থায় মারা যায় না।

(ii) ইহাদের প্রজনন ক্ষমতা প্রচুর, ফলে লাভজনক ব্যবসা।

(iii) উৎকৃষ্ট ভোজ্য অংশ সমৃদ্ধ দেহ।

(iv) বেশী মাত্রায় অম্ল, ক্ষার বা লবণ সহ্য করিতে পারে।

খাদ্যগত স্বভাব :

সমস্ত তিলাপিয়া মাছই উদ্ভিজ্জ খাদ্য বেশী পছন্দ করে। খাদ্যের মধ্যে উদ্ভিদকণা হইতে উচ্চতর উদ্ভিদও থাকিতে পারে। কতকগুলি প্রজাতি সর্বভুক এবং উদ্ভিদভোজী প্রজাতিগুলি অত্যন্ত পেটুক স্বভাবযুক্ত।

প্রজনন ও চারামাছ সংগ্রহ :

মাছ চাষের ব্যাপারে বেশীর ভাগ প্রজাতির চারামাছ সংগ্রহ এক অসুবিধাজনক ব্যাপার কিন্তু তিলাপিয়া এই ব্যাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। ইহাদের অতিমাত্রায় প্রজনন ক্ষমতার জন্য কোনও বিশেষ প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রথার প্রয়োজন পড়ে না। প্রজনন পুকুরে 25-30টি স্ত্রীমাছ এবং অর্ধেক সংখ্যক পুরুষ মাছ প্রতি এক হাজার বর্গ মিটার জলাশয়ে ছাড়া হয়।

চাষের প্রথা :

প্রধান কার্প জাতীয় মাছগুলির সঙ্গে তিলাপিয়া মাছ চাষ সুবিধাজনক নয় কারণ ইহারা কার্প জাতীয় মাছের পোনাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। নোনাজলের ভেড়ীতে অন্যান্য মাছের সঙ্গে, ছোট পুকুরে, ডোবাতে তিলাপিয়া মাছ চাষ করা হয়, এবং আট মাসে প্রতিটি মাছ 450 গ্রাম ওজন হওয়া অসম্ভব নয়। ইন্দোনেশিয়াতে আবর্জনামিশ্রিত জলে এবং ধানীজমিতে তিলাপিয়া চাষে ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে।

পার্শে জাতীয় মাছ চাষ

পার্শে মাছ প্রধানতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের মাছ। কিন্তু কয়েকটি প্রজাতি সমশীতোষ্ণ (temperate zone) অঞ্চলে বাস করে। পার্শে মাছের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য চাষ করা সহজ হয়। যথা—

(i) খাদ্য হিসাবে সুস্বাদু এবং দেহ হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোজ্য পাওয়া যায়।

(ii) মাছের লবণজলের সহনশীলতা বেশী (0 হইতে 38%)।

(iii) তাপমাত্রা সহনশীলতা বেশী (3 হইতে 35 ডিগ্রী সেলেসিয়াস)।

(iv) খাদ্যশৃঙ্খলের উপরের স্তরে থাকে।

(v) চালের কুঁড়া, খইল পরিপূরক খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

(vi) মোহনার জলে সহজেই চারামাছ পাওয়া যায়।

(vii) আবদ্ধ জলে কৃত্রিম প্রজননে নিয়োজিত করা যায়।

ভারতে প্রজাতিগুলির মধ্যে অন্যতম *Mugil cephalus, Liza macrolepis, Liza tade, Liza parsia.*

চাষের প্রথা ঃ পার্শে মাছকে এক প্রজাতি চাষ, নিকটাত্মীয় প্রজাতির মিশ্রচাষ, ভিন্ন প্রজাতির সঙ্গে মিশ্রচাষ ও চিংড়ী মাছের সঙ্গে চাষ করা হয়। তবে ভিন্ন প্রজাতির মিশ্রচাষেই ইহার উৎপাদন বেশী হয়। সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কাতলা, রুই, মৃগেল এবং তিলাপিয়ার সঙ্গেও পার্শের চাষ করা হয়। কাকদ্বীপে CIFRI পরীক্ষামূলকভাবে *L. parsia* এবং *Liza tade*-এর সহিত দুইটি প্রজাতির চিংড়ী (*Palaemon monodon* ও *P. indicus*) চাষে উভয়ের ফলনই ভাল পাওয়া গিয়াছে।

আঁতুড় পুকুর পরিচালনা ঃ

পুকুরটি 0·01-0·1 হেক্টর হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুকুরকে প্রথমে সংস্কার করিয়া আগাছা, খাদক মাছ ও অবাঞ্ছিত প্রাণী দূর করা হয়। এই পুকুরে হেক্টর প্রতি 200-250 কিলোগ্রাম চূণ দেওয়ার এক সপ্তাহ পর প্রতি বছরে হেক্টর প্রতি 5000 কিলোগ্রাম গোবর ও 10,000 কিলোগ্রাম মুরগীর বিষ্ঠা প্রয়োগ করিলে পুকুরের উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। আঁতুড় পুকুর তৈয়ারী হইলে হেক্টর প্রতি 1-5 লক্ষ চারা ছাড়া হয়। চারা মাছগুলি 30-90 দিন এই পুকুরে থাকে এবং পরিপূরক খাদ্য হিসাবে সকালে বা সন্ধ্যায় গমের ভূষি, মাছের গুঁড়া ও খইল দেওয়া হয়।

পালন পুকুর পরিচালনা ঃ

পালন পুকুর এক একর হইলে ভাল হয়, ইহার প্রস্তুত প্রণালী আঁতুড় পুকুরের মতই। পার্শে মাছের (*L. parsia*) একটি প্রজাতি চাষ করা হইলে পালন পুকুরে 25,000-50,000 চারামাছ হেক্টর প্রতি ছাড়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির সঙ্গে চাষে মোট চারাপোনা 10,000-50,000 হেক্টর প্রতি রাখা হয়।

ধানক্ষেতে মাছ চাষ

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ধানের চাষ ব্যাপক। বর্ষাকালে ধানক্ষেতে জমা

জলে ছোট মাছ জন্মায়। বর্ষার শেষে বা অল্প বৃষ্টিতে ধানক্ষেতের জল-নিকাশীর মুখে বাঁশের ঘুর্ণী বসাইয়া ছোট মাছ ধরা হয়। বর্ষার শেষে ধানক্ষেত হইতে জিওল মাছের চারা সংগৃহীত হয়। এই সকল ধানক্ষেতে নিকটবর্তী পুকুর হইতে মাছ আসে এবং প্রজনন হয়। বর্ষার পরে জল অপসারিত করিয়া মাছ ও চারাপোনা সংগৃহীত হয়।

ধানক্ষেতে মাছ চাষের গুণ :

ধানক্ষেতে মাছচাষ খুব লাভজনক না হইলেও নিম্নলিখিত কারণে ধানক্ষেতে মাছ চাষ পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত—

(i) ধানক্ষেতে মাছ চাষ হয় বলিয়া পৃথকভাবে কোন পুকুরের প্রয়োজন হয় না।

(ii) ধানের ক্ষতিকারক পোকাকে মাছ ধ্বংস করে।

(iii) ধানের চারার শিকড়ের কাছে খুঁটাইয়া খাদ্য অন্বেষণ করিবার জন্য ধানচারা মাটি থেকে ভালভাবে সার ও খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে।

(iv) মাছ জলাজমির অবাঞ্ছিত জলীয় আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে।

(v) মাছের বর্জ্য পদার্থ ধানগাছের সার হিসাবে কাজ করে।

(vi) মাটি হইতে জৈব ও অজৈব খাদ্য গ্রহণ করিয়া মাছ বড় হয়, ফলে পৃথকভাবে মাছচাষের জন্য পরিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু বর্তমানে ধানক্ষেতে মাছ চাষের সফলতা পাওয়া যায় না। বর্তমানে ধানের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক সার মাছের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। ধানক্ষেতে আগাছা নাশ করিবার জন্য এবং পতঙ্গকে ধ্বংস করিবার বিভিন্ন আগাছা নাশক ও কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। এই সকল ঔষধের প্রয়োগে মাছ মারা যায়। ফলে ধানক্ষেতে মাছ চাষের প্রবণতা কমিয়া আসিতেছে বিশেষতঃ অধিক ফলনশীল ধানক্ষেতে বেশী রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারে মাছ চাষ একেবারেই করা সম্ভব নয়।

ধানচাষের সঙ্গে মাছ চাষ করিতে হইলে জমির সংস্কার প্রয়োজন। ছোট ক্ষেতে মাছ চাষ করা সম্ভব হয় না, অন্ততঃপক্ষে 5 বিঘার উপর [illegible] ধানচাষের সঙ্গে মাছ চাষ করা যাইতে পারে। ধানের সঙ্গে মাছ [illegible] করিতে হইলে ক্ষেতের চারিদিকে চওড়া করিয়া, নীচে 3 থেকে $3\frac{1}{2}$ মিটার ও উপরে 6 মিটার চওড়া খাল কাটা প্রয়োজন। খালের বাইরের দিকে উঁচু করিয়া আল দিতে হয়। এই আল যেন ধানক্ষেতের চেয়ে

$\frac{1}{2}$ মিটার বেশী উঁচু হয়, খালের গভীরতা হয় এক মিটার। খালের মধ্যের জল যেন বাইরে না যাইতে পারে অথবা বাইরে থেকে জল আসিয়া যেন খালে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। বর্ষার পর সমস্ত জল ধরার মত শক্ত আল বা বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন। ধানক্ষেতে পরিমাণমত কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় যাহাতে মাছের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়। যে ধানগাছ জলে বেশী বাড়ে, সেই চারা রোপণ করা ভাল, যাহাতে জলের উপরে ধানের ডগা বাহির হইয়া থাকে। ক্ষেতে চারা গাছ লাগানোর একমাস পর মাছের চারা ছাড়া হয়। হেক্টর প্রতি 750 মৃগেল, 750 রুই ও 1,000 কাতলার চারা ছাড়া হয়। আমেরিকান রুই ধানগাছের গোড়া নষ্ট করে বলিয়া ধানক্ষেতে এই মাছ চাষ করা হয় না।

যদিও ধানক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে জৈব ও অজৈব পদার্থ থাকে তথাপিও মাছ চাষের জন্য চালের কুঁড়া ও বাদাম খোলের কুঁড়া পরিপূরক খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয়। খাদ্যের পরিমাণ মাছের ওজনের শতকরা এক বা দুই ভাগ হয়।

ধানক্ষেতের জলনিকাশী মুখে বাঁশের ঘুর্ণী বসাইয়া মাছ ধরা হয়। ধান কাটার পর মাছ খাল বা পুকুরে আশ্রয় নেয়। তখন এই সকল স্থানে জল কমিয়া যায় ফলে টানা জাল বা খেপলা জাল দিয়া সহজেই মাছ ধরা যায়।

আমাদের দেশে ধান কাটার পরেও ধানক্ষেতে সাময়িক জলপূর্ণ করিয়া মাছ চাষ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে ধানক্ষেতে জল প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে ধানক্ষেতে চিংড়ী ও নোনা মাছের চাষ করা হয়। বর্ষাকালে খালের নোনাজলের সঙ্গে ছোট চারাপোনা, চিংড়ী, পারসে, ভেটকী, ট্যাংরা, ধানক্ষেতে প্রবেশ করে। ধানকাটার পরে, খালের জল প্রবাহিত করিয়া পরবর্তী ধানচাষের পূর্বেই মাছ সংগ্রহ করা হয়। এই ধরনের ধানের ক্ষেতের নিকটবর্তী বড় খাল থাকা প্রয়োজন। অতএব মাছের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য ধানক্ষেতকে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

পুকুরে শিঙি ও মাগুর মাছের চাষ ও প্রজনন

কই, শিঙি, মাগুর অতিপরিচিত জিওল মাছ। শাল, শোল, ল্যাটা, চ্যাং মাছও জিওল মাছের মধ্যে ধরা হয়। এই মাছে চর্বির পরিমাণ কম

ফলে সহজেই পরিপাক হয়, লৌহের পরিমাণ বেশী থাকায় এই মাছ রোগীর পথ্য হিসাবে প্রচলিত। জিওল মাছ প্রায় সকল জলাশয়ে পাওয়া যায়, রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের সঙ্গে একই পুকুরে পাওয়া যায়। অথচ জলা বিল বা পতিত জলাশয়ে জিওল মাছ থাকে। খুব অল্পদিন হইল জিওল মাছের চাষ শুরু হইয়াছে, এই মাছ পুষ্টিকর বলিয়া বাজারে ভালই চাহিদা আছে। শিঙি মাছের তুলনায় মাগুর মাছের চাষ লাভজনক বলিয়া ইহাদের চাষ হয় বেশী। তবে শিঙি মাছের তুলনায় মাগুর মাছের চাষে ব্যয় বেশী। তাছাড়া মাগুর মাছের চারা কালীপূজার পর থেকে সরস্বতী পূজা পর্যন্ত পাওয়া যায়।

জিওল মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় কম জলে বাঁচিতে পারে। কাজেই যে পুকুরে রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের চাষ হয় না, সেখানে জিওল মাছ সহজেই বাঁচে। কচুরীপানা আবৃত বিল, খানা, ডোবাতে জিওল মাছ খুব স্বচ্ছন্দেই থাকে, কাজেই যে জলাশয়ে মাছ চাষ করা যায় না, সেখানে জিওল মাছ চাষ করিয়া মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। সুন্দর-বনের ধানক্ষেত হইতে চারা ধরিয়া ক্যানিং, বসিরহাট, হাসনাবাদ, ইটিণ্ডাঘাট বাজারে বিক্রী করা হয়।

পুকুরে জিওল মাছের চাষ (Jeol fish culture)

পুকুরে শিঙি মাছ বা মাগুর মাছ বা কই মাছ এককভাবে বা মাগুর ও শিঙি একত্রে চাষ করা হয়। মিশ্রচাষের পুকুরে ছয় রকমের মাছের সঙ্গেও মাগুর মাছের চাষ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে মৃগেল মাছের পরিবর্তে মাগুর চাষ করা হয়। আতুড় পুকুরে বর্ষাকালে ধানীপোনা উৎপাদনের পর শীতকালে পরিয়া থাকে, এইসকল পুকুরে জিওল মাছের চাষ লাভজনক। ময়লা জলের পুকুরেও ভাল জিওল মাছের চাষ হয়, বাইরে থেকে কোন পরিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না এবং মাছও দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ছোট বা বড় যে কোন পুকুরেই মাগুর ও শিঙি চাষ করা যায়, তবে পুকুরে অন্ততঃ একহাত জলের গভীরতা থাকা চাই। এই চাষে পুকুরের তেমন সংস্কারের প্রয়োজন হয় না। পুকুরের জলের উপরিতল হইতে কচুরি-পানা পরিষ্কার করা হয় এবং চারা ছাড়ার আগে জাল দ্বারা সকল মাছ তুলিয়া ফেলা হয়। পুকুরে পূর্বের মাছ, পোকা ইত্যাদি মারিবার জন্য

প্রয়োজনে মহুয়া খইল প্রয়োগ করা হয়। এই চাষে রাসায়নিক বা জৈব সারের প্রয়োজন হয় না।

পুকুরে চারা ছাড়িবার পূর্বে সমস্ত মাছকে লঘু ফরম্যালিন গোলা জলে কিছুক্ষণ রাখা যায়, যাহাতে চারার ক্ষতে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী জন্মাইতে না পারে। ইহাতে চারার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। 100 লিটার জলে 1 মিলিলিটার ফরম্যালিন ও 0·01 গ্রাম ম্যালাকাইট গ্রীণ গুলিয়া সেই জলে সমস্ত চারামাছকে 2 মিনিটের জন্য রাখা হয়। যে পুকুরে শিঙি ও মাগুর মাছের চাষ করা হয় সেখানে শাল, শোল, ল্যাটা ও বোয়াল ইত্যাদি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বিঘা প্রতি 7,000 মাগুরের চারা বা 10,000 শিঙির চারা ছাড়া হয়, এই শিঙি চারার গড় ওজন 6-7 গ্রাম ও মাগুরের 10 গ্রাম হয়। চারা একেবারে না ছাড়িয়া দুই-তিন বারে ছাড়িলে ফলন ভাল হয়।

পরিপূরক খাদ্য, যত্ন ও পরিচর্যা :

ফ্রেজারগঞ্জ, জুনপুট বা বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি অঞ্চলে অনেক শুঁটকি মাছ ফেলে দেওয়া হয়। সেই ফেলে দেওয়া মাছ কম দামে কিনিয়া শিঙি, মাগুরের পরিপূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করিলে ব্যবসার পক্ষে ও মাছের পুষ্টির পক্ষে লাভজনক হয়। বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ অঞ্চলে রেশম পোকার গুটির সুতা সংগ্রহের পর মৃত পলু খাইতে দেওয়া হয়। শিঙি ও মাগুরের চাষ হয় পাঁচ হইতে ছয় মাস। প্রথম তিন মাসে শুঁটকি মাছের গুঁড়া, চালের কুঁড়া যথাক্রমে দুইভাগ ও একভাগ হারে খাওয়ানো হয়। শেষের তিনমাসে দুইভাগ কুঁড়া ও একভাগ শুঁটকির গুঁড়া দেওয়া হয়। মাছের ওজনের শতকরা তিনভাগ পরিপূরক খাদ্য প্রতিদিন দেওয়া উচিত।

শিঙি মাছের ক্ষেত্রে আরও সস্তা খাদ্য ব্যবহার করা হয়। মাংসের দোকানের নাড়িভুঁড়ি, উদর ও তাদের ভিতরের আধা হজম হওয়া খাদ্য শিঙি মাছকে খাওয়ানো চলে। নাড়িভুঁড়ি, চালের কুঁড়া ও শুঁটকির গুঁড়া একত্রে মিশাইয়া খাদ্য পরিবেশন করা হয়। গোবরের সাথে চালের কুঁড়া, বাদাম খোলের গুঁড়া ও শুঁটকি মাছের গুঁড়া মিশাইয়া শিঙি মাছের খাদ্য তৈয়ারি করা হয়। মাগুর বা শিঙি চাষই হোক না কেন পনের দিন অন্তর মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করিয়া খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। পুকুরে যত চারাপোনা ছাড়া হয়, তার ওজনের শতকরা চারভাগ থেকে পাঁচভাগ খাদ্য দেওয়া হয়।

যত্ন ও পরিচর্যা

পুকুরে মাছের ঠিক বৃদ্ধি হয় কিনা তাহা নিয়মিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন। মাছের বৃদ্ধি ভাল না হইলে পুকুরের চারিকোণায় গোবর দিতে হয়। 20-25 কিলোগ্রাম গোবর মাসে 10-15 দিন 4 কাঠার মত পুকুরে কোণায় কোণায় রাখা হয়। পাঁচমাসে মাগুর বিক্রীর উপযুক্ত হয়। মাগুর মাছ খেপলা জাল ও টানা জাল দ্বারা ধরা হয়। মাগুর মাছ চাষের পুকুরে জল কম থাকায় পাম্প করে পুকুর শুকনা করে একবারেই সমস্ত মাছ ধরা হয়।

মাছের রোগ প্রতিরোধের জন্য এক কিলোগ্রাম খাদ্যের সঙ্গে 100 মিলি-গ্রাম টেরামাইসিন তিনদিন খাওয়ানো হয়। পরের দুইদিন খাদ্যের সঙ্গে টেরামাইসিনের পরিমাণ অর্ধেক করা হয়। শেষের দুইদিন 25 মিলিগ্রাম টেরামাইসিন প্রতি কিলোগ্রাম খাদ্যে পরিবেশন করা হয়।

বাঁশের খাঁচায় জিওল মাছের চাষ

বর্তমানে নূতন ধরনের পদ্ধতিতে বাঁশের খাঁচায় জিওল মাছ চাষ করা হয়। বাঁশের খুঁটির সাহায্যে ছোট বাঁশের খাঁচা পুকুরে ডোবান থাকে। খাঁচার তলদেশ পুকুরের তলদেশে কিছুটা উপরে থাকে। বাঁশের বেড়া দ্বারা আয়তাক্ষেত্রাকার খাঁচা এবং বাঁশের চটা দ্বারা গোল খাঁচা তৈয়ারি করা হয়। খাঁচার চারিদিকে বন্ধ থাকে শুধুমাত্র উপরের দিকে খোলা থাকে। খাঁচার অর্ধেক অংশ জলে ডোবান থাকে, বাকী অংশ জলতলের উপরে থাকে। 2 মিটার × 1 মিটার × 75 সেন্টিমিটার খাঁচায় 200-300 মাগুর, শিঙি বা কই মাছের চারা হয়। পুকুরের মাছ চাষের মত খাঁচাতেও পরিপূরক খাদ্য দেওয়া হয়। এই খাঁচা হইতে পাঁচ-ছয় মাস পর মাছ তুলিয়া ফেলা হয়, খাঁচাতে মাত্র শতকরা দশভাগ মাছ মারা যায়। এই খাঁচাতে মাছ ধরার কোন অসুবিধা থাকে না।

শোল জাতীয় মাছের চাষ

18-25 মিলিমিটার দৈর্ঘ্য সম্পন্ন চারামাছগুলিকে পালন পুকুরে প্রতি-পালিত করা হয়। ইহার পর 7-10 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য সম্পন্ন মাছগুলিকে মজুত পুকুরে আগষ্ট মাসে হেক্টর প্রতি 2,500 হিসাবে ছাড়া হয়। মজুত পুকুরে নিয়মিত গোবর দেওয়া হয়। শোল জাতীয় মাছগুলি প্রায়ই পুকুরের জল ছাড়িয়া ভিজা মাটিতে চলিয়া যায়। ফলে পুকুরের চারিপাশে প্রায় 50

সেন্টিমিটার উঁচু বেড়ার ব্যবস্থা করা হয়। পুকুরে পুঁটি, চেলা, মৌরলা ইত্যাদি মাছ বাড়ন্ত শোল মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শোল জাতীয় মাছ চাষে কয়েকটি অসুবিধা ঃ

(i) শোলজাতীয় মাছগুলি জলের নীচের স্তরে বাস করে বলিয়া মাছ ধরা সহজ হয় না।

(ii) মাছগুলি প্রায়ই কাদায় গর্ত করিয়া থাকে, ফলে জালে ধরা পড়ে না।

(iii) বিষপ্রয়োগে মাছ ধরার অসুবিধা এই যে ইহাতে অন্য মাছও মারা যায়।

(iv) শোল, শাল, মাছগুলি প্রায়ই নিজেদের মধ্যে মারামারি করিবার ফলে ফলন হ্রাস পায়।

(v) মাছগুলি ডাঙায় যাইবার প্রবণতাও মাছ চাষের ক্ষতি করে।

জিওল মাছের প্রণোদিত জনন ঃ শোল জাতীয় পুরুষ মাছের প্রজননে 15-40 মিলিগ্রাম এবং স্ত্রী-মাছের প্রজননে 80-120 মিলিগ্রাম পিটুইটারি গ্রন্থি নির্যাস প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজন হিসাবে প্রবেশ করাইয়া প্রণোদিত জনন করা হয়। এই প্রজননে কার্প জাতীয় মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি কাজে লাগানো হয়। মাগুরের ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীকে 100-150 মিলিগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজন হিসাবে নির্যাস প্রয়োগ করা হয় (খান এবং মুখোপাধ্যায়, 1971)। শিঙি মাছের পুরুষ ও স্ত্রীকে যথাক্রমে প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজন হিসাবে 60 মিলিগ্রাম ও 80 মিলিগ্রাম হরমোন প্রয়োগ করা হইলে ভাল ফল পাওয়া যায় (পাল এবং খান, 1969)।

নোনাজলে চিংড়ী ও পোনার চাষ ঃ

বেশী নোনাজলে রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের চাষ হয় না কিন্তু কম নোনাজলে বাগদা চিংড়ীর চাষ ভাল হয়। এক লিটার জলে 8 গ্রাম লবণ থাকিলে বাগদা ও পোনা একত্রে চাষ ভাল হয়, অবশ্য লবণের পরিমাণ বেশী হইলে শুধুমাত্র বাগদার চাষ হয়।

বর্ষার প্রারম্ভে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ীর বাচ্চা পাওয়া যায়, তাহা আঁতুড় পুকুরে পালন করা হয়। হেক্টর প্রতি বছরে মোট তিনবার ফলনে 1800 কিলোগ্রাম বাগদা চিংড়ীর ফলন হয়।

চিংড়ীর চাষ করিতে হইলে পুকুরের উপরের স্তর হইতে 30 সেন্টিমিটার বকচর থাকা উচিত। নোনাজলে পোনা ও চিংড়ীর একত্রে চাষ করিলে বা পৃথকভাবে চিংড়ীর চাষ করিলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি মানিয়া চলা উচিত—

(i) পুকুরের জল ছাঁকিয়া সূর্যের তাপে মাটি শুকাইয়া লওয়া হয়।

(ii) পুকুরের জমিতে উপযুক্ত লাঙল দেওয়া হয়।

(iii) হেক্টর প্রতি 400 কিলোগ্রাম তামাক পাতার গুঁড়া ও 2000 কিলোগ্রাম মুরগীর মল, মৃত শামুক ও কাঁকড়া ইত্যাদি মাটিতে ভালভাবে যোগ করা হয়।

(iv) সার প্রয়োগের পর পুকুরে জল প্রবেশ করানো হয়, লক্ষ্য রাখা দরকার জলের গভীরতা যেন 10 সেন্টিমিটারের বেশী না হয়। এই জল প্রবেশ করানোর সময় লক্ষ্য রাখা হয় যেন মাছখেকো মাছ বা মাছের ক্ষতিকারক প্রাণী প্রবেশ না করে।

(v) পরবর্তী পর্যায়ে জলের গভীরতা বাড়াইয়া 15 সেন্টিমিটার করা হয়। এই সময় হেক্টর প্রতি 400 কিলোগ্রাম ইউরিয়া, 20 কিলোগ্রাম ফসফেট সার দেওয়া হয়। জলের প্রশমভাব বজায় রাখিবার জন্য চুণ ব্যবহার করা হয়। জলে অক্সিজেনের 4 হইতে 8 ppm. হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পোনা মাছের সঙ্গে বাগদার চাষ করিতে হইলে পুকুরের নিকটবর্তী ছোট পালন পুকুরে বাগদার চারা পালন করা হয়। এই পুকুরের গভীরতা এক-মিটার হয়। এই পালন পুকুরে হেক্টর প্রতি 50,000 বাচ্চা পালন করা হয়। বাগদা বাচ্চার পেটের দিকে শুঁড় হইতে লেজ পর্যন্ত লাল দাগ থাকে, পরে ঐ দাগ খয়েরি বর্ণের হয়। 20 মিলিমিটার লম্বা বাচ্চার বহিরাবরণী গোলাপি হয় ও পরে হালকা সবুজ বর্ণের হয়।

বাগদার সঙ্গে পোনা মাছ চাষ করিতে হইলে জল বেশী নোনা হওয়া চলে না। বাগদার বাচ্চাকে প্রথমে বেশী নোনাজলে পালন পুকুরে চাষ করা হয়। পরে ঐ পুকুরে জল প্রবেশ করাইয়া লবণের মাত্রা কমাইয়া আনা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে কম নোনাজলে বাগদাকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় 1000 ভাগ জলে 5 ভাগ মাত্র লবণ থাকে।

বাগদা চিংড়ীর খাদ্য, যত্ন ও পরিচর্যা

বাগদার বাচ্চারা উদ্ভিদকণা খায়। আঁতুড় পুকুরে তালপাতা ও

নারকেলপাতা ডুবাইয়া রাখা হয়। এই পাতায় লাগিয়া থাকা উদ্ভিদকণা বাগদার বাচ্চারা খায়। বাগদার চারা ছাড়িবার পর হেক্টর প্রতি $7\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম ফসফেট সার, $7\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন সার দিতে হয়। 10 কাঠার আঁতুড় পুকুরে 25,000 বাগদার বাচ্চা লালন করা হয়। এই চারার বৃদ্ধির জন্য পরিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন। পরিপূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুঁড়া, বাদাম খোলের কুঁড়া ও শুকনা চিংড়ীর গুঁড়ার অনুপাত 1:1:1 হয়। এই বাচ্চারা লম্বায় 10 মিলিমিটার হয় এবং 0·005 গ্রাম ওজনের হয়। অর্থাৎ 25000 বাচ্চাকে প্রতিদিন 250 গ্রাম খাদ্য পরিবেশন করিতে হয়। বাচ্চার ওজনের শতকরা 10 ভাগ হিসাবে খাদ্য দেওয়া হইলে উপযুক্ত বৃদ্ধি ঘটে এবং বাঁচিবার হার বাড়ে। ছয় সপ্তাহ পর বাগদার বাচ্চাকে মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

পোনামাছের সঙ্গে বাগদার চাষ করিতে হইলে হেক্টর প্রতি জলের উপরের স্তরে 2,000, মাঝের স্তরে 1500 চারাপোনা ও নীচের স্তরের জন্য 30,000 বাগদার বাচ্চা ছাড়া হয়।

মজুত পুকুরেও মাছের বৃদ্ধির জন্য পরিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাছের গড় ওজন যদি 5 গ্রাম হয় তবে 30,000 চিংড়ীর ওজন হইবে 15 কিলোগ্রাম এবং 3500 চারাপোনার ওজন হইবে 17·5 কিলোগ্রাম। চারাপোনার শতকরা তিনভাগ ওজনের চিংড়ীর শতকরা 10 ভাগ ওজনের পরিপূরক খাদ্য দেওয়া হয়। বাগদার খাদ্য মণ্ড করে বকচরে বা পুকুরের মাটিতে রাখা হয়। প্রতিমাসে একবার জাল টানিয়া বাগদার ওজনের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

ভেড়ীতে মাছ চাষ ঃ

রুই, কাতলা বদ্ধ স্রোতবিহীন জলাশয়ে ডিম পাড়ে না। বর্ষাকালে নদীর জল ঢাল দিয়া নীচু জমিতে টানিয়া লওয়া হয় এবং বাঁধ দিয়া সেই জল আটকানো হয়। এই নীচু জমির চারিদিক ঘেরা থাকে, শুধু একটি দিক খোলা থাকে, এই পথে নদীর জল প্রবেশ করে। প্রয়োজনে স্থায়ী স্লুইস দরজা লাগান যায়। বর্ষা শুরুর পূর্বেই এই জমিকে চাষ উপযোগী করা হয়। জমি হইতে ফসল তুলিবার পর ধানগাছের গোড়া থাকিয়া যায়। এই জমিতে গোবর সার প্রয়োগ করিয়া ভালভাবে কর্ষণ করা হয়। বর্ষাকালে জমি জলপূর্ণ হয়, খড় পচিয়া এই জমি জলজ উদ্ভিদ ও শৈবালের

বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই জলাশয়ে শামুক, পোকা, সন্ধিপদ প্রাণী জন্মায়, ইহাদের মাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এইভাবে প্রতিবৎসর শুষ্ক জমিকে বর্ষার আগে ও পরে মাছ চাষের উপযোগী করিয়া তোলা হয়। এই জলাশয়ের গভীরতা পাঁচ-ছয় ফুট হয়। এই ধরনের মৎস্যচাষের স্থানকে **ভেড়ী** বলে। নিকটবর্তী নালা-নর্দমার জল ভেড়ীতে ফেলিবার পাকা বন্দোবস্ত রাখা হয়। এই নোংরা জলে জৈব, অজৈব পদার্থ থাকে, যাহা মাছের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। এই পথ প্রয়োজনে বন্ধ রাখা হয়। ভেড়ীতে সাধারণতঃ চারাপোনা এক কিলোগ্রাম বৃদ্ধি পাইলে বাজারে বিক্রীর জন্য তুলিয়া ফেলা হয়।

সংকর মাছ সৃষ্টি (Hybridization) ঃ

নিকট সম্পর্ক বিশিষ্ট মাছের মধ্যে প্রজনন ঘটাইয়া বর্তমানে সংকর মাছ সৃষ্টি করা হয়। এই প্রজনন দুইভাবে হয়, যথা—

(i) **অন্তঃগণ প্রজনন ঃ** এই পদ্ধতিতে একই গণভুক্ত ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে জনন ঘটাইয়া সংকর মাছের সৃষ্টি করা হয়। লেবিও গণের অন্তর্ভুক্ত দুইটি প্রজাতির মাছের মধ্যে প্রজনন ঘটাইয়া সংকর মাছ সৃষ্টি করা হয়।

(1) পুরুষ রুই মাছ × স্ত্রী কালবোশ = রুই-কালবোশ (সংকর মাছ)

(2) স্ত্রী রুই মাছ × পুরুষ কালবোশ = কালবোশ-রুই (সংকর মাছ)

(ii) **আন্তঃগণ প্রজনন ঃ** এই পদ্ধতিতে ভিন্ন গণের মাছের মধ্যে প্রজনন ঘটাইয়া সংকর মাছের সৃষ্টি করা হয়।

(1) পুরুষ কাতলা × স্ত্রী কালবোশ = কাতলা-কালবোশ (সংকর মাছ)

(2) পুরুষ কাতলা × স্ত্রী রুই = কাতলা-রুই (সংকর মাছ)

জলাধারে মাছ চাষ ঃ

ভারতবর্ষে কৃত্রিম জলাধারের অস্তিত্ব যদিও শতাধিক বৎসর পূর্বেও ছিল তথাপি ঐ জলাধারগুলিকে মাছচাষ সম্পর্কিত কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা তুলনামূলকভাবে নতুন বলা যাইতে পারে। বিগত পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি বহুমুখী নদী-উপত্যকা প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর জলাধারে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছচাষের সুযোগ বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতের জলাধারগুলিতে মাছ উৎপাদনের ক্ষমতা বিভিন্ন এবং গড় উৎপাদন মাত্র 6 হইতে 7 কিলোগ্রাম প্রতি হেক্টর জলধারে (ঝিনগ্রান ও ত্রিপাঠি, 1969)। জলাধারে মাছ চাষের ব্যাপারে রাশিয়া অগ্রণী। রাশিয়ার জলাধারগুলি

মোট 5 লক্ষ টন মাছ উৎপন্ন করে এবং গড় উৎপাদন প্রতি হেক্টর জমিতে 60 কিলোগ্রাম। অথচ জলাধারগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার গড় উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে।

জলাধারে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি মানিয়া চলা উচিত—

(i) জলাধারগুলিতে জৈবিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার।

(ii) আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় মাছ অপসারণ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ মাছ চাষের দরকার।

(iii) জলাধারগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে চারামাছ সরবরাহ করা।

(iv) জলাধারের কাছে মাছচাষ কেন্দ্র স্থাপন করা, কারণ প্রণোদিত জনন দ্বারা চারামাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং পোনামাছের প্রাথমিক লালনের দায়িত্ব মাছচাষ কেন্দ্রে করা।

(v) জলাধারগুলিতে মাছের খাদ্যকণা বৃদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় মাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, পরজীবী প্রাণীর নিয়ন্ত্রণ এবং খাদক মাছ দূরীকরণ করা।

(vi) ধৃত মাছের সংরক্ষণ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

জলাধারের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কাছাকাছি অবস্থিত যে কোন ধরনের বাধা যা সূর্যালোক বিস্তারে অসুবিধা ঘটায় সেইগুলি দূর করা দরকার। জলাধারের তলার জীবকণা (Benthos) উর্বরতা বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। আগাছা কায়িক পরিশ্রমে দূর করা প্রয়োজন। জলাধারের স্বাভাবিক জীবকণার চরিত্র ভৌগলিক অবস্থান, মাটি, আবহাওয়া এবং অন্যান্য ভৌত রাসায়নিক শর্তের উপর নির্ভরশীল।

যে সমস্ত জলাধারগুলি সরাসরি নদীর সঙ্গে যুক্ত, সেখানে স্বাভাবিক মজুত পদ্ধতি দ্বারা চারামাছগুলি জলাধারে আনা হয়। যেমন উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের জলাধারগুলি স্বাভাবিকভাবে চারামাছ দ্বারা পূর্ণ হয়। স্বাভাবিক মজুত পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে জলাধারগুলিতে কৃত্রিম উপায়ে প্রধান কার্পজাতীয় মাছের চারাপোনা ছাড়া হয়। এইসকল জলাধারের নিকটে মাছচাষ কেন্দ্র থাকে, এই কেন্দ্রে ডিমপোনা ও চারাপোনা পালন করা হয়, তাহা হইলে জলাধারে মাছের মৃত্যুহার কম হয়। গোপালকৃষ্ণ এবং পাল 1964 সালে তিলাইয়া জলাধারে মৃগেল ও কাতলার জনন এবং পাঞ্চেত জলাধারে মৃগেল, রুই মাছের জননের বিশদ পরীক্ষা করেন।

দেশের কয়েকটি প্রধান জলাধার ও মৎস্যচাষ

জলাধার	রাজ্য	সংযোগকারী প্রধান নদী	মাছ
(i) মেট্টুর	তামিলনড়ু	কাবেরী	সাইপ্রিনাস, মৃগেল, রুই, ট্যাংরা
(ii) রিহাদ	উত্তরপ্রদেশ	শোন	কালবোশ, বাটা, ট্যাংরা
(iii) নাগার্জুন সাগর	অন্ধ্রপ্রদেশ	কৃষ্ণা	ট্যাংরা, কালবোশ, মৃগেল, অল্প কাতলা
(iv) পাঞ্চেৎ	পশ্চিমবাংলা	দামোদর	কাতলা, রুই, বাটা, মৃগেল, চিতল, কালবোশ।

বিদেশের বাজারে চিংড়ীমাছের অত্যাধিক চাহিদার জন্য স্বাদুজলের চিংড়ীকে জলাধারে চাষ করা হয়। গোপালকৃষ্ণান এবং মল্লিকার্জুন রাও (1969) মনে করেন জলাধারে চিংড়ী চাষের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

মোহনায় মাছ চাষ ঃ

মৎস্যবিজ্ঞানী ঝিনগ্রানের মতে (1972) ভারতের মোহনার জলের মাছ সম্পদ এবং মোহনা সংক্রান্ত মাছচাষের ভবিষ্যৎ স্বাদুজলের মাছচাষ অপেক্ষা অনেক বেশী উৎসাহজনক। ভারতের মোহনা, মোহনার জলপূর্ণ জলাশয়, সমুদ্রের আবদ্ধ জল, জোয়ারের জলপূর্ণ অঞ্চল ইত্যাদি অঞ্চলগুলি মোট এলাকা 2·6 মিলিয়ন হেক্টর। এই বিস্তৃত জলাশয়গুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করা হইলে আমাদের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন যথেষ্ট হইবে। পশ্চিমবাংলা ও কেরালাতে মোহনাসংক্রান্ত মাছচাষ বহু আগে থেকেই প্রচলিত আছে। সুন্দরবনের মোহনায় ব্যাপকভাবে মাছ চাষ করা হয়। হুগলী-মাতলা মোহনাতন্ত্রের অঞ্চল প্রায় 3,100 বর্গমাইল জুড়িয়া বিস্তৃত। এই অঞ্চলে জোয়ারের প্রাবল্য প্রায় সমুদ্র হইতে 290 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। নীচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মোহনার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

হুগলী-মাতলা মোহনাতন্ত্র ঃ

ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল, আয়তন 3,100 বর্গমাইল। এই অঞ্চলে জোয়ারের প্রাবল্য প্রায় 295 কিলোমিটার। জল সাধারণতঃ ঘোলাটে এবং জলের তাপমাত্রা 19·33 থেকে 32·9 ডিগ্রী সেলেসিয়াস পর্যন্ত

পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলে পার্শে, গুরজাউলি, ভোলাভেটকী, ভেটকী, ফিতামাছ, ইলিশ, ফ্যাশা, তপসে ও লটকে মাছ পাওয়া যায়।

মহানদী মোহনাতন্ত্র ঃ

উড়িষ্যার কটক এবং পুরী জিলায় এই মোহনাতন্ত্র অবস্থিত। এই অঞ্চলে জোয়ারের প্রাবল্য প্রায় 42 কিলোমিটার। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য মাছ হইল ইলিশ, পার্শে, ট্যাংরা, তপসে, ভেটকি, ভোলাভেটকি এবং সামুদ্রিক মাছের বিভিন্ন প্রজাতি।

গোদাবরী মোহনাতন্ত্র এবং কাকিনাদ উপসাগর কেন্দ্র ঃ

এই অঞ্চলের মোট আয়তন 110 বর্গ কিলোমিটার। মোহনায় জলের উচ্চতা প্রায় 1-1·5 মিটার এবং প্রাবল্য 40 কিলোমিটার পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলে পার্শে মাছ বেশী পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ট্যাংরা, ভেটকি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

কাবেরী ও অন্যান্য নদীর মোহনাতন্ত্র ঃ

তামিলনাড়ুর কাবেরী নদী ও অন্যান্য কয়েকটি অপ্রধান মোহনাতন্ত্রে প্রধানতঃ পার্শে জাতীয় মাছ ও চিংড়ী বেশী পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া অল্প পরিমাণে ইলিশ, ভেটকি, তপসে ও প্রভৃতি ধরা পড়ে।

পশ্চিম উপকূলের মোহনাতন্ত্র ঃ

নর্মদা ও তাপ্তি নদীর মোহনাই প্রধান। নর্মদা নদীর মোহনায় ইলিশ ধরা পড়ে, এই অঞ্চলে মাছ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

আবর্জনা মিশ্রিত জলে মাছ চাষ

আবর্জনা মিশ্রিত জলের প্রয়োগে স্বাদুজলের পুকুরে মাছ চাষ আমাদের দেশে বর্তমানে এক নূতন প্রচেষ্টা। পুকুর বা জলাশয়ে আবর্জনা মিশ্রিত জলের প্রয়োগে কার্পজাতীয় মাছের ভাল চাষ হয়। জার্মানী, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, ইজরায়েল, চীন এবং জাভায় এই প্রথায় মাছ চাষ বহুকাল পূর্ব হইতেই প্রচলিত।

আবর্জনা মিশ্রিত জলে মাছ চাষে সুবিধা ঃ

(i) এই প্রকার মাছ চাষে খরচ কম।

(ii) আবর্জনা মিশ্রিত জলের উপযুক্ত ব্যবহার।

(iii) রাসায়নিক ও জৈব সারের বিকল্প হিসাবে আবর্জনা মিশ্রিত জলের ব্যবহার।

(iv) আবর্জনাযুক্ত জল প্রচুর পরিমাণে NPK দ্বারা সমৃদ্ধ।

আবর্জনাযুক্ত জলের বৈশিষ্ট্য ঃ

আবর্জনাযুক্ত জলে পূর্ণ বা আংশিক পচনশীল জৈব বস্তু বা ভাসমান কঠিন-বস্তু, গৃহস্থালী নিঃসৃত জল, বৃষ্টির জল ও মাটির অভ্যন্তরস্থ জল থাকে।

আবর্জনাযুক্ত জলের পরিশোধন ব্যবস্থা

ভৌত পরিশোধন অবস্থা ঃ

(i) সূক্ষ্ম ও বড় ভাসমান কঠিন পদার্থ পৃথকীকরণের জন্য ছাঁকন ব্যবস্থা।

(ii) ভারী কঠিন পদার্থ পৃথকীকরণের জন্য অধঃক্ষেপন ব্যবস্থা।

(iii) চর্বি ও তৈল জাতীয় পদার্থ পৃথকীকরণের জন্য অভিকর্ষ পৃথকী-করণ ব্যবস্থা।

(iv) সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থ পৃথকীকরণের জন্য পরিস্রাবণ ব্যবস্থা।

ইহা ছাড়াও রাসায়নিক পরিশোধন ব্যবস্থা ও জৈবিক ব্যবস্থা দ্বারা আবর্জনামিশ্রিত জলকে মাছ চাষের উপযোগী করা হয়। জৈবিক ব্যবস্থার দ্বারা পচনশীল বস্তু অবাত ও সবাত পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা ক্ষতিকারক নহে এমন পদার্থে পরিণত হয়।

মাছ চাষের পুকুরে আবর্জনাযুক্ত জল প্রয়োগের পূর্বে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা ঃ

(i) আবর্জনাযুক্ত জল মাছ চাষের পুকুরে প্রয়োগের পূর্বে পরিশোধন প্রয়োজন।

(ii) পুকুরের অতিরিক্ত আবর্জনা মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

(iii) আবর্জনাযুক্ত জলের প্রভাবে পুকুরে অম্লতা বৃদ্ধি পাইলে চূণ যোগ করা বাঞ্ছনীয়।

(iv) পুকুরের জলে অক্সিজেনের পরিমাণ জানা প্রয়োজন।

আবর্জনাযুক্ত জল ব্যবহারের রীতি ঃ

আবর্জনাযুক্ত জল ব্যবহৃত পুকুরগুলি সাধারণতঃ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে জলশূন্য করা প্রয়োজন। বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ মে মাসের প্রথমে ঐ

পুকুর 3 ফুট গভীরতায় আবর্জনা জল ছাড়া হয়। বর্ষার জলে পুকুর ভর্তি হইলে চারামাছ ছাড়া হয়। এরপর অল্প পরিমাণে আবর্জনা জল পুকুরে মিশ্রিত করা হয়।

পশ্চিমবাংলায় আবর্জনা মিশ্রিত পুকুরে মাছ চাষ ঃ

ভারতে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবাংলায় মাছ চাষের পুকুরে আবর্জনা জল ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত। কলিকাতার সন্নিকটে ধাপা অঞ্চলে এবং টিটাগড়ের কয়েকটি পুকুরে নিয়মিত এই প্রথায় চাষ করা হয়। প্রধান কার্প জাতীয় মাছগুলি এই পুকুরে চাষ করিবার পক্ষে উপযুক্ত। চারামাছের মধ্যে মৃগেল মাছের সংখ্যা বেশী লওয়া হয়। কারণ মৃগেল পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত জৈববস্তু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা পরীক্ষামূলকভাবে এই পুকুরগুলি হইতে প্রায় হেক্টর প্রতি 7500 কিলোগ্রাম মাছ উৎপাদনে সক্ষম হয়। জিওল মাছ চাষ করিবার পক্ষে এই পুকুরগুলি উপযুক্ত কারণ জিওল মাছ পচনশীল বস্তু, নোংরা ইত্যাদি বেশী খাদ্য হিসাবে পছন্দ করে।

আবর্জনাযুক্ত জলে মাছ চাষে কয়েকটি অসুবিধা ঃ

(i) আবর্জনাযুক্ত জলে জৈববস্তুগুলি প্রায়শই অত্যন্ত পচনশীল হওয়াতে পুকুরের জলে অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং মাছের জীবন বিপন্ন করে।

(ii) পরজীবী প্রাণীর আক্রমণে মাছ রোগাক্রান্ত হয় এবং মারা যায়।

(iii) ব্যাক্টিরিয়াজনিত রোগের বিস্তার সহজেই ঘটে।

(iv) পুকুরের জলে আগাছা বৃদ্ধি পায়।

সামুদ্রিক মাছ চাষ (Marine fisheries)

এইপ্রকার মাছ চাষে শুধুমাত্র সামুদ্রিক পরিবেশ হইতে মাছের সংগ্রহের দিকে প্রধান লক্ষ্য দেওয়া হয়।

সামুদ্রিকমাছ চাষের সাফল্য নির্ভর করে উন্নত ধরনের সামুদ্রিক জলযান, মাছ ধরার আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের উপর। সামুদ্রিক মাছ ধরার মূলকেন্দ্র হইল মহাদেশীয় প্রান্তভাগ অঞ্চল। মাছ সংগ্রহের পরিবেশ অনুযায়ী সামুদ্রিক মাছ চাষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) **উন্মুক্ত অঞ্চলীয় মাছ চাষ ঃ** সমুদ্রের উন্মুক্ত জলরাশিতে বসবাসকারী মাছগুলিকে বিভিন্ন ধরনের জাল দ্বারা ধরা হয়।

(ii) **সমুদ্রের তলদেশীয় মাছ চাষঃ** সমুদ্রের তলদেশের মাছগুলির আহরণ এই প্রকার মাছ চাষের আওতায় পড়ে। স্বাদুজলের তুলনায় সামুদ্রিক পরিবেশে প্রায় ছয়গুণ বেশী উৎপাদন হয়। সামুদ্রিক মাছ উৎপাদনের এক বিরাট অংশ আসে প্রশান্ত মহাসাগর (49%) এবং আটলান্টিক মহাসাগর (47%) অঞ্চল হইতে। ভারত মহাসাগর মাত্র শতকরা 4 ভাগ উৎপাদন করে।

মাছের প্রণোদিত জনন (Induced breeding) :

প্রণোদিত জনন বলিতে বোঝায় মাছকে কোনওভাবে উত্তেজিত করিয়া প্রজননে রত করা। রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের ডিমপোনা নদী হইতে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জিলার বাঁধ হইতে সংগৃহীত হয়। এই ডিমপোনা সংগ্রহে অনেক অসুবিধা লক্ষ্য করা যায় যেমন এই ডিমপোনার সঙ্গে অন্য মাছের ডিমপোনা থাকিতে পারে। তাছাড়া ডিমপোনাতে কাতলা, রুই ও মৃগেলের অনুপাত 40:30:30 হওয়া প্রয়োজন, তা না হইলে পুকুরের সকল অংশকে সমানভাবে ব্যবহার করা যাইবে না। এছাড়া কাতলার বৃদ্ধি হয় বেশী, তা চাষীর পক্ষে লাভজনক। কিন্তু ডিমপোনা সংগ্রহের ফলে নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় থাকে না বা প্রয়োজন নির্দিষ্ট ডিমপোনা সংগ্রহকরা যায় না।

বর্তমানে মৎস্যবিজ্ঞানীরা মাছের প্রণোদিত জনন করাইতে সফল হইয়াছেন। ফলে মৎস্যচাষীরা নিজেরাই প্রজননক্ষম মাছ হইতে ডিমপোনা সংগ্রহ করিতে পারেন এমনকি প্রয়োজনে ডিমপোনার ব্যবসা করিতে পারা সম্ভব হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে পিটুইটারি হরমোন প্রয়োগ করিয়া প্রজননে রত করানো হয়।

পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

মাছের মস্তিষ্কের অংকীয়তল হইতে পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ করা হয়। এই গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন উত্তেজক হিসাবে কার্য করে। সাধারণতঃ মাছের বাজার থেকে বড় মাছের কাটা মাথা হইতে পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ করা হয়। করোটির পিছনে অবস্থিত ফোরামেন ম্যাগনাম দ্বারা ঈষৎ বাঁকা শলাকা দ্বারা পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ করা হয়। এই গ্রন্থি সংগ্রহ করিয়া খাঁটি ইথাইল অ্যালকোহলে রাখা হয়। পিটুইটারি গ্রন্থির ওজন 3 মিলিগ্রাম হইতে 20 মিলিগ্রাম হইতে পারে।

পরিণত মাছের পরিচর্যা ও প্রজনন উপযোগী স্ত্রী ও পুরুষ মাছ চিনিবার উপায়

যে মাছের ডিমপোনা দরকার সেই মাছের স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে বাছিয়া লইয়া পৃথক পুকুরে তিনমাস ধরিয়া পরিচর্যা করা হয়। আমেরিকান রুই শীতকালে এবং অন্য মাছ বর্ষাকালে ডিম পাড়ে। শিঙী ও মাগুর ছাড়া অন্য মাছ নিরামিশাষী, সেইজন্য অন্য মাছকে বর্ষার তিনমাস পূর্বেই পৃথক করা হয়। প্রতিটি স্ত্রী মাছের জন্য দুইটি করিয়া পুরুষ মাছ বাছিয়া লওয়া হয়। প্রজনন পুকুরে পালিত মাছকে পরিপূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুঁড়া, ডালের ভূষি ও চীনা বাদামের খোল 1 : 1 : 1 অনুপাতে দেওয়া হয়। প্রতিদিন এই খাদ্যের পরিমাণ মাছের ওজনের শতকরা একভাগ হয়। গ্রাসকার্প প্রজননের জন্য পালন করা হইলে জলজ উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে দিতে হয়।

ডিম ছাড়িবার আগে থেকেই স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে চেনা যায়। এই সময় পুরুষ পোনা মাছের কানকুয়ার পিছনে অবস্থিত পাখনার যে দিকটা গায়ের সঙ্গে লাগিয়া থাকে, সেই দিকটা খসখসে হয় এবং স্ত্রী মাছের ঐ পাখনা মসৃণ হয়। প্রজননগুটি দেখিয়া শিঙী ও মাগুর মাছের পুরুষ ও স্ত্রী পৃথক করা যায়। পায়ুছিদ্রের পশ্চাতে গুটি থাকে। পুরুষ মাছের প্রজননগুটি সরু ও লম্বা হয়। স্ত্রী মাগুর মাছের গুটিটি গোলাকার এবং স্ত্রী শিঙী মাছের গুটি একটু লম্বা কিন্তু অগ্রভাগ ভোঁতা হয়। যে সকল মাছকে প্রণোদিত জননের কাজে লাগানো হইবে তাহাদের সঠিকভাবে বাছা দরকার, না হইলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না। সঠিক বাছাই হইলে কাতলার ক্ষেত্রে শতকরা 25 ভাগ এবং রুই ও মৃগেল মাছের ক্ষেত্রে শতকরা 75 ভাগ প্রণোদিত জনন সফল্ হয় এবং স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে। এছাড়া বর্ষাকালে পেটে ডিম থাকার জন্য স্ত্রী মাছের পেট নরম, গোলাকার ও স্ফীত হয় এবং পুরুষ মাছের পেটের নীচের দিকে চাপ দিলে সাদা রসের মতো শুক্রাণু নির্গত হয়। যাহা হউক বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী মাছ সহজেই পৃথক করা যায়।

গ্রন্থিনিঃসৃত হরমোনের প্রয়োগ পদ্ধতি ও পরিমাণ :

মাছকে ইনজেকশান দেবার জন্য শিশি হইতে পিটুইটারি গ্রন্থি বাহির করিয়া ওজন লওয়া হয়। গ্রন্থিটি পাতিত জলের সহিত মিশাইয়া টিস্যু হোমোজেনাইজার যন্ত্রে মিহি করা হয়। তাহার পর জলীয় পদার্থটি

সেন্টিফিউজ মেশিনের সাহায্যে তরলকে ভাসমান পদার্থ হইতে পৃথক করা হয়। এই পরিষ্কার তরলকে সিরিঞ্জে লইয়া মাছকে ইনজেক্শান করা হয়।

মাছের ওজনের সঙ্গে পিটুইটারি গ্রন্থির ওজনের নির্দিষ্ট অনুপাত আছে। সেইজন্য প্রণোদিত জননের পূর্বে পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে পৃথকভাবে ওজন করা হয়। বর্ষাকালে জলের তাপমাত্রা 27-30° সেলেসিয়াস হইলে মজুত পুকুর হইতে প্রায় সমান ওজনের দুইটি পুরুষ মাছ ও একটি স্ত্রী মাছ তুলিয়া ব্রীডিং **হাপায়** রাখা হয়। সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে স্ত্রী মাছকে প্রথমে প্রাথমিক ইনজেকশান দিতে হয়। স্ত্রী মাছের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের 7-10 মিলিগ্রাম ও পুরুষ মাছের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোগ্রামে 2-3 মিলিগ্রাম গ্রন্থি লইয়া রস নিঃসৃত করা হয়। এই হরমোন দ্রবীভূত জল স্ত্রী মাছকে কিলোগ্রাম প্রতি 2-3 মিলিগ্রাম ইনজেকশান দিতে হয়। পৃষ্ঠ ও পুচ্ছ পাখনার প্রায় মধ্যবর্তী অংশে স্পর্শইন্দ্রিয় রেখা বাদ দিয়া 60° কোণ করিয়া ইনজেক্শনের সূঁচ প্রবেশ করাইতে হইবে। ইহার ছয় ঘণ্টা পরে স্ত্রী মাছকে পুনরায় কিলোগ্রাম প্রতি 5-7 মিলিগ্রাম হরমোন মিশ্রিত জল পূর্বের ন্যায় বিপরীত পার্শ্বে প্রবেশ করাইতে হইবে। এইবার পুরুষ মাছ দুইটিকে কিলোগ্রাম প্রতি 2-3 মিলিগ্রাম হারে হরমোন মিশ্রিত জল একই পদ্ধতিতে ইনজেক্শন করা হয়। এইবারে স্ত্রী মাছ ও পুরুষ মাছ দুইটিকে একত্রে ব্রীডিং হাপায় রাখা হয়। হাপায় রাখিবার পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পর প্রজননক্রিয়া শুরু হয়। প্রজননের চার-পাঁচ ঘণ্টা পর নিষিক্ত ডিমগুলি বিশেষ জালের সাহায্যে তুলিয়া হ্যাচিং হাপায় ছাড়িতে হইবে। হ্যাচিং হাপায় প্রতি দুই-তিন লিটার জলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নিষিক্ত ডিম ছাড়া হয়।

হাপাতে (Hapa) পরিণত মাছের প্রজনন :

হাপা সাধারণতঃ মার্কিন কাপড়ে তৈয়ারী হয়। মশারিকে উল্টা দিক করিয়া ধরিলে যে আকার হইবে, হাপার গঠন সেইপ্রকার। সাধারণতঃ হাপা 2 মিটার দৈর্ঘ্য 1 মিটার প্রস্থ ও 1 মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট হয়। তবে হাপার আয়তন প্রয়োজনে ইহা অপেক্ষা বড় করা যাইতে পারে। হাপাটিকে জলের মধ্যে চারিটি বাঁশের খুঁটির সাহায্যে দৃঢ়ভাবে আটকানো হয়, হাপার ছাদটি জলের নীচে থাকে, উপরের মুখ থাকে খোলা। হাপাটির অর্ধেক অংশ জলের নীচে থাকে, লক্ষ্য রাখা হয়, হাপার তলদেশ যেন পুকুরের মাটিস্পর্শ না করে। বর্ষাকালে নদীতে বা খালে হাপা লাগাইলে প্রণোদিত জনন ভাল হয়।

দ্বিতীয়বার ইনজেকশন দেওয়ার প্রায় 6 ঘন্টার মধ্যে প্রজনন আরম্ভ হইতে পারে। প্রজনন হাপাতে স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে ও পুরুষ মাছ শুক্র ক্ষরণ করে এবং ডিমকে নিষিক্ত করে। ডিম ছাড়িবার পর হাপা হইতে বড় মাছকে সরাইয়া লওয়া হয়। চার-পাঁচ ঘন্টা ডিম হাপায় রাখিয়া শক্ত করা হয়।

একলিটার মগে আনুমানিক 25,000 মত ডিম ধরে, তবে সকল ডিমই নিষিক্ত হয় না। অনিষিক্ত ডিম অস্বচ্ছ হয়। ডিম হইতে ডিমপোনা সৃষ্টি করিবার জন্য হ্যাচিং হাপা ব্যবহার করা হয়। এই হাপাতে খোলস ভেদ করিয়া ডিমপোনা বাহিরে আসে।

প্রজনন হাপার মতই হ্যাচিং হাপা মার্কিন কাপড়ে তৈয়ারি করা হয়। প্রজনন হাপার মত উপরে কাপড়ের আংশিক ঢাকনা থাকে না। এখানে দুইটি হাপা থাকে। এইটি বাইরের হাপা 2 × 1 × 1 মিটার আয়তনের এবং হাপার আয়তন 1·5 মিটার × 75 সেমি × 75 সেমি হয়। ভিতরের হাপা মশারির কাপড় দ্বারা তৈয়ারী হয়। ভিতরের হাপাটি বাইরের হাপার সঙ্গে ফিতার সাহায্যে লাগান থাকে।

প্রজনন হাপার মত হ্যাচিং হাপা পুকুরের জলে, নদী ও খালে বাঁশের খুঁটি দ্বারা আটকান হয়। ভিতরের হাপাতে প্রায় 40,000-75,000 ডিম রাখা হয়। দশ ঘন্টা পরে ডিমের খোলস মুক্ত হইয়া ডিমপোনা মশারির জালের মধ্য দিয়া বাইরের হাপাতে আসে এবং ডিমের খোলসগুলি জালে আটকাইয়া যায়। ইহার ভিতরের হাপা সরাইয়া ফেলা হয় এবং বাইরের হাপাতে তিনদিন পর্যন্ত ডিমপোনা রাখা হয়।

সাইপ্রিনাস ও শিঙীর ডিম ঝাঁঝির সঙ্গে লাগিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের প্রথমেই হ্যাচিং হাপায় সরাসরি রাখা হয়। ডিম ফুটিয়া ডিমপোনা বাহির হইতে শিঙী মাছের সময় লাগে প্রায় একদিন এবং সাইপ্রিনাস কার্পের দুই হইতে তিনদিন সময় লাগে। বাচ্চা বাহির হইলে ঝাঁঝি সযত্নে হাপা হইতে সরাইয়া লওয়া হয় এবং নতুন ঝাঁঝি দেওয়া হয়।

গ্লাসজার হ্যাচারিতে ডিমপোনা সৃষ্টি ঃ

গ্লাসজার হ্যাচারিতে হ্যাচি হাপা অপেক্ষা ভালভাবে ডিমপোনা উৎপাদন করা যায়। এইরকম হ্যাচারিতে (চিত্র 21) কয়েকটি কাঁচের জার আছে। এই হ্যাচারি প্রয়োজনে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে রাখা হয়। একটি কাঠের টেবিলে গোল গর্ত করিয়া অনেকগুলি কাঁচের জার খাড়াভাবে টেবিলে বসান

হয়। কাঁচের পাত্র তিনটি ক্ল্যাম্প দ্বারা ভালভাবে আটকাইবার ব্যবস্থা থাকে। কাঁচের জারে উপরের প্রান্তে লোহার চওড়া অঙ্গুরী আছে।



চিত্র 21 : গ্লাসজার হ্যাচারি

কাঁচের পাত্রের একদিকে খাঁজ করা অংশ থাকে। সামনে গ্যালভানাইজড লোহার খোলা নল আছে। জলাধার হইতে জল নীচের সরু অংশ দ্বারা প্রবাহিত হয়। ডিম হইতে ডিমপোনা হইতে 15 ঘণ্টা সময় লাগে। ডিমপোনা কাঁচপাত্রের উপরের মুখ দিয়া জলের সঙ্গে আসিয়া ডিমপোনা সংগ্রহের জন্য রাখা জলের আধারে জমা হয়। তিনদিন এই জলাধারে রাখিবার পর ডিমপোনা পুকুরে ছাড়া হয়।

বিদেশী মাছের প্রজনন (Breeding of exotic fishes) ঃ

সিলভার কার্প ও গ্রাসকার্পের প্রজনন বর্ষাকালে হয়। সাইপ্রিনাস বর্ষাকালে ও শীতের শেষে প্রজনন করানো হয়। এখানে রুই, কাতলার মত দুইটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী মাছ আলাদা করা হয়। সিলভার কার্প ও গ্রাসকার্পের পুরুষ মাছের বক্ষপাখনা অমসৃণ হয়। স্ত্রী মাছের পেট নরম, স্ফীত ও ডিম নির্গমনের স্থান অল্প লাল হয়। ইহাদের প্রজননে হাপার প্রয়োজন হয় না। ইহাদের প্রজননের জন্য শুষ্ক নিষ্কাশন পদ্ধতি (Dry stripping) অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে স্ত্রী মাছকে দুইবার ও পুরুষ মাছকে একবার ইনজেকশন দেওয়া হয়। ইনজেকশনের মাছগুলিকে হাপাতে রাখা হয়।

স্ত্রী মাছকে দ্বিতীয়বার ইনজেক্শন দেওয়ার প্রায় আট ঘণ্টা পরে শুক্র নিষ্কাশন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। একটি এনামেলের পাত্রে পুরুষ মাছের পেটে চাপ প্রয়োগ করিয়া শুক্র নিঃসরণ ও স্ত্রী মাছের পেটে চাপ প্রয়োগ করিয়া ডিম্বাণু নিঃসরণ করা হয়। একটি পালক দ্বারা শুক্র ও ডিম ভালভাবে মিশাইয়া দিয়া তিন-চার মিনিট রাখা হয় এবং ডিম্বাণুগুলি নিষিক্ত হয়। তারপর ডিমগুলি ভালভাবে ধুইয়া পরিষ্কার জলের পাত্রে রাখা হয়। ঘেসো রুই-এর ডিমে কমলা বর্ণের আভা এবং সিলভার কার্পের ডিমে ফিকে নীল আভা দেখা যায়। নিষিক্ত হইবার আটঘণ্টা পর রুই, কাতলা, মৃগেলের মত ডিমগুলিকে হ্যাচিং হাপায় স্থানান্তরিত করা হয়।

সাইপ্রিনাস কার্পের প্রজননের জন্য কিছু প্রজনন উপযোগী স্ত্রী ও পুরুষ মাছ ছোট প্রজনন পুকুরে পালন করা হয়। ইহারা পুকুরে স্বাভাবিকভাবে ডিম পাড়ে, নিষিক্ত ডিমগুলি ঝাঁঝি, কচুরিপানা মূলে লাগিয়া যায়। এই নিষিক্ত ডিম জলজ উদ্ভিদের সহিত সংগ্রহ করিয়া কাপড়ের হাপাতে বা চৌবাচ্চায় রাখা হয়। নিষিক্ত ডিম হইতে ডিমপোনা হইতে দুইদিন সময় লাগে। ডিমপোনা দুই-তিনদিন রাখিবার পর আঁতুড় পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রণোদিত জননের সাহায্যে পুকুরে চাষ উপযোগী ডিমপোনা উৎপাদন করা সম্ভব হয়। বর্ষাকালীন আবহাওয়া সকল মাছেরই প্রজননের অনুকূল। কাতলা মাছের প্রণোদিত জনন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে করা হয়। তবে লক্ষ্য রাখা হয় যে পুকুরে হাপা টাঙানো হয় সেই পুকুরে শৈবালের আধিক্য না থাকা বাঞ্ছনীয়। হাপাতে অন্য ক্ষতিকারক পোকা যাতে প্রবেশ করিতে না পারে তাহা লক্ষ্য রাখা উচিত। সর্বোপরি মাছের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উপর প্রণোদিত জনন নির্ভর করে। বর্তমানে গর্ভবতী মহিলার মূত্রের হরমোন HCG মাছের প্রণোদিত জননে নিয়োজিত করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা চলিতেছে। ইহাছারা ট্রাইক্লোরো অ্যাসেটিক অ্যাসিড দ্বারা সহজ উপায়ে প্রজনন পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতেছে।

মাছ চাষে সমস্যা, রোগ ও প্রতিকার
(Problems in fisheries, diseases and prevention)

মাছচাষ ব্যবসা লাভজনক হইলেও সমস্যা অনেক। মাছের পরিবেশ বলিতে জলকে বুঝাইলেও মাটির গুণের উপর মাছের বৃদ্ধি ও জনন নির্ভর

করে। জল ও মাটির পরিবেশ যাহাতে মাছের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়, তাহা বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। বাইরে থেকে নোংরাজল বা বৃষ্টিধোয়া কীটনাশক ঔষধমিশ্রিত ক্ষেতের জলও পুকুরকে দূষিত করে। পরিপূরক খাদ্যের যোগান না দিলেও মাছ মারা যায়। পরিচালন ব্যবস্থা ত্রুটির ফলেই বেশীর ভাগ মাছ মারা যায়।

গ্রীষ্মকালে পুকুরের তলদেশের জৈব পদার্থ, জলজ উদ্ভিদের পচন হইলে পুকুরের জলের অক্সিজেন কমিতে থাকে। মেঘলা দিনে, গুমোট আবহাওয়ায় বা প্রতিদিন অল্প বৃষ্টি হইলে জলে অক্সিজেনের মাত্রা অত্যন্ত কমিয়া যায়। মাছ জলের উপরিভাগে ভাসিতে থাকে এবং এই প্রতিকূল আবহাওয়ার পরিবর্তন না হইলে যাবতীয় মাছ মারা যাওয়ার উপক্রম হয়। পুকুরে আবর্জনা, শুকনা পাতা পচিয়া জলকে দূষিত করে। জলে অতিরিক্ত শৈবাল জন্মাইলে মাছ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মাছ মারা যাওয়ার থেকে মাছকে রক্ষা করিবার জন্য বিঘা প্রতি পুকুরে 40-50 কিলোগ্রাম চূণ তিন-চার কিস্তিতে জলে প্রয়োগ করা হয়। চূণ প্রয়োগের পর জলে পটাশ পারম্যাংগানেটের জলীয় দ্রবণ যোগ করা হয়। বিঘা প্রতি 500 গ্রাম পটাশ পারম্যাংগানেট জল শোধন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। জলে অতিমাত্রায় হাইড্রোজেন সালফাইড ও অ্যামোনিয়া গ্যাসের আধিক্য হইলে মাছকে বাঁচান সম্ভব হয় না, তখন মাছকে জাল দ্বারা ধরাই শ্রেয়।

অন্যান্য প্রাণীর মত মাছের নানারকম রোগ হয়। মাছের রোগ দুই ধরনের হয়। (i) যে সমস্ত রোগের বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় না; (ii) সে সমস্ত রোগের বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। মাছের দেহে ছত্রাক দ্বারা, জীবাণুর দ্বারা, আদ্যপ্রাণী দ্বারা, কৃমি ও সন্ধিপদ দ্বারা বিভিন্ন রোগ হয়।

(i) **ছত্রাক জনিত রোগ** : মাছের দেহে কোন কারণে আঘাত লাগিলে ক্ষতস্থান ছত্রাক জনিত রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। এইরকম রোগে মাছকে ধরিয়া শতকরা পাঁচভাগ লবণের জলীয় দ্রবণে ডুবাইলে রোগের প্রতিকার হয়। এই পদ্ধতি পর পর তিন-চারদিন অনুসরণ করা হয়। একলিটার জলে একগ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবীভূত করিয়া মাছকে কয়েক মিনিট ডুবাইয়া লইলে ছত্রাকের প্রতিরোধ হয়।

(ii) **ফুলকা পচা রোগঃ** পুকুরের জলে জৈব পদার্থের পচনে মাছের ফুলকা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে মাছের শ্বসনে ব্যাঘাত ঘটে এবং মাছ মারা যায়। পুকুরে চূণ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

(iii) **পাখনা ও লেজ পচাঃ** জীবাণুর আক্রমণে মাছের লেজ ও পাখনা পচে, দেহে জল জমে বা উদরী রোগ হয়। জীবাণুর আক্রমণে মাছের চোখ নষ্ট হয়, মাগুর মাছের শুঁড় নষ্ট হয়, সিলভার কার্পের দেহে দাগ দেখা যায়। প্রথমে মাছের লেজে পচন ধরে, পরে সমস্ত দেহে পচন শুরু হয়। এই রোগাক্রান্ত মাছকে 2000 মিলিলিটার জলে এক গ্রাম কপার সালফেটের দ্রবণে ডুবাইয়া লইলে রোগের উপশম হয়। চারাপোনা এই রোগে আক্রান্ত হয়। পালনপুকুরে খাদ্যের সহিত টেরামাইসিন প্রয়োগে এই রোগ উপশম হয়। প্রতি কিলোগ্রাম খাদ্যের সহিত 50 মিলিগ্রাম টেরামাইসিন পর পর সাতদিন জলাশয়ে যোগ করা হয়।

(iv) **শোথ রোগঃ** উদরে চাপ দিলে মলদ্বার দ্বারা জল বাহির হয়। এই রোগের নাম ড্রপসি। এই রোগের জীবাণুকে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্বারা ধ্বংস করা যায়। প্রতিঘন মিটার জলে দুই গ্রাম পটাশিয়াম প্যারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ পুকুরে সপ্তাহে তিন-চারি দিন দিতে হয়। খাদ্যের সঙ্গে টেরামাইসিন প্রয়োগ করিয়া রোগের প্রতিকার সম্ভব।

(v) **আন্ত্যপ্রাণী আক্রান্ত রোগঃ** আঁতুড় পুকুর ও পালন পুকুরে আন্ত্যপ্রাণী ডিমপোনা, ধানীপোনা ও চারাপোনার ক্ষতি করে। এই রোগে মাছের দেহে, ফুলকায় সাদা গুটি দেখা যায়। এই রোগে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও মাছ মারা যায়। শতকরা দুইভাগ লবণ জলে মাছকে ডুবাইয়া পুকুরে ছাড়িলে উপকার হয়। এছাড়া বিঘা প্রতি 40 কিলোগ্রাম চূণ প্রয়োগ করিয়া প্রতিকার পাওয়া যায়। মিক্সোস্পোরিডিয়া পরজীবীর প্রভাবে ছোট গুটি দেখা যায়। মাছ দুর্বল হয়, আঁশ নষ্ট হয় ও ছিদ্রযুক্ত হয়।

(vi) **কৃমি দ্বারা মাছ আক্রান্তঃ** আঁতুড় পুকুর ও পালনপুকুরে মাছের ক্ষতি করে কৃমি। গাইরোডাক টাইলাস ও ডাকটাইলোগাইরাম পরজীবী বর্ষাকালে দেখা যায়। গাইরোডাইটাইলাস চর্ম ও ফুলকাকে আক্রমণ করে এবং রক্তশোষণ করে। রক্তশূন্যতা হইয়া মাছ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং মারা যায়। এই পরজীবীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার

জন্য মাছকে শতকরা তিনভাগ লবণের দ্রবণে ডুবাইয়া লইতে হয়। পুকুরে চুণ প্রয়োগ করিয়াও রোগের আক্রমণ হইতে মাছকে রক্ষা করা যায়।

লিগুলা নামক ফিতাকৃমি দ্বারা মাছ আক্রান্ত হয়। এই কৃমির পূর্ণাঙ্গ অবস্থা মাছের দেহে থাকে, মৎস্যভুক পাখীরা মাছ খাইলে পাখীর অন্ত্রে প্রবেশ করে। পাখীর মলের সহিত কৃমির ডিম জলে পড়ে এবং এক ধরনের জলজ প্রাণী সাইক্লপস ডিমকে তাহাদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই সাইক্লপসকে মাছ খায় এবং মাছের দেহে এই ডিম পূর্ণাঙ্গ কৃমিতে পরিণত হয়।

(vii) **সন্ধিপদ প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত রোগ**ঃ সাধারণতঃ রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের দেহ ফুলকাতে সন্ধিপদ প্রাণী আরগুলাস আক্রমণ করে। মাছের দেহের রক্ত শোষণ করে। এই পরজীবীদের আক্রমণে দেহের আঁশ খুলিয়া যায়, মাছ ছটফট করে এবং মারা যায়। এই রোগের প্রতিকারে জলে সামান্য পরিমাণে গ্যামাক্সিন প্রয়োগ করা হয়। গ্যামাক্সিন প্রয়োগে লারণিয়া নামক পরজীবীর আক্রমণ হইতে মাছ রক্ষা পায়।

মাছের রোগের হাত হইতে সাবধান থাকিবার জন্য সকল ক্ষেত্রেই পুকুরে চুণ প্রয়োগ প্রয়োজন। এছাড়া মাছের দেহে কোন রোগের বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা লওয়া প্রয়োজন। পুকুরের জলের পরিচ্ছন্নতা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ জলে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ, pH মাত্রা, জলজ উদ্ভিদের পরিমাণ, জৈব ও অজৈব পদার্থের পচন, জলের তাপমাত্রা, রাসায়নিক দ্রব্যের পরিমাণ ইত্যাদি সকল সময় পরীক্ষা করা উচিত, নচেৎ মাছ চাষে সুফল পাওয়া যাইবে না। পুকুরের মাছকে রক্ষা করিবার সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হইলে মাছ চাষ সফল হইবে।

মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importance of fisheries) ঃ

(i) মাছ প্রোটিন খাদ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মাছের প্রোটিন সহজপাচ্য এবং প্রোটিনে প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে।

(ii) ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা ইত্যাদি খনিজ পদার্থের উৎস।

(iii) মাছের ভিটামিনের মধ্যে A, D এবং B-কমপেক্স প্রধান। বহু মাছের যকৃত ভিটামিন A ও D এর গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

(iv) মাছের গুঁড়া গবাদি পশু, হাঁস, মুরগী এবং শূকরের পরিপূরক

খাদ্য। এই খাদ্যে প্রায় 60 শতাংশ প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম থাকে।

(v) মানুষের খাদ্যের অনুপযুক্ত মাছ শুকিয়ে গুঁড়া করিয়া সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে নাইট্রোজেন এবং ফসফেট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় 1

(vi) মাছের তৈল অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। যকৃত নিঃসৃত তৈল ভিটামিন A ও D দ্বারা ভরপুর। এই তৈল বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে যেমন— ইলাসমিন, সার্কোভিট, অ্যাডামিন বাজারে পাওয়া যায়। সার্ডিন, হেরিং এবং স্যালমন জাতের মাছের দেহনিঃসৃত তৈল সাবান, রং, ভার্নিশ-এর কাজে এবং ভোজ্য তৈল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(vii) মাছের চামড়া, পাখনা ইত্যাদি হইতে আঠা তৈয়ারী হয়। এই আঠা বই বাঁধানো ও চর্মশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

(viii) আইজিন কাঁচ তৈয়ারীর জন্য কয়েক ধরনের মাছের পটকা ব্যবহৃত হয়। এই কাঁচ মদের পরিশোধনে ব্যবহৃত হয়।

(ix) মাছের চামড়া জুতা, হাতব্যাগ এবং বিভিন্ন ধরনের বাক্স তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়।

(x) বিভিন্ন মাছ অ্যাকোরিয়ামে রাখা হয়, ইহাকে ঘিরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও ব্যবসা গড়িয়া উঠিয়াছে।

(xi) বিভিন্ন মাছ জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়। যেমন মশা দমনের জন্য গাম্বুসিয়া, তেচোকা, গাপ্পি মাছের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। মশার লার্ভা ইহাদের প্রিয় খাদ্য।

(xii) আধুনিক কালে রাশিয়া ও জাপানে ইনসুলিন হরমোনের উৎস হিসাবে তুনা, কর্ড ইত্যাদি মাছকে সংগ্রহ করা হয়।

চিংড়ী চাষ (Prawn Culture)

সূচনা (Introduction) :

সন্ধিপদ পর্বের ক্রাসটেসিয়া শ্রেণী ও ডেকাপোডা বর্গের অন্তর্গত অধিবর্গ নাটানপিয়ার সভ্যগুলি স্বাদু এবং লবণজলে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বহু প্রজাতির চিংড়ী মানুষের খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। বেশীর ভাগ দেশে চিংড়ী চাষ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করা হয় না অথবা চাষের প্রথা পরীক্ষান্তরে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্ততঃ পাঁচটি দেশে চিংড়ীর চাষ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কোন কোন দেশে শুধুমাত্র চিংড়ী আহরণ করা হয় অথবা মোহনার কাছাকাছি জলাশয়ে স্বল্পস্থায়ী প্রতিপালন করিয়া বাজারে বিক্রী করা হয়। কোন কোন দেশে মোহনায় অন্যান্য মাছের সঙ্গেও প্রতিপালন করা হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রজাতি-গুলির একক চাষ করা হয় না। কিন্তু জাপানে 1934 সাল হইতে নিবিড় চিংড়ী চাষ (Intensive prawn culture) করা হয় এবং বদ্ধ জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির জননকার্যে সাফল্য লাভ করিয়াছে। **মোতোগাকু ফুজিনাগা** (Motogaku Fujinaga) সর্বপ্রথম চিংড়ীর আবদ্ধ জনন ও কৃত্রিম প্রতিপালনে সমর্থ হন।

চিংড়ী চাষের সুবিধা (Advantages of prawn culture) :

চিংড়ী চাষের কয়েকটি সুবিধা হইল—

(i) ইহারা জলে সকলপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করে, ফলে পরিপূরক খাদ্যের বেশী প্রয়োজন হয় না।

(ii) উপযুক্ত পরিবেশে চিংড়ীর দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে।

(iii) চিংড়ীর লবণাক্ত জল সহ্য করিবার ক্ষমতা বেশী, ফলে সমুদ্রে, নোনাজলে, ভেড়ীতে চাষ করা হয়।

(iv) কয়েকটি সামুদ্রিক প্রজাতির চিংড়ীর বৃদ্ধি মোহনার জলে বেশী ঘটে।

চিংড়ীর বিস্তরণ ও বীজ সংগ্রহ (Distribution of prawn and collection of seeds) :

(i) **বাগদা** (চিত্র 22A) : সুন্দরবন অঞ্চলের সর্বত্র, ভারতের পূর্ব

উপকূলে বিশেষতঃ পুলিকাট হ্রদের মুখে, গোপালপুর, চিল্কা, এন্নোর, মহানদী, গৌতমী ও গোদাবরী অঞ্চলে সারা বছর বাগদা বীজ পাওয়া যায়।



চিত্র 22 : বিভিন্ন ধরনের চিংড়ী

A—বাগদা, B—হন্যে, C—চামনে, D—রুশ্না

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে ভরা কোটালে প্রতি জোয়ারে 10,000 বীজ সংগৃহীত হয়।

(ii) **হন্যে চিংড়ী** (চিত্র 22B) : হুগলী ও মাতলা নদীর খাঁড়ি মোহনায় হন্যে চিংড়ীর বীজ সারা বছরই পাওয়া যায়।

(iii) **চামনে চিংড়ী** (চিত্র 22C) : হুগলী-মাতলা নদীর খাঁড়ি মোহনায়, আদিয়ার খাঁড়ি, গৌতমী, গোদাবরী নদীর খাঁড়িতে চামনে চিংড়ীর বীজ পাওয়া যায়। এই বীজ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অবস্থায় ধরা হয়।

(iv) **চাপড়া** : ভারতের পূর্ব উপকূলের খাঁড়ি মোহনায় এবং নোনা

হ্রদে বছরের সব সময়েই চাপড়া চিংড়ীর বীজ পাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে জানুয়ারী হইতে মার্চ মাসে, কাকদ্বীপ ও বকখালিতে আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে বীজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(v) **হেড়ে বাগদা** : অন্ধ্র, তামিলনাড়ুর খাঁড়ি মোহনায় এবং নোনা হ্রদে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক হেড়ে বাগদার বীজ পাওয়া যায়। পুলিকট হ্রদে সারা বছরই বীজ পাওয়া যায় তবে মার্চ, জুন, আগষ্ট ও ডিসেম্বরে ইহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(vi) **রুশ্না চিংড়ী** (চিত্র 22D) : হুগলী, মাতলা, রূপনারায়ণপুর মোহনায়, চিল্কা হ্রদ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ সারা বছর পাওয়া যায়। হুগলী নদীর মৌসুমী দ্বীপ অঞ্চলে বিণ্ডিজাল পিছু প্রতি ঘণ্টায় 1,400 চারা ধরা পড়ে।

চাষের উপযুক্ত চিংড়ীর বিভিন্ন প্রজাতি (Different species of prawn suitable for culture) :

নাটানপিয়ার সভ্যগুলি পিনিডিয়া এবং ক্যারিডিয়া এই দুই দলে বিভক্ত। ক্যারিডিয়ান চিংড়ী প্রজাতি ও পিনিডিয়া প্রজাতির মধ্যে বাহিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ক্যারিডিয়ান প্রজাতিদের প্রথম ম্যাক্সিলিপেডের এক্সোপোডাইটে একটি খণ্ড উপস্থিত। এই প্রজাতিগুলি ডিম পছন্দ করে। পিনিডিয়া জাতের চিংড়ীগুলি মোহনার জলে প্রধানতঃ চাষ হয়। ইহারা সাধারণতঃ অগভীর কর্দমাক্ত জলাশয়ে বাস করে। এই জাতের চিংড়ীগুলির চাষই ভারতবর্ষে প্রধান হয় যথা—*Penaeus indicus* (Indian white prawn), *P. monodon* (Giant tiger prawn), *P. merguiansis* (Banana prawn), *P. semisulcatus* (Green tiger prawn), *Metapenaeus dobini* (Yellow prawn), *M. brevicornis*, *M. affinis* ইত্যাদি।

ক্যারিডিয়ান প্রজাতিগুলির মধ্যে প্রধানতঃ নীচের প্রজাতিগুলিই ভারতের বাজারে পাওয়া যায়। যথা—*Palaemon styliferus. M. malcotrisonii*, *M. rosenberyii*, *M. villosimanns*, *M. idae. M. rude* ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে *M. rosenberyii* সর্বোৎকৃষ্ট।

চিংড়ী চাষ প্রথা (Prawn culture methods) :

আমাদের দেশে পুকুর, মোহনার জলপূর্ণ জলাশয়, ধানের জমি, খাঁড়ি,

ইত্যাদি জলাশয় চিংড়ী চাষের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতেই নদীর মোহনা অঞ্চলে বাঁধ দিয়া নোনা জলের ভেড়ীতে বা ঘেরীতে চিংড়ী চাষ করা হয়। ভেড়ীতে বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত মাছের চারার প্রবেশ এবং অনিয়ন্ত্রিত মজুতের ফলে সীমিত খাদ্য ও বাসস্থানের মধ্যে মাছদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, ফলে সামগ্রিক উৎপাদন বহুলাংশে কম হয়।

বিগত কয়েক বছরে মাছ চাষ সম্পর্কে গবেষণায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিংড়ী চাষ প্রথা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আধুনিক পদ্ধতিতে পুকুরে বাছাই জাতের চিংড়ীর প্রজাতির চাষ করা হয়।

মোহনার জলপূর্ণ পুকুরে চিংড়ীর একপ্রজাতি চাষ :

ভারতীয় চিংড়ী প্রজাতিগুলির মধ্যে *Penaeus monodon* বা বাগদার চাষ সবচেয়ে লাভজনক। এই চিংড়ী আকারে বড় হয়, বৃদ্ধির হার দ্রুত, চাষের পরিবেশে প্রতিকূল অবস্থায় সহনশীলতা, চারা মাছের পর্যাপ্ততা, উৎকৃষ্ট খাদ্যগুণ এবং পরিশেষে বাজারে চাহিদা—এই সকল গুণের জন্য এই চিংড়ীর চাষ বেশী হয়। আমাদের দেশে এই প্রজাতির বৈজ্ঞানিক পন্থায় চাষের বিস্তার হইলে হেক্টর প্রতি 1,200 কিলোগ্রাম উৎপাদন সম্ভব হয়।

চারা সংগ্রহ : চিংড়ী প্রজাতিগুলি স্বাভাবিকভাবে পুকুরে প্রজনন করে না ফলে প্রতিবছর চাষের শুরুতে চিংড়ীর চারা সংগ্রহ করিয়া পুকুরে ছাড়া হয়। *P. monodon* এর ক্ষুদ্র 10 হইতে 14 মিলিমিটার উত্তর লার্ভা দশা (post larva) সুন্দরবনের মোহনা, চিল্কা হ্রদ, পুলিকাট হ্রদ, গোপালপুর মহানদী, গৌতমী, গোদাবরী ও আদায়ার মোহনায় পাওয়া যায়। প্রজাতিটির উত্তর লার্ভা দশা এবং অপরিণত দশাগুলি বছরের সকল সময় পাওয়া যাইলেও ইহাদের পর্যাপ্ততা ঋতু এবং স্থানানুযায়ী পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে উত্তর লার্ভা দশাগুলি মার্চ হইতে জুন মাস পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই দশাগুলিকে বিভিন্ন ধরনের জাল দ্বারা সংগ্রহ করা হয়।

P. monodon 15-20 মিলিমিটার দৈর্ঘ্যসম্পন্ন ও অপরিণত দশাগুলির স্বচ্ছ দেহের পেটের দিকে লাল দাগ থাকে। 50-60 মিলিমিটার অপরিণত দশাগুলির দেহ কালচে এবং লেজের দিকে হলুদ ও কালো দাগ থাকে।

আঁতুড় পুকুর পরিচালনা :

সদ্য সংগৃহীত অপরিণত দশাগুলিকে পুকুরের হাপায় 5 হইতে 12 ঘন্টা

রাখিয়া ধাতস্থ করা হয়। এই সময় দুর্বল ও আহত চিংড়ীকে তুলিয়া ফেলা হয়।

আঁতুড় পুকুরকে ব্যবহারের পূর্বে জলশূন্য করিয়া অবাঞ্ছিত প্রাণী মারিয়া ফেলা হয়। পুকুর পরিপূর্ণ শুষ্ক না হইলে বিঘা প্রতি 20 কিলোগ্রাম মহুয়া খইল প্রয়োগ করা হয়। পুকুরের তলায় সঞ্চিত বর্জ্য পদার্থ এবং ক্ষতিকারক পদার্থ বিনষ্ট করিবার জন্য হেক্টর প্রতি 200 কিলোগ্রাম চূণ প্রয়োগ করা হয়। উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য পুকুরে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করা হয়। জৈব সার হিসাবে মুরগীর বিষ্ঠা সর্বোৎকৃষ্ট। প্রতি হেক্টরে 250 কিলোগ্রাম মুরগীর বিষ্ঠা অথবা 750 কিলোগ্রাম গোবর প্রয়োগ করা হয়। অজৈব সার হিসাবে ইউরিয়া এবং সুপারফসফেট যোগ করা হয়। পুকুরে 20-30 সেন্টিমিটার পর্যন্ত জল ঢুকাইবার পনের দিন পর জলে শৈবাল ও খাদ্যকণা জন্মায়। প্রায় 20 দিন বাদে 80-100 সেন্টিমিটার জল প্রবেশ করানো হয়। এই সময়ে হেক্টর প্রতি 3 হইতে 5 লক্ষ চারা ছাড়া হয়। লম্বা কাণ্ডযুক্ত জলজ ঘাস এবং তালগাছের পাতা জলে ডুবাইয়া রাখিলে তাহাতে শেওলা জন্মায়। প্রায় একমাসের মধ্যে চারাগুলি 40-60 মিলিমিটার দৈর্ঘ্য সম্পন্ন হয়।

মজুত পুকুর পরিচালনা :

মজুত পুকুরের পরিচালনা আঁতুড় পুকুরের মতই। এই পুকুরে একই আকারের চিংড়ী চারাগুলি লওয়া হয়, কারণ বড় আকারের চারাগুলি ছোট চারা ধ্বংস করিয়া ফেলে। মজুত পুকুরে হেক্টর প্রতি 25000-50000 চারা ছাড়া হয়। পুকুরে মাঝে মাঝে জোয়ারের জল ছাড়িবার ব্যবস্থা করা হয় ফলে পুকুরের উর্বরতা স্বাভাবিকভাবে বজায় থাকে। বর্ধিষ্ণু চিংড়ীর চারাগুলিকে পরিপূরক খাদ্য হিসাবে শুকনা মাছের গুঁড়া, বাদাম খোলের গুঁড়া, চালের গুঁড়া ইত্যাদি দেওয়া হয়। মজুত চিংড়ীর ওজনের 5 শতাংশ খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন।

পরিণত চিংড়ী সংগ্রহ :

বাগদা চিংড়ী স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। কিন্তু স্বল্পমেয়াদী ফসল হিসাবে 100 দিনের মধ্যে হেক্টর প্রতি 350 কিলোগ্রাম ফসল পাওয়া সম্ভব। এই সময়ের মধ্যে চিংড়ীগুলি প্রায় 40-50 গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পায়।

স্বাদুজলের পুকুরে চিংড়ী চাষ ঃ

স্বাদুজলে চিংড়ী চাষের জন্য *Macrobrachium rosenbergii* প্রজাতিই সর্বোৎকৃষ্ট। প্রজাতিটির চাষের সুবিধা হইল যে ইহার বৃদ্ধি দ্রুত হয়, সর্বভুক এবং হিমায়িত অবস্থায় লবণাক্ত প্রজাতি অপেক্ষা সুস্বাদু। কিন্তু এই প্রজাতির চিংড়ীর চারা প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। কাজেই বহুদেশে পরীক্ষাগারে পরিণত চিংড়ীর প্রজননের সাহায্যে চারা উৎপন্ন করা হয়। ভারতে প্রজাতিটির স্বাদুজলে চাষ এখনও পরীক্ষা-মূলক পর্যায়ে আছে।

চিংড়ীর চারা উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে পরিণত প্রজাতি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষাগারে কৃত্রিম জলাশয়ে রাখা হয়। এই চিংড়ীকে চালের গুঁড়া, কুঁচা চিংড়ী ইত্যাদি পরিপূরক খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয়। কৃত্রিম উপায়ে জলাধারে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়। একটি স্ত্রী চিংড়ী একমাস ব্যাপী প্রজননে অংশগ্রহণ করে। মিলনের 24 ঘণ্টা পরে ডিমগুলি লেজের প্লিওপড উপাংগে দেখা যায়। স্ত্রী চিংড়ী প্রায় 7,000—3,00,000 ডিম পারিতে সক্ষম। 15 হইতে 24 দিনের মধ্যে ডিম হইতে লার্ভা বাহির হয়। লার্ভাকে পালন জলাধারে স্থানান্তরিত করা হয়।

লার্ভা প্রতিপালন পদ্ধতি ঃ

কেন্দ্রীয় মৎস্যচাষ গবেষণা সংস্থার চিংড়ী প্রজনন বিভাগের পরীক্ষায় দেখা যায় যে *M. rosenbergii* প্রজাতির লার্ভা টিউবিফেক্স (*Tubifex*) নামক প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। লার্ভাগুলিকে 27 হইতে 29 ডিগ্রী সেলেসিয়াস তাপমাত্রায় লালন করা হয়। জলাধারগুলিতে প্রাথমিকভাবে শতকরা 12-14 লাবণিকতা সম্পন্ন সামুদ্রিক জল দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং ধীরে ধীরে স্বাদুজলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

পুকুরে পালন পদ্ধতি ঃ

পুকুরগুলি ছায়াঘেরা এবং নিমজ্জিত ধরনের জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইলে ভাল হয়। লার্ভাগুলি 2·0 হইতে 3·0 সেন্টিমিটার হইলে স্বাদুজলের পালন পুকুরে ছাড়িবার উপযোগী হয়। সাধারণতঃ ভোরের দিকে চিংড়ী চারা ছাড়িবার উপযুক্ত সময়। পরীক্ষামূলকভাবে 5,000 হইতে 30,000 চারা হেক্টর প্রতি ছাড়া হয়। 4 হইতে 6 মাস বাদে হেক্টর প্রতি 280 হইতে

700 কিলোগ্রাম পর্যন্ত চিংড়ীর উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয়।

মোহনাতন্ত্রে চিংড়ীর চাষ :

বড় জাতের পিনিডের মধ্যে *P. monodon* এবং *P. indicus* কদাচিৎ ব্যবসায়িকভাবে পাওয়া যায়। মোহনাগুলির নিম্নাঞ্চলে এই প্রজাতির উত্তর লার্ভা দশা পাওয়া যায়।

মহানদী মোহনাতন্ত্র : চিল্কা হ্রদ মহানদী মোহনাতন্ত্রের অন্তর্গত। ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মোহনাজলের হ্রদ, গড় আয়তন প্রায় 1040 বর্গ কিলোমিটার। হ্রদে লাবণিকতা 0·31 হইতে 29·84 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। হ্রদের গভীরতা 1·78 হইতে 2·7 মিটার পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এই হ্রদে প্রাপ্ত চিংড়ীর বিভিন্ন প্রজাতি এবং তাহাদের উৎপাদনের শতকরা পরিমাণ নীচে উল্লেখ করা হইল।

P. indicus (64·2%), *P. monodon* (23.9%), *Metapenaeus monoceros* (3·2%) এবং *M. dobsoni* (3·7%)।

বৃহত্তর পিনিড জাতের চিংড়ী চাষের ক্ষেত্রে চিল্কা দেশের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হিসাবে পরিগণিত। সাম্প্রতিককালে চিংড়ী প্রজাতিগুলির pen এবং cage culture চিংড়ী চাষের পক্ষে উৎসাহজনক প্রথার সূচনা করিয়াছে।

গোদাবরী মোহনাতন্ত্র এবং কাকিনাদ উপসাগর কেন্দ্র :

এই অঞ্চলের মোট আয়তন 110 বর্গ কিলোমিটার। ক্যারিডিয়ান এবং পিনিড জাতের বহু প্রজাতির চিংড়ী পাওয়া যায়। তার মধ্যে *P. indicus*, *P. monodon* এবং *Metapenaeus monoceros* প্রধান।

পশ্চিম উপকূলের মোহনায় আবদ্ধ জল :

কোচিন অঞ্চলের মোহনার আবদ্ধ জলাশয়গুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই অঞ্চলে ধানীজমির মধ্যে মোহনার জল প্রবেশ করে। ধান ও মাছের সহাবস্থানে পোকখালি মাছ চাষ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মাছের মোট উৎপাদনের শতকরা 60 হইতে 70 ভাগ চিংড়ী পাওয়া যায়। প্রধানতঃ পাঁচটি প্রজাতির চিংড়ী এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। যথা—*Matapenaeus dobsoni*, *M. monoceros*, *M. afflnis* এবং অল্প পরিমাণে *P. indicus*, *Macrobrachium rosenbergii.*

পুলিকাট হ্রদ ঃ

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ চিংড়ী পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে মুখ্যতঃ *P. indicus* পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া *P. monodon, P. semisulcatus, M. monoceros* এবং *M. dobsoni* ইত্যাদি প্রজাতি ধরা পড়ে।

নোনা জলে চিংড়ী মাছের চাষ ঃ

পশ্চিমবাংলার উপকূলে বিশেষ করিয়া 24 পরগণা ও মেদিনীপুর জেলায় বেশীরভাগ পুকুরের জলে লবণের পরিমাণ বেশী। কম নোনা জলে বাগদা চিংড়ীর চাষ ভালই হয়। বাগদা চিংড়ীর চাষ লাভজনক, কারণ ছোট চারা বছরের সকল সময়েই পাওয়া যায়। বছরে মোট তিনবার ফলনে হেক্টর প্রতি 1800 কিলোগ্রাম মাছ পাওয়া যায়। আঁতুড় পুকুরে প্রায় 10 কাঠা জলাশয়ে 25,000 বাগদার বাচ্চা পালন করা হয়। তাহাদের বাঁচার হার শতকরা 40 হইলে দুইমাস পড়ে 10,000 বড় বাচ্চা পাওয়া যাইতে পারে। পরিপূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুঁড়া, বাদাম খোলের কুঁড়া ও শুকনা চিংড়ী 1:1:1 অনুপাতে দেওয়া হয়। প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন বাচ্চার গড় ওজনের শতকরা (0·005 গ্রাম) দ্বিগুণ খাদ্য দিতে হয়। তিন সপ্তাহ পর বাচ্চা তুলিয়া পুনরায় গড় ওজন দেখিয়া লওয়া হয়। এই সময় দেহের ওজনের শতকরা 10 ভাগ হিসাবে খাদ্য দিতে হয়। বাচ্চার গড় ওজন 0·5 গ্রাম হইলে মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

মজুত পুকুরে মাছের গড় ওজনের শতকরা দশভাগ খাদ্য দিতে হয়। প্রতিমাসে একবার জাল টানিয়া বাগদার গড় ওজন পর্যবেক্ষণ করা হয়। নোনা জলের মজুত পুকুরে পোনা মাছের সঙ্গে চিংড়ী চাষ করিলে নয় মাস পর চিংড়ীর গড় ওজন হয় 40-50 গ্রাম। এই পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি এক বছরে চিংড়ীর দুইবার ফলনে 1200 কিলোগ্রাম উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয়।

ধানজমিতে চিংড়ী চাষ (Paddy prawn fishery) ঃ

পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলের ধানজমিতে সেচখাল হইতে চাষের জন্য জল সরবরাহ করা হয়। এই সমস্ত ধানজমিতে চিংড়ী চাষ করা হয়। জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত সেচখালের তল ধানজমির তল অপেক্ষা 30 সেন্টিমিটার নীচে রাখা হয়। জুন-জুলাই মাসে বর্ষার প্রারম্ভে ধানজমিতে সার প্রয়োগ করিয়া ধানচারা রোপণ করা হয়। আগষ্ট মাসে ধানজমি বৃষ্টির জলে ডুবিয়া যায় এবং এই জলে লবণের পরিমাণও কম থাকে। এই সময় ধান-

জমি এবং সেচখালের মধ্যবর্তী মাটির বাঁধ স্থানে স্থানে কাটিয়া দেওয়া হয়। সেচখালের জলে নদী হইতে আসা যে সমস্ত চিংড়ীর বীজ থাকে, তাহা এই কাটা অঞ্চল দিয়া ধানজমিতে প্রবেশ করে। ধান কাটার পূর্ব পর্যন্ত বীজগুলি ধানজমিতে বড় হয়। ধান কাটার পূর্বেই চিংড়ী সংগ্রহ করিয়া মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয় বা বাজারে বিক্রীর জন্য ছাড়া হয়।

নোনা জলের ভেড়ীতে চিংড়ী চাষ ঃ

বহুদিন পূর্ব হতেই সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ করিবার জন্য জমির বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জমির চারিপার্শ্বে বাঁধ দিয়া পলিমাটি জমার জন্য ঐ জমিতে স্লুইশ দরজার মাধ্যমে জোয়ারের জল প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ভরা কোটালে ঐ জলের সহিত অনেক বীজ প্রবেশ করিত। এই নোনা জলের ভেড়ীতে চিংড়ী চাষ করা হয়। চাষ করিবার এই পদ্ধতিকে **'ভাসাবাধা'** বলে। দেশের বৃহত্তম মোহনা অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের হুগলী-মাতলা ও সুন্দরবনের মোহনার জলে অসংখ্য খাল, প্রণালী ইত্যাদির মাধ্যমে ভাসাবাধা প্রথায় চিংড়ী চাষ হয়। চিংড়ী প্রজাতিগুলির মধ্যে *P. monodon, P. indicus, M. brevicornis* ইত্যাদি প্রধান। এই সকল খাঁড়িতে জোয়ার-ভাটায় জল তিন হইতে পাঁচমিটার পর্যন্ত উঠানামা করে। এই জলে লবণ ও জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে।

ভাসাবাধা পদ্ধতিতে নির্ধারিত এলাকার পরিধি বরাবর বাঁধ দিয়া, বাঁধের একপার্শ্বে স্লুইশ দরজা বসান হয়। স্লুইশ দরজা নদী বা খালের জলকে জমিতে প্রবেশ বা নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ করে। জোয়ারের জলে চিংড়ীর বীজ ঐ ভেড়ীতে প্রবেশ করে। স্লুইশ দরজা ও জমির মধ্যবর্তী খালে পাটা বসানো থাকে। দুই পাটার সংযোগস্থলে চেরা বাঁশ দ্বারা তৈয়ারী **'বিত্ত'** বা **আটল** উল্টান 'W' বা 'V' আকারের এমনভাবে বসানো হয় যাহাতে কেবলমাত্র ছোট মাছ প্রবেশ করিতে পারে।

মাছচাষের জমিতে বীজসহ জল জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে প্রবেশ করানো হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে জমির চারিদিকের বাঁধকে মেরামত করা হয়। মে-জুন মাসে জমির জল কমিয়া যায়, অবৈধ চুরি বন্ধের জন্য জমিতে বাঁশ, কাঠ, পুঁতিয়া রাখা হয় যাহাতে জাল সহজে টানা না যায়। ডিসেম্বরে বিক্রয় উপযোগী চিংড়ী ধরা হয়।

নোনাজলে চিংড়ী চাষের অসুবিধা এবং প্রতিকার ঃ

নোনাজলে চিংড়ী চাষের 'অসুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(1) **যান্ত্রিক কারণ ঃ**

(i) **পয়োদ্বারের গঠনগত ব্যর্থতা ঃ** যোগান খালের (Feeder canal) সঙ্গে খাঁড়ির এবং খামারের প্রতিটি পুকুরের সংযোগ সাধনের জন্য উপযুক্ত পয়োদ্বার থাকে। পয়োদ্বার সৃষ্টির সময় খারাপ মালমশলা ব্যবহারের জন্য পুকুরের তলা বসিয়া যায় বা খামারের গঠনগত ত্রুটির জন্য চাষ নষ্ট হয়।

(ii) **পুকুরে পলি জমা ঃ** পুকুরে অতিমাত্রায় পলি জমা হইলে জলাশয়ের গভীরতা কমিয়া যায়। চাষ শুরু করিবার পূর্বে এবং শেষে পলি তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন।

(iii) **বাঁধের ধ্বসা মাটি ঃ** ঝড়-বৃষ্টি বা গঠনগত ত্রুটির জন্য বাঁধের মাটি ভাঙিয়া জলাশয়ে পড়িলে জলের গভীরতা কমিয়া যায় এবং জল বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

(iv) **খামার ভাসিয়া যাওয়া ঃ** অতিমাত্রায় বৃষ্টি হইলে বা পয়োদ্বার ভাঙিয়া গেলে খামার ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সেইক্ষেত্রে পাম্পের মাধ্যমে জল নিকাশের প্রয়োজন।

(2) **ভৌত কারণ ঃ**

(i) **তাপমাত্রা ঃ** গ্রীষ্মকালে খামারের জলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে জলের পরিমাণ হ্রাস পায় ফলে জলে লবণের ঘনত্ব বাড়িয়া যায়। শীতকালে পুকুরের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণগত হ্রাস পায়।

(ii) **অপরিষ্কার জল ঃ** জলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, ভাসমান পলি বৃদ্ধি পাইলে বা লবণের পরিমাণ হ্রাস পাইলে পুকুরের জল নোংরা হয়।

(3) **রাসায়নিক কারণ ঃ**

(i) **লবণতা ঃ** খামারের জলের একটি নির্দিষ্ট লবণতা থাকা উচিত। অতিমাত্রায় লবণাক্ত জলে চিংড়ীর বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং রোগ হয়।

(ii) **অক্সিজেনের অভাব ঃ** জলে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া যায়। জলে জলজ উদ্ভিদের পরিমাণ হ্রাস পাইলে জলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়া যায়। এইজন্য

জোয়ারের জল ও খামারের জলে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

(iii) **চাষের পুকুরের জৈব কারণ জনিত দূষণ :** অক্সিজেনের স্বল্পতায় পুকুরের তলায় ক্ষরিত জৈব বস্তুর অজৈব সারে রূপান্তরিত হইতে বেশী সময় লাগে। এই অবস্থায় পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থের জমা হওয়ার মাত্রা উহাদের অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার হার হইতে বেশী হয় ফলে জলে জৈব দূষণের সম্ভাবনা দেখা যায়।

(4) **জৈব কারণ :**

(i) নোনাজলের খামারে চিংড়ী বা অন্যান্য মাছ সাধারণতঃ পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয় না। চিংড়ী অনেক ক্ষেত্রে বোপোরাইড পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইক্ষেত্রে 5% পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়।

(ii) শামুক চিংড়ীর খাদ্য গ্রহণ করে এবং ব্যালানাস (*Balanus*) নামক সন্ধিপদ প্রাণী খামারের কাঠের কাঠামো নষ্ট করে। জলে ট্রাইক্লিনাটুল, তামাকের গুঁড়া নিয়মিত ব্যবহার করিলে শামুকের উপদ্রব কমে। কাঠামোর গাত্রে আলকাতরা ব্যবহার করিলে ব্যালানাসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

জাপানে চিংড়ী চাষের পদ্ধতি (Methods of prawn fishery in Japan) :

বর্তমানে জাপানে কংক্রীটের চৌবাচ্চার স্বল্প পরিসরে সার্থকভাবে চিংড়ী চাষ করা হয়।

পূর্ণবয়স্ক কিছু পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ী সমুদ্র হইতে ধরিয়া আঁতুড় পুকুরে রাখা হয়। সংগৃহীত এই প্রজাতির নাম পিনিয়াস জ্যাপোনিকাস।

আঁতুড় পুকুর সিমেন্টের তৈরী চৌবাচ্চার মতন হয়। ইহারা নানারকম হইতে পারে, তবে সাধারণতঃ 57 বর্গমিটার বা 200 বর্গমিটার হইতে পারে। এই চৌবাচ্চায় জলের প্রবেশ ও নির্গমন পথ থাকে। চৌবাচ্চায় সমুদ্রের জল ব্যবহৃত হয়। পরিণত স্ত্রী চিংড়ী আঁতুড় পুকুরে ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলি নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত হইবার পর লার্ভা বাহির হয়। লার্ভার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য পটাশিয়াম নাইট্রেট ও পটাশিয়াম ফসফেট 10 : 1 অনুপাতে ব্যবহার করা হয়। লার্ভাগুলি বড় হইলে উহাদের সঞ্চয় পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

সঞ্চয় বা মজুত পুকুরের গঠন আঁতুড় পুকুরের ন্যায় তবে আকারে বড় হয়। সঞ্চয়ী পুকুরে সার দেওয়া হয় এবং চিংড়ী বড় হইলে বিক্রয়ের জন্য ধরা হয়।

চিংড়ী চাষের আধুনিক প্রথা (Modern methods of prawn culture) ঃ

মোহনার কাছাকাছি জলাশয়গুলিকে সংস্কার করিয়া মাছ চাষে ব্যবহার করিবার খরচ অনেক বেশী। আধুনিক ব্যবস্থায় মোহনার কাছাকাছি খাল, জলাশয়, উপসাগর এবং হ্রদগুলিকে সরাসরি চিংড়ী চাষে ব্যবহার করা হয়। ঘেরা এবং খাঁচা চাষ প্রথায় (pen and cage culture) মোহনার জলে সহজে চিংড়ী চাষ করা সম্ভব। জাপান, আমেরিকা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশগুলিতে ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ করিবার পদ্ধতি বহুদিন হইতেই প্রচলিত। ফিলিপাইনে ঘেরা চাষ বা পেন কালচার প্রথায় মাছ চাষ করা হয়। বস্তুতঃ মোহনার জলে এই পদ্ধতিতে চিংড়ী চাষ বর্তমানে পরীক্ষাস্তরে আছে। অতি সম্প্রতি চিল্কা হ্রদে এই পদ্ধতিতে চিংড়ী চাষের চেষ্টা চলিতেছে।

পেন ও খাঁচার বৈশিষ্ট্য ঃ

পেন প্রকৃতপক্ষে বৃত্তাকার বা আয়তাকার আবদ্ধ জলাশয়। সরু বুননের বাঁশের কঞ্চি দিয়া কাঠামো তৈয়ারি করা হয় এবং ভিতরে থাকে নাইলনের সরু জাল। পেনগুলি 50-200 বর্গমিটার পর্যন্ত হইতে পারে। খাঁচা চাষ প্রথায় বাঁশের কঞ্চি দিয়া কাঠামো তৈয়ারি করা হয়। অগভীর জলে খাঁচাটিকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয় এবং গভীর জলে ইহাকে ভাসাইয়া রাখা হয়। খাঁচার ভিতরে নাইলনের জাল ব্যবহার করা হয়।

চাষের প্রথা ঃ চাষের পূর্বে পেনগুলি হইতে অবাঞ্ছিত মাছ, পোকা ইত্যাদি মুক্ত করা হয়। ভাসমান খাঁচাগুলিকে জোয়ারের জল, হাওয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভালোভাবে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা প্রয়োজন। পরীক্ষামূলকভাবে প্রতি খাঁচায় প্রতি বর্গমিটার 10 হইতে 20টি চিংড়ীর চারা ছাড়া হয়। প্রধানতঃ *P. monodon*, *P. indicus* এবং *P. semisulcatus* চারা ব্যবহার করা হয়। 14 হইতে 50 মিলিমিটার আকৃতির অপরিণত দশাগুলি চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। নিয়মিতভাবে পেন বা খাঁচার জালগুলি পরিষ্কার করা হয় এবং লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে জালে কোন

ছিদ্র না থাকে। বর্ধিষ্ণু চারাগুলিকে পরিপূরক খাদ্য দেওয়া হয়। এই প্রকার চাষের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলা হয়—

(i) ঘোলাটে ও দূষিত জলে এই প্রকার চাষ অনুপযুক্ত।

(ii) চাষের অঞ্চলে পর্যাপ্ত জলের সরবরাহ।

(iii) জলের গভীরতা একমিটারের বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

(iv) চাষের অঞ্চলে ঝড় এবং জোয়ারের জলের প্রাবল্য কম হওয়া প্রয়োজন।

(v) জলাশয়ের নীচে কাদামাটি থাকা বাঞ্ছনীয়।

আবদ্ধ সমুদ্রের জলে চিংড়ী চাষ (Prawn culture in the back water of the sea) :

যে সকল স্থানে সমুদ্রের জোয়ারের জল পৌছায় এবং ঐ জোয়ারের জল আবদ্ধ করা সম্ভব সেই সকল স্থানে শিশু চিংড়ীকে আবদ্ধ করিয়া প্রতিপালন করা হয়। এই আবদ্ধ জলে চারা বৃদ্ধি পাইয়া পরিণতি লাভ করে। বিভিন্ন প্রকার জালের সাহায্যে বাজারে চালান দেওয়া হয়।

চিংড়ীর প্রসেসিং (Processing of prawns) :

ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ খোলা ছাড়ান চিংড়ীকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করিবার পদ্ধতিতে **প্রসেসিং** বলে। এই সংরক্ষণের তিনটি পর্যায় আছে।

(i) **তাজা অবস্থায় সংরক্ষণ** : সমুদ্র হইতে চিংড়ী ধরিয়া উপকূলে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে আনিবার জন্য যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে না করা যায় তাহা হইলে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ও ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণে চিংড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে প্রোটিনের খাদ্যমূল্য ব্যাহত হয় এবং ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণে ফ্যাটি অ্যাসিড বাহির হইয়া স্বজারণ পদ্ধতিতে কার্বোনিল যৌগ উৎপাদন করে, ফলে চিংড়ী দুর্গন্ধ হইয়া যায়। সাধারণতঃ 28 ডিগ্রী সেলেসিয়াস তাপমাত্রায় 4 ঘন্টা পর্যন্ত চিংড়ী অবিকৃত থাকে। যদি এই চিংড়ীকে সমপরিমাণ বরফের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে ব্যাক্টিরিয়া পচন ক্রিয়া শুরু করিতে পারে না। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী চিংড়ী ধরিবার 5 ঘন্টার মধ্যেই 45° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় সংরক্ষিত করিয়া 34 ডিগ্রী হইতে 40 ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় সঞ্চিত করিতে

হইবে। বর্তমানে ক্রায়োজেনিক নাইট্রোজেন (-320°F) মাল্টিজোম ফ্রিজারো মাধ্যমে প্রতি মিনিটে 7000 ফিট হারে সঞ্চালিত করা হয়। সাধারণতঃ শিরোবক্ষ অপসারিত করিয়া চিংড়ী সংরক্ষিত করা হয়।

(ii) **সঞ্চয় পদ্ধতিঃ** চিংড়ী সাধারণতঃ ক্রায়োজোনিক রেফ্রিজারেটরে 20°F তাপমাত্রায় সংরক্ষিত করা হয়। সঞ্চয় কালে চিংড়ীর খোলক ধীরে ধীরে কালো হইতে থাকে। সুতরাং ভাল দাম পাইবার জন্য চিংড়ী বরফ দ্বারা আবৃত করিয়া জল ঢালা হয়। ইহাতে চিংড়ীর খোলক কালো হয় না।

কুকিং পদ্ধতিঃ প্রতি পাউণ্ডে 200টি চিংড়ী হয়, এমন ওজনের চিংড়ীকে ফুটন্ত সমুদ্র জলে (brine) কুকিং করিয়া রাখা হয়। এক একবারে 30 পাউণ্ড অর্থাৎ 6000 চিংড়ী ফুটন্ত ব্রাইনে 2-3 মিনিট সিদ্ধ করা হয়, এই পদ্ধতিকে **ব্লাংকিং** (blanching) বলে। এই ব্লাংকিং করা চিংড়ী 2 ডিগ্রী সেলেসিয়াস জলে ডোবান হয়, এই পদ্ধতিকে গ্লেজিং (glazing) বলে।

(iii) **ক্যানিং শিল্পঃ** হিমায়িত চিংড়ী ব্রাইন মাধ্যমে বায়ুনিরোধ পাত্রে ভর্তি করিয়া বিক্রয় উপযোগী করা হয়। পাত্রের ব্রাইনে সাইট্রিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া ব্রাইনের pH 6·4-6·6 রাখা হয়। পাত্রগুলি 0·7 কিলোগ্রাম প্রতি বর্গসেন্টিমিটার চাপে 115·3 ডিগ্রী সেলেসিয়াস তাপমাত্রায় প্রসেসিং করা হয়। আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখিবার জন্য পাত্রের ব্রাইনে প্রতি কিলোগ্রাম চিংড়ীর জন্য 250 মিলিগ্রাম EDTA রাসায়নিক যৌগ যোগ করা হয়।

চিংড়ীর প্রণোদিত প্রজনন (Induced breeding of prawn)

চিংড়ীর চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিংড়ী পোনার চাহিদা বাড়িয়াছে। *Penaeus monodon* (বাগদা) এবং *Panaeus indicus* (চাপড়া) সমুদ্রের গভীরতল অঞ্চলে ডিম দেয়। বাচ্চা অবস্থায় ইহারা মোহনা ও উপকূলের দিকে চলিয়া আসে। উপকূলের নিকটস্থ বিভিন্ন শাখা নদী, খাঁড়ি হইতে চিংড়ীর বাচ্চা ধরা হয় এবং চাষের জন্য দূর-দূরান্তের ঘেড়ীগুলিতে পাঠান হয়।

বর্তমানে চিংড়ীর কৃত্রিম প্রজননের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতে কৃত্রিম প্রজনন বিশেষ প্রচলিত নাই তবে দক্ষিণভারতের কিছু অংশে ব্যবসায়িক

ভিত্তিতে 'Penacid prawn'-এর কৃত্রিম প্রজনন চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের উন্নত গবেষণা হইতেছে না, তবে কাকদ্বীপের কেন্দ্রীয় সরকারী মৎস্য খামারে চিংড়ীর কৃত্রিম প্রজননের চেষ্টা চলিতেছে

জাপানের মৎস্য বিজ্ঞানী মিঃ হুডিনাগা 1930 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম Penacid prawn-এর বাচ্চা কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারি করেন। প্রধানতঃ তাঁহার পদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া বর্তমানে আধুনিক চিংড়ীর প্রজনন চলিতেছে। কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা সংস্থা (CMFRI) এই ব্যাপারে এইদেশে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

প্রধানতঃ *Penaeus monodon* এবং *Penaeus indicus*-এর প্রজনন পদ্ধতি খুবই সহজ। কৃত্রিম প্রজননেও সমুদ্রের জলের প্রয়োজন, ইহাই একমাত্র সমস্যা, অন্য কোন তেমন অসুবিধা থাকে না।

এই চিংড়ীর স্ত্রী ও পুরুষের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 130 মিলিমিটার ও 125 মিলিমিটার হয়। এই অবস্থায় স্ত্রী চিংড়ী ডিম দিবার উপযুক্ত হয়। বৎসরের যে কোন সময় ডিম দেয় তবে বর্ষাকাল ও শীতকাল প্রধান সময় হিসাবে চিহ্নিত হয়। স্ত্রী চিংড়ী খোলস বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে খোলস না বদলানো পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। মিলনকালে স্ত্রী তাহার *"Thelycum"* (স্ত্রীজননকেন্দ্র)-এ শুক্রকীট গ্রহণ করে। পুরুষ তাহার *'Petasma'* দ্বারা ঐ শুক্রকীট The lycum-এ প্রবেশ করায়। এই অবস্থায় স্ত্রীকে *Impregnated female* বলে। স্ত্রী তাহার পরবর্তী খোলস বদল না করা পর্যন্ত এই শুক্রকীট সমূহ বহন করে। স্বাভাবিক নিয়মে সমুদ্রে এই চিংড়ী পরবর্তীকালে ডিম দেয়।

কৃত্রিম প্রজননের জন্য সমুদ্র থেকে আনা Impregnated স্ত্রী সবচেয়ে ভাল। যদিও মোহনায় বা নোনা ঘেড়ী থেকে প্রজননের উপযুক্ত ভাল চিংড়ী পাওয়া যায়। এইভাবে সংগ্রহ করা স্ত্রী চিংড়ীর যে কোন একটি চোখ কাটিয়া ফেলা হয়। চক্ষুসন্ধি কাটিবার জন্য বৈদ্যুতিক Cantery বা যে কোন ধারাল যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিকে *'Eye stalk abalation'* বলা হয়।

Eye stalk abalated কয়েকটি স্ত্রী চিংড়ীর সঙ্গে পুরুষ চিংড়ী একত্রে বড় চৌবাচ্চায় রাখা হয়। এই অবস্থায় যদি খোলস বদলায় তবে সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের সাথে মিলিত হইবার সুযোগ দিবার জন্য পুরুষ চিংড়ী রাখা

হয়। চৌবাচ্চায় অবশ্যই সমুদ্রের জল থাকা দরকার। পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য Compresor-এর সাহায্যে জলে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকে। ঝিনুক জাতীয় প্রাণীর মাংস প্রতিদিন খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয়। তিন হইতে পাঁচদিনের মধ্যে স্ত্রী চিংড়ী ডিম পাড়িবার উপযুক্ত হয় এবং ডিম্বাশয় পরিপক্ক হয়। খোলসের নীচে পিঠের উপরে ডিম্বাশয়কে পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়।

এক একটি পরিণত চিংড়ীকে ডিম পাড়িবার জন্য পৃথক পৃথক চৌবাচ্চায় রাখা হয়। এই চৌবাচ্চায় সমুদ্রের জল রাখা হয় এবং বায়ুচলাচলের বন্দোবস্ত রাখা হয়। জলে এক গ্রাম ডাইসোডিয়াম লবণ যোগ করা হয়। সাধারণতঃ 26°C হইতে 30°C তাপমাত্রায় রাত্রে জলে ডিম পাড়ে। ডিম ছাড়িবার পূর্বমুহূর্তে স্ত্রী চিংড়ী দ্রুতবেগে সাঁতার কাটে এবং দেহের ঝাঁকুনিতে ডিম ছাড়ে। প্রতিটি ডিম বাহির হইবার সময় Thelycum-এ রক্ষিত শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসে এবং নিষিক্ত হয়। প্রতিটি স্ত্রী চিংড়ী গড়ে দেড় লাখ ডিম দিতে পারে এবং তিন-চার মিনিটের মধ্যে ঐ ডিম দেওয়া শেষ হয়।

ডিম দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে স্ত্রী চিংড়ীকে তুলিয়া লইতে হয়। ডিম জলে ছাড়িবার 10-12 ঘণ্টার মধ্যে বাচ্চা বাহির হয়। এই সময় ইহাদের '*Nauplius*' বলে। Nauplius অবস্থায় থাকাকালীন ইহাদের বড় আকারের চৌবাচ্চায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই চৌবাচ্চায় সমুদ্রের জল থাকে এবং বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত রাখা হয়। প্রতিদিন আংশিকভাবে জল বদল করা অবশ্যই প্রয়োজন। 36 হইতে 48 ঘণ্টার মধ্যে '*Protozoea*'-তে পরিণত হয় এবং খাদ্যগ্রহণ শুরু করে। 3-4 দিনের মধ্যে '*Mysis*' অবস্থা আসে, তখন ছোট ফাইটোপ্ল্যাংকটন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। সাধারণতঃ ইহার তিনদিন পর post লার্ভা দশায় পরিণত হইয়া জুপ্ল্যাংকটন খাইতে শুরু করে। 15-20 দিনের মধ্যে চিংড়ী পোনায় পরিণত হয়। চিংড়ী পোনাকে আঁতুড় পুকুরে চালান দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে 4-5 দিনের মধ্যে post লার্ভা মোহনা বা কম লবণাক্ত জলাশয়ে আসে এবং যখন দৈর্ঘ্যে 50 হইতে 100 মিলিমিটার হয় তখন সমুদ্রে ফিরিয়া যায়। সেখানে চিংড়ী পরিণত হয় এবং ডিম দিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

চিংড়ীর ব্যাধি ও প্রতিবিধান (Diseases & control of prawn)

1. **অণুজীবী সৃষ্ট রোগ ঃ** Vibrio গণের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির আক্রমণে 70% হইতে 80% পিনিড চিংড়ীর লার্ভা অবস্থায় মারা যায়। ইহার আক্রমণে জুইয়া ও মাইসিস দশা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রতিবিধান ঃ

(i) পালনপুকুরে ডিম স্থানান্তরণ করা প্রয়োজন।

(ii) ডিমে অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োগ করিলে আক্রমণের তীব্রতা কমে।

2. **আন্থপ্রাণী সৃষ্ট রোগ ঃ** বিভিন্ন আন্থপ্রাণী চিংড়ীর ফুলকা, ত্বক, উপাঙ্গকে আক্রমণ করিয়া শ্বসন ও চলনে ব্যাঘাত ঘটায়।

প্রতিবিধান ঃ

(i) 25% হইতে 30% পি. পি. এম ফরমালিনের দ্রবণে লার্ভাকে আধঘণ্টা রাখিয়া দিলে অক্রমণের তীব্রতা কমে।

3. **ছত্রাক সৃষ্ট রোগ ঃ** পুকুরে শতকরা কুড়িভাগ চিংড়ী Lagenidium গণের ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। বয়স্ক চিংড়ী Fusarium গণের ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়।

প্রতিবিধান ঃ

(i) জলে ম্যালাকাইট গ্রীন ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

(ii) পালনপুকুরে ক্লোরিন মিশ্রিত করিলে সুফল পাওয়া যায়।

4. **গোল ও চ্যাপ্টা কৃমি সৃষ্ট রোগ ঃ** আন্দামানের পূর্ণতাপ্রাপ্ত চিংড়ীর অন্ত্রে গোলকৃমি ও চ্যাপ্টা কৃমির লার্ভা পাওয়া যায়।

5. **কোপিপড সৃষ্ট রোগ ঃ** Caligus গণের কোপিপড প্রাণীর চিংড়ীর চলনঅঙ্গ ও সুইমারেটে অবস্থান করিয়া চলনের তীব্রতা কমায়।

চিংড়ী চাষের উন্নতি (Improvement of prawn culture) ঃ

চিংড়ী চাষের উন্নতির জন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলি গ্রহণ করা হইয়াছে—

(i) চিংড়ীর চারা প্রাপ্তির স্থান সম্পর্কে সন্ধান।

(ii) চিংড়ী চাষ নোনাজলে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়।

(iii) চিংড়ী ছাড়িবার পূর্বে খামার পুকুর তৈয়ারীতে সাবধানতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খামার নির্মাণ।

(iv) বীজের সংগ্রহ ও সঠিক বাছাই।

(v) চিংড়ীর মিশ্রচাষে নোনাজলে পার্শে, ভাঙ্গর, চাঁদা, প্রভৃতি মাছের চাষ।

(vi) চিংড়ীর উন্নত প্রণালীতে নিবেশিত প্রজননের মাধ্যমে ডিম উৎপাদন। দেখা গিয়াছে চিংড়ীকে চিংড়ীর অক্ষিদণ্ডের নির্যাস ইনজেকশন করিলে উহারা প্রজননে রত হয়।

চিংড়ী চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importanc of prawn culture) ঃ

বিদেশের বাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং মূল্যের অগ্রগতির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় ব্যাপকভাবে চিংড়ী চাষ হয়। পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে 1975 সালে চিংড়ী রপ্তানী করিয়া ভারত সরকার 95 কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছে। 1979 সালে প্রায় 53,511 টন চিংড়ী রপ্তানী করিয়া 223·12 কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। প্রধানতঃ চিংড়ী শ্রিম্ফ (Shrimp) জাপান ও আমেরিকাতে রপ্তানী হয়। সমুদ্রজাত রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে ইহাদের পরিমাণ শতকরা 65 ভাগ। ইহার মধ্যে জাপান ও আমেরিকায় শতকরা 93 ভাগ ও অন্যান্য দেশে বাকী 7 ভাগ রপ্তানী হয়। সুতরাং কর্মসংস্থানের মাধ্যম হিসাবে ও ভারতীয় অর্থনীতিতে চিংড়ী চাষের গুরুত্ব অপরিসীম।

কাঁকড়া চাষ (Crab Culture)

সূচনা Introduction) :

কাঁকড়া ভারতের কোচিন, কালিকট হইতে ফ্রান্স, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও মরিশাশে চালান যায়। গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, মহানদীর মোহনা এবং এন্নুর, চিল্কা ও পুলিকটের স্বল্প নোনাজলে কাঁকড়ার চাষ হয়।

তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, গোয়া, গুজরাট ও কর্ণাটকে কাঁকড়ার চাষ করা হয়।

চাষ ও সংগ্রহ পদ্ধতি (Culture & melhods of collection) :

কাঁকড়া **সমুদ্রের জলে, নোনাজলে ও মোহনায় চাষ করা হয়।** আমাদের দেশে মোহনার জলে Scylla serrata প্রজাতির বিস্তার খুব ব্যাপক। প্রজাতিটি মিষ্টি জলে বাস করিতে পারে। ইহারা সাধারণতঃ 15-20 সেন্টিমিটার খোলক বরাবর দৈর্ঘ্যে হয়। বছরের সবসময়েই এই বৃহৎ প্রজাতিটির কাঁকড়া পাওয়া যায়।

ইহাছাড়া অন্য প্রজাতিগুলি হইল, *Portunus pelagicus* এবং *P. sanguinolentus.* উপরোক্ত প্রজাতি দুইটিকে সাধারণতঃ জানুয়ারী হইতে মার্চ মাসের মধ্যে গিল নেট, কাষ্ট নেট, ট্রল নেট দ্বারা ধরা হয়। বর্ষাকালে নদীর মুখ এবং মোহনা হইতে ধরা হয়।

কাঁকড়া ধরিবার জন্য **টোপ** (Bait) ব্যবহার করা হয় এবং জালের সাহায্যে ধরা হয়। টোপ হিসাবে সাধারণতঃ মরা মাছের অংশ ব্যবহার করা হয়। খাঁড়ি এবং অগভীর জলে Seine net দ্বারা ইহাদের ধরা হয়। পাথরের ফাঁক হইতে ইহাদের ধরিবার জন্য আংটাযুক্ত লোহার দণ্ড ব্যবহার করা হয়।

Paratelphusa spinigera নামক প্রজাতি দৈর্ঘ্যে 7-8 সেন্টিমিটার এবং প্রজাতিটি পশ্চিমবাংলার স্বাদুজলে পাওয়া যায়।

খাদ্যমূল্য (Food value) :

কাঁকড়া উচ্চ প্রোটিন (স্বল্প ক্যালোরির) জাতীয় খাদ্যরূপে পরিগণিত।

ব্যাঙ চাষ (Frog Culture)

সূচনা (Introduction) :

হিমায়িত ব্যাঙের পা (Frog leg) রপ্তানীতে বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। 1979 খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ব্যাঙের পা-এর রপ্তানীর পরিমাণ ছিল 3,764 মেট্রিক টন এবং ইহার ফলে বাণিজ্যিক আয় হয় প্রায় 8·72 কোটি টাকা। আমাদের দেশে ব্যাঙ চাষের সংক্রান্ত শিল্পে মূলতঃ ব্যাঙ ধরাকেই বোঝায়। বছরে প্রায় তিনটি প্রজাতির (120-150 মিলিয়ন) ব্যাঙ রপ্তানীর উদ্দেশ্যে মারা যায়। ব্যাঙের প্রজাতি-কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোপরি আমাদের দেশের ব্যাঙের বাণিজ্যিক সম্পদকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রচুর পরিমাণ ব্যাঙের চারা উৎপাদন প্রয়োজন। CIFRI-এর কটক এবং কল্যাণী কেন্দ্রে ব্যাঙের প্রণোদিত জনন এবং ডিম ফোটানোর প্রথা (Frog hatchery technique) সম্পর্কে গবেষণা করা হয়।

ব্যাঙের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি সমূহ (Economically important frog spceies) :

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
ভারতীয় বুলফ্রগ	*Rana tigrina*
জার্ডন ফ্রগ (Jerdon's frog)	*Rana crassa*
গ্রীণ পণ্ড ফ্রগ	*Rana hexadactyla*

Rana tigrina এবং *Rana crassa* প্রজাতি দুইটির ভারতে ব্যাপক চাষ হয়। *Rana hexadactyla* মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রে বেশী পাওয়া যায়। এই প্রজাতির মাংস সুস্বাদু।

প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতি (Method of induced breeding) :

ব্যাঙের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রজাতি প্রণোদিত জননে সাড়া দেয়। এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হইলে ব্যাঙের চারা উৎপাদনে যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

পরিণত ব্যাঙ সংগ্রহ ও প্রতিপালন :

পরিণত ব্যাঙগুলি বর্ষার শুরুতে এপ্রিল মে-মাসে খাল হইতে ডিম ধরা

হয়। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ ব্যাঙগুলির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চামড়া মোটা ও খসখসে হয়। ইহাকে Nuptial pad বলে। ইহা ছাড়া নিচের চোয়ালের দুইপাশে স্বরথলি দেখা যায়। পুরুষের পুরোবাহু অপেক্ষাকৃত সুগঠিত হয়। *Rana hexadactyla* প্রজাতির পরিণত ব্যাঙগুলিকে জলজ উদ্ভিদ সমৃদ্ধ পুকুরে পালন করা হয়।

ডিম প্রদানকারী উৎকৃষ্ট পরিণত স্ত্রী ব্যাঙ নির্বাচন :

প্রজনন প্রথায় উৎকৃষ্ট পরিণত স্ত্রী ব্যাঙ নির্বাচন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিণত পরিপক্ক ডিম বহনকারী স্ত্রী ব্যাঙের উদর স্ফীত অবস্থায় থাকে। এই সময়ে স্ত্রী ব্যাঙের পা বেশ পেশীবহুল হয়।

ব্যাঙের পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ :

প্রাক প্রজনন বা প্রজনন ঋতুতে পরিণত সুস্থ ব্যাঙের পিটুটারি গ্রন্থি সংগ্রহ করা হয় এবং অ্যালকোহল বা অ্যাসিটোনে সংরক্ষিত করা হয়। দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থিগুলিকে রেফ্রিজারেটারে রাখা হয়।

পিটুইটারি গ্রন্থিরস সংগ্রহ এবং ইনজেকশন প্রদান :

সদ্য সংগৃহীত অথবা সংরক্ষিত পিটুইটারি গ্রন্থিকে 0·5 মিলিলিটার পতিত জলে মিশ্রিত করিয়া হোমোজেনাইজার যন্ত্রে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়। তারপর ঐ মিশ্রণকে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে রাখা হয় এবং মিশ্রণের উপরিভাগের তরলকে সিরিঞ্জে লওয়া হয়। পরিণত স্ত্রী ব্যাঙের শ্রোণী অঞ্চলে চামড়ার তলায় ইনজেকশান করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতি এমনকি বুফো প্রজাতির পিটুইটারি গ্রন্থিনিঃসৃত হরমোন দ্বারা রাণা প্রজাতির ব্যাঙগুলিকে প্রজননে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব।

Rana tigrina প্রজাতির বড় আকারের 140 মিলিমিটার বা তদূর্ধে ব্যাঙগুলিকে জননে উদ্বুদ্ধ করিতে 5-6টি সম অথবা বিষম প্রজাতির পিটুইটারি গ্রন্থির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন প্রজাতিগুলির হরমোন-গোলা জল ইনজেকশানের পর স্ত্রী ব্যাঙ প্রায় 1000 হইতে 10,000 ডিম ছাড়ে।

ডিম নির্গমন ও কৃত্রিম নিষেক :

পিটুইটারি ইনজেকশন প্রদানের 2-4 ঘন্টা পরে ডিমগুলি জরায়ু হইতে বাহির হয়। পরিপূর্ণভাবে ডিমগুলি বাহিরে আসিবার জন্যে আঙুলের চাপের প্রয়োজন। কৃত্রিমভাবে ডিমগুলি নিষিক্ত করিবার জন্য পরিণত জীবন্ত পুরুষ ব্যাঙের শুক্রাশয় ব্যবচ্ছেদ ও টুকরা করিয়া পরীক্ষাগারে

সংগৃহীত পুকুরের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই জলে ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়।

ডিম ফুটানোর প্রথা ঃ

নিষিক্ত ডিমগুলিকে পরীক্ষাগারে জলপূর্ণ ট্রেতে ফুটানো হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে 25°C-29°C ডিগ্রী তাপমাত্রায় ডিম ভালভাবে ফোটে। *R. tigrina* প্রজাতির ডিম ফুটিতে 18-21 ঘণ্টা সময় লাগে। কল্যাণীর ব্যাঙচাষ গবেষণা কেন্দ্র উদ্ভাবিত কাঁচের তৈরী ডিম ফুটানর পাত্রে (Glassjar hatchery) এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য পাওয়া যায়।

ডিমগুলিকে কাঁচের পাত্রে কম জলের প্রবাহে রাখা হয়। 24°C-29°C তাপমাত্রার 16-17 ঘণ্টায় ডিম ফুটিয়া ব্যাঙের চারা বাহির হয়। চারা-গুলিকে তারপর জলের প্রবাহযুক্ত অন্য একটি পাত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তী আশি ঘণ্টা পর্যন্ত চারার কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

1980 সালে কল্যাণী কেন্দ্রে প্রণোদিত জননের মাধ্যমে প্রায় 1·7 মিলিয়ন ব্যাঙের চারা উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে।

হিমায়িত ব্যাঙের পা রপ্তানিযোগ্য করিবার পদ্ধতি (Processing of frogslegs for export) ঃ

সংগৃহীত আগেরদিনের অভুক্ত ব্যাঙ তারজালির বাক্সে রাখিতে হয় এবং 10% লবণদ্রবণে প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া ডুবাইতে হয়। অতঃপর ব্যাঙ তুলিয়া আনিয়া কাটিতে হয়। কাটিবার সময় ব্যাঙগুলিকে ব্রিন (Brine) দ্রবণ দ্বারা অ্যানেসথেটাইসিস করিতে হয়। ইহাতে যন্ত্রণা লাঘব হয়। সম্প্রতি Central Institute of Fisheries Technology, কোচিনে এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঙ মারা হয়। যাহা হউক, পাগুলি ভালভাবে কাটিয়া সুরক্ষা করা হয়। অন্যান্য জীবাণু বা *Entamoeba Coli*-এর সংক্রমণ হইতে সতর্ক থাকিতে হয়। পা হইতে চামড়া ছাড়াইয়া সাধারণ লবণের (2%) দ্রবণে তৎক্ষণাৎ ডুবাইয়া দিতে হয়। ইহাতে রক্ত ভিতরে জমাট বাঁধিতে পারে না। চামড়াছাড়ানো পাগুলির পাতার গোড়া বাদ দিয়া নিখুঁতভাবে কাটিতে (Trimming) হয়। ধমনী ও শিরাগুলি পা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ফ্রিজিং, প্যাকিং এবং স্টোরেজ (Freezing, Packing and Storage) ঃ

চামড়াছাড়ানো ব্যাঙের পা সর্বদাই বরফের আস্তরণের মধ্যে রাখা

হয়। ইহার পর তুলিয়া আনিয়া পরিষ্কার জলে ভালভাবে ধুইয়া লইয়া জমা করা হয়। আকৃতির উপর হিমায়িত করাও নির্ভর করে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যাঙের হিমায়িত পাগুলি তিন প্রকারের হয়—ইষৎ গোলাপী, বাদামী এবং নীল বর্ণের। প্রায় 40% সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পাগুলি হিমায়িত করা হয়। এইবার ভালভাবে প্যাক করিয়া বাজারে সরবরাহ করা হয়। প্যাকিং ভালভাবে করিয়া 23° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় স্টোরে প্রায় ছয়মাস রাখা যায়।

হিমায়িত পা-এর রঙের উন্নতিসাধন (Improvement of colour of frog's leg) ঃ

আইভরি সাদা অথবা মাখনের মত সাদা বর্ণের হিমায়িত পা-এর চাহিদা সর্বত্র বেশী। যদি মনে করা হয়, এই বর্ণ শেষ পর্যায়েও আসে নাই তখনই Central Institute of Fisheries, Cochin-এর গবেষণালব্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

এই পদ্ধতিতে পা হইতে চামড়া ছাড়াইয়া 0·3% সোডিয়াম সালফেট দ্রবণে প্রায় 30 মিনিট ধরিয়া ডুবাইয়া রাখিতে হয়। এক কিলোগ্রাম চামড়াছাড়ানো পা-এর জন্য প্রার 1·5 লিটার দ্রবণ দরকার হয়। এরপর পা তুলিয়া 0·15% সাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণে ঠাণ্ডা পরিবেশে প্রায় 30 মিনিট রাখিতে হয়। এর পরই যথারীতি হিমায়িত করা হয়।

ভারতবর্ষের কেরালা, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ু রাজ্যগুলিতে রপ্তানি-যোগ্য ব্যাঙের চাষ করা হয়। ব্যাঙের হিমায়িত পা ব্যতীত ইহাদের চামড়া জাপানে ব্যবহৃত হয়। অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও ব্যাঙের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। প্রাণিবিদ্যায় শিক্ষামূলক হিসাবে আদর্শ মেরুদণ্ডী প্রাণী বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন গবেষণায় ব্যাঙকে কাজে লাগানো হয়। আমাদের দেশে ব্যাঙ চাষের এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ব্যাঙচাষের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ছাড়াও প্রাকৃতিক ভারসাম্যও রক্ষা হইবে।

মুক্তা চাষ (Pearl Culture)

সূচনা (Introduction) ঃ

মানবসভ্যতার সঙ্গে মুক্তার পরিচিতি বহুদিনের। ভারতের অনেক প্রাচীন সাহিত্যে মণি-মুক্তার উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টজন্মের 2000 বছর আগেও প্রাক্‌-আর্যযুগে মুক্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমে মুক্তা পদ ও মর্যাদার প্রতীকরূপে গণ্য হইত। প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর সভ্যদেশের অলঙ্কারে মুক্তার ব্যবহার ছিল। পূর্বে পৃথিবীর সকল দেশেই সমুদ্র হইতে সামুদ্রিক কম্বোজ প্রাণী আহরণ করিয়া মুক্তা সংগ্রহ করা হইত, ফলে ইহার মূল্য ছিল অনেক বেশী। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ জাপানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় বিশেষ ধরনের কম্বোজ প্রাণীর চাষ করিয়া মুক্তা পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী প্রচেষ্টায় মুক্তাপালনের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

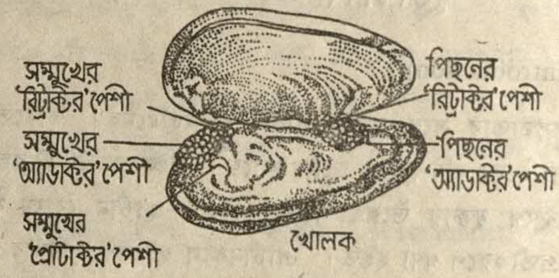
মুক্তা কাহাকে বলে (What is pearl) ? ঃ

কম্বোজ পর্বের বিশেষ কয়েকটি প্রজাতির দেহ নিঃসৃত পদার্থ জমাট বাঁধিয়া মুক্তা সৃষ্টি হয়। জমাট বাঁধা কঠিন বস্তুকে **নেকরে** বা **মাদার অফ পার্ল** বলে। বিশেষ কম্বোজ প্রাণীর ম্যাণ্টলে অবস্থিত এই মাদার অফ পার্ল হইতে ক্ষরিত পদার্থ কোন বহিরাগত বস্তুর বাহিরে স্তরে স্তরে জমিয়া চকচকে মুক্তা গঠিত হয়। খোলক ও ম্যাণ্টলের মধ্যবর্তী স্থানে মুক্তা গঠিত হয়।

মুক্তার আকার (Shape of pearl) ঃ

মুক্তার আকার বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে, যথা—গোল, ডিম্বাকার, চ্যাপ্টা বা বিশেষ আকৃতিবিহীনও হয়। আকৃতিবিহীন মুক্তার অর্থমূল্য কম এবং গোল মুক্তার চাহিদা ও মূল্য অনেক বেশী। মুক্তার ওজনের একককে **পার্ল গ্রেন** (Pearl grain) বলে। এক পার্ল গ্রেন = 50 মিলিগ্রাম = $\frac{1}{4}$ ক্যারাট। $\frac{1}{4}$ পার্ল গ্রেন ওজনের মুক্তাকে সীড পার্ল বলে। সর্ববৃহৎ স্বাভাবিক মুক্তার ওজন 1,800 পার্ল গ্রেন। মুক্তাটির নাম **বার্কুয়ো** (Baroques)। একটি ডিম্বাকার 337 পার্ল গ্রেন ওজনের ও একটি 350

গ্রেন ওজনের ওরিয়েন্টাল পার্ল বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মুক্তার আকার ও উজ্জ্বলতার উপর দাম নির্ভর করে।



চিত্র 23 : ঝিনুকের খোলক

মুক্তার বর্ণ (Colouration of pearl) :

মুক্তার নির্দিষ্ট বর্ণ থাকা সম্ভব নয়। মুক্তাসৃষ্টিকারী কম্বোজ প্রজাতির প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর মুক্তার বর্ণ নির্ভর করে। মুক্তার বর্ণ সাদা, ধূসর, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো ইত্যাদি হয়। তবে সাদা, নীল, কালো বর্ণের মুক্তার চাহিদা বেশী। স্বাভাবিক মুক্তার গাত্র অমসৃণ, বিশেষ পদ্ধতিতে পালিশ করিয়া উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা হয়, তবে সকল প্রজাতির মুক্তাই সমান উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট হয় না। মুক্তার গাত্রের চকচকে ভাবকে **'ওরিয়েন্ট'** (Orient) বলা হয়।

মুক্তার রাসায়নিক গঠন (Chemical composition of pearl) :

মুক্তা প্রধানতঃ দুইটি উপাদান লইয়া গঠিত। যথা—মুখ্য উপাদান **ক্যালসিয়াম কার্বনেট** ও দ্বিতীয় প্রধান উপাদান **কনকিওলিন**। মুক্তার প্রিজমস্তর ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা তৈয়ারী, ন্যাকার স্তরেও ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে। মুক্তার রাসায়নিক গঠন—

(i)	ক্যালসিয়াম কার্বনেট (আর্গোনাইট)	— 88-90%
(ii)	কনকিওলিন (Conchiolin) ($C_{30}H_{48}N_2O_{11}$)	— 3·8-5·9%
(iii)	জল	— 2-4%
(iv)	অন্যান্য পদার্থ	— 0·1-0·8%

কম্বোজ পর্বের মুক্তা উৎপাদনকারী প্রজাতি ঃ

কম্বোজ পর্বের পেলিসাইপোডা শ্রেণীর অন্তর্গত অনেক প্রজাতি মুক্তা গঠন করিতে পারে। ইহাদের সাধারণ কথায় মুক্তা ঝিনুক বা Pearl oyster বলে। যথা—

(i) পিঙ্কটাডা মারটেনসিস (*Pinctada martensis*)
(ii) পিঙ্কটাডা ফুকাটা (*P. fucata*)
(iii) পিঙ্কটাডা অ্যানোমিয়ইডেজ (*P. anomioides*)
(iv) পিঙ্কটাডা এ্যাট্রোপারপুরিয়া (*P. atropurpurea*)
(v) পিঙ্কটাডা মার্গারিলিফেরা (*P. margarilifera*)
(vi) পিঙ্কটাডা কেমনিটজি (*P. chemnitzi*)



চিত্র 24 ঃ ঝিনুকের বহিরাকৃতি

পিঙ্কটাডা মারটেনসিস পারস্য উপসাগরে ও মান্নার উপসাগরে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ওরিয়েন্টাল পার্ল পাওয়া যায়। ভারত সাগরের কয়েকটি অঞ্চলে পিঙ্কটাডা ফুকাটা প্রজাতি পাওয়া যায়।

মুক্তা উৎপাদক ঝিনুক ছাড়াও অসংখ্য সমুদ্র বসবাসকারী ঝিনুক এবং মিষ্টি জলবাসী ঝিনুক (চিত্র 23 ও চিত্র 24) মুক্তার ন্যায় বস্তু প্রস্তুত করিতে সক্ষম, যেমন—*Haliotes* ও *Mytilus* প্রজাতি। গ্রীষ্মমণ্ডলে বসবাসকারী অনেক মিষ্টি জলবাসী ঝিনুক হইতে মুক্তা পাওয়া যায়, তবে তাহা অনেক নিম্নমানের।

মুক্তা উৎপাদনকারী প্রজাতির স্বভাব ও বাসস্থান ঃ

মুক্তা উৎপাদনে সক্ষম ঝিনুক নিশ্চল প্রকৃতির। এই ধরনের মুক্তা সমুদ্র-তলের পাথরগাত্রে বা বালিতে পশ্চাতের কিছু অংশ প্রোথিত করিয়া বাস

করে। সমুদ্রতটরেখা হইতে কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে এবং 18-22 মিটার পর্যন্ত গভীরতায় ইহাদের পাওয়া যায়। এই কম্বোজ প্রজাতির বাসস্থানকে **পার্লবেড** বলে। ভারতের পূর্ব উপকূলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া পার্লবেড আছে। ভারতের কয়েকটি পার্লবেড হইতে **লিংগা** নামক দামী মুক্তা সংগ্রহ করা হইয়াছে। পারস্য উপসাগর, মান্নার উপসাগর, অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সংলগ্ন সমুদ্রে মেক্সিকো উপসাগর ও কালিফোর্নিয়া উপসাগরে পার্লবেড আছে। কচ্ছ ও মান্নারের গাল্‌ফে এবং পার্ল বে'-তে **পিঙ্কটাডা ভালগারিস** প্রজাতি পাওয়া যায়। পূর্ব উপকূলে কন্যাকুমারিকা হইতে কিলকারাই অবধি পার্লবেড বিস্তৃত। পশ্চিম উপকূলে কচ্ছের গালফ্‌ হইতে সৌরাষ্ট্রের হালার অঞ্চল পর্যন্ত এবং জামনগর পর্যন্ত পার্লবেড বিস্তৃত। পূর্ব উপকূলের পার্লবেড হইতে বেশী পরিমাণে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক পাওয়া যায়। পশ্চিম উপকূলের পার্লবেড অপেক্ষাকৃত অনুন্নত।

কিভাবে মুক্তা সৃষ্টি হয়?

কম্বোজ পর্বের খোলক উহাদের ম্যানটল আবরণীর এপিথেলিয়াল কলা নিঃসৃত পদার্থ দ্বারা সৃষ্টি হয়। বাহির হইতে কোন বস্তু ম্যানটল আবরণী



ঝিনুকের মুক্তাথলির ছেদ

চিত্র 25 : মুক্তা সৃষ্টি

ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবেশ করিবার পর ম্যান্টল আবরণীর কোষসমূহ

উহাকে ঘিরিয়া ধরে। কোষগুলি হইতে নিঃসৃত পদার্থ এই কঠিন পদার্থের উপর স্তরে স্তরে জমা হয়। এই নিঃসৃত পদার্থই মুক্তা উৎপন্ন করে (চিত্র 25)।

অনুপ্রবেশকারী বস্তুটি ম্যান্টল গহ্বরের গভীরে প্রবেশ করিলে বস্তুটিকে ঘিরিয়া ম্যান্টল একটি আবরণী বিশিষ্ট থলি গঠন করে। পরে কোষগুলি নিঃসরণ আরম্ভ করে। অনুপ্রবেশকারী বস্তুটিকে ঘিরিয়া সৃষ্ট থলির উপর কোন চাপ কোনভাবে সৃষ্ট না হইলে সাধারণতঃ গোলাকার মুক্তার সৃষ্টি হয়। থলিটির উপর চাপ সৃষ্টি হইলে মুক্তার আকার অনিয়মিত হয়। অনিয়মত আকারের মুক্তাকে **বারাকুড** বলে। খোলক ও ম্যান্টলের মধ্যবর্তী স্থানে অনুপ্রবেশকারী বস্তুটি থাকিলে ম্যান্টল আবরণী হইতে কোনরূপ থলির সৃষ্টি হয় না। এই স্থলে উৎপাদিত মুক্তার একটি তল সমতল ও বিপরীত তলটি অবতল হয়। ইহাদের **ব্লিষ্টার পার্ল** বলে।

মুক্তা চাষ পদ্ধতি (Methods of pearl culture) ঃ

মুক্তাচাষ পদ্ধতিকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (i) **প্রকৃতি হইতে মুক্তা সংগ্রহ** ও (ii) **কৃত্রিম পদ্ধতিতে মুক্তাচাষ**।

(i) **মুক্তা সংগ্রহ** (Pearl collection) ঃ যে সকল পার্ল অয়েস্টার পার্সিয়ান উপসাগরের এবং লোহিতসাগরের উষ্ণ জলে এবং চীন, জাপান, ভারত, শ্রীলংকা, উত্তর অষ্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিছু দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্র উপকূলে বাস করে সেই সকল পার্ল অয়েস্টার হইতে মূল্যবান মুক্তা সংগ্রহ হয়। এই প্রকার মুক্তা সংগ্রহে সংগ্রহকারীর বিশেষ সুবিধা হয় না। তাহাছাড়া ডুবুরিরা খুব কম পরিমাণে মুক্তা ঝিনুক সংগ্রহ করিতে পারে, সুতরাং মুক্তা সংগ্রহে খরচ অনেক বেশী হয়। ভারতে মাদ্রাজের টিউটি কোরিনের উপকূলে ডুবুরী দ্বারা মুক্তা ঝিনুক সংগ্রহ করা হয়, মজুরী হিসাবে তাহারা মুক্তার এক-তৃতীয়াংশ পায়। এই মুক্তা সাধারণতঃ গোলাকার হয় এবং দামও বেশী। গ্রীষ্মকালে প্রধানতঃ মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। এই সময় সমুদ্রের জল শান্ত ও স্বচ্ছ হয়। এই সময়ে একটানা দুইমাস মুক্তা ঝিনুক আহরণ করা যাইতে পারে।

কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা চাষ

জাপানে মুক্তা চাষ পদ্ধতি (Pearl fishery in Japan) ঃ

কৃত্রিম পদ্ধতিতে মুক্তা চাষের প্রধান পথপ্রদর্শক জাপানের **কোকিচি**

মিকিমাতো এবং **তাত সুহেয়াই মিসেকে**। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম পদ্ধতিতে মুক্তা চাষের জন্য টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের **টোকিচি নিশিকাওয়ার** দান উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া বর্তমানে জাপানে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা চাষ করা হয়।

জাপানে পিঙ্কটাডা মারটেনসিস্ প্রজাতি হইতে দামী মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। ইহা ছাড়া পিঙ্কটাডা ম্যাক্সিমা ও পিঙ্কটাডা মারগারিটিফেরা প্রজাতি হইতেও বড় আকারের মুক্তা পাওয়া যায়। *Pteria penquine* নামক প্রজাতি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মুক্তা গঠন করে।

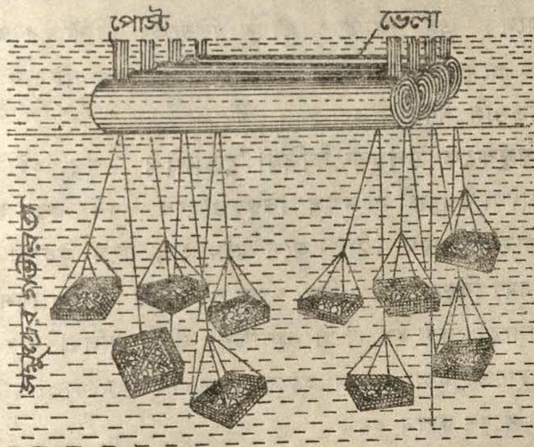
জাপানের মুক্তা শিল্পকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(i) **মুক্তা সংগ্রহ ও মুক্তা চাষ**।

(1) **মুক্তা সংগ্রহ** (Pearl collection) : জাপানে মহিলা ডুবুরীরা মুক্তা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। এই মহিলা ডুবুরীরা সমুদ্রের তলদেশ হইতে মুক্তাশুক্তি সংগ্রহ করেন। এই মুক্তাশুক্তিকে আঞ্চলিক ভাষায় **আমা** বলা হয়। আমা শব্দের অর্থ সমুদ্রকন্যা। ভাঁটার সময় মহিলা ডুবুরীরা এই আমা সংগ্রহ করেন। প্রতি ডুবুরী একবার ডুব দিয়া গড়ে 40টি মুক্তাঝিনুক সংগ্রহ করেন। মুক্তা ঝিনুকের বয়স অনুযায়ী ইহাদের পৃথক করা হয়। দ্বিতীয় বৎসরের ঝিনুকগুলি মৎস্যচাষ কেন্দ্র বা মুক্তা চাষ কেন্দ্র কিনিয়া লয় এবং পুনরায় সমুদ্রের তলদেশে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। তিন-চার বছর ঝিনুকগুলিকে পুনরায় তুলিয়া অগভীর সমুদ্রের অসমান তলদেশে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। পরবর্তী বছরের চৈত্র-বৈশাখ মাসে ঐ ঝিনুককে সমুদ্রের তলদেশ হইতে তুলিয়া আনা হয় এবং পরীক্ষাগারে ইহাতে নিউক্লিয়াস প্রবিষ্ট করান হয়।

(2) **আধুনিক মুক্তা চাষ** (Modern pearl fishery) : বর্তমানে জাপানে মুক্তাঝিনুকের ডিম সংগ্রহ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে তা দিয়া লার্ভা নির্গত করাইবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হইয়াছে। এই নূতন পদ্ধতির আবিষ্কারে **মিকিমাতোর** অবদান উল্লেখযোগ্য।

(i) **স্প্যাট বা ডিম সংগ্রহ** (Egg or spat collection) : মুক্তা-ঝিনুকের লার্ভা সর্বদা আলোক বিপরীতমুখী হয়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া মিকিমাতো এক বিশেষ ধরনের স্প্যাট সংগ্রাহক আবিষ্কার করেন। ইহা 2 সেন্টিমিটার ঘেরাওয়ালা বিশেষ তারের একটি খাঁচা। ইহা

লম্বায় 48 সে.মি., প্রস্থে 54 সে.মি. এবং 20 সে.মি. উচ্চতাবিশিষ্ট সম্পন্ন হয়। খাঁচাটিতে গরম আলকাতরা মাখাইয়া দেওয়া হয়, ফলে জলে তারের জাল নষ্ট হয় না। খাঁচাটির চারিদিকের গাত্রে সিমেন্ট বালির আস্তরণ দেওয়া হয়, ফলে অমসৃণ গাত্রে সহজেই স্প্যাটগুলি লাগিয়া থাকিতে পারে। খাঁচার তলদেশ ও পার্শ্বীয়গাত্রে কালো বোর্ড লাগান থাকে ফলে এই অন্ধকার অঞ্চলে স্প্যাটগুলি আসে। ছয় মিটার গভীরে জলে ভাসমান ভেলা হইতে খাঁচাগুলিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। জুলাই হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত খাঁচাগুলি জলে থাকে এবং বাচ্চা ঝিনুকগুলি 1·5 সে.মি. দীর্ঘ হয় এবং ইহাদের পালন খাঁচায় স্থানান্তরিত করা হয় (চিত্র 26)।



চিত্র 26 : ভেলা হইতে স্প্যাট সংগ্রহ

(ii) **পালন খাঁচা** (Rearing cage) : সংগ্রাহক খাঁচার মতই পালন খাঁচা তৈয়ারি করা হয়, তবে এই ক্ষেত্রে খাঁচাকে একাধিক (ছয়টি পর্যন্ত) প্রকোষ্ঠে ভাগ করা হয়। কাপড় বা তারের জাল দ্বারা খাঁচার উপর অংশ ঢাকা থাকে। জলজ প্রাণীর হাত হইতে এইভাবে বাচ্চা ঝিনুককে রক্ষা করা হয়। খাঁচাগুলিকে পরবর্তী বৎসরের জুন-জুলাই পর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশে রাখা হয় এবং জুলাই মাসে খাঁচা উঠাইয়া ফেলা হয়। যে সমস্ত ঝিনুকের বয়স এক বৎসর হইয়াছে তাহাদের পৃথক করিয়া সমুদ্রের 5 মিটার গভীর অসমান

তলদেশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া বপন করা হয়। সমুদ্রের তলদেশে দুই বৎসর কাল ইহাদের বৃদ্ধি করান হয়।

(iii) **চাষের খাঁচা** (Culture cages) ঃ তৃতীয় বৎসরের জুন হইতে আগষ্ট মাসের মধ্যে ডুবুরীরা এই ঝিনুক সংগ্রহ করে এবং চাষের খাঁচায় 10 দিন রাখা হয়। এই দশদিনে খাঁচার মধ্যে ঝিনুকগুলি নানা ধরনের প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজিত হইতে শেখে এবং অগভীর জলে বাস করিবার পক্ষে উপযুক্ত হয়। এই কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইবার পর ইহাদের পরীক্ষাগারে আনা হয় এবং নিউক্লিয়স প্রবেশ করানো হয়।

(iv) **নিউক্লিয়স প্রবেশ করাইবার পদ্ধতি** (Nucleus insertion) ঃ যে বহিরাগত বস্তুকে ঘিরিয়া ন্যাকার স্তরে স্তরে জমা হয়, তাহাকে নিউক্লিয়স বলে। এই পদ্ধতিতে জীবন্ত ঝিনুকের ম্যান্টলের ক্ষুদ্র টুকরা অপর ঝিনুকে প্রবেশ করানো হয়। নিউক্লিয়স প্রবেশ করাইবার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা হয়। যথা—

(a) **ঝিনুককে উপযুক্ত করিয়া তোলা** ঃ সমুদ্র হইতে তোলা ঝিনুককে বাছিয়া উপযুক্ত সহনশীল ঝিনুকগুলিকে পৃথক করা হয়। এই ঝিনুককে পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে রাখা হয়, ফলে ইহারা উত্তেজিত হয়। এই সময় ঝিনুক শুক্র ও ডিম্ব স্খলন শুরু করে। অপারেশনের জন্য ইহাদের শ্বাসরোধ করা হয়, ফলে কপাটিকা দুইটি খুলিয়া যায়। উন্মুক্ত কপাটিকা যাহাতে পুনরায় বন্ধ না হইতে পারে সেইজন্য খোলা স্থানে বাঁশের পেগ খোলক প্রবেশ করান হয়।

অপারেশন করিবার সময় ঝিনুকটিকে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাহাতে দক্ষিণ খোলকটি উপরের দিকে থাকে। ম্যান্টল পর্দাকে মসৃণ করিয়া পর্দাকে উন্মুক্ত করা হয়। পর্দার আবরণী কলার উপর সামান্য কাটিয়া একটি নালিকার সৃষ্টি করা হয় যাহাতে এই নালিকার মাধ্যমে গ্রাফট টিস্যু নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করান যায়। নিউক্লিয়স প্রবেশ করাইবার পর মিউকাস নিঃসৃত হইয়া পদের ক্ষতস্থান শুকাইয়া যায়। ইহার পর বাঁশের পেগকে সরাইয়া লইলে ঝিনুক খোলক দুইটি বন্ধ করিতে পারে।

(b) **গ্রাফট টিস্যুর প্রস্তুতি** ঃ যে সকল ঝিনুক ন্যাকার ক্ষরণ করিতে পারে এমন ঝিনুকের ম্যান্টল পর্দা হইতে গ্রাফট টিস্যু তৈয়ারি করা হয়। প্রথমে 7 সেন্টিমিটার লম্বা ও 4 সেন্টিমিটার চওড়া একটি ম্যান্টলের অংশ

কাটা হয়। এই অংশটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গাকারে সমান করিয়া কাটা হয়। সমুদ্রের জলের ভিতর 17-22 ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিউক্লিয়স অপারেশন করা হয়। বিশ মিনিটের মধ্যে গ্রাফট টিস্যু সহ নিউক্লিয়স ম্যানটল ও খোলকের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করান হয় (চিত্র 27)।

(c) **আদর্শ নিউক্লিয়স প্রস্তুতিঃ** আদর্শ নিউক্লিয়স গঠনে চুণ নির্মিত খোলকের ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহার করা হয়। মজবুত ও জীবন্ত ঝিনুকের খোলক নিউক্লিয়স গঠনে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র 27 : জাপানী মুক্তা ঝিনুকে নিউক্লিয়াস প্রবেশ করান হইয়াছে

(d) **নূতন মুক্তা গঠনঃ** নিউক্লিয়স যুক্ত ঝিনুককে খাঁচায় রাখিয়া 2-3 মিটার গভীর জলে স্থাপন করা হয়। একটি ভেলা হইতে প্রায় 60টি খাঁচা ঝোলান হয়। প্রতিটি খাঁচায় নিউক্লিয়স যুক্ত প্রায় 60টি ঝিনুক থাকে। মুক্তা ঝিনুক প্রায় তিন হইতে ছয় বৎসরকাল থাকিয়া প্ল্যাংকটন খাদ্য গ্রহণ করিয়া বড় হয়। ইহার পর খাঁচাসমেত ইহাদের তুলিয়া ফেলা হয় এবং ঝিনুকের মধ্য হইতে সৃষ্ট মুক্তা বাহিরে আনা হয়। মুক্তার বর্ণ ও আকারের উপর ভিত্তি করিয়া মুক্তা বাছাই করিয়া বাজারে ছাড়া হয়।

ভারতে মুক্তা চাষ (Pearl fishery in India) ঃ

টিউটিকোরিনে জাপানী প্রথায় মুক্তা চাষ করা হয়। ভারতীয় মুক্তা ঝিনুকের নাম **পিঙ্কটাডা ভালগারিস** (*Pinctada vulgaris*)। ইহাদের কচ্ছ

উপসাগরে পাওয়া যায়। এই ঝিনুকের খোলক দুইটি অসমান, ইহার পৃষ্ঠে সিঙ্গার ন্যায় অরীয় ভাবে বিন্যস্ত দাগ দেখা যায়। এই দাগগুলি মুক্তপ্রান্তে আঙ্গুলের মত প্রবর্ধকের সৃষ্টি করে। বাইসাস তন্তুর মাধ্যমে ইহারা শিলাখণ্ডে আটকাইয়া থাকে। 1975 খ্রীষ্টাব্দে কে. আলাগাস্বামী প্রমাণ করেন যে ভারতীয় মুক্তা বৃদ্ধির হার জাপানের মুক্তা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী।

মুক্তা চাষ উন্নত করিবার উপায় (Means for improvement of Pearl culture) :

বিদেশে মুক্তার চাহিদা বেশী। আমাদের দেশেও অলংকার হিসাবে ইহার কদর সর্বাধিক। সুতরাং মুক্তাচাষ বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

(i) ভারতের সমুদ্রে উপযুক্ত মুক্তাভূমির অনুসন্ধান।

(ii) উপযুক্ত মুক্তাভূমির সন্ধান পাইলে সরকারী নিয়ন্ত্রণে তাহার তত্ত্বাবধান ও সংস্কার সাধন।

(iii) অপরিণত ও দুর্বল মুক্তাঝিনুক যাহাতে আহরণ না করা হয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(iv) মুক্তা ঝিনুকের স্বভাব ও বসতির উপযুক্ত সমুদ্রজলের নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, নতুবা মুক্তা ঝিনুকের জনন ব্যাহত হইবে।

(v) মুক্তাভূমিকে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে সরকারী ঘোষণা প্রয়োজন।

(vi) উন্নতমানের মুক্তাঝিনুক সন্ধান, সংকর মুক্তাঝিনুক সৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রয়োজন।

(vii) সমুদ্রে মুক্তা চাষের নূতন আধুনিক পদ্ধতির কৌশল আবিষ্কার প্রয়োজন।

(viii) মুক্তা চাষ কেন্দ্রে নীরোগ মুক্তা ঝিনুক কিভাবে রাখা যায় তাহা জানা প্রয়োজন।

অর্থাৎ উপযুক্ত কলাকুশলীদের সহায়তায় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের দেশে মুক্তা চাষের আধুনিকীকরণ সম্ভব।

স্পঞ্জ, প্রবাল ও শম্বুকের খোলক
(Sponge, Coral and Molluscan Shell)

সূচনা (Introduction) :

মানুষের নানাবিধ প্রয়োজনে স্পঞ্জ, প্রবাল ও শম্বুকের খোলক ব্যবহৃত হয়। অর্থনৈতিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ভারতবর্ষে মুক্তাচাষ ব্যতীত এই সকল প্রাণীদের চাষের জন্য শিল্প একদমই গড়িয়া উঠে নাই। পৃথিবীর উন্নতিশীল কয়েকটি দেশে এই সকল প্রাণীদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং চাষের ব্যবস্থা করা হয়।

1. স্পঞ্জ চাষ (Sponge Culture)

সূচনা (Introduction) :

বহুকোষী প্রাণীর তালিকায় স্পঞ্জ সর্বপেক্ষা পুরাতন ও অনুন্নত গোষ্ঠীরূপে বিবেচিত হইলেও অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহার মূল্য নগণ্য নহে। শয্যাদ্রব্য, আরামকেদারা, বিভিন্ন পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বহুতর সামগ্রী প্রস্তুতের উপকরণ হিসাবে ইহার ব্যবহার পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। যদিও বর্তমানে কৃত্রিম স্পঞ্জ জাতীয় দ্রব্য আবিষ্কারের পর প্রাকৃতিক স্পঞ্জের ব্যবহার অধিকাংশেই কমিয়া যাইতেছে।

পরিফেরা পর্বভুক্ত, বহু ছিদ্রযুক্ত দেহ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পাঁচ হাজার প্রজাতির স্পঞ্জ প্রধানতঃ সামুদ্রিক প্রাণী। কিছু প্রজাতির স্পঞ্জ স্বাদুজলে বাস করে। ইহাদের মধ্যে মাত্র তেরোটি প্রজাতি হইতে বাণিজ্যিক স্পঞ্জ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক স্পঞ্জ উৎপন্ন হয় না বলিয়াই স্পঞ্জ শিল্প ততটা গড়িয়া উঠে নাই।

স্পঞ্জ চাষ প্রধানতঃ ফ্লোরিডা এবং ইটালিতেই করা হয়। কিউবা, বাহামাস, জামাইকা, তুর্কী এবং মিশরেও বাণিজ্যিক স্পঞ্জ উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্যিক স্পঞ্জ উৎপন্নকারক প্রজাতিসমূহ (Species of sponge producing commercial sponge) :

পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত প্রজাতিগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায় এবং বাণিজ্যিক স্পঞ্জ উৎপন্ন করে (A. B. Misra, 1961)—

	বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name)	সাধারণ নাম (Common name)	প্রাপ্তিস্থান (Occurance)
1.	*Euspongia officinalis lamela*	এলিফ্যান্ট ইয়ার (Elephant ear)	তুর্কী
2.	*Euspongia officinalis mollissima*	তুর্কী কাপ (Turkey cup)	ভূমধ্যসাগরীয় দেশ
3.	*Euspongia officinalis adriatica*	তুর্কী টয়লেট (Turkey toilet)	অ্যাড্রিয়াটিক সাগর
4.	*Euspongia zimocca*	জিমোক্কো (Zimocca)	ভূমধ্যসাগরীয় দেশ
5.	*Hippospongia equina elastica*	হানিকোম্ব (Honeycomb)	ভূমধ্যসাগরীয় দেশ
6.	*Hippospongia lachne*	শীপ্‌স্ উল (Sheeps wool)	বাহামাস্
7.	*Hippospongia grossypina*	ভেলভেট (Velvet)	বাহামাস্
8.	*Hippospongia canaliculata*	গ্লোভ (Glove)	ফ্লোরিডা
9.	*Spongia graminea*	গ্রাস (Grass)	বাহমাস, কিউবা এবং ফ্লোরিডা
10.	*Spongia dura*	হার্ডহেড (Hardhead)	বাহামাস
11.	*Spongia agaricina*		
12.	*Spongia barbara*	হলুদ স্পঞ্জ (Yellow sponge)	ফ্লোরিডা
13.	*Spongia obiqua*	—	বাহামাস, কিউবা, ফ্লোরিডা

স্পঞ্জ বেড (Sponge bed) ঃ

পৃথিবীতে সর্বত্র স্পঞ্জ বেড ছড়াইয়া আছে। ওয়েষ্টার্ন আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভূমধ্যসাগরেই ইহাদের প্রাধান্য বেশী। ইহারা জলে নিমজ্জিত শিলা, খোলক, প্রবাল এবং যে কোনো কঠিন বস্তুর সহিত সংলগ্ন হইয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক বৃহদাকার স্পঞ্জগুলি জীবিত থাকে।

স্পঞ্জের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও গঠন (Characterstics of sponges and structure) ঃ

ইহাদের দেহ অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত। বিভিন্ন বর্ণের স্পঞ্জ বিভিন্ন আকৃতির। ব্যাসার্ধ 1 মিটার হইতে 2 মিটার পর্যন্ত হইতে পারে। ইহাদের কোন সুনির্দিষ্ট অঙ্গ বা দেহতন্ত্র নাই। ইহারা প্রধানতঃ উপনিবেশ গঠন করিয়া সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলিকে **অস্টিয়া** (Ostia) এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিদ্রগুলিকে **অসকিউলাম** (Osculum) বলে। স্পিকিউল (Spicule) নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা বা স্পন্‌জিন্ (Spongin) নামক জৈবপদার্থ দ্বারা ইহাদের দেহের কাঠামো নির্মিত। দেহ প্রাচীর এক্টোডার্ম (ectoderm) এবং এণ্ডোডার্ম (endoderm) নামক দুইটি স্তর দ্বারা গঠিত। দেহাভ্যন্তরস্থ নালীর বিশেষ বিশেষ অংশে কোয়ানোসাইট (Choanocyte) নামক এক ধরণের কোষ বিদ্যমান। এই কোষগুলিই স্পঞ্জের খাদ্য সংগ্রহে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

খাদ্যবস্তু সমেত জল নালিতন্ত্রের (Canal system) মাধ্যমে সংবাহিত হয় এবং পরিশেষে বর্জ্য পদার্থসহ সেই জল অসকিউলায় ছিদ্র দিয়া পরিত্যক্ত হয়। স্পঞ্জের শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যসম্পাদনে নালিতন্ত্রের গুরুত্ব অসীম।

অযৌন ও যৌন উভয় প্রকার পদ্ধতিতে প্রজনন সম্পন্ন করে। অযৌন জনন **দেহপুনর্গঠন** (Regeneration), কোরকোদ্‌গম (Budding) তথা গেমিউল (Gemmule) গঠনের মাধ্যমে হইয়া থাকে। যৌন প্রজননে অর্কিওসাইট কোষ হইতে জনন কোষের সৃষ্টি হয়। স্পঞ্জের দেহের অভ্যন্তরে জনন কোষ দুইটির নিষিক্তকরণ ঘটে। সিলিয়া সমন্বিত স্পঞ্জের লার্ভা স্বাধীনজীবী হয়।

ইতিহাস ও শ্রেণীবিভাগ (History and classification) :

পেলেওজোইক (Paleozoic) যুগের পূর্বেই স্পঞ্জের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তখন প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাছে উদ্ভিদ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে লিনিয়াস (Linnaeus), ল্যামার্ক (Lamarck) এবং কুভিয়ার (Cuvier) স্পঞ্জকে আম্বোজোয়ার সম্বন্ধযুক্ত জু-ফাইটা (Zoophyta) বলিয়া অনুমান করেন। রবার্ট. ই. গ্রান্ট (Robert. E. Grant) 1836 খ্রীষ্টাব্দে স্পঞ্জকে প্রাণী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এবং পরিফেরা (Porifera) নামেও অভিহিত করেন। বর্তমানে স্পঞ্জ মেটাজোয়া (Metazoa) অন্তর্ভুক্ত হইলেও অনেকে ইহাদের প্যারাজোয়া (Parazoa) বলিয়াও বিবেচিত করেন।

দেহের অন্তঃকঙ্কালের উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত প্রজাতির স্পঞ্জ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যদিও 1970 সালে হার্টম্যান (Hartman) ও গোরাউ (Goreau) আর একটি নূতন শ্রেণী সংযোজনের জন্য উল্লেখ করিয়াছেন।

পর পৃষ্ঠায় তিনটি শ্রেণীভুক্ত পরিফেরা প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগের (Classification) রূপরেখা দেওয়া হইল :—

স্পঞ্জ চাষ পদ্ধতি (Methods of Sponge Culture) :

প্রায় 8 কিউবিক ইঞ্চির মত কাটা স্পঞ্জ পরিষ্কার জলের তলায় কংক্রিটের স্লাব অথবা অন্যান্য জিনিষের সহায়তায় বাঁধিয়া রাখা হয়। জলের স্রোতের সহিত খাদ্য সরবরাহ করা হয়। বিক্রয়জাত স্পঞ্জ হইতে কয়েক বৎসর সময় লাগে। সর্ববৃহৎ জীবিত বাথস্পঞ্জের বয়স প্রায় 50 বৎসর।

ছোট ছোট নৌকা করিয়া স্পঞ্জ বেডে আসিয়া স্পঞ্জ তুলিয়া জালের মধ্যে রাখা হয়। স্পঞ্জবেডগুলি প্রায় 110 ফুট ও তারও বেশী গভীরতায় থাকে। অতঃপর স্পঞ্জ ডাঙ্গায় তুলিয়া নৌকার ডেক্-এ রাখা হয়। কাপ আকৃতির, গোলাকার, চ্যাপ্টা আকৃতির ও কেকের স্পঞ্জগুলি হলুদ, বাদামী, কালো ও ধূসর বর্ণের মতো দেখায়। পোর্টে ফিরিয়া আসিয়া স্পঞ্জগুলি ছড়াইয়া রাখা হয় এবং লাঠি মারিয়া অবশিষ্ট ফ্লুইড (Fluid) বাহির করা হয়। ইহার পর ইহাদের শুকাইয়া বিছানো হয়। স্পঞ্জ ভালোভাবে কাটিয়া প্যাক করা হয় এবং বাজারে সরবরাহ করা হয়।

পরিফেরা (Porifera)
শ্রেণী (Class)

- ক্যালকেরিয়া (Calcarea) (সামুদ্রিক) (উপশ্রেণী) (Subclass)
  - ক্যালকেরোনিয়া (Calcaronea)
    উদাহরণ :—সাইকন, লিউকোসোলেনিয়া
  - ক্যালসিনিয়া (Calcinea)
    উদাহরণ :— ক্লাথরিনা, টেরোবিয়োনা
- হেক্স্অ্যাকটিনেলিডা (Hexactinellida) (সামুদ্রিক) (উপশ্রেণী) (Subclass)
  - অ্যাম্ফিডিস্কোফোরা (Amphidiscophora)
    উদাহরণ :—হাইয়ালোনেমা
  - হেক্সাস্টেরোফোরা (Hexasterophora)
    উদাহরণ :—ইউপ্লেকটেলা
- ডেমোস্পঞ্জীয়া (Demospongia)
  উপশ্রেণী (Subclass)
  - টেট্রা ক্টিনোমরফা (Tetractinomorpha)
    উদাহরণ :—ক্লিওয়ানা, নেপচুনসকাপ
  - সেরা ক্টিনোমরফা (Ceractinomorpha)
    উদাহরণ :—স্পঞ্জিলা, ফাইলোস্পঞ্জিয়া

স্পঞ্জের বিশেষত্ব (Peculiarities of sponge) :

ইহাদের দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকায় জল ধারণ ক্ষমতা অনেকগুণ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। রাবার ও অন্যান্য সিনথেটিক স্পঞ্জের তুলনায় ইলাসটিক ক্ষমতাও দীর্ঘস্থায়ী হয়, ইহা অত্যন্ত নরম হয়। দেহের অতি সূক্ষ্মতর অংশেও স্পঞ্জিন নামক জৈবতন্তুর উপস্থিতির ফলে জলশোষণ করিতে পারে। স্পঞ্জের বর্ণসুষমাও মনলোভা হয়।

স্পঞ্জের ব্যবহার (Uses of sponges) :

স্পঞ্জ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। নার্শারী, হস্‌পিটাল এবং বাড়ীতে শয্যাদ্রব্য, আরামকেদারা, ও বিভিন্ন পরিচ্ছদ তৈয়ারীতে ইহার ব্যবহার নিয়মিত হয়। স্নানাগারেও গা মুছিবার জন্য ইহা আমাদের নিত্যসঙ্গী। গৃহসজ্জায় এবং কারুশিল্পে স্পঞ্জের বহুল ব্যবহার সমাদৃত। টুপী, লিথোগ্রাফী তৈয়ারীতে ইহা ভীষণভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রীম ব্যবহার করিতে এবং জুতো পালিশ করিতে Euspongia বেশী ব্যবহৃত হয়।

2. কোরাল বা প্রবাল (Coral)

সূচনা (Introduction) :

নিডারিয়া (Cnidaria) পর্বভুক্ত, অ্যান্থোজোয়া (Anthozoa) শ্রেণীর অন্তর্গত কয়েকটি প্রজাতি কোরাল তৈয়ারি করিতে সমর্থ হয়। হেক্সা-কোরালিয়া (Hexacorallia) উপশ্রেণীর ফাঙ্গিয়া (Fungia), এক্রোপোরা (Acropora) প্রভৃতি সঙ্ঘবদ্ধ প্রাণী প্রবাল গঠন করে। মূল্যবান রক্তিম প্রবাল তৈয়ারি করিতে সমর্থ হয় অক্টোকোরালিয়া (Octocorallia) উপ-শ্রেণীর কয়েকটি প্রজাতি। যেমন—**পেন্নাটুলা** (Pennatula), **গর্গোনিয়া** (Gorgonia) অথবা **সি-ফ্যান** (Sea-fan), **কোরালিয়াম** (Corallium) প্রভৃতি। শোভাবর্ধনকারী প্রজাতি **অ্যান্টিপ্যাথেস্** (Antipathes), অ্যান্টি-প্যাথেরিয়া বর্গের অন্তর্গত। ইহাদের সাধারণভাবে **'ব্লাককোরাল'** বলা হয়। **কোরালের বৈশিষ্ট্য ও গঠন** (Characteristics and structure of coral) :

একক অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমুদ্রের জলে বাস করে। ইহাদের কেবলমাত্র পলিপ (Polyp) দশা হয়। জীবনচক্রে কোন লার্ভারও অস্তিত্ব দেখা যায় না। বিস্তৃত মুখপ্রান্ত ডিস্কের (Disc) ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়।

গোলাকার মুখছিদ্র ওরাল-ডিস্ক (Oral disc) নামে অভিহিত। ওরাল্-ডিস্কটিকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া ছয় হইতে অসংখ্য কর্ষিকা থাকে। গোলাকার মুখছিদ্রটি মুখনালী বা স্টোমোডিয়ামের (Stomodaeum) সহিত যুক্ত। এই শ্রেণীর পলিপের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য শ্রেণী-ভুক্ত পলিপের থেকে সহজেই পার্থক্য করা যায়। বহিঃকঙ্কাল এক্টোডার্ম কোষ নিঃসৃত চুনজাতীয় বা কিরাটিন দ্বারা গঠিত। বহিঃকঙ্কালই কখনও কখনও পুঞ্জীভূত হইয়া অতিকায় প্রবাল গঠনে সমর্থ হয়।

কোরকোদ্গম (Budding) এবং দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে অযৌন জনন হয়। ইহার ফলেই একএকটি কলোনি বা উপনিবেশের সৃষ্টি হয়।

কোরাল রিফ (Coral reef) : ম্যাড্রেপোরারিয়া (Madreporaria) বর্গের অন্তর্গত প্রাণীরাই কোরাল রিফ তৈয়ারি করিতে সমর্থ। কোরাল পলিপগুলি সাধারণতঃ 20° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার অগভীর সমুদ্র জলে [20 ফাদম্ (Fathoms)*] ভাল জন্মায়। ইহারা ধীরে ধীরে এক-একটি কলোনি বা উপনিবেশের সৃষ্টি করে। কখনও কখনও কোরাল এবং বালুদানা জমিয়া রক সৃষ্টি করে। এই জমায়েত এক সময় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের মধ্যে ফ্লোরিডার কাছাকাছি, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এবং ফিলিপাইনের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকাতে আইল্যাণ্ড (Island) অথবা অ্যাটল (Atoll)-এ পরিণত হয়।

উল্লেখযোগ্য, অস্ট্রেলিয়ার ব্যারিয়ার রিফ (Barrier reef) প্রায় 1200 মাইল দীর্ঘ। এই প্রকার 'রক্' (Rock) পলিপের এক্টোডার্ম নিঃসৃত রস হইতে তৈয়ারী হয়। কখনও কখনও সি-অ্যানিমন (Sea-anemone) বা 'সমুদ্র কুসুম' এইসব পলিপের বিভিন্ন স্থানে আটকাইয়া থাকে। ইহা হইতে নিঃসৃত রসও রিফ তৈয়ারীতে জমা হয়। রিফ তৈয়ারীতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট জমা হয় এবং নিম্নোক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়—

$$Ca^{2+} + 2HCO_3^- \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2 \rightleftharpoons CaCO_3 + H_2CO_3 \rightleftharpoons H_2O + CO_2 \uparrow$$

এক একটি রিফ তৈয়ারী হইতে বহু বৎসর সময় লাগে। বর্তমানের উল্লেখ-যোগ্য রিফগুলির বয়স প্রায় 10,000-30,000 পর্যন্ত ধরা হইয়া থাকে।

* 1 ফাদম=6 ফুট গভীরতা

কোরালের ব্যবহার (Uses of coral) :

বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রবাল গহনা শিল্পের অলঙ্করন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রমতে নির্দেশিত গ্রহরত্ন ধারণ করিবার রক্তিম প্রবাল কোন কোন প্রজাতি হইতে পাওয়া যায়। কোরাল রিফ তৈল সঞ্চিত থাকিবার আদর্শ স্থান বলিয়া মনে করা হয়। উক্ত রিফ উপকূলরক্ষীর কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে। কারণ ইহা জাহাজ যাতায়াতের বাধার সৃষ্টি করে। গৃহের শোভাবর্ধনে-কোরাল দুর্লভ এবং কৌতুহলোদ্দীপক বস্তুরূপে পৃথিবীর সর্বত্র সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। কোরাল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া কাগজপত্র চাপা (Paper weight) দেওয়ার বস্তু হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

3. শম্বুকের খোলক (Molluscan Shell)

সূচনা (Introduction) :

মোলাস্কা (Mollusca) পর্বের প্রাণীদের সহিত মানুষের নিবিড় সম্পর্ক বহুদিনের। এই পর্বভুক্ত প্রাণীদের নরম দেহ শক্ত খোলকে আবৃত থাকে। শম্বুকের খোলক পুরাকাল হইতেই মনুষ্যের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আগে অর্থের পরিপূরক হিসাবেও ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও কোথাও ইহারই মাধ্যমে জিনিষপত্রের বিনিময় প্রথা চালু আছে। ভূমিক্ষয় নিবারক হিসাবেও ইহাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

মোলাস্কা পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য (Characterstics of the phylum Mollusca) :

এই পর্বের অধিকাংশ প্রাণী জলজ এবং সামান্য সংখ্যক স্থলে বসবাস করে। দেহ খুব নরম এবং নমনীয়। ইহাছাড়া অখণ্ডিত (মোনোপ্লাকোফোরা ব্যতীত) এবং দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম। ম্যান্টল দ্বারা ক্ষরিত পদার্থ হইতে খোলক (Shell) তৈয়ারী হয়। দেহের অঙ্কদেশে অধিকাংশদের ক্ষেত্রে পেশীময় পদ (Foot) বর্তমান। দেহগহ্বর হিমোসিল এবং সংবহনতন্ত্র যুক্ত। শ্বসনঅঙ্গ হিসাবে ফুলকা বা টিনিডিয়া (Gills or Ctenidia), কখনও ফুসফুসথলি এবং রেচনঅঙ্গ হিসাবে একজোড়া হইতে ছয় জোড়া বৃক্ক থাকে। লিঙ্গ ভেদ থাকিলেও কিছু উভলিঙ্গ। জীবনচক্র সরাসরি বা রূপান্তরের মাধ্যমে (লার্ভার নাম 'ভেলিগার') সম্পন্ন হয়।

খোলকযুক্ত প্রাণী (Shelled animals) :

প্রাণিজগতে মোলাস্কা পর্বটি দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রায় 80,000-এরও বেশী প্রজাতির প্রাণী এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। আর্থ্রোপোডা পর্বের পরই ইহাদের স্থান। সব প্রাণীদের দেহে খোলক থাকে না। খোলক যুক্ত প্রাণীরা স্ক্যাফোপোডা (Scaphopoda), গ্যাস্ট্রোপোডা (Gastropoda), এবং বাইভালভিয়া (Bivalvia) শ্রেণীভুক্ত।

শ্রেণী (Class) : স্ক্যাফোপোডা (Scaphopoda)

এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা সকলেই সামুদ্রিক। খোলক হাতির দাঁতের মত লম্বাকৃতি (2-3 ইঞ্চি) দেখিতে হয় বলিয়া ইহাদের "টাস্ক শেল" অথবা "টুথ-শেল" (Tusk shell or Tooth shell) বলা হয়।

উদাহরণ : ডেন্টালিয়াম (Dentalium), ক্যাডুলাস (Cadulus) ইত্যাদি।

শ্রেণী (Class) : গ্যাসট্রোপোডা (Gastropoda)

সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রজাতির প্রাণী এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা স্বাদু জলে, সমুদ্রের জলে ও স্থলে বাস করে। ম্যান্টল হইতে উৎপন্ন একটি মাত্র প্যাঁচানো খোলক দ্বারা দেহ আবৃত থাকে। অনেক প্রাণীদের পূর্ণ খোলক থাকে না।

উদাহরণ : পাইলা (Pila), মুরেক্স (Murex), পাটেল্লা (Patella) ইত্যাদি।

শ্রেণী (Class) : বাইভালভিয়া (Bivalvia)

প্রাণীদের দেহ খোলকের দুইটি কপাটিকা দ্বারা আবৃত থাকে। কপাটিকা দুইটি মধ্যপৃষ্ঠ বরাবর যুক্ত থাকে। স্বাদুজল এবং সমুদ্রজলে ইহারা বসবাস করে। পদটি লাঙ্গলের ফলার ন্যায়। এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের দৈর্ঘ্য $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি হইতে $4\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পর্যন্ত হইয়া থাকে।

উদাহরণ : নিকিউলা (*Nucula*), ইউনিও (*Unio*), লামিলিডেন্স (*Lamellidens*), মাইটিলাস (*Mytilus*), পিংকটাডা (*Pinctada*) ; (মুক্তা গঠন করে Pearl oyster)।

খোলক (Shell) : বিচিত্র বর্ণের, ছোট-বড় এবং বিভিন্ন আকৃতির খোলক বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পাওয়া যায়। ম্যান্টল হইতে নিঃসৃত পদার্থ দ্বারা শক্ত খোলক গঠিত হয়। বাইভালভিয়া শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের দুইটি কপাটিকা বিশিষ্ট খোলক দেহকে পুরোপুরি আবদ্ধ করিয়া রাখে। যেমন—

স্বাদুজলের ঝিনুক। ইহার বাহিরের দিক উত্তল (Convex) এবং ভিতরের দিক অবতল (Concave)। পিঠের দিকে সম্মুখপ্রান্ত ঘেঁসিয়া সাদা রং-এর উন্নত স্থানের নাম আম্বো (Umbo)। এই অংশটিকে ঘিরিয়া কতকগুলি বৃত্তাকার রেখা খোলকের পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধিকে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে। এই রেখাগুলিকে "বৃদ্ধি রেখা" (Line of Growth) বলা হয়। পিঠের দিকে একটি রেখা বরাবর দুইটি কপাটিকা কব্জার ন্যায় আবদ্ধ থাকে। এই রেখার নাম 'কব্জা রেখা' (Hing line)। কপাটিকার অন্তঃতলে কয়েকটি ছোপের মত দাগ বিদ্যমান। ম্যান্টলের পেশী প্যালিয়াল রেখা বরাবর খোলকের সহিত সংযুক্ত থাকে।

খোলকের ব্যবহার (Uses of shells) :

1. **অর্থের পরিপুরক হিসাবে** (Medium of exchange) : স্ক্যাফাপোডা শ্রেণীর অন্তর্গত ডেন্টালিয়ামের খোলক উত্তর আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান্স' (Red Indians) দ্বারা ব্যবহৃত হইত। ভার্জিনিয়া হইতে কানাডা এবং ক্যালিফোর্নিয়া হইতে আলাস্কা পর্যন্ত অর্থের পরিপূরক হিসাবে এই খোলকের ব্যবহার প্রায় হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া প্রচলিত ছিল। এই অর্থপরিপূরক খোলক বাইভালভ শ্রেণীর অন্তর্গত *Mercinaria mercinaria* প্রজাতি হইতে পাওয়া যাইত।

আফ্রিকাতে কড়ির (গ্যাসট্রোপোড খোলক) প্রচলন বহুদিনের। সাহারা হইতে বেনিন এবং কঙ্গোলুণ্ডলাবাতেও কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এমনকি কড়ি দিয়া স্ত্রীদের (Wives) কিনিতে হইত। একজন যুবতীর জন্য 60,000 হইতে 100,000 খোলক দিতে হইত। একটু প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রায় 20,000 খোলক দিতে হইত, যাহার বর্তমান মূল্য 20-40 ডলার। বর্তমানে সুদানের কয়েকটি অঞ্চলে কড়ির ব্যবহার আজও আসীন (Rohler, 1971)। ভারতবর্ষেও বহু আগে কড়ির ব্যবহার ছিল বলিয়া জানা যায়।

2. **বোতাম ও অন্যান্য সৌখিন দ্রব্য তৈয়ারি করিবার উপাদান হিসাবে** : বিশেষতঃ ঝিনুক জাতীয় প্রাণীর খোলক হইতে বোতাম, শাঁখা, আংটি ইত্যাদি উৎপাদন হয়। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য উন্নতিশীল দেশগুলিতেও এইসবের ব্যাপক চাহিদা দেখা যায়।

3. **মুক্তা উৎপাদক হিসাবে** : ঝিনুক ভালো মুক্তা গঠন করে।

সাধারণ ঝিনুক হইতে প্রাপ্ত মুক্তার ব্যবসায়িক মূল্য কম। বাইভালভিয়া শ্রেণীর পার্ল ওয়েষ্টার (Pearl oyster) নামক ঝিনুক জাতীয় প্রাণীর দেহে ঘটনাচক্রে মুক্তা সৃষ্টি হয়। ভারত, জাপান, শ্রীলঙ্কা ও উত্তর অষ্ট্রেলিয়ায় এই প্রাণীর ব্যপকতা দেখা যায়। "মুক্তা চাষ" (Pearl culture) পৃথকভাবে আলোচিত করা হইয়াছে।

4. **চুন তৈয়ারি করিবার উপাদান হিসাবে ঃ** ঝিনুকের খোলকে প্রচুর পরিমাণে চুন থাকায় ইহাকে পুড়াইয়া চুন তৈয়ারি করা হয়।

5. **শিল্পদ্রব্য হিসাবে ঃ** ঝিনুকের ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতেই সুবিদিত। ফুলদানি, ছাইদানি এবং নানারকম কারুকার্য করিয়া শিল্প-সামগ্রী হিসাবে খোলকের বহুল ব্যবহার আজও প্রচলিত।

নানাপ্রকার অলংকার এবং বাসনপত্র হিসাবে খোলকের ব্যবহার আছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শঙ্খের ব্যবহার হইয়া থাকে এবং সধবা হিন্দু নারী শাঁখা ব্যবহার করে।

ছাগল পালন (Goat Rearing)

সূচনা (Introduction) :

বর্তমানে ছাগলের চাষ বেশ লাভজনক। অল্প মূলধনে অল্প জায়গায় ছাগল চাষ করা যায়। কম অবস্থাপন্ন লোকেরা সাংসারিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য ছাগল পোষে। ছাগল চাষে নিম্নলিখিত গুণাগুণ লক্ষ্য করা যায়—

(i) ছাগল চাষে বেশী মূলধন লাগে না, দুই-তিনটি স্ত্রী ছাগল লইয়াই চাষ শুরু করা যায়।

(ii) ছাগল রাখিবার জন্য বাড়ীতে কম পরিসরেই ব্যবস্থা করা যায়।

(iii) ছাগল চাষে অপেক্ষাকৃত বড় চারণভূমির প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর আনাজের খোসা, ফলের খোসা, লতাপাতা, ভাতের ফেন ইত্যাদি খাইয়াই ছাগল পেট ভরায়। গ্রামাঞ্চলে বা শহরতলীর বাড়ীর আশেপাশে কিছুটা উন্মুক্ত স্থান থাকিলেই ছাগল চাষ করা যায়, রাতে থাকিবার জন্য একটি ছোট আস্তানা প্রয়োজন।

(iv) দুগ্ধ ও মাংসের জন্য ছাগল চাষ গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ ছাগলের মাংস খাদ্য হিসাবে বেশী প্রচলিত। ছাগদুগ্ধ শিশু, বয়স্ক ও রোগীর ক্ষেত্রে উত্তম বলকারক পানীয়। ছাগদুগ্ধ সহজপাচ্য।

(v) দেশী ছাগী প্রতিবারে দুই হইতে পাঁচটি বাচ্চা দেয় এবং বৎসরে দুইবার বাচ্চা প্রসব করে।

(vi) ছাগী একবছরের মধ্যেই গর্ভিণী হয় এবং প্রায় পাঁচমাস গর্ভধারণের পর বাচ্চা প্রসব করে।

(vii) ছাগলের চামড়া বিভিন্ন কাজে বিক্রী হয়।

(viii) ছাগলের মলমূত্র সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে, ভারতে ছাগল চাষের প্রচলন অপেক্ষাকৃত বেশী, কারণ গরু-মহিষ পালনে খরচা এবং ঝামেলা উভয়ই বেশী। সেইজন্য সাধারণ গৃহস্থরা কম খরচ ও কম ঝামেলার জন্য ছাগল পোষে। ছাগী হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায়। পুরুষ ছাগল কিছুটা বড় করিয়া মাংসের জন্য বিক্রী করা বেশ লাভজনক। ভারতবর্ষ বিদেশের বাজারে ছাগল রপ্তানী করিয়া এবং চামড়া

রপ্তানী করিয়া বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। বর্তমানে দেশে দুধের অভাব অতিমাত্রায় বেশী। যদি গৃহস্থেরা প্রয়োজন মত ছাগল পালন করে, অন্ততঃ দুধের সমস্যা মেটে এবং অর্থেরও সাশ্রয় হয়। বড় পরিবারে প্রতিদিন যে সকল খাদ্য, তরি-তরকারীর খোসা, ভাতের ফেন ফেলা যায়, তাহাতেই দু-একটি ছাগলের খাদ্যের সঙ্কুলান হইয়া যায়। এছাড়া ছাগলকে দিনে কিছুমাত্রায় পরিপূরক খাদ্য দিলে ভাল পরিমাণে দুধ পাওয়া যায়।

ছাগলের বিভিন্ন জাত (Different breeds of goat)

গৃহপালিত সকল ছাগল আসে ক্যাপরা ইগাগরাস (*Capra aegagrus*) হইতে। এশিয়ার পাহাড়ী অঞ্চল হইতে ছাগল বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। মূল জাতের ছাগলের সঙ্গে স্থানীয় জাতের ছাগলের প্রজনন করাইয়া নূতন নূতন ভ্যারাইটির সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে ছাগলের ত্বকের বর্ণ, লোম ও দুধের পরিমাণ বিভিন্ন হয়।

পৃথিবীর কয়েকটি সেরা ছাগল :

(i) **আলপাজান্ :** প্রথম অবস্থায় ইউরোপের আলপ্স পর্বতমালার কাছে এই ছাগলের উৎপত্তি। ইহাদের ত্বকের বর্ণ কালো বাদামী, সাদা। পুরুষ ছাগলের ওজন 65 হইতে 80 কিলোগ্রাম এবং ছাগীর ওজন 50 হইতে 60 কিলোগ্রাম হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সবদেশেই এই ছাগলের চাষ করা হয়।

(ii) **সানেন :** সুইজারল্যাণ্ডের দেশীয় ছাগল। আলপাজানের মতই দেহের ওজন হয়। ত্বকের বর্ণ সাদা বা ক্রীম। কদমছাঁট চুল ও ক্ষুর-দাড়ি আছে। পরিণত ছাগী দিনে 5 কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দিতে পারে।

(iii) **নিউবিয়ান :** ইহাদের জাসি ছাগলও বলা হয়। এই ছাগলের বর্ণ সাদা, কালো বা লাল বাদামী। দীর্ঘ নাক, নোলা কান, একজোড়া শিং ও কদমছাঁট চুল আছে।

(iv) **টগেনবারগ :** এই জাতির উৎপত্তিস্থল সুইজারল্যাণ্ড। আমেরিকায় বর্তমানে ইহার প্রচলন বেশী। হাল্কা বাদামী বর্ণের হয়, পায়ে সাদা দাগ আছে। মুখ থেকে কান পর্যন্ত সাদা দাগ আছে। শিং থাকে, গায়ের লোম ছোট খাড়া, পাকানো বা লম্বা হইতে পারে। দিনে পাঁচ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দিতে পারে।

ভারতের কয়েকটি সেরা জাতের ছাগল ঃ

(i) **যমুনাপারি ঃ** যমুনাপারি ভারতের সেরা ছাগল। এই ছাগলের আদি বাসস্থান ছিল যমুনা, গঙ্গা ও চম্বল নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। পরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ছাগল আমদানী করা হয়। আকারে বিরাট, বর্ণ সাদা বা হাল্কা হলুদ, গলায় এবং মুখে হাল্কা বাদামী বর্ণের ছোপ দেখা যায়। দেহে অনেক সময় বাদামী ও কালো বর্ণের ছোপ দেখা যায়। নাক লম্বা, কান ঝোলা ও ভাঁজ করা। পা লম্বা, পিছনের পায়ে পিছনের দিকে লম্বা লম্বা চুল থাকে। যমুনাপারি ছাগল কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মচঞ্চল। এই ছাগলের পালান বড় ও ঝোলা এবং বাঁট লম্বা ও পুষ্ট হয়। ছাগীর ওজন 45 হইতে 60 কিলোগ্রাম হয় এবং দিনে তিন কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দেয়। এই ছাগী বছরে একটি মাত্র বাচ্চা প্রসব করে।

(ii) **বারবারি ঃ** এই ছাগলের আদি বাসস্থান মধ্য আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা। উত্তরপ্রদেশের এটোয়া, আগ্রা ও মথুরা জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষের ওজন 40 হইতে 50 কিলোগ্রাম এবং ছাগীর ওজন 30 হইতে 40 কিলোগ্রাম। ইহাদের আকার ছোট, কান সরু, ছোট এবং উপরদিকে খাড়া। গায়ের বর্ণ সাদা এবং দেহে ছোট লোম থাকে। সাদা বর্ণের দেহে কালো বা বাদামী বর্ণের ছাপ থাকিতে পারে। ইহাদের পাগুলি খুব ছোট হয়। এই ছাগলকে বদ্ধঘরে বা আবদ্ধ স্থানে পালন করা হয়। ছাগী বছরে দুইবার বাচ্চা প্রসব করে, প্রতিবারে সংখ্যায় 2/3টি বাচ্চা দেয়। দিনে প্রায় এককিলোগ্রাম দুধ দেয়।

(iii) **বীটল (অমৃতেশ্বরী) ঃ** ইহাদের উৎপত্তিস্থল পাঞ্জাবের শিয়ালকোট, জেলুম, গুরুদাসপুর। এই ছাগল অনেকটা যমুনাপারির মত দেখিতে। কান ছোট এবং শিং পিছনের দিকে বাঁকা। ইহারা বিভিন্ন বর্ণের হয়। পুরুষ ছাগলের দাড়ি হয়, ছাগীর দাড়ি থাকে না। ছাগী প্রতিদিন গড়ে দুই কিলোগ্রাম দুধ দেয়। পুরুষ ছাগলের ওজন 75 হইতে 80 কিলোগ্রাম হয় এবং ছাগীর ওজন হয় প্রায় 40 হইতে 50 কিলোগ্রাম। ছাগী প্রতিবারে দুইটি বাচ্চা প্রসব করে।

(iv) **কাশ্মিরী ঃ** কাশ্মীর ও তিব্বতীয় পাহাড়ী অঞ্চলে এই ছাগল দেখা যায়। পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশেও এই ছাগলের জনপ্রিয়তা বেশী। এই ছাগল শুষ্ক অঞ্চলে বাঁচিতে পারে না। দেহের বর্ণ হয় সাদা তবে ধূসর

ও বাদামী বর্ণের ছাগলও দেখা যায়। ইহাদের দেহ প্রায় 4·5 ইঞ্চি লম্বা ও লোমে আবৃত। লোমের আড়ালে ছাই বর্ণের পশম থাকে। কাশ্মিরী মোটা শাল এই পশম হইতে তৈয়ারী হয়।

(v) সুরতি : গুজরাট, বোম্বাই, খান্দেস, সুরাট, নাসিকে এই ছাগল বেশী দেখা যায়। বর্ণ সাদা, অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের প্রাণী। দিনে এক কিলোগ্রাম হইতে দুই কিলোগ্রাম দুধ দেয়।

(vi) আংগোরা : এই ছাগলের দেহ সাদা চুলে ঢাকা থাকে, এই চুলকে বলা হয় মোহের। মোহের উৎপাদন ছাড়াও মাংস উৎপাদনে ইহাদের চাষ করা হয়।

(vii) **বেঙ্গল জাত :** এই জাতের ছাগল প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে পাওয়া যায়। এই ছাগলের বর্ণ সাদা বা কালো। এই জাতের ছাগলের মাংস সুস্বাদু। এই ছাগলের বিভিন্ন জাত আছে, যথা—ব্ল্যাক বেঙ্গল, ব্রাউন বেঙ্গল ও হোয়াইট বেঙ্গল। তবে ব্ল্যাক বেঙ্গল বেশী প্রচলিত। এই ছাগী দুধ দেয় কম, তবে খুব যত্ন করিলে দুধের পরিমাণ বাড়ে। মাংসের জন্য এই ছাগল পালন করা লাভজনক। বুক চওড়া, কান খাড়া ও গায়ে ছোট নরম লোম থাকে। প্রায় পনের মাসের মধ্যে দুইবার বাচ্চা হয়, প্রতিবারে একাধিক বাচ্চা প্রসব করে।

(viii) **দেশী বা অন্ত্যজ ছাগল :** ভারতে মোট ছাগলের শতকরা নব্বইটি দেশী বা অন্ত্যজ ছাগল। দাক্ষিণাত্যের সমতলভূমিতে এই ছাগল প্রচুর দেখা যায়। এই ছাগলের নির্দিষ্ট গড়ন নাই, দুধও দেয় না। প্রধানতঃ মাংস ও ছালের জন্য এই ছাগল পালন করা হয়।

ছাগলের খাদ্য (Foods)

ছাগল যাহা পায় তাহাই খায়, খাদ্যের ঝামেলা খুবই কম। গ্রামে, শহরতলীতে ছাগল মাঠে চরিয়া ঘাস খায়। তাহাছাড়া বিভিন্ন গাছের পাতা-ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ছাগলকে খাওয়ানো হয়। সাধারণতঃ দিনের বেলায় দড়ি দিয়া বাড়ীর কাছাকাছি ছাগল বাঁধা থাকে।

ছাগলের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য খাদ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকা প্রয়োজন।

আমিষ ও স্নেহ পদার্থ : সাধারণতঃ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য হইতে

স্নেহ জাতীয় পদার্থ তৈয়ারী হয়। সবুজ ঘাস ও খইল খাওয়াইলে ছাগলের চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ছাগলের দেহে শর্করা খাদ্য হইতেই প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

খনিজ পদার্থঃ ছাগলের দেহগঠনে খাদ্যে খনিজ পদার্থ থাকা প্রয়োজন। খনিজ পদার্থের মধ্যে ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও হাড়ের গুঁড়া প্রধান। দেহ গঠনের প্রতি 100 পাউণ্ড ওজনে 6·69 গ্রাম ক্যালসিয়াম ও 3·26 গ্রাম ফসফরাস থাকা প্রয়োজন। ছাগলের খাদ্যে শতকরা দুইভাগ নিম্নলিখিত খনিজ পদার্থের মিশ্রণ থাকা প্রয়োজন।

হাড় গুঁড়া	40 ভাগ
চূণের গুঁড়া	30 ভাগ
সাধারণ লবণ	20 ভাগ
গন্ধক	5 ভাগ
লৌহ	2 ভাগ

ভিটামিনঃ ছাগলের প্রতিদিনের খাদ্যে উপযুক্ত ভিটামিন থাকা প্রয়োজন। সবুজ পাতাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-A থাকে। এই সবুজ সবজী ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, সি, ডি, ও ই-এর অভাব পূরণ করে।

তাহাছাড়া ছাগলকে ভিটাব্লেণ্ড এ-ডি-3 ও রভিমিক্স A-D-3 খাওয়ানো হয়। ইহাছাড়া Nuvomin forte ঔষধ খাওয়াইলে খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের চাহিদা পূরণ হয়।

ছাগলের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য পৃথকভাবে পরিপূরক পশুখাদ্যের প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের ছাগলকে দেহরক্ষার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের পরিপূরক খাদ্য দেওয়া হয়।

ছাগলের প্রকৃতি	পরিপূরক খাদ্যের পরিমাণ
(i) পূর্ণবয়স্ক ছাগলের উপযোগী খাদ্য	50 কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য 250 গ্রাম খাদ্য।
(ii) উৎপাদন উপযোগী খাদ্য	প্রতি অর্ধলিটার দুধের জন্য 500 গ্রাম খাদ্য।
(iii) বর্দ্ধিষ্ণু ছাগল	বয়স অনুপাতে 125 হইতে 200 গ্রাম খাদ্য।
(iv) গর্ভকালীন অবস্থা	200 গ্রামের অধিক খাদ্য।

(৮) পুরুষ ছাগলের খাদ্য — সাধারণ সময়ে 350 গ্রাম এবং প্রজনন করাইবার কালে 450 গ্রাম খাদ্য।

ছাগলের উপযোগী পোষ্টাই খাদ্য ঃ

ছাগলকে খাওয়ানোর জন্য নানারকম পোষাই খাদ্য তৈয়ারি করা হয়।

(i)	গমের ভূষি	একভাগ
	ভূট্টা ভাঙ্গা	দুইভাগ
	তিসির খইল	একভাগ
(ii)	ভুট্টা ভাঙা	দুইভাগ
	বার্লি ভাঙা	একভাগ
	সরিষার খইল	দুইভাগ
	ছোলা ভাঙা	দুইভাগ
(iii)	গম ভাঙা	একভাগ
	বার্লি ভাঙা	দুইভাগ
	বাদাম খইল	একভাগ
(iv)	ছোলা ভাঙা	দুইভাগ
	গমের ভূষি	একভাগ

এই খাদ্যের যে কোন একটি বাছিয়া লইয়া ছাগলকে খাওয়ানো যাইতে পারে। খাদ্যে উপযুক্ত লবণের মিশ্রণ ও ভিটামিন থাকা প্রয়োজন।

ছাগশিশুর যত্ন ও পরিচর্যা (Proper care) ঃ

ছাগী সাধারণতঃ এক, দুই বা দুইটির বেশীও বাচ্চা প্রসব করে। তবে যমুনাপারি, বারবারি বছরে একবার একটি মাত্র বাচ্চা দেয়।

বাচ্চা প্রসব হইবার পর ছাগী চাটিয়া বাচ্চার দেহ পরিষ্কার করে। পরিষ্কার কাপড় দ্বারা বাচ্চাকে পরিষ্কার করানো যায়, ইহাতে বাচ্চা সহজেই শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পারে। জন্মাইবার কিছুক্ষণ পরেই বাচ্চারা দাঁড়াইবার চেষ্টা করে এবং দুধের জন্য ছাগীর কাছে যায়। প্রথমে বাচ্চাকে মায়ের বাঁট ধরাইয়া দিতে হয়। বাচ্চা হওয়ার প্রথম দুই-তিনদিন মাতৃদুগ্ধ বাচ্চার পক্ষে উপকারী। এই দুধে উপস্থিত পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-A ও গ্লোবিউলিন ছাগশিশুকে সুস্থ রাখে।

জন্মের দুইঘণ্টা বাদে শিশুকে দুই গ্রাম অরিওমাইসিন বা টেরামাইসিন

পাউডার জলে দ্রবীভূত করিয়া ছাগশিশুকে খাওয়ানো হয়। প্রায় একদিন পর বাচ্চাকে ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট ও ফেনোভিস জলে দ্রবীভূত করিয়া খাওয়ানো হয়। কৃমির প্রতিরোধক হিসাবে এই ঔষধ খাওয়ানো হয়।

বাচ্চা দুই সপ্তাহ হইবার পর পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস দেওয়া প্রয়োজন। আলো, বাতাস পায় এইরকম উন্মুক্ত স্থানে ইহাদের রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। বাচ্চা তিন মাসের হইলে মায়ের কাছ হইতে পৃথক রাখিতে হয় এবং দুধ খাওয়া বন্ধ করাইতে হইবে। প্রজনন কাজে না লাগিলে পুরুষ বাচ্চাকে তিনমাস বয়সে খাসী করিয়া দিতে হইবে। খাসী করিলে মাংসের স্বাদ ভাল হয় এবং দেহের ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। খাসী ব্যবসার পক্ষে লাভজনক। বাচ্চা প্রসব হইবার পর ছাগীর খাদ্যের প্রতি অনীহা আসে, এই সময় নিম্নলিখিত উপাদানের জলীয় দ্রবণ ছাগীকে খাওয়ানো হয়—

গমের ভুষি	200 গ্রাম
আখের গুড়	25 „
আদাবাটা	5 „
হলুদবাটা	5 „
লবণ	5 „
কর্পূর	অল্পমাত্রায়
সরিষার তৈল	25 গ্রাম
গরমজল	500 „

বাচ্চা প্রসবের পর ছাগীকে ভুষি, কচি ঘাস, নটেশাক, পালংশাক ইত্যাদি দিনে দুই-তিনবার দেওয়া প্রয়োজন। এই সময় ছাগীর সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। 100 কিলোগ্রাম সুষম খাদ্যে দুই কিলোগ্রাম খনিজ পদার্থের মিশ্রন ও দশগ্রাম ভিটামিন যোগ করা প্রয়োজন। তিনমাস পর বাচ্চাকে দুধ খাইতে দেওয়া হয় না, ফলে বাচ্চার উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত খাদ্য (Kid starter) প্রয়োজন।

নূতন ভাঙ্গা ভুট্টা	45 ভাগ
চালে তুষ	20 ভাগ
গমের ভুষি	15 ভাগ
বাদাম খইল	10 ভাগ
পাউডার মিল্ক	8 ভাগ

খনিজ পদার্থ	2 ভাগ
ভিটামিন-A	এক টনে 20 গ্রাম
ভিটামিন-D	এক টনে 6 গ্রাম
অ্যান্টিবায়োটিক	এক টনে 8 গ্রাম

ছাগলের বাসস্থান (Rearing places) ঃ

ছাগলের থাকার পৃথক আস্তানার প্রয়োজন হয় না। ঘরের মধ্যে, গোয়ালে, বারান্দা বা যে কোন বেড়ার আস্তানায় ছাগল থাকিতে পারে। গরু-মহিষের গোয়ালঘরে 10-1৭টি ছাগল অনায়াসেই থাকিতে পারে। গ্রামাঞ্চলে ছাগল সারাদিন মাঠে চড়িয়া বেড়ায় এবং রাত্রিবেলা যে কোন আস্তানায় থাকে।

অনেক ছাগল একসঙ্গে পালন করিলে একটি নির্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন হয়। নীচু ও ভিজা জমিতে ছাগল বাস করিতে পারে না। জল জমিয়া থাকা জায়গায় ছাগলকে চড়ান উচিত নয়, তাহা হইলে রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ছাগলের আস্তানা যতই উপযুক্ত হউক না কেন চরাইবার উপযুক্ত রান থাকা প্রয়োজন। খাদ্য অন্বেষণের মাধ্যমেই ছাগলের উপযুক্ত ব্যায়াম হয়। ছাগলকে গ্রীষ্মকালে ভোরবেলা চড়ানো ভাল, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রের প্রখরতা বাড়িয়া যায়, ছাগলের কষ্ট হয়। তবে শিশিরসিক্ত ঘাস ছাগল চরার পক্ষে উপযুক্ত নয় কারণ ছাগল মাটির গোড়া ঘেঁষে ঘাস খায় ফলে শিশিরসিক্ত ধুলা-বালি মুখে প্রবেশ করে। ছাগলের মুখে ক্ষত হয়, পেট ফোলে বা আমাশয় হয়।

মাঝারি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ছাগল পালনের জন্য চারিদিকে খোলা বিচালির দোচালা তৈয়ারি করা প্রয়োজন। দোচালার ছাদ নীচু হওয়া প্রয়োজন যাহাতে বৃষ্টির ছাঁট প্রবেশ না করে। প্রয়োজনে ছাদে টালি, এসবেসটস চাপান দেওয়া যাইতে পারে তবে টিন না দেওয়াই শ্রেয়। টিনের চালার আস্তানায় গ্রীষ্মকালে ছাগলের কষ্ট হয়। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে চারিদিকে অন্ততঃ মাটির তৈয়ারী প্রাচীর দ্বারা আস্তানা করা প্রয়োজন। আলো বাতাসের জন্য প্রাচীরে উপযুক্ত জানালার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। একটি 60 ফুট লম্বা ও 40 ফুট চওড়া দোচালায় 125টি পর্যন্ত ছাগল রাখা যায়।

পুরুষ ছাগলের জন্য পৃথক ঘরের প্রয়োজন। পুরুষ ছাগলের গায়ে বিশ্রী ধরনের গন্ধ আছে ফলে একসঙ্গে রাখিলে ছাগদুগ্ধ গন্ধযুক্ত হয়। ছাগলবাচ্চার

জন্য অবশ্যই পৃথক ঘরের প্রয়োজন। এছাড়া সম্পূর্ণরূপে একটি ছোট পৃথক আস্তানা থাকা প্রয়োজন। এই আস্তানায় বাচ্চা প্রসব করাইবার ব্যবস্থা থাকে এবং প্রয়োজনে রোগাক্রান্ত ছাগলকে রাখা হয়। নূতন কেনা ছাগল খামারে আনিবার অন্ততঃ প্রথম 15 দিন এই পৃথক ঘরে রাখা ভাল কারণ যদি রোগগ্রস্ত হয় তাহা যেন সুস্থ ছাগলে সংক্রামিত হইতে না পারে। ছাগলের ঘর প্রতিদিন বীজাণুনাশক ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার করা প্রয়োজন এবং মল-মূত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করা দরকার।

ভাল ছাগীর লক্ষণ :

মাথা : লম্বা ও মাঝারি আকারের চওড়া এবং নাসারন্ধ্র খোলা ও বড় হয়। ছাগীর চোখ দুইটি উজ্জ্বল ও পরস্পর দূরত্বে অবস্থান করে। ইহারা স্বভাবে নম্র। পূর্ণাঙ্গ ছাগীর নীচের চোয়ালে আটটি দাঁত সম্পূর্ণভাবে উপরের মাংসপিণ্ডে (Dental pad) পড়িবে।

গলা ও কাঁধ : গলা লম্বা ও সরু হইবে, কুঁজ (Wither) এবং কাঁধ একই সরলরেখায় থাকিবে।

বুক : মাঝারি আকারের ও চওড়া হয়।

পাঁজরা : পাঁজরাগুলি বাঁকান হয়।

পশ্চাদ অংশ : হিপ এবং বাম্প এবং পিন হাড়ের ও হুকের মাঝে বিস্তৃত জায়গা থাকে।

সামনের পদ : সোজা, শক্ত ও হাড় মজবুত হয়।

পশ্চাদ পদ : হাড়গুলি লম্বা ও মজবুত হয়।

পালান ও বাঁট : পালানের লোম রেশমের মতো নরম হবে, বাঁট দুইটি আলাদা থাকে। পালানের নিকটবর্তী দুধ-শিরাগুলি স্পষ্ট হয়। দুধ দেওয়ার পরেই পালান-আকার ছোট হইয়া যায়।

চামড়া ও লোম : চামড়া নরম, চকচকে হয়, লোম নরম ও চকচকে হয়।

পুরুষ ছাগলের লক্ষণ : পুরুষ ছাগলের মাথা, কাঁধ পুরুষালি ও ভারি, বুক চওড়া, পাঁজরা টান টান কাস্তের মতো নিচের দিকে নামে। দেহের পশ্চাৎ অংশ (hip) উন্নত ও ভারী হওয়া প্রয়োজন, পিছনের অংশ দুর্বল হইলে প্রজননে অংশগ্রহণ করানো যায় না। অণ্ডকোষের আকার বড় ও দুইটি অণ্ডকোষ বেশ গভীরভাবে পৃথক থাকিবে। পুরুষ ছাগল প্রথম দুই-

তিনবছর বেশী কর্মক্ষম থাকে, এই বয়সের একটি পুরুষ ছাগল একশত হইতে দুইশত ছাগীকে গর্ভাধান করাইতে পারে।

ছাগলের রোগ (Diseases)

অন্যান্য গবাদি পশুর মত ছাগলও নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। ছাগলের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 102 হইতে প্রায় 104 ডিগ্রী ফারেণহাইট। প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি 6৪ হইতে 90 বার। ছাগলের বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়, তবে সংক্রামক ব্যাধি বেশী ক্ষতি করে।

(i) **গুটিরোগ** (Rinderpest) : ইহা একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। পালের মধ্যে একটি বা দুইটি এই রোগে আক্রান্ত হইলে সমস্ত ছাগলের মধ্যে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। আক্রান্ত পশুর প্রবল জ্বর হয়, পাতলা মলে রক্তের ছিট ও শ্লেষ্মা দেখা যায়। আক্রান্ত ছাগল কিছু খায় না, দাঁত কড়মড় করে, গায়ের লোম খাড়া হইয়া যায়। কান ঝুলিয়া যায়, মুখবিবরে, মাড়িতে, মুখের তালুতে, ঠোঁটে ও জিহ্বার নীচে লাল ক্ষত দেখা যায়।

প্রতিরোধ : রোগ আক্রমণের প্রথম অবস্থায় সিরাম ইনজেকশন দিতে হয়। আক্রান্ত ছাগলের অতিরিক্ত পায়খানা হইলে চাল ভালভাবে সিদ্ধ করিয়া ফেন খাওয়াইতে হয়। সুস্থ ছাগলকে **অ্যান্টি রিণ্ডারপেস্ট সিরাম** ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। গোয়ালঘরের মেঝে, দেওয়াল ব্লিচিং পাউডার দ্বারা শোধন করা উচিত। রোগাক্রান্ত ছাগল মারা যাইলে নির্জন স্থানে পুঁতিয়া ফেলা প্রয়োজন।

(ii) **খুরুয়া রোগ বা এঁসো রোগ** (Foot and mouth diseases) : ইহা একটি ভাইরাসবাহিত ব্যাধি। ছাগলের মুখনিঃসৃত লালা ও ক্ষতস্থানের মধ্যে এই রোগের জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে। আক্রান্ত পশুর কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসে, মুখ ও পায়ে ফুস্কুড়ী বাহির হয়, ফুস্কুড়ীগুলি ফাটিয়া গিয়া ক্ষতের সৃষ্টি করে।

প্রতিরোধ : রোগাক্রান্ত ছাগলটির মুখের বা অন্যান্য অংশের ক্ষত পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। গরমজলে লবণ, ফিটকারী, পটাশিয়াম প্যারম্যাংগানেট, ডেটল ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া বোরিক পাউডার লাগান হয়।

(iii) **তড়কা (Anthrox) :** গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে তড়কা একটি প্রধান রোগ। আর্দ্র স্থানে এই রোগের আক্রমণ বেশী। রোগজীবাণু ছাগলের দেহে প্রবেশের 24 ঘন্টার মধ্যেই রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেক সময় রোগলক্ষণের পূর্বেই মারা যায়, যদি বাঁচিয়া যায় তবে পশুটির জ্বর হয়। পেটের যন্ত্রনায় প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়ে ও পায়খানার সহিত রক্ত নির্গত হয়।

প্রতিরোধ : প্রোকেইন পেনিসিলিন পিছনের মাংসপেশীতে দেওয়া হয় অথবা 5 মিলিলিটার টেরামাইসিন মাংসপেশীতে ইনজেকশন করা হয়। ইহাছাড়া Anti anthrox serum সুস্থ পশুর দেহে প্রবেশ করান হয়।

(iv) **বাদলা (Blaen quarter) :** ইহা ছাগলের একটি সংক্রামক রোগ। এই রোগ গ্রীষ্মকালে বেশী হয়। এই রোগে বাচ্চা ছাগল বেশী আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পশুর প্রথমে জ্বর হয়, পশুটি খায় না বা জাবর কাটে না, আক্রান্ত পশুটি ভালোভাবে চলিতে পারে না। গলায়, কাঁধে, পিঠে, কোমরে, হাঁটুতে ফোলা দেখা যায়।

আক্রান্ত পশুর খুব একটা ভাল চিকিৎসা করা যায় না। সুস্থ ছাগলকে এই রোগের টীকা দেওয়া যাইতে পারে।

(v) **গলাফোলা (Haemorerhagic septicaemia) :** গলাফোলা অন্যান্য গবাদি পশুর মত ছাগলের একটি সংক্রামক রোগ। আক্রান্ত পশুর প্রবল জ্বর হয়, কোন খাদ্য গ্রহণ করে না, জাবর কাটে না ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। মুখ হইতে আঠাল রস ও নাসারন্ধ্র হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। গলার গ্রন্থি ফুলিয়া ওঠে। মুখের, চোখের পাতার ও নাসিকার ঝিল্লী ঘোর লাল বর্ণের হয়। মুখের ভিতর ঘা হয়।

প্রতিরোধ : আক্রান্ত পশুকে পেনিসিলিন, সিরাম প্রভৃতি ইনজেকশন দেওয়া হইলে উপকার পাওয়া যায়। ফোলা জায়গায় কর্পূর, তার্পিন তৈল ও সরিষার তৈল একত্রে মিশাইয়া মালিশ করা হইলে ফোলা কমিয়া যায়।

(vi) **পেট কামড়ান (Colic pain) :** এই রোগে নাভির চারিদিকে হঠাৎ অসহ্য বেদনা হয়, আবার হঠাৎ কমিয়া যায়। আক্রান্ত ছাগল পা ছোঁড়ে, পিছনের পা দিয়া পেটে আঘাত করে।

রোগের লক্ষণ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(vii) **উদরাময় ও পেটফোলা (Diarrhoea & Indigestion) :** দূষিত জল ও পচা খাদ্যবস্তু হইতে ছাগলের উদরাময় হয়। এই রোগে পাতলা পায়খানা হয়। খাদ্যবস্তু ঠিকমত হজম না হইলে পেটফোলা রোগ হয়। পেটফোলা রোগে কাঁচা হলুদ বাটা 250 গ্রাম গুড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে পেট ফোলা কমিয়া যায়।

(viii) **পালানের প্রদাহ (Inflamation of Udder) :** অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় বা জলে ভিজিলে পালানে প্রদাহ হয়। ফলে পালান শক্ত, স্ফীত, গরম ও বেদনাযুক্ত হয়।

(ix) **সর্দি ও কাশি (Catarrh & Cough) :** ঠাণ্ডা, জলে ভেজা, হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে ছাগলের সর্দি-কাশি হয়, আক্রমণ বেশী হইলে জ্বর হয়। সর্দি-কাশির লক্ষণ ও তীব্রতা দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

(x) **কৃমিজনিত রোগ (Worm diseases) :** ছাগল গোল কৃমি, চ্যাপ্টা কৃমি প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। কৃমির আক্রমণে ছাগল অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে, রক্তাল্পতা দেখা যায়, তাহাছাড়া কৃমির আক্রমণে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

প্রতিরোধ : ছাগলের প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের হিসাবে 4 হইতে 8 গ্রাম পাইপারেজিন ঔষধ গোল কৃমির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। হুককৃমির ক্ষেত্রে 5 মিলিলিটার টেট্রাক্লোরোইথিলিন এবং ফিতা কৃমির ক্ষেত্রে ডাইক্লোরোফেন বড়ি খাওয়ান হয়।

সাধারণভাবে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Prevention) :

নিম্নলিখিত জিনিষগুলি পালন করিলে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

(i) ছাগলকে উপযুক্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন।

(ii) আলো-বাতাস পূর্ণ খামারে ছাগল চাষ করা বাঞ্ছনীয়।

(iii) ছাগল পালনের জন্য উপযুক্ত বড় স্থানের প্রয়োজন। ইহাতে ছাগলের স্বাভাবিক ব্যায়াম হয়।

(iv) শুষ্কভূমিতে ইহাদের চারণ করিতে দেওয়া প্রয়োজন, খামার অবশ্যই শুষ্ক ও উঁচু মাটিতে হওয়া প্রয়োজন।

(v) খামার পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন, জীবাণুনাশক ঔষধ দ্বারা প্রতিদিন পরিষ্কার করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

(vi) রোগের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য উপযুক্ত টীকা দেওয়া

প্রয়োজন।

(vii) রোগাক্রান্ত ছাগলকে পৃথক রাখা প্রয়োজন।

(viii) রোগাক্রান্ত ছাগলকে উপযুক্ত পশু-চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করা দরকার।

(ix) ছাগল রোগগ্রস্ত হইয়া মারা যাইলে মাটিতে অনেক বেশী গর্ত করিয়া পুঁতিয়া দেওয়া প্রয়োজন। গর্তে পর্যাপ্ত চুণ দিয়া মাটি চাপান দেওয়া প্রয়োজন।

(x) রোগাক্রান্ত ছাগলের মলমূত্র গর্ত করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া আবশ্যক।

(xi) আক্রান্ত ছাগলের পরিচর্যাকারীকে সুস্থ ছাগলের পরিচর্যা করা উচিত নয়।

(xii) গোচারণভূমি হইতে যাহাতে ছাগলের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হইতে না পারে তাহা ছাগপালকের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

ছাগলের ব্যবহারিক মূল্য:

দুধ: ছাগলের দুধ উপাদেয় ও সহজপাচ্য। শিশু, রোগী ও বৃদ্ধ সহজেই হজম করিতে পারে। Belschner, 1953 ছাগদুগ্ধের সহিত অন্যান্য দুগ্ধের তুলনা করিয়াছেন। যথা—

দুগ্ধের উপাদান	বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী			
	ছাগল	ভেড়া	গাভী	মানুষ
প্রোটিন	4·06	5·37	4·48	1·52
চর্বি	5·14	3·65	3·13	3·55
শর্করা	5·28	5·46	4·77	6·50
খনিজ পদার্থ	0·58	0·79	0·60	0·45
কঠিন পদার্থ	15·06	15·27	12·93	12·02
জল	84·94	84·73	87·02	87·98
	100·00	100·00	100·00	100·00

প্রজাতি ভেদে দুধের তারতম্য নির্ভর করে। বারবারি ছাগীর দুগ্ধে শতকরা 4·90 ভাগ চর্বি থাকে এবং যমুনাপারী ছাগীর দুগ্ধে 5·20 ভাগ চর্বি থাকে। ছাগীর বয়স হইলে দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যায়। তাহাছাড়া বর্ষাকালে ঘাস, পাতা বেশী খায় বলিয়া দুধের পরিমাণ বেশী হয় কিন্তু ঘনত্ব কমিয়া যায়। আবার শীতকালে দুগ্ধের পরিমাণ কমে ও ঘনত্ব বাড়ে। সারাদিন বারে বারে দুগ্ধ দোহন করিলে দুগ্ধে ফ্যাটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, দিনে একবার দুগ্ধ দোহন করিলে দুগ্ধে জলের মাত্রা বেশী থাকে।

ছাগলের লোম : ছাগলের চুল হইতে বিভিন্ন জিনিষ তৈয়ারী হয়। দড়ি, ব্যাগ, কম্বল লোম হইতে তৈয়ারী হয়। পশমিনা ছাগলের চুল হইতে কাশ্মিরী শাল তৈয়ারী হয়, এই ছাগলের আদিবাস তিব্বত সীমানা। আংগোরা ছাগল হইতে পাওয়া চুলকে **মোহের** বলে। এই চুল বড় ও চকচকে। বিভিন্ন জাতের সঙ্গে আংগোরা ছাগলের প্রজনন করাইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনুতে উৎপন্ন ছাগলে লোমের উৎকর্ষ বাড়িয়া যায় কিন্তু ছাগলের আকার ছোট হয়।

ছাগলের মাংস : প্রাণীজাত প্রোটিনের প্রধান উৎস।

ছাগলের চামড়া : ছাগলের চামড়া বিভিন্ন কাজে লাগে। ভারতবর্ষ বিদেশে এই চামড়া রপ্তানি করিয়া কয়েক কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

ছাগলের মল : ছাগলের মল জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ছাগলের আবাসস্থলের মলমূত্র জমিতে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শূকর পালন (Pig Rearing)

সূচনা (Introduction) ঃ

বর্তমানে শূকর পালন একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে। শূকর পালনে মূলধন খুব তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসে এবং শূকর পালনে আবাসস্থল ও আনুষঙ্গিক খরচা অনেক কম। মাদী শূকর বছরে দুইবার করিয়া চার-পাঁচটা বাচ্চা দেয়। চল্লিশ হইতে পঞ্চাশটি শূকরী ও দুই-তিনটি পুরুষ শূকর দুই বা তিন ব্যক্তি অনায়াসে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন। শীত বা গ্রীষ্মকাল ছাড়া তাহাদের রাতের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না। শীতে এবং গ্রীষ্মকালে ইহারা ঘরে আশ্রয় লয়। 1961 সালের আদমসুমারীর হিসাবে দেখা যায় ভারতে 51,76,210 সংখ্যক শূকর আছে। বর্তমানে শূকরের সংখ্যা অসংখ্য। পশ্চিমবঙ্গে শূকরের সংখ্যা প্রায় 2,51,732।

এখন ভারতে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে মানুষের শূকরের মাংস খাওয়ার প্রবণতা কম। তিরিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বেও মুরগীর ডিম ও বিশেষতঃ মুরগীর মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল কম। বর্তমানে শূকরের মাংসের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা আছে। তাহার কারণ শূকর নোংরা পরিবেশে থাকে। আসলে যে সকল লোক শূকর পালন করেন, তাহাদের খাইতে দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় শূকর যাহা পায় তাহাই খাইতে অভ্যস্ত হয়। পূর্বে শুধুমাত্র সাঁওতাল, দীনদুঃখী বা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা শূকর পালন করিত।

কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের শূকর পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেরই অনেক অঞ্চলে বড় শূকর খামার গড়িয়া উঠিয়াছে। পাঁঠা, ভেড়া, ও মুরগীর মাংসের তুলনায় শূকরের মাংস সস্তা, অথচ সমভাবে পুষ্টিকর। ছাগল ও ভেড়ার তুলনায় সন্তান-ধারণের এবং সন্তান-সংখ্যার হার শূকরের বেশী। শূকরের বৃদ্ধির হার অনেক দ্রুত। যদি শূকর পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পালন করা হয় তাহা হইলেই শূকরের মাংস খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে।

শূকরের চাষযোগ্য শ্রেণীবিভাগ

ব্রিটিশ শূকর ঃ

(i) **বড় সাদা ইয়র্কশায়ার ঃ এই শূকরের উৎপত্তি হইয়াছে**

ইংলণ্ডে, এখন ব্যাপকভাবে কানাডা, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এই শূকরের চাষ হইতেছে। ভারতবর্ষে এই শূকরের চাষের প্রচলন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শূকর খামারে এই জাতীয় শূকর পালন করা হয়। দেশী স্ত্রী শূকরকে পুরুষ ইয়র্কশায়ার শূকর দ্বারা প্রজনন ঘটাইয়া সংকর শূকরের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এই শূকরের গায়ের বর্ণ সাদা, দেহ লম্বা ও স্থূল। কানজোড়া পাতলা ও সামনের দিকে প্রসারিত। একটি পরিণত পুরুষ শূকরের ওজন তিনশত হইতে চারশত কিলোগ্রাম। স্ত্রী শূকর ভালো দুধ দেয় এবং সংখ্যায় বাচ্চা দেয় বেশী।

(ii) **বার্কশায়ার** : ইংলণ্ডের খুব পুরাতন জাতের শূকর। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডাতে এই শূকর চাষের প্রচলন বেশী। দক্ষিণভারতেও এই শূকরের সাহায্যে দেশী শূকরকে প্রজনন করাইয়া শূকর চাষের উন্নতি করা হইতেছে। ইহাদের দেহের বর্ণ কালো, চারটি পায়ে, নাকে ও লেজে সাদা বর্ণের দাগ আছে। মাথা ছোট, মুখ চ্যাপ্টা, দেহ লম্বা ও বাঁকা। একটি পুরুষ বার্কশায়ারের ওজন প্রায় চারশ কিলোগ্রাম।

(iii) **টেমওয়ার্থ** : ইংলণ্ডেই এই শূকরের সৃষ্টি। গায়ের বর্ণ সোনালী থেকে লাল, লম্বা সরু মাথা, মুখটা লম্বা এবং দেহ তুলনামূলকভাবে লম্বা। বেকন মাংসের জন্য এই শূকরের চাষ করা হয়। একটি পুরুষ শূকরের ওজন প্রায় তিনশত কিলোগ্রাম।

(iv) **লার্জ ব্ল্যাক** : ইংলণ্ডের উত্তরদেশীয় অঞ্চলের শূকর এবং নেপোলিটন শূকরের সঙ্গে প্রজনন করাইয়া এই জাতের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাদের বর্ণ কালো, দেহ লম্বা, কান দুইটি মাথার দুইপাশে ঝোলে।

(v) **ডেনিস ল্যাণ্ডরেস** : ভারতের যে কোন সরকারী-বেসরকারী খামারে এই শূকরের চাষ হয়। এই শূকর বেশী সংখ্যায় বাচ্চা দেয়। এই শূকরের বর্ণ সাদা, আকারে বড় এবং কান দুইটি ঝোলা হয়।

(vi) **ওয়েসেক্স স্যাডলব্যাক** : এই শূকরের মাংস হইতে ভাল বেকন তৈয়ারী হয়। কম খরচে এই শূকরের চাষ করা যায়। মুক্ত অঞ্চলে এই শূকরের চাষ করা যায়। ইহাদের বর্ণ কালো, সামনের পায়ে ঘোড়া পিঠে বসিবার আসনের আকারে সাদা দাগ থাকে।

আমেরিকান শূকর :

(i) **পোল্যাণ্ড চায়না :** ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার ওহিও প্রদেশে এই শূকরের সৃষ্টি করা হয়। চীনের বাইফিল্ড এবং ওয়ারেণ অঞ্চলের শূকরের মিশ্রণে এই জাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা আকারে খুব বড় হয়। গায়ের বর্ণ কালো, পায়ে, লেজে এবং নাকে ছয়টি সাদা দাগ আছে।

(ii) **ডিওরক :** এই শূকরের গায়ের বর্ণ লাল। সোনালী থেকে গাঢ় লাল দাগ সমস্ত দেহে ছড়াইয়া থাকে। এই শূকরের বৃদ্ধি বেশী হয়, চর্বির জন্য এই শূকরের পালন করা হয়। স্ত্রী শূকর একসঙ্গে অনেক বাচ্চা প্রসব করে।

(iii) **চেষ্টার হোয়াইট :** আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ায় এই শূকরের উৎপত্তি। গায়ের বর্ণ সাদা। স্ত্রী শূকর একসঙ্গে দশ বারোটি বাচ্চা প্রসব করে। একটি পরিণত পুরুষ শূকরের ওজন প্রায় চারশত কিলোগ্রাম।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শূকর :

ক্যান্টনীস : দক্ষিণ চীনের দেশীয় শূকর। দেহে সাদা-কালো বর্ণের দাগ দেখা যায়। দেহ লম্বা এবং বৃদ্ধির হার দ্রুত। স্ত্রী শূকর মাত্র পাঁচ মাস বয়সেই গর্ভধারণ করে ফলে চাষের দিকে লাভজনক। ইহা ছাড়া সুম্বা, বার্কশালা ফিলিপাইন, চীনা বা মালায়ম শূকর, বালিনীস ইত্যাদি সংকর শূকর সৃষ্টি করা হইয়াছে।

আফ্রিকা মহাদেশের শূকর :

বাকাশী : ইহা কেমারুনদেশীয় কালো বর্ণের শূকর। সাদা বা কালো ও সাদা বর্ণের মিশ্রিত বাকাশী শূকর দেখা যায়।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার শূকর :

পেলোন, কুইনো, ফ্রিওল্লো ও ক্যানাস্ত্রা এই অঞ্চলের শূকর।

শূকরের খাদ্য (Foods)

ছাগল ও গরুর মতো শূকর চরিয়া খায়। শূকর পালনে সুবিধা এই যে রান্নাঘর ও বাজারের ফেলে দেওয়া শাকসব্জী সাগ্রহে খায়। এইরকম খাদ্য খাইয়াই শূকরের দেহের বৃদ্ধি হয়।

শূকরের চাষকে লাভজনক করিতে হইলে দামী খাদ্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বাজার, রান্নাঘর, হোটেল, মেস বাড়ীর যাবতীয়

উচ্ছিষ্ট শাকসব্জী; তরিতরকারী ও ফেলিয়া দেওয়া খাদ্য অনায়াসেই অল্প পয়সায় যোগাড় করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ শীতের সময় বাজারে ছাঁটাই ফুলকপি, বাধাকপির পাতা, মূলাপাতা ও বিভিন্ন তরকারী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে এইগুলি ভালভাবে সিদ্ধ করিয়া শূকরকে খাওয়ানো উচিত, তাহা হইলে রোগের সম্ভাবনা কম থাকে।

শূকর প্রতিপালনের জন্য বাজারে যে দানাশস্য সস্তা হয়, তা কিনিয়া রাখা উচিত। যেমন চালের ক্ষুদ, কুঁড়া, ভাঙা চাল, পচা বা পোকা খাওয়া চাল, গম, গমের ভূষি শূকরের প্রধান খাদ্য। তবে চালের অপেক্ষা গমে খাদ্যমূল্য বেশী থাকে। ইহাছাড়া মাইলো, জোয়ার, ভুট্টা যখন যাহা সস্তায় পাওয়া যায় তাহা কিনিয়া রাখা ভাল। তিসির, তিলের, বাদামের, নারিকেলের, রেড়ীর, সরিষার খইল খাদ্যের সহিত মেশান হয়। শুঁটকি মাছও খাদ্যে মিশান হয়। প্রতি 100 কিলোগ্রাম খাদ্যে Vitablend AD_3 দশ গ্রাম এবং খনিজ-মিশ্রণ প্রায় দুই কিলোগ্রাম যোগ করা হয়।

(i) ক্রীপ ফিডঃ শূকরের প্রায় চৌদ্দ মাসে তিনবার বাচ্চা হয়। এক সপ্তাহের বাচ্চাকে বিশেষ ধরনের ক্রীপ ফিড দেওয়া হয়। বাচ্চাদের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হইতে হয়।

ক্রীপ ফিড

টাটকা ভুট্টা গুঁড়া	40 কিলোগ্রাম
স্কিমড্ দুধ	10 "
বাদাম খইল	10 "
চিল	10 "
ভূষি	10 "
গুড়	10 "
শুঁটকি মাছ	8 "
খনিজ পদার্থ	2 "
রুবিমিক্স (AB_2D_3) বা ভিটাব্লেণ্ড (AB_2D_3)	10 গ্রাম
মোট	100·10 কিলোগ্রাম

উপরিলিখিত শতকরা ওজন হিসাবে প্রতিদিন খাদ্য মিশাইয়া লইতে হয়। খাদ্য একসঙ্গে মিশাইয়া রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

সেইজন্য শূকরের সংখ্যা অনুযায়ী দিনে প্রতিটি শূকরের 300 গ্রাম খাদ্যের হিসাবে খাদ্য মিশাইয়া লইতে হয়। এই হিসাবে দুইমাস পর্যন্ত শূকরের খাদ্য দেওয়া হয়। ইহাছাড়া প্রতি কিলোগ্রাম খাদ্যে চার গ্রাম অ্যান্টিবায়োটিক যেমন Aurofac 2A বা Teramycin T.M.5 এবং $\frac{1}{4}$ গ্রাম ভিটামিন Rovimix যোগ করা হয়।

(ii) গ্রোয়ার রেশন : বাড়ন্ত বাচ্চার তিনমাস বয়স হইতে বিক্রীর সময় পর্যন্ত বিভিন্ন রকম দানাশস্য খাওয়ানো হয়। এই খাদ্যে অল্প পরিমাণে দানাশস্য দিয়া অন্যান্য খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। এই সময়ে বাচ্চাদের বৃদ্ধির হার বেশী। বৃদ্ধির উপর শূকরের দাম নির্ভর করে, সুতরাং খাদ্যের পরিমাণের উপর নজর দিতে হয়।

দানা সহকারে খাদ্য

পচা ও পোকা গম	20 কিলোগ্রাম
জোয়ার	15 "
ভাঙা চাল, ক্ষুদ, পোকা চাল	15 "
তিল খইল	10 "
বাদাম খইল	10 "
গমের ভূষি	10 "
চালের কুঁড়া	10 "
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	7·5 "
খনিজ	2·5 "
রুবিমিক্স (AB_2D_3)	·10 গ্রাম
মোট	100·10 কিলোগ্রাম

কমদানা যুক্ত শূকরের খাদ্য

ভুট্টা	30 কিলোগ্রাম
ভূষি	40 "
বাদাম খইল	20 "
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	7·5 "
খনিজ	2·5 "
ভিটাব্লেণ্ড AB_2D_3	0·10 গ্রাম
মোট	100·10 কিলোগ্রাম

কম দানাযুক্ত খাদ্যে শুধুমাত্র ভূট্টা ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ এই সময় চাল, গমের দাম বেশী থাকে, ভূট্টা দেওয়া সহজ হয়।

কয়েকটি খাদ্যের শতকরা পরিমাণ

খাদ্যের উপাদান	1 কিলোগ্রাম	2 কিলোগ্রাম	3 কিলোগ্রাম	4 কিলোগ্রাম
গমের ভূষি	70	—	60	—
চালের কুঁড়া	—	70	—	60
বাদাম খইল	20	—	20	20
তিল খইল	—	20	—	—
মাছ	6·5	6·5	6·5	6·5
ভূট্টা	—	—	10	—
খনিজ পদার্থ	3·5	3·5	3·5	3·5
রুবিমিক্স AB_2D_3 বা ভিটাব্লেণ্ড AB_2D_3	·10 গ্রাম	·10 গ্রাম	·10 গ্রাম	·10 গ্রাম
	100·10	100·10	100·10	100·10

শুঁটকি মাছের দাম বেশী হইলে কম পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে, তবে উপরোক্ত খাদ্যে তিন কিলোগ্রামের কম হইলে চলিবে না। শূকরের ওজন পঞ্চাশ কিলোগ্রামের অধিক হইলে খামারে রাখা লাভজনক নহে। কারণ এই সময় শূকরের দিনে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি মাত্র 300-400 গ্রাম, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ওজনের বৃদ্ধি হ্রাস পাইবে। এই সময় শূকর বিক্রী করাই খামারের পরিচালকের পক্ষে লাভজনক।

পঞ্চাশ কিলোগ্রাম বা ততোধিক ওজনের শূকরের খাদ্য

খাদ্যের উপাদান	1 কিলোগ্রাম	2 কিলোগ্রাম	3 কিলোগ্রাম
ভূট্টা	25	20	40
মাইলো	—	20	—

পচা ও ভাঙ্গা চাল	15	—	—
বাদাম খইল	12	12	12
তিল খইল	10	10	10
মাছের গুঁড়া	5·5	5·5	5·5
গমের ভূষি	—	20	30
চালের কুঁড়া	30	10	10
খনিজ	2·5	2·5	2·5
রুবিমিক্স বা ভিটাব্লেণ্ড	·10 গ্রাম	·10 গ্রাম	·10 গ্রাম
	100·10	100·10	100·10

অন্যান্য পশুর তুলনায় শূকরের বৃদ্ধির হার অনেক বেশী। জন্মের সময় শূকরের যে ওজন থাকে, ছয়মাস পর প্রায় 40 গুণ বৃদ্ধি পায়। এই দ্রুত বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

বাচ্চার বয়স	শূকরীর দুধ	খাদ্যের পরিমাণ
একমাস	শুধু দুধ	—
দুইমাস	দুধ	250 গ্রাম
তিনমাস	—	500 গ্রাম
চারিমাস	—	1 কিলোগ্রাম
পাঁচমাস	—	$1\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম
ছয়মাস	—	2 কিলোগ্রাম

অবশ্যই খাদ্যে পরিমাণমত লবণ, ভিটামিন থাকা প্রয়োজন।

বাচ্চাসহ শূকরীর খাদ্য :

প্রথম অবস্থায় বাচ্চারা মায়ের দুধ খায়, দুইমাস কাল হইতে মায়ের খাদ্যে ভাগ বসায় এবং মায়ের সঙ্গেই থাকে। সেক্ষেত্রে মায়ের খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। প্রায় গড়ে প্রতিটি শূকরীর জন্য এক কিলোগ্রাম বা বাচ্চার জন্য 500 গ্রাম, মোট 1500 গ্রাম খাদ্য দেওয়া হয়। ধরা যাক্‌, একটি

শূকরীর দশটি বাচ্চা। অর্থাৎ মোট 6 কিলোগ্রাম খাদ্যের যোগান দিতে হয়।

কম পয়সার খাদ্যে শূকর প্রতিপালন ঃ

(i) হোটেল, রান্নাঘর বা মেসবাড়ীর ফেলে দেওয়া জিনিষ ঃ শূকরের খামারের নির্দিষ্ট লোক রান্নাঘর ও মেসবাড়ীর ফেলিয়া দেওয়া খাদ্য জোগাড় করিবে। এই খাদ্য বিনা পয়সায় বা অল্প পয়সার বিনিময়ে সংগ্রহ করা যায়। এই খাদ্য শুধু আনিবার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা চাই। অবশ্য এই ধরনের খাদ্য খামারের নিকটবর্তী অঞ্চল হইতেই সংগ্রহ করা হয়।

এই খাদ্য সংগ্রহ করিয়া খাদ্য হইতে অপাচ্য অংশ বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই খাদ্য একটি বড় পাত্রে খুব ভালভাবে ফুটাইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বীজাণুমুক্ত হয়। তাহা ছাড়া প্রয়োজনে খাদ্যে ব্যাকটিরিয়া প্রতিরোধকারী ঔষধ মেশান যাইতে পারে।

ফেলিয়া দেওয়া খাদ্যে উপযুক্ত পুষ্টি হয় না। এই খাদ্যে জলের পরিমাণ বেশী হয়, ফলে শূকরের পেট ভরিয়া যায় কিন্তু বৃদ্ধি হয় না। নিকৃষ্ট হোটেলে ভালকিছু সব্জী পাওয়া যায় না। শূকরকে এই খাদ্য পরিবেশনের সঙ্গে পরিপূরক খাদ্য হিসাবে কুঁড়া, ভূষি খাওয়ানো হয়। এই খাদ্যে খনিজ পদার্থ বা ভিটামিন থাকে না, ফলে পরিপূরক খাদ্যের সহিত খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন যোগ করা হয়।

(ii) বাজারের ফেলে দেওয়া সব্জী ঃ শহর, শহরতলীর বাজারে, গ্রামের হাটে তরিতরকারি, মাছের আঁশ, কানকো, নাড়ি-ভুঁড়ি, মাংসের ছাট ইত্যাদি সব কিছুই পাওয়া যায়। এই খাদ্যে শর্করা, চর্বি ও প্রোটিনের পরিমাণ যথেষ্ট থাকে, শুধুমাত্র খনিজ লবণ ও ভিটামিন খাদ্যে যোগ করা হয়।

এই সংগৃহীত খাদ্য হইতে নোংরা ও খাদ্যের অনুপযুক্ত জিনিষ বাছিয়া লওয়া হয়। বড় সব্জীকে কাটিয়া ছোট করা হয়, তারপর বড় পাত্রে ভালভাবে ফুটাইয়া লইয়া শূকরকে খাইতে দেওয়া হয়। তবে এই খাদ্য শূকরকে খাওয়াইলে পরিপূরক খাদ্যের যোগানও অল্প পরিমাণে করিতে হয়, নয়ত শূকরের স্বাভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হয়।

নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি সস্তায় সুবিধামত কিনিয়া রাখা যাইতে পারে, যথা—

(i) চালের কলে সস্তায় চালের কুঁড়া, ক্ষুদ, চালের ছাঁট পাওয়া যায়।

(ii) ময়দা ও সুজির কলে ভূষি সংগ্রহ করা যায়।

(iii) বিভিন্ন ভোজ্য তৈলের মিলে সস্তায় খইল কেনা যাইতে পারে।

(iv) মদের ভাটি হইতে সস্তায় ফেলিয়া দেওয়া ভাতের পরিত্যক্ত অংশ পাওয়া যায়।

(v) লজেন্সের কারখানা হইতে ফেলিয়া দেওয়া অংশ (গাদ), বেকারীর ফেলিয়া দেওয়া রুটি, নারিকেল তৈলের মিলে নারিকেলের ছাঁট অতি অল্পমূল্যে সংগ্রহ করা যায়।

(vi) বিভিন্ন কসাইখানা হইতে রক্ত, হাড়, ফুসফুস, মাংসের ছাঁট অল্প মূল্যে সংগ্রহ করা যায়।

(vii) যেখানে শুঁটকি মাছ তৈয়ারী হয়, সেখান হইতে খুব কমদামে ফেলিয়া দেওয়া শুঁটকি মাছ শূকরের জন্য সংগ্রহ করা যায়।

এইভাবে খাদ্য সংগ্রহের জন্য শূকর পালকের সংগ্রাহকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে শূকর পালকের খাদ্য সংগ্রহের খরচা অনেক কম হইবে।

শূকরের আবাসস্থল (Rearing places)

শূকর খামারের পরিচালকের প্রয়োজন অনুযায়ী আবাসস্থল ঠিক করা হয়। স্থায়ী ভাল আবাসস্থল নির্মাণের জন্য পালকের যথেষ্ট অর্থেরও প্রয়োজন হয়। বড় চড়িবার জায়গা থাকিলে ফাঁকা জায়গায় শূকর পালন করা যায়, শুধুমাত্র রাতে যে কোন ধরনের আস্তানা থাকিলেই চলিবে।

ফাঁকা বিস্তীর্ণ জমিতে শূকর পালন ঃ ফাঁকা বিস্তীর্ণ এলাকায় শূকর চাষ লাভজনক। বিদেশে অনেক শূকর পালকই এই পদ্ধতিতে চাষ করেন। সাধারণতঃ বিরাট গম বা ভুট্টা ক্ষেতে শূকর চড়ান হয়, এই ভুট্টা খাইয়া শূকরের বৃদ্ধি হয় বেশী। ভুট্টা বিক্রী অপেক্ষা শূকরের মাংসের দাম অনেক বেশী পাওয়া যায়। দুইভাবে সাধারণতঃ চাষ করা হয়, যথা—(1) চাকা লাগানো খামার (2) তাঁবু।

(i) **চাকা লাগানো ছোট খামার ঃ** এই খামারগুলি আয়তনে ছোট হয়। তবে একটি ছয় মাস বয়সের শূকরের জন্য অন্ততঃ 20 বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন। খামার ঘরটি কাঠের তৈয়ারী হয় এবং খামারকে বিরিয়া

কাঠের বেড়া থাকে। বেড়ার চারিধারে শূকরগুলি ঘুরিয়া বেড়ায় এবং রাত্রে খামারে থাকে। বেড়াশুদ্ধ সমস্ত খামার চাকার সাহায্যে লাগান থাকে। প্রয়োজনে ট্রাকটরের সাহায্যে এই খামারকে স্থানান্তরিত করা যায়। এই সঞ্চরণশীল খামারের সুবিধা হইল শূকরের মলমূত্র জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজনে নতুন জমিতে সারের মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়।

এইভাবে শুধুমাত্র দেশী শূকর চাষই করা চলে, বিদেশী শূকরে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। বর্তমানে প্রচুর জমি পাওয়া পালকের পক্ষে দুঃস্কর।

তাঁবু ঃ এই প্রথায় স্বাধীনভাবে শূকর চড়ানো হয়। শূকরগুলি মাঠের ফসল খায়, যে ফসলের বাজার দর কম সেই ফসল শূকরকে খাওয়ানো হয়। লোক দ্বারা শূকর চড়ান হয়। শুধু রাতে রাখিবার জন্য তাঁবু বা আস্তানার প্রয়োজন।

বদ্ধ খামারে শূকর পালন ঃ

বিলাতি ভাল জাতের শূকর খামারেই চাষ করা হয়। শূকর পালনের জন্য বড় জমি খোঁজ করা প্রয়োজন। জমিটা ভালো করিয়া ঘেরা দরকার। আর্থিক সঙ্গতির দিকে চিন্তা করিয়া কাঁটাতার, বেড়ালতা, বাঁশ বা ইটের প্রাচীর দেওয়া হয়। এই জমির মধ্যে আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, নারিকেল ও সুপারি ইত্যাদি গাছ লাগান হয়। গাছ বড় হইলে গ্রীষ্মকালে গাছের ছায়ায় শূকর বিশ্রাম করে। জমি বড় হইলে প্রয়োজনে বিভিন্ন মরশুমে তরিতরকারি লাগান যায়। সব্জী বিক্রী করিয়াও অর্থ আসে এবং সব্জীর দাম কমিয়া গেলে শূকরকে খাওয়ানো যাইতে পারে।

শূকর পালকের অর্থসঙ্গতি বেশী থাকিলে খামারে একই সঙ্গে গরু, মহিষ, ছাগল, মুরগীর সঙ্গে শূকরের মিশ্র চাষ করা যায়। এই মিশ্র চাষে একের ক্ষতি অন্যের চাষে পুষাইয়া যায়। শূকরের সঙ্গে অন্য পশুর চাষ না করিলেও অন্ততঃপক্ষে ছাগলের চাষ করা যায়। ছাগল শুধু চড়িয়াই খায়, পরিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

বদ্ধ খামারে ছোট শূকরের জন্য দুই বর্গফুট এবং প্রতি বড় শূকরের জন্য কুড়ি বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন। সুতরাং এক বিঘা জমিতে কয়েকশত শূকর পোষা যায়।

খামারের জমি বেশ উঁচু হওয়া প্রয়োজন যাহাতে প্রবল বর্ষাতেও জল না জমে। জমির দক্ষিণ দিক উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন। জমির মধ্যে একটি

বড় পুকুর বা জলাশয় থাকা প্রয়োজন। পুকুরের জলে পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট যোগ করা হয়। জমির মধ্যে বালির ভাগ বেশী না থাকাই ভাল, কারণ গ্রীষ্মকালে মাটি বেশী গরম হয়, ফলে শূকরের কষ্ট হয়।

খুব কম খরচায় খামারের মেঝে করা হয়। মাটি খুব ভালভাবে পেটান হয়। খালি মেঝেতে শূকর চাষ করিলে মাটিতে খড়কুটা, সুরকি আর চূণ মেশাইয়া মাটি পেটান হয়। মাটি পেটানর সময় মেঝেতে একদিকে ঢাল রাখা হয়। সেইদিকে নালা রাখা হয়। মাটির মেঝেতে শূকরকে স্নান করানো চলে না, ঘরের বাইরে শূকরকে স্নান করাইবার ব্যবস্থা থাকে। ঘরের মেঝে ব্লিচিং পাউডার, ফরম্যালিন, ফিনাইল দ্বারা প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয়।

শূকরের খামারের নর্দমার গভীরতা বেশী করা হয় না, কারণ পড়িয়া গিয়া শূকরের আঘাত পাইবার সম্ভাবনা থাকে। বয়স অনুসারে শূকরের জায়গার প্রয়োজন হয় নিম্নরূপ—

(i) দুই থেকে চার মাস বয়সের শূকরের জন্য 10 বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন। (ii) পাঁচ থেকে ছয় মাস বয়সের শূকরের জন্য 12 বর্গফুট স্থানের দরকার। (iii) ছয় মাসের বেশী বয়সের শূকরের জন্য 20 বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন।

একটি ছোট ফার্মে অন্ততঃ 10টি শূকরী থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ দশটি শূকরীর জন্য 200 বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন।

শূকরের ঘরের মধ্যেই একটি দেওয়াল বা চট দ্বারা পৃথকভাবে মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। শূকর যেখানে থাকে, খাওয়াদাওয়া করে, সেখানে কখনই মলমূত্র ত্যাগ করে না। শূকরের মলমূত্রকে নর্দমার মাধ্যমে খামারের বাহিরে ফেলিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একটি বড় গর্তে এই নোংরা জমা রাখা হয়, পরে মূল্যবান সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা যায়। পুকুরে মাছ চাষেও এই সার ব্যবহার করা যায়। পালকের ইচ্ছা বা ক্ষমতা অনুযায়ী কংক্রীটের পাকা মেঝে করা যায়। এই মেঝেতে দড়ি ফেলিয়া কাঁচা অবস্থায় দাগ দিতে হয়। কারণ জলের সঙ্গে খাদ্য মিশিয়া খামারের মেঝে পিচ্ছিল হয়, শূকরের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

পুরাতন পিচের ড্রাম দিয়া খামারের চারিপাশের দেওয়াল করা হয়। পিচের ড্রাম সোজা করিয়া মেঝের চারিপাশে মাটিতে গর্ত করিয়া কিঞ্চিত

প্রবেশ করান থাকে। মাটির মধ্যে অন্ততঃপক্ষে এক ফুট ও মাটির উপরে তিন ফুট খাড়াই থাকা প্রয়োজন। চারিপাশে বাঁশ বা কাঠের খুঁটি দিয়া টিনের দেওয়ালকে শক্ত করা হয়।

মাটি যদি খুব শক্ত হয়, মাটির দেওয়াল করা যাইতে পারে। তবে খামারের চারিপার্শ্বে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ইটের প্রাচীর দেওয়াই ভাল। এই প্রাচীরের ভিতরের দিকে অবশ্যই মেঝের মত পালিশ থাকা প্রয়োজন নয়ত প্রাচীর নষ্ট হইবে। এই প্রাচীর তিনফুট উচ্চতা বিশিষ্ট করা হয়। এই প্রাচীরের উপর পাঁচফুট উচ্চতায় বাঁশের চাটাই দ্বারা ঘেরা থাকে। খামারে আলো ও বাতাস চলাচলের জন্য চাটাইতে ফাঁকা জানলার ব্যবস্থা করা হয়। এইপাঁচ ফুট বাঁশের চাটাইয়ের পরিবর্তে লোহার বা শক্ত তারের জাল দেওয়া যাইতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় এই তিনফুট প্রাচীরের উপর সরু লোহার রডের জালের মত গ্রীল দেওয়া। শীতকালে ও বর্ষাকালে এই পাঁচফুট উপরের দিকের প্রাচীর চট বা থলে দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়।

খামারের ছাদ বিচালি বা খড়ের, শুকনা পাতার, টিনের, টালির, এসবেসটসের, পিচচটের বা টিনের করা হয়। অন্যান্য ছাদ অপেক্ষা টিনের ছাদ মজবুত হয়। আগুন লাগা বা ঝড়ে-বৃষ্টিতে ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। গ্রীষ্মকালে টিন প্রচণ্ড গরম হয় ফলে শূকরের কষ্ট হয়। সেজন্য এই ধরনের ঘরের উচ্চতা আটফুটের পরিবর্তে বারোফুট হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে টিনের চালা দেওয়া খামারে গরম কম হইবে। তাহাছাড়া টিনের ছাদের নীচে কাঠ বা কমদামের তক্তার ফ্রেম করিয়া বাঁশের দরমা লাগান হয়। এই দরমার ভিতরের দিকে অর্থাৎ ঘরের দিকে মাটি ও গোবরের প্রলেপ লাগান হয়। এইভাবে গ্রীষ্মকালে তাপ রোধ করা যায়। টিনের চাল দেওয়া খামার মজবুত হয় এবং ভারী হয়, সেইজন্য খামারের প্রাচীরও যথেষ্ট মজবুত হওয়া প্রয়োজন নচেৎ ছাদের ভার রাখিতে পারিবে না। সাধারণতঃ শক্ত মজবুত বাঁশ বা শাল কাঠের গুঁড়ি দিয়া থাম করিয়া টিন চাপান হয়। ছাদের দুইদিকে ঢাল থাকা ভাল, বৃষ্টির জল শীঘ্রই নামিয়া যায়। সর্বোপরি খামারের একদিকের প্রাচীর এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ঐ দিকেই প্রয়োজনে খামার বাড়ানো যাইতে পারে।

প্রসব কালে শূকরীর ও বাচ্চার যত্ন

প্রসব কালে গর্ভবতী শূকরকে কখনই পুরুষ শূকরের কাছে রাখা হয় না। এই অবস্থায় মারামারি করিলে গর্ভবতী শূকর মারা যায়। গর্ভবতী শূকরীকে এই সময় পৃথক আস্তানায় রাখাই ভাল। এই সময় শূকরীকে সবুজ ঘাস, জল ও দুই কিলোগ্রামের উপর সুষম খাদ্য দেওয়া হয়। শূকরীর ঘর যেন পিচ্ছিল না হয়, শূকরীর এই সময় দেহ ভারী হয় ফলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণে এই সময় ঘরের মেঝেতে শুকনা বিচালি, খড় বা পাতা দেওয়া হয়। ঘরে বীজাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

শূকরীর বাচ্চা প্রসবের পর পরিষ্কার তোয়ালে দ্বারা নোংরা মুছিয়া কাঠের বাক্স বা ঝুড়িতে বাচ্চাদের রাখা হয়। ঝুড়িতে বা বাক্সের নীচে বিচালি বা শুকনা পাতা দেওয়া হয়। খুব ঠাণ্ডার দিনে বাচ্চাদের প্রায় 250 ডিগ্রী সেলেসিয়াস তাপমাত্রায় সাতদিন রাখা হয়। শূকরীর জরায়ুর দুইটি শাখা, প্রতিটি শাখায় গড়ে পাঁচটি বাচ্চা থাকিতে পারে। গর্ভাধানের প্রায় 114 দিন পর শূকরী বাচ্চা প্রসব করে। শূকরী সাধারণতঃ ছয় হইতে নয় মাস বয়সে গর্ভবতী হয়।

শূকরের বংশবিস্তারের পদ্ধতি

(i) *Upgrading* **:** বিশুদ্ধ জাতের শূকরের সঙ্গে ঐ জাতের সংকর শূকরীর প্রজনন করাইবার পদ্ধতিকে *upgrading* বলে। বিশুদ্ধ বলিতে বোঝায় যে শূকরগুলি Breeding সংস্থায় রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছে, যেমন ইয়র্কসায়ার, ল্যাণ্ডরেস ইত্যাদি।

(ii) ***Purebred breeding*** **:** একই জাতের শূকর ও শূকরীর মধ্যে প্রজনন করাইবার পদ্ধতিকে *purebred breeding* বলে।

(iii) ***Cross breeding*** **:** এই পদ্ধতিতে এক জাতের শূকরের সঙ্গে অন্য জাতের বা সংকর শূকরীর প্রজনন করানো হয়।

(iv) ***Criss crossing*** **:** প্রথমে এক জাতের শূকরের সঙ্গে অন্য জাতের বা সংকর শূকরীর সঙ্গে প্রজনন করানো হয়। এই প্রজননে সৃষ্ট শূকরীকে পিতৃজন্তুর মায়ের জাতের পুরুষের সঙ্গে প্রজনন করানো হয়। এই F_1 জন্তুতে সৃষ্ট শূকরীর সঙ্গে পিতৃজন্তুর জাতের পুরুষ শূকরের সঙ্গে প্রজনন করাইয়া দ্বিতীয় অপত্য জন্তু F_2 সৃষ্টি করা হয়। এই পদ্ধতিকে *criss cross*

পদ্ধতি বলে।

(v) *Rotation breeding* : অনেক দেশে তিন বা ততোধিক জাতের পুরুষের সঙ্গে প্রজনন করানো হয়। ধরা যাক, প্রথম বছর পোলাণ্ড চায়না ব্যবহার করা হয়, দ্বিতীয় বছরে হ্যাম্পশায়ার পুরুষকে প্রথম বছরে সৃষ্ট শূকরীর সঙ্গে প্রজনন করানো হয়, আবার তৃতীয় বছরে হয়ত চেষ্টার হোয়াইট পুরুষের সঙ্গে দ্বিতীয় বছরে সৃষ্ট শূকরীর সঙ্গে প্রজনন করানো হয়।

(vi) *In breeding* : একই জাতের ভাই-বোন ও মা-ছেলের মধ্যে প্রজনন করাইবার প্রদ্ধতিকে *Inbreeding* বলে।

(vii) *Cross line breeding* : একই জাতের বহুদিন পূর্বের পুরুষ ও স্ত্রী শূকরের মধ্যে প্রজনন করানো হয়।

(viii) *Line breeding* : নিকট সম্পর্কের শূকর শূকরীর মধ্যে প্রজনন করাইবার রীতিকে *line breeding* বলে।

শূকরের রোগ ও চিকিৎসা (Diseases and treatment)

শূকরের রোগকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়, যথা:—

(1) **ভাইরাস ঘটিত রোগ** : হগ কলেরা, এঁসো, গুটি বসন্ত।

(2) **বীজাণু ঘটিত রোগ** : সোয়াইন ইরিসিপিলাশ, তড়কা, নিউমোনিয়া, ক্ষয় রোগ প্রভৃতি।

(3) **ভিটামিনের অভাব জনিত রোগ** : রক্তাল্পতা।

(4) **লবণের অভাব জনিত রোগ** : **ভাইরাস ঘটিত** : রক্তাল্পতা, রিকেটস।

(5) **কৃমি জাতীয় রোগ।**

(6) **পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগ।**

(1) **ভাইরাস ঘটিত রোগ** :

ভাইরাস দ্বারা রোগ খুব দ্রুত পশুদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। শূকরের ভাইরাস জনিত রোগে কোন ঔষধই ফলপ্রসূ নহে। এ্যান্টিবায়োটিক বা সালফা জাতীয় ঔষধে সুফল পাওয়া যায় না। ভাইরাস রোগের প্রধান প্রতিরোধ ব্যবস্থা হইল টীকা।

(i) **সোয়াইন জ্বর বা হগ কলেরা** : পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই রোগ দেখা যায়। ভারতের সব প্রদেশেই শূকরের এই রোগ হয়,

1962-63 সালে পশ্চিমবঙ্গে এই রোগ মহামারী রূপে চিহ্নিত হয়। কম বয়সের শূকরের এই রোগ হয় এবং মারা যায়। নোংরা জায়গায় শূকর যাতায়াত করিলে শূকর এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগে শূকরের 105°F হইতে 108°F পর্যন্ত দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। শূকর খাওয়া ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়। জলের মত পাতলা মল ত্যাগ করে, দুই চোখের কোণ হইতে কালো বর্ণের তরল পদার্থ বাহির হইতে থাকে। প্রায় দুই সপ্তাহ রোগভোগের পর শূকরের মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ এই কলেরা রোগের কোন ঔষধ জানা নাই। একমাত্র ব্যয়বহুল সিরাম শিরায় প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা করিলে রোগ উপশমের সম্ভাবনা থাকে। শূকরের সাতদিন বয়সে এবং আট সপ্তাহ বাদে ও প্রতিবছরে একবার করিয়া এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে টীকা দেওয়া যায়। এই রোগের সবচেয়ে ভাল প্রতিরোধ ব্যবস্থা রোগাক্রান্ত শূকরকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা।

(ii) **এঁসো রোগঃ** এই রোগ খুব ছোঁয়াচে, বৈজ্ঞানিকেরা এই রোগের সাত রকম টাইপ চিহ্নিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই রোগে দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়া যায়। জিভের ত্বকে, মাড়ি, ঠোঁটে, ফোস্কার মত অংশ সৃষ্টি হয়, ঐ অংশ হইতে জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া লাল বর্ণের ক্ষত সৃষ্টি করে। পায়ের দুই ক্ষুরের মধ্যবর্তী অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, শূকরের চলাফেরায় অসুবিধা হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ বোরিক অ্যাসিড বা ফিটকারি দ্রবণ দ্বারা মুখের ক্ষত সারান যায়। পাঁচভাগ আলকাতরা ও একভাগ তুঁতে মিশাইয়া ক্ষুরের ক্ষতে প্রলেপ লাগান হয়। এঁসো রোগে আক্রান্ত হইলে শূকর দুর্বল হইয়া পড়ে ফলে নিউমোনিয়া বা উদরাময়ে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। তাই সালফা জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

(iii) **গুটি বসন্তঃ** এই রোগে শূকরের কানের ত্বকে, গলায়, উরুর ভিতর দিকে এবং উদরে প্রথম ছোট ফোলা অংশ দেখা যায়। গায়ের তাপমাত্রা বাড়ে, শ্বাসকষ্ট দেখা যায় এবং শূকর ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ ক্ষতস্থানকে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দ্বারা ধৌত করিয়া বোরিক পাউডার লাগান হয়। বসন্তে আক্রান্ত

শূকরকে পৃথক রাখা প্রয়োজন।

(2) বীজাণু ঘটিত রোগঃ

(i) **হগ প্লেগঃ** এই রোগ শূকরের কম হয়, রোগগ্রস্ত শূকর খাদ্য, জল খাওয়া ত্যাগ করে। এই রোগে শূকর দুর্বল হইয়া পড়ে, দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ও শ্বাসকষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিকারঃ পেনিসিলিন, স্ট্রেপটো পেনিসিলিন, টেরামাইসিন, ক্লোরামফেনিকল জাতীয় ঔষধে এই রোগের উপশম হয়। এই রোগের প্রতিষেধক টীকাই একমাত্র প্রতিকারের ব্যবস্থা।

(ii) **সোয়াইন ইরিসিপিলাসঃ** পৃথিবীর সকল দেশেই শূকরের এই রোগ দেখা যায়। তিন হইতে ছয় মাস বয়স কালের শূকরের এই রোগের সম্ভাবনা বেশী থাকে। রোগাক্রান্ত শূকরের বিষ্ঠা যদি সুস্থ শূকর খাদ্যের সহিত গ্রহণ করে, তাহা হইলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই রোগে শূকরের চোখ লাল হয়, প্রচুর জল পড়ে এবং প্রবল জ্বর হয়। কয়েকদিনের মধ্যে দেহত্বকে রক্তবর্ণ ফোস্কার মত অংশ দেখা যায় এবং অংশগুলি বেশী ফুলিয়া ওঠে। অনেকদিন রোগভোগের পর শূকর মারা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিকারঃ এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধই একমাত্র চিকিৎসা। রোগাক্রান্ত শূকরকে পৃথক আস্তানায় রাখা প্রয়োজন। রোগের প্রকোপ বাড়িলে শূকরকে মারিয়া পুঁতিয়া ফেলা প্রয়োজন।

(ii) **ক্ষয় রোগঃ** শূকরের ক্ষয়রোগে প্রধানতঃ গলার লসিকাগ্রন্থি আক্রান্ত হয়। দেহের তাপমাত্রার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। এই রোগের হাত হইতে প্রতিরোধের জন্য পরিষ্কার আবাসস্থল থাকা একান্তই প্রয়োজন।

(3) ভিটামিনের অভাব জনিত রোগঃ

ভিটামিন A-এর অভাবে শূকরের ক্ষুধামান্দ্য ও দেহ শীর্ণ হইতে শুরু করে, বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। চক্ষুর রোগ ও পক্ষাঘাত হয় এবং স্ত্রী শূকর প্রজনন ক্ষমতা হারায়। বাচ্চার ভিটামিন A-এর অভাবে যকৃত, বৃক্ক, মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের আকারের বিকৃতি ঘটে।

ফিড লিভার তৈল বা প্রিপ্যালিন ফোর্ট ইনজেকশন (এক হইতে পাঁচ মিলিলিটার) করা হয়।

ভিটামিন D-এর অভাবে শূকর চলাফেরা করিতে পারে না। বাচ্চা শূকরের রিকেটস ও বড় শূকরের অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ দেখা যায়। সূর্যের আলোতে ভিটামিন D তৈরী হয়। আলো-বাতাস পূর্ণ খামারে শূকর চাষ করিলে এই ভিটামিনের অভাব ঘটে না। **রাইবোফ্লেবিন ভিটামিনের** অভাবে শূকরের চর্ম রোগ হয় ও অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। শূকরী মৃত বাচ্চা প্রসব করে। **নিকোটিনিক অ্যাসিডের** অভাবে অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও মুখে ক্ষত হয়। **প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের** অভাবে চর্মরোগ হয়, লোম পড়িয়া যায়। চলন ভঙ্গীটা অনেকটা রাজহাঁসের মত হয়, সেইজন্য goose stepping বলে। **ভিটামিন B_{12}**-এর অভাবে চর্মরোগ, রক্তাল্পতা ও স্বরভঙ্গ হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ শূকরের দৈনিক খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন যোগ করা প্রয়োজন। সুষম খাদ্যেও পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন পাওয়া যায়।

(4) খনিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগঃ

শূকরের দেহে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অভাবে বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(i) **ক্যালসিয়ামের অভাবেঃ** শূকরের দেহের পিছনে পক্ষাঘাত হয়, পা বাঁকিয়া যায় এবং বাচ্চা শূকরের রিকেট হয়।

(ii) **ফসফরাসের অভাবেঃ** ফসফরাসের অভাবে দেহের বৃদ্ধি কমিয়া যায় এবং জনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

(iii) **আয়োডিনের অভাবেঃ** গায়ের লোম পড়িয়া যায় এবং শূকরী মৃত শাবক প্রসব করে।

(iv) **লৌহের অভাবেঃ** বাচ্চা শূকর লৌহের অভাবে রক্তাল্পতায় ভোগে। জন্মের দুই হইতে চার সপ্তাহের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়।

(v) **দস্তার অভাবেঃ** ইহার অভাবে চর্মরোগ হয় ও শূকরের দেহের বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

(vi) **ম্যাঙ্গানিজের অভাবেঃ** ইহার অভাবে দেহের স্থূলতা বৃদ্ধি পায়।

(5) কৃমি জাতীয় রোগঃ

শূকরের অন্ত্রে ফিতাকৃমি ও গোলকৃমি দেখা যায়। নিয়মিত কৃমি-নাশক

ঔষধ ব্যবহার করিলে এবং শূকরের বাসস্থান পরিষ্কার রাখিলে কৃমিরোগে শূকর আক্রান্ত হয় না।

শূকরের দেহের ওজনের কিলোগ্রাম প্রতি 0·2 গ্রাম পাইপারেজিন বা বড় শূকরে 30 গ্রাম ফেনোভিস বা 30 গ্রাম এভলোথেন দেওয়া হয়।

(6) বাহ্যিক পরজীবী :

শূকরের ত্বকে উকুন হয়, এর ফলে লোম ঝড়িয়া পড়ে এবং ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। উকুনের আক্রমণে শূকরের ওজন হ্রাস পায়। গায়ে 0·6% গ্যামাক্সিন, 0·75% ডি. ডি. টি জলে গুলিয়া স্প্রে করা হয়, এর ফলে উকুন নির্মূল হয়। ত্বকে মাইটের আক্রমণ হইলে জলে টেটমোজোল গুলিয়া স্প্রে করা হয়।

শূকর বাচ্চাদের কয়েকটি প্রধান রোগ :

(i) **পিগলেট অ্যানিমিয়া :** জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই এই রোগে অনেক বাচ্চা মারা যায়। দেহে লৌহের পরিমাণ কম থাকায় এই রোগ হয়। শূকর শাবকের রক্তে প্রতি 100 মিলিলিটারে 9 গ্রাম লৌহ থাকে, তাহা কমিয়া তিন-চারি গ্রাম হয়। এই রোগে শাবকের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, জড়তা দেখা যায় এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ :

(i) তিনদিনের বয়সে ও তিন সপ্তাহ বয়সের শাবকদের দুই মিলিলিটার আয়রণ ডেক্সট্রন ইনজেকশন দিতে হয়।

(ii) এক গ্যালন জলে এক পাউণ্ড ফেরাস সালফেট দ্রবীভূত করিয়া শূকরীর স্তনে মাখাইয়া দেওয়া হয়। শাবকেরা মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময় লৌহ পায়।

(iii) চারদিন বয়সে, দুই সপ্তাহ ও তিন সপ্তাহ বয়সের শূকরকে নিম্নলিখিত ঔষধটি খাওয়ানো হয়।

ফেরাস সালফেট	4 গ্রাম	প্রতি 100টি শূকরের জন্য
মাল্টিভিটামিন বড়ি	8টি	
জল	100 মিলিলিটার	

(ii) **উদরাময় :** জন্মের পরেই অনেক বাচ্চারা উদরাময় রোগে ভোগে। শাবকের মল পাতলা, সাদা ও হলুদ বর্ণের হয়। শাবক দুর্বল হইয়া পড়ে।

এই রোগে ষ্টিনাসিন, গ্যাসট্রিনা ও সালফাডিমাইডিন বড়ি প্রয়োগ করা হয়।

(iii) **নিউমোনিয়া :** বাচ্চাদের হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। মেঝের উপর বিচালি বিছাইয়া বাচ্চা শূকরকে রাখিলে ঠাণ্ডা কম লাগে। ষ্ট্রেপটোপেনিসিলিন, টেরামাইসিন ও সালফাডিমাইডিন ইনজেকশন করা হয়।

(iv) **নাভী ফোলা :** জন্মের সময় নাভীর শুশ্রূষা না করিলে নাভী ফুলিয়া যায়। নাভীতে পুঁজ হয় এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পটাশ দ্রবণ দ্বারা ধুইলে ক্ষত সারে বা প্রয়োজনে পেনিসিলিন ও টেরামাইসিন ইনজেকশন দেওয়া হয়।

শূকর শাবকদের রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা :

(i) বাচ্চা জন্মাইবার পর নাভীর কাটা অংশে তুলায় করিয়া হালকা আয়োডিনের দ্রবণ লাগান হয়। কিছুদিন পর নাড়ী শুকাইয়া যায়।

(ii) বাচ্চারা যাহাতে শূকরীর দুধ খায় সেইদিকে পালকের লক্ষ্য রাখা উচিত।

(iii) শূকরী ও নবজাতককে শুকনা বিচালি পাতা ঘরে রাখা হয়।

(iv) শূকরী ও বাচ্চাদের ঘোরার জন্য উন্মুক্ত স্থান (run) প্রয়োজন।

(v) জন্মের তিন ঘণ্টার মধ্যে অরিওমাইসিন নিউট্রিনানাল ঔষধটি খাওয়াইতে হয়।

শূকরের রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা :

(i) প্রথমেই ভাল নাম করা ফার্ম হইতে স্বাস্থ্যবান শূকরী বা বাচ্চা কেনা প্রয়োজন।

(ii) শূকর পালনে শূকর বা বাচ্চার পুষ্টির প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। সুষম খাদ্যে ভিটামিন, লবণ ও প্রয়োজনীয় পদার্থ থাকিলে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়।

(iii) শূকরের বাসস্থান জীবাণুরোধকারী ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

(iv) শূকরের মলমূত্র নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(v) শূকর ও বাচ্চাদের নিয়মিত বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টীকা এবং ঔষধ খাওয়াইতে হইবে।

(vi) কোন শূকর বা বাচ্চার রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেই পৃথক ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করা চাই।

(vii) সর্বোপরি শূকর পালকের প্রতিটি শূকর ও বিশেষতঃ শাবকের শরীরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

শূকর পালনের ব্যবহারিক দিক ঃ

শূকর পালনের ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক মূল্য অনেক বেশী। শূকরের ব্যবসা বেশ লাভজনক। পাঁঠা, মুরগী ইত্যাদির মাংসের অপ্রতুলতার জন্য শূকরের মাংসের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। শূকরের লোম হইতে বুরুশ, আঁকার তুলি ইত্যাদি তৈরী হয়, ইহাদের ক্ষুর নানা কাজে লাগে। শূকরের খামারের মল-মূত্র সার হিসাবে বিক্রয় করা হয়। শূকর মাংস হইতে নানারকম উপাদেয় রান্না করা মাংস (processed pork) বাজারে পাওয়া যায়, যথা—হ্যাম, বেকন্, সসেজ, সালামি ইত্যাদি। বিশেষতঃ শীতপ্রধান অঞ্চলে ও শীতকালে এই মাংস অন্যান্য মাংসের তুলনায় উপাদেয়। ইহাদের মাংসে স্বাদে গন্ধে ও খাদ্যগুণের কোন তারতম্য থাকে না, প্রায় অন্যান্য মাংসের মতই। তাছাড়া পুরুষ, স্ত্রী, বাচ্চা, বড় সকল প্রকার শূকরই খাওয়ার পক্ষে উপযোগ্য। শূকরের দেহে চর্বির পরিমাণ বেশী, অনেক দেশে শূকরের চর্বি ভোজ্য তেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সর্বোপরি ব্যবসার দিকে শূকরের খামার তৈয়ারীর খরচ অনেক কম। অন্যান্য পশুর তুলনায় শূকরের বৃদ্ধির হার বেশী। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেও অনেকে শূকর পালনকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

গো-পালন (Cow Rearing)

সূচনা (Introduction) :

মানুষের জীবনের সাথে গরু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গরু দুধ দেয়। গোবর থেকে সার তৈরী হয়, ঘুঁটে জ্বালান হয়, মৃত গরুর চামড়া থেকে জুতা ও বিভিন্ন জিনিষ তৈয়ারী হয়, অস্থি সার, চিনিশোধনে ও বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়। জীবন্ত গরুর দেহে বসন্ত রোগের ভাইরাস প্রবেশ করাইয়া গরুকে মারিয়া ফেলা হয়, সেই শহীদ গরু হইতেই বসন্ত রোগের টীকা তৈয়ারী হয়। আমাদের বিভিন্ন কীর্তি কাহিনী গাথা-উপকথা, ধর্মগ্রন্থে গরুর মাহাত্ম্য ছড়াইয়া রহিয়াছে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পূজা সকলক্ষেত্রে গরু ঠিক হাম্বা হাম্বা করিয়া পশ্চাতে রহিয়াছে।

গরু মোটামুটিভাবে ভারতীয় বাজটে 10,0000 লক্ষ টাকার সংকুলান করে। আর যদি গরুর গাড়ীর খরচ ধরা হয় তাহা হইলে আরও 40,000 লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়। গড়ে ভারতের গাভী বছরে 173 কিলোগ্রাম দুধ দেয়। ভারতে শতকরা 94টি গরু দিনে এক কিলোগ্রামের কম দুধ দেয়। ভারতে বছরে গরুর দুধের পরিমাণ 20,993 মেট্রিক টন, অথচ ডেনমার্কের গাভী বছরে 3,710 কিলোগ্রাম, আমেরিকার গাভী 3,280 কিলোগ্রাম ও সুইজারল্যাণ্ডের গাভী 3,250 কিলোগ্রাম দুধ দেয়।

গাভীর শ্রেণীবিভাগ (Classification) :

পৃথিবীতে গরুর কুঁজ দেখিয়া দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, চীন সহ মোটামুটি এশিয়ার সকল অঞ্চলে কুঁজওয়ালা গরু দেখিতে পাওয়া যায়। অপর জাতের গরুর কুঁজ একেবারেই নাই। যথা—জার্সি, হলষ্টিন, শর্টহর্ণ. আয়ারসায়ার ইত্যাদি।

(i) **জার্সি :** ইংলিশ চ্যানেলের মধ্যবর্তী জার্সি দ্বীপে এই জাতের গরু সৃষ্টি করা হয়। জার্সি গরুর দেহের বর্ণ বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। মুখটি কালো এবং সমস্ত মুখটি ঘিরিয়া একটি হাল্কা আবর্তনী থাকে। চোখের মণি বড়, পেছনের দিক সরু। মাথা হইতে দেহের পশ্চাৎভাগ একেবারে সরলরেখায় অবস্থান করে। আবার মাঝখানে চোখের নীচে একটি গোল

গর্ত থাকে। এই জাতের গরু হয় ঠাণ্ডা স্বভাবের, পালানটি বেশ বড়। বিদেশে জার্সি গাভী দিনে 20-25 কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দেয়।

(ii) **হলষ্টীন ঃ** হলষ্টীন গরুর আদি বাসভূমি হল্যাণ্ড। দেহের বর্ণ সাদা-কালোয় মিশ্রিত থাকে। সমস্ত দেহের কালোবর্ণের উপর বিস্তৃত কালো দাগ থাকে। লেজের চুল সর্বদাই সাদা হইবে। পেট বিরাট, পালান বড, মাথাটি লম্বা ও সরু, জার্সি গাভী অপেক্ষা বেশী দুধ দেয়। ভারতবর্ষে বর্তমানে জার্সি ও হলষ্টীন ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করাইয়া দেশী গরুদের উন্নত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

(iii) **আয়ারসায়ার ঃ** স্কটল্যাণ্ডে এই আয়ারসায়ার গরু তৈরি করা হয়। আয়ারসায়ার গরুর দেহে লালের উপর সাদা ছোপ অথবা সাদার উপর লালের ছোপ থাকিতে পারে। পালান ভালো, গরুগুলি খুব কর্মক্ষম।

আয়ারসায়ার এবং ভারতীয় সংকর জাতের গরু ঃ

(i) **ব্রাউন-সুইস ঃ** সুইজারল্যাণ্ডের পার্বত্য এলাকায় এই জাতের গরু তৈরী হইয়াছে। দেহের বর্ণ কালো বা কালোর কাছাকাছি। মুখ ও পিঠের বর্ণ হাল্কা। নাক, লেজের গোড়া এবং শিংএর উপরের বর্ণ কালো। সাধারণতঃ দিনে 20-25 কিলোগ্রাম দুধ দেয়।

(ii) **গারণসে ঃ** ফ্রান্সের অন্তর্গত গারণসে নামক দ্বীপে এই জাতের গরুর আদি বাসভূমি। বর্ণ প্রায় লাল। মুখে, পায়ে, লেজের গোড়ায় এবং পেটের দুই পাশে সাদা দাগ থাকে। ইহাদের মুখ ও চোখের নীচে ডিস্কের মত গর্ত থাকে। এই জাতের গাভী দিনে 35 কিলোগ্রাম দুধ দেয়।

(iii) **জারমান ফ্লেকভিস ঃ** জারমানীর দক্ষিন ও দক্ষিণ-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলে এই গরুর জাত তৈয়ারি করা হয়। খারাপ আবহাওয়া-পূর্ণ পার্বত্য এলাকায় ইহারা ভালই বসবাস করে।

ভারতীয় গরুকে উৎপাদনশক্তি অনুযায়ী তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(1) **যে সকল গরু ভারবহন বা লাঙ্গল চাষ করে,** (2) **যে সকল গরু শুধু দুধ দেয়,** (3) **যে সকল গরু ভারবহন করে, লাঙ্গল চাষ করে, আবার দুধ দেয়।**

ভারতের কয়েকটি ভারবাহী লাঙ্গল চাষের উপযুক্ত গরু ঃ

(i) **বাচৌর ঃ** বিহারের সীতামারি অঞ্চল এই গরুর উৎপত্তিস্থল। দেহটি মজবুত, পা সুন্দর গড়নের এবং মাঝারি ধরনের ভারী মাথা। কপালের

দিক চওড়া, মোটা শিং ক্রমশঃ বাইরে ও সামনের দিকে উপরে উঠিয়া যায়। কান বড় ও ঝোলা, লেজটি শক্ত ও মোটা এবং গোড়ার কালো চুল থাকে। এই জাতের বলদ ভাল চাষ করিতে পারে বা মাল টানিতে সক্ষম।

(ii) **অমৃতমহল ঃ** কর্ণাটক ইহাদের আদি বাসস্থান, ইহারা ভীষণ কর্মক্ষম ও ভারবাহী গরু। বলদ প্রচুর ভার অনেকদূর পর্যন্ত বহন করিতে পারে কিন্তু গাভীর দুধের পরিমাণ কম।

মাথাটি লম্বা এবং একটি খাঁজ আছে। সামনের ও পিছনের পায়ের মধ্যবর্তী দেহের অংশ লম্বা ও গোল। নাভিদেশ ভিতরদিকে ঢোকানো। পালান ছোট, পালানের বাঁট ছোট। দেহ মাঝারি ধরনের লম্বা ও পা মজবুত।

(iii) **বারগুড় ঃ** কোয়াম্বাটুরের বারগুড় পাহাড়ে এই জাতের গরু প্রথম দেখা যায়। দেহের গঠন ছোট ও আঁটসাঁট ধরনের। ইহারা কষ্ট সহ্য করিতে পারে এবং দ্রুত মাল বহন করিতে পারে। মাথা লম্বা, দুই শিং-এর গোড়ায় মধ্যবর্তী স্থানে খাঁজ আছে, দুইটি শিং কাছাকাছি জায়গা হইতে উটিয়াছে। পা ছোট, লেজ ছোট ও পায়ে শক্ত ক্ষুর থাকে। পায়ের বর্ণ লাল, সাদা বা ছাইবর্ণের।

(iv) **খিলাড়ী ঃ** মহারাষ্ট্রের সোলাপুর, সাতারা জেলা এবং সাতপুরা পার্বত্য অঞ্চলে ইহাদের প্রধান বাসস্থান। বিরাট মাথা কপালের মাঝে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত খাজ থাকে। শিংজোড়া কাছাকাছি জায়গা হইতে উঠিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে পিঠের দিকে বাঁকিয়া যায়। বলদ দ্রুত মাল টানে, গাভী খুব কম পরিমাণে দুধ দেয়।

(v) **ডাঙ্গী ঃ** এই গরু খুব শক্ত ও সমর্থ। প্রচুর বৃষ্টিপাতে ইহাদের কোন অসুবিধা হয় না। বলদগুলি চাষের কাজে লাগে। গায়ের বর্ণ লাল, বাদামী অথবা সাদা-কালোর মিশ্রণ।

(vi) **মালভী ঃ** মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, গোয়ালিয়র ও ভূপালে এই জাতীয় গরু পাওয়া যায়। মাঝারি ধরনের গড়ন। মাথা ছোট, শিং দুইটি উপরের দিকে বাঁকানো। লেজ লম্বা প্রায় মাটি স্পর্শ করে। গলায়, কাঁধে কুঁজে এবং পেছনের বর্ণ কালো। চাষের জমিতে বলদ খাটে।

(vii) **হাল্লিকর ঃ** মাথা লম্বা, কপাল উটের মত, কপালের মাঝে খাঁজ থাকে। দেহের গড়ন লম্বা ও মজবুত। গায়ের বর্ণ ছাই রং থেকে

গাঢ় ছাই রং-এর হয়। মুখে ও গলকম্বলে সাদাবর্ণের দাগ থাকে।

(viii) **কেনকাথা ঃ** উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডে এবং কেন নদীর ধারে এই জাতের গরু পাওয়া যায়। ইহারা খুব বেশী পরিশ্রমী নহে। মাথা ছোট, চওড়া কপাল, ও গায়ের বর্ণ ধূসর।

(ix) **খেড়ীগড় ঃ** উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরী জেলা এই গরুর আদি বাসস্থান। অতিরিক্ত পরিশ্রমী নয়। গাভীও কম পরিমাণে দুধ দেয়। গায়ের বর্ণ সাধারণতঃ সাদা এবং সরু খাড়াই শিং থাকে।

(x) **কাংগায়াম ঃ** তামিলনাড়ুর কোয়াম্বাটুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বে এই গরুর আদি উৎপত্তিস্থল। ছোট মাথা, চওড়া কপাল, দুইটি শিং-এর অগ্রভাগ একেবারেই কাছাকাছি অবস্থান করে। সাদা বা ছাই বর্ণের গরু, চার পায়ের গোড়ায় কালো দাগ থাকে। চারমাস বয়সকাল অবধি বাছুরের বর্ণ লাল হয়। ইহারা মাঝারি ধরনের ভারবাহী গরু। গাভীর দুধের পরিমাণ অনেক কম।

(xi) **নাগোড় ঃ** ইহারা রাজস্থানের নাগোড় ও যোধপুর অঞ্চলের গরু। বলদগুলি বড় ও অতিমাত্রায় পরিশ্রমী, রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলে ভারী কাজ করিতে অভ্যস্ত। প্রচুর মালবহন করিবার ক্ষমতা রাখে। গাভী আকারে ছোট এবং দুধ কম দেয়।

(xii) **পোনয়ার ঃ** উত্তরপ্রদেশের পিলিকিট ও খেড়ী লখিমজেলার গরু। লম্বা সরু মুখ, লম্বা ছুঁচালো শিং জোড়া পিছনের দিকে বাঁকানো। ভারবাহী পশু হিসাবে এই অঞ্চলে পরিচিত।

(xiii) **সিরি ঃ** দার্জিলিং, সিকিম ও ভুটানে এই জাতের গরু পাওয়া যায়। ছোট ও স্থূল গরু, এই জাতের গরু পাহাড়ী পথে মাল বইতে পটু, পাগুলি খুঁটির মতো শক্ত ও মোটা। গায়ের বর্ণ সাদা-কালো অথবা লাল-সাদায় মেশানো।

(xiv) **নিমাড়ী ঃ** নর্মদা উপত্যকায় এই জাতের গরু পাওয়া যায়। ইহারা খুব কর্মক্ষম। লম্বা মাথা, কপাল উটের মত, মাঝারি ধরনের শিং। শক্ত ও মাঝারি আকারের পা। গায়ের বর্ণ লাল, সাদা বর্ণের ছাপ দেখা যায়।

ভারতের কয়েকটি দুধেল গরু ঃ

(i) **দেওনি ঃ** পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অন্ধ্রপ্রদেশে এই জাতের দুধেল গরু পাওয়া যায়। মাঝারি আকারের গরু, ঝোলা কান ও শক্ত মোটা শিং

জোড়া। পালানে বড় বড় বাঁট থাকে, দুই-তিন কিলোগ্রাম দুধ দেয়।

(ii) **গির :** দক্ষিণ কাথিওয়াড় এবং জুনাগড়ের গির অরণ্য এই দুধেল গরুর উৎপত্তিস্থল। পশ্চিম রাজস্থান, বরোদা ও মহারাষ্ট্রের উত্তর অঞ্চলে এই গরু বেশী দেখা যায়। বিরাট মাথা, কপাল উটের মত। লম্বা সরু মুখ, কান দুইটি শুকনা পাতার মতো এবং অগ্রভাগে খাঁজকাটা। শিং দুইটি ক্রমান্বয়ে পিছনের দিকে উপরের দিকে আবার সামনের দিকে গিয়ে হঠাৎ পিছনে বাঁক লইয়া শেষ হইয়াছে। সামনের ও পিছনের পায়ের মধ্যবর্তী দেহের অংশ লম্বা। চোখ দুইটি প্রায় বোজা। বর্ণ সাধারণতঃ লাল-কালো, লাল-সাদা অথবা লাল ও সাদা ছাপযুক্ত। খুব যত্ন করিলে দিনে তিন কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দেয়।

(iii) **সিন্ধী :** এই জাতের উন্নত গরু বর্তমানে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা, উড়িষ্যা ও পাঞ্জাবে পালন করা হইতেছে। দিনে চার কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দেয়, ভালভাবে রাখিলে ছয় কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দিতে পারে। মাঝারি গড়ন, চওড়া কপাল, মোটা শিং বাইরের দিকে বিস্তৃত ও অগ্রাংশ ভোঁতা। গায়ের বর্ণ লাল, বড় পালান, লেজ বড় মাটি স্পর্শ করে।

(iv) **সাইবাল :** পশ্চিম পাকিস্তানের মন্টোগোমারি জেলার ও রাবী নদীর শুষ্ক নীরস মরুভূমি অঞ্চলের গরু। পাঞ্জাবে, দিল্লীতে, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে এই গরু পালন করা হইতেছে। লম্বা মাথা, মাঝারি কপাল, ছোট, মোটা শিং বাইরের দিকে বিস্তৃত। ছোট খুঁটির মত পা। পিঠ কুঁজ থেকে আরম্ভ করিয়া পিছনের দিকে আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। গায়ের বর্ণ লাল বা ফিকে লাল, অনেক সময় লালের উপর সাদা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। খামারে ভালভাবে এই গরু চাষ করিলে দিনে দশ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দিতে পারে।

কয়েকটি ভারবাহী এবং দুধেল গরু :

(i) **গাওলাও :** ওয়ার্ধা এবং মধ্যপ্রদেশের চিন্দাবাড়া জেলায় এই জাতের গরু পাওয়া যায়। লম্বা মুখ, ছোট কান ও লেজ ছোট হয়।

(ii) **হরিয়ানা :** এই জাতের বলদই সাধারণতঃ মাল টানে, গাভী অল্প পরিমাণে দুধ দেয়। রোটাক, কারনাল, হিসার ও পুরগাঁও জেলা এই গরুর আদি বাসস্থান। মুখ ছোট, সরু ও লম্বা। শিং জোড়াটি বৃত্তাকারে উঠিয়া যায় এ শিং-এর অগ্রভাগ কাছাকাছি অবস্থান করে, পাগুলি লম্বা,

গাভী দুই কিলোগ্রামের কম বেশী দুধ দেয়।

(iii) **কাংকরেজ ঃ** বলিষ্ঠ শক্তিশালী গরু, কচ্ছের রাণের দক্ষিণ প্রান্ত এই গরুর আদি উৎপত্তিস্থল। সরু মুখ, চওড়া কপাল, মাঝে খাঁজ। দুই চোখের উপরের পাতার উপর সাদা দাগ। ছোট মোটা পা, গায়ের বর্ণ ছাই থেকে কালো ধূসর বর্ণের।

(iv) **মেবাতী ঃ** ভরতপুর, আলোয়াড় এই গরুর আদি বাসস্থান। বলদ চাষ করে ও গাড়ী টানে, গাভী প্রায় দুই কিলোগ্রাম দুধ দেয়। ছোট পা, লম্বা লেজ। দেহের বর্ণ প্রাধানতঃ সাদা, মাথায়, ঘাড়ে, গলায় ও পশ্চাদ্দেশে কালো দাগ আছে।

(v) **কৃষ্ণা উপত্যকার গরু ঃ** ধারওয়ার, সাতারা, বেলগাঁও, সাংলি, সিরাজ, শোলাপুর, ইত্যাদি অঞ্চলে এই গরু দেখা যায়। ছোট মাথা, চওড়া কপাল, খুঁটির মত ছোট পা, লম্বা লেজ প্রায় মাটি স্পর্শ করে। চাষের জমিতে বলদ কাজ করে, গাভী দিনে প্রায় দুই কিলোগ্রাম দুধ দেয়।

(v) **ওংগোল ঃ** অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোড় এবং গুন্টুর জেলা এই গরুর উৎপত্তিস্থল। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর নিকটস্থ শুষ্ক জমিতে ইহাদের দেখা যায়। মাঝারি মাথা, খুব মোটা শিং প্রথমে বাইরের দিকে ও পরে ভিতরের দিকে বাঁক নেয়। ইহারা মাল বহনে বিশেষ উপযোগী, গাভী প্রায় দুই কিলোগ্রাম দুধ দেয়। গরুর বর্ণ সাধারণতঃ সাদা, কুঁজ, গলার ও পশ্চাদ্দেশের বর্ণ কালো।

(vii) **রাথ ঃ** সমতল কপাল, ছোট মোটা শিং। দেহের বর্ণ সাদা ধূসর, পা চারিটি মোটা ছোট।

(viii) **থারপারকার ঃ** বেশ বড় বলিষ্ঠ গরু, মাল বহন করিতে বিশেষ পটু। গাভী দিনে তিন কিলোগ্রাম দুধ দেয়। অনেক গৃহস্থ দুধের জন্য এই গাভী পালন করেন।

গরুর খাদ্য (Foods)

গরুর পাকস্থলী বিরাট, এইজন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় বেশী। গরু ঘাস পাতা বিচালি খেয়ে তাহা হইতে পুষ্টিকর উপাদান পেটের মধ্যে তৈয়ারি করিতে পারে। একটি গরু দিনে চার-পাঁচ কিলোগ্রাম বিচালি খায়। ইহাদের খাদ্যের প্রধান খরচ খাদ্যের কনসেনট্রেটের জন্য। যব ও ভূট্টার দাম

বেশী এবং খাওয়াইলে খরচ পোষায় না। গমের ভূষি, ডালচূর্ণ ইহাদের পুষ্টি যোগায়। সবুজ ঘাস খড়ের চেয়ে পুষ্টিকর। দশ কিলোগ্রাম সবুজ ঘাস এক কিলোগ্রাম কনসেনট্রেটের সমান। একটি গরু দিনে 35 কিলোগ্রাম ঘাস হজম করে।

গরুর খাদ্যে শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, লবণ ও জল থাকা প্রয়োজন। শস্যের দানার বদলে ধান, চাল, ময়দা, ডালের খোসা দিয়া গরুর সুষম খাদ্য তৈরি করা হয়। বাছুরের হজমের শক্তি কম, বাছুরকে গম, যব, ভুট্টা ভাঙা দিলে ভালো হয়। ছোলার ডাল পুষ্টিকর খাদ্য। ডালের শতকরা 56 ভাগ শর্করা ও বারো ভাগ প্রোটিন। গাভী যখন দুধ দেয় তার দরকার বেশী পুষ্টিকর ও প্রোটিন সমৃদ্ধ সহজপাচ্য খাবার। দুধ দেওয়া গাভীর দিনে অন্ততঃ 500 গ্রাম ছোলা ভাঙা খাদ্যের সহিত মিশান হয়। গুড় সবচেয়ে সহজপাচ্য খাদ্য। সাধারণতঃ 250 হইতে 500 গ্রাম গুড় খাদ্যের সঙ্গে মেশাইয়া জলে গুলিয়া দুধ দেওয়া গরুকে খাওয়ানো ভাল।

খইল প্রোটিন খাদ্যের প্রধান উপাদান। ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য ইহা উৎকৃষ্ট খাদ্য। বাদাম খইলে 41%, তিসির খইলে 23% ও সরিষার খইলে 27% প্রোটিন থাকে। অন্য খইলের তুলনায় সরিষার খইলের দাম কম হওয়ায় বেশী ব্যবহার করা হয়। তিসির খইল খাদ্যে ব্যবহার না করাই ভাল। বাদাম খইলে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী ও সহজপাচ্য। বাদাম খইলের দাম বেশী এবং সব জায়গায় সব সময় পাওয়া যায় না। দুইভাগ বাদাম খইলের সহিত একভাগ সরিষার খইল দেওয়া যাইতে পারে। বর্তমানে অনেকে ইউরিয়া প্রোটিন খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেন, তবে না করাই শ্রেয়।

গরুকে বিচালী খাইতে দেওয়া হয়। বিচালিতে প্রোটিন নাই, বিচালির পুষ্টিকর হজমযোগ্য অংশ 37 ভাগ। গরুর দেহের ওজনের প্রতি 100 কিলোগ্রামে $1\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম বিচালি দেওয়া হয়। বিচালি জলে ভিজাইয়া জলে ফেলিয়া বিচালি খাওয়ান হয়।

গরুকে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে সবুজ ঘাসপাতা দেওয়া ভাল। সবুজ ঘাসে ভিটামিন A ও ক্যারোটিন থাকে। গাভীর দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন 100 মিলিগ্রাম ক্যারোটিন দরকার। এক কিলোগ্রাম ঘাসে এই 100 মিলিগ্রাম ক্যারোটিন পাওয়া যায়। শহর, শহরতলীতে গরুর জন্য ঘাস

সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার। গ্রামাঞ্চলে গরু চরেই অনেক ঘাস খায় ও দেহের পুষ্টি সাধন করে। গ্রামাঞ্চলে নিজস্ব মাঠে প্যারাঘাসের সঙ্গে নেপিয়ার ও বারসিম বপন করা হয়। গরুর এককিলোগ্রাম কনসেনট্রেট খাদ্যের সঙ্গে দশ কিলোগ্রাম সবুজ ঘাসের তুলনা করা হয়। গরু ডাঁটা জাতীয় খাদ্য বেশ তৃপ্তি সহকারে খায়। কচুরিপানাতে প্রোটিন ও শর্করা থাকে। যদি সম্ভব হয় দিনে এককিলোগ্রাম কচুরিপানা দেওয়া যাইতে পারে। কচুরিপানাতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পুষ্টিযোগ্য উপাদান থাকে।

গরুর খাদ্যে প্রতিদিন প্রতি কিলোগ্রাম খাদ্যের সহিত 10 গ্রাম সাধারণ লবণ থাকা দরকার। ক্যালসিয়াম অস্থি গঠনের জন্য প্রয়োজন। গাভীর দিনে ছয় গ্রাম ক্যালসিয়াম দরকার। খনিজ লবণ পরিপূরক খাদ্যে যোগ করা হয়।

পুষ্টিকর খাদ্যগুলি একসঙ্গে এমনভাবে মিশান হয় যাহাতে সকল প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে। এইরকম সুষম খাদ্যকে ঘনীভূত খাদ্য বা **কনসেনট্রেট খাদ্য** বলে। খাদ্যে বিভিন্ন পরিমাণে প্রোটিন আছে, কিন্তু সমস্তই কাজে লাগে না, তাহার ছক নমুনা নীচে দেওয়া হইল।

কনসেনট্রেট খাদ্যের তুলনা

		হজমযোগ্য প্রোটিন	হজমযোগ্য পুষ্টি
ছোলা চূর্ণ	20%	2·4	14·8
অড়হর চূর্ণ	30%	2·4	18·5
গমের ভূষি	25%	2·3	16·2
বাদাম খইল	20%	9·0	14·4
সরিষার খইল	5%	1·5	3·5
	100	17·6	67·4

উপরের খাদ্য তৈয়ারি করিতে হইলে উপাদানগুলি নিম্নলিখিতভাবে মিশাইতে হইবে।

		প্রতি কিলোগ্রামে
ছোলার চূর্ণ	20%	200 গ্রাম
অড়হর চূর্ণ	30%	300 „

গমের ভূষি	25%	250 গ্রাম
বাদাম খইল	20%	200 "
সরিষার খইল	5%	50 "
		1000 গ্রাম

এই খাদ্যের প্রতি কিলোগ্রামে 200 গ্রাম খনিজ লবণ ও 10 গ্রাম খাদ্য লবণ যোগ করিতে হইবে। খাদ্যের সঙ্গে গমভাঙা ভাঙা চাল, চালের তুষ ইত্যাদি দ্বারা খাদ্য তৈয়ারি করা যায়। যথা—

চালের ক্ষুদ	15 কিলোগ্রাম
গমের ভূষি	15 "
ডাল চূর্ণ	24 "
সরিষার খইল	30 "
তিসি খইল	14 "
লবণ	1·500 "
খনিজপদার্থ ও ভিটামিন	·500 "
	100·00 কিলোগ্রাম

গর্ভবতী গাভীর খাবার ঃ

গর্ভবতী গাভীর পুষ্টির প্রয়োজন বেশী, ভ্রূণের যাবতীয় পুষ্টি মায়ের দেহ হইতে হয়। গর্ভাবস্থার শেষের দিকে গাভীর বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হয়, এই অবস্থায় দুই হইতে তিন কিলোগ্রাম খাওয়া লাগে।

(i) গাভীর যদি গর্ভবস্থায় দুধ থাকে ঃ

প্রথম সাত মাস—	দুধালো গাভীর	সাধারণ খাবার
শেষ দুই মাস—	দেহরক্ষার জন্য	2 কিলোগ্রাম
	গর্ভের বাচ্চার জন্য	1 কিলোগ্রাম
	দিনে—	3 কিলোগ্রাম

(ii) গর্ভবতী গাভীর যদি দুধ না থাকে ঃ

প্রথম পাঁচমাস—	শুধু দেহরক্ষার জন্য	2 কিলোগ্রাম
ষষ্ঠ মাস হইতে—	দেহরক্ষার জন্য	2 কিলোগ্রাম
	গর্ভের বাচ্চার জন্য	1 কিলোগ্রাম
	দিনে	3 কিলোগ্রাম

কাজে নিযুক্ত বলদের খাদ্য ঃ

খাদ্যের উপর বলদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, বলদের স্বাস্থ্যের উপর তার কর্মক্ষমতা নির্ভর করে। বলদের সাধারণভাবে দেহরক্ষার জন্য দুই কিলোগ্রাম পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয়। তবে লাঙ্গল দেওয়ার দিন বা গাড়ী টানিলে আরও দুই কিলোগ্রাম অতিরিক্ত খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন।

গাভীর পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া চাই। একটি পূর্ণবয়স্ক গাভীর দিনে 35 লিটার জল লাগে। গাভী যখন দুধ দেয় তখন অতিরিক্ত জল দেওয়া হয়। প্রতি 1 লিটার দুধের জন্য অতিরিক্ত দুই লিটার জলের প্রয়োজন। একটি গাভী দিনে 10 লিটার দুধ দিলে তাহার মোট 55 লিটার জলের প্রয়োজন। তাহাছাড়া গাভীকে স্নান করানো ও গোয়ালঘর পরিষ্কারের জন্য জলের প্রয়োজন হয়। এইজন্য প্রতি গাভীর জন্য দিনে প্রায় 100 লিটার জলের প্রয়োজন হয়।

দেশী গরু সাধারণতঃ এককিলোগ্রামের কম দুধ দেয়, ফলে সুষম খাদ্য দেওয়ার খরচা বেশী হয়। ফলে কচি ঘাসই তাহাদের পর্যাপ্ত পুষ্টি যোগায়, অবশ্য দেশী গাভীর গর্ভবতী অবস্থায় অবশ্যই পালককে অন্ততঃ এক কিলোগ্রাম সুষম খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা গাভীটির বা বাচ্চার ক্ষতি হইবে এবং পুষ্টির অভাব ঘটিবে। যদি খামারে কয়েক বিঘা জমি থাকে তবে জোয়ার, ভুট্টা, বার্লি, বারসীম, নেপিয়ার প্যারা ইত্যাদি লাগান যায়। এক্ষেত্রে গরুকে সুষম খাদ্যের পরিমাণ কম দেওয়া হয়।

গরুর থাকিবার আস্তানা (Cow-sheds)

চুরির হাত হইতে গরুকে বাঁচাইবার জন্য, ঝড়-বৃষ্টি, সূর্যের তাপ বা ঠাণ্ডা হইতে রক্ষার জন্য, নিরিবিলিতে জাবর কাটিবার জন্য, গরুকে নীরোগ রাখিবার জন্য এবং গরুর উপযুক্ত পরিচর্যার জন্য গোয়ালঘর দরকার।

বিভিন্ন ধরনের ঘর ও ব্যবস্থাদি ঃ

(i) উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ থাকিলে দেশের যে সকল জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া কিন্তু বড় বড় গাছ আছে, তাহার নীচে যেকোন ধরনের চালাঘর করিলেই চলে। মাথায় যে কোন ধরনের খড় বা বিচালি দ্বারা আচ্ছাদন তৈয়ারি করা যায়। খুব ঝড়-বৃষ্টি বা প্রতিকূল পরিবেশ না হইলে এই ধরনের চালাঘরে গাছের নীচে স্বচ্ছন্দে একাধিক গরু থাকিতে পারে। আবহাওয়া

শুষ্ক থাকায় জল, মূত্র মাটি শোষণ করিয়া লইবে, শুধুমাত্র গোবর পরিষ্কার করিলেই চলিবে।

(ii) সবচেয়ে কম খরচেও গোয়ালঘর তৈয়ারি করা যায়। এক্ষেত্রে গোয়ালঘরের মেঝে মাটি দ্বারা তৈয়ারি করা হয়, তবে এঁটেল মাটি উপযুক্ত না। এঁটেল মাটি বেশী পিচ্ছিল, গরুর পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু একান্তই অন্য মাটি পাওয়া না যাইলে এঁটেল মাটির সহিত কাঁকড় মিশাইয়া জমি অমসৃণ করা হয়। এক্ষেত্রে ঘরের চারিপাশে প্রাচীর করা হয় না, বিভিন্ন দিকে বাঁশের বা পুরানো শালকাঠের খুঁটি দিয়া মাচান দেওয়া হয়। মাচানে খড় বা বিচালি দেওয়া হয়। পয়সার সাশ্রয় থাকিলে টালি বা টিন চাপান দেওয়া হয়। তবে সবক্ষেত্রেই এই ছাদ যেন বেশী ঢাল হয়, অর্থাৎ মাটির দিকে নামিয়া আসে। তবে ঝড়-বৃষ্টিতে বা রৌদ্রে গরুর কষ্ট হইবে না। এই ঘরে গরুর খাবারের জন্য সিমেণ্টের পাকা খাবারের জায়গা নির্মাণ করাই ভাল, এই পাত্রের উভয় দিকে গরু বাঁধা থাকে। খাবারের পাত্র গোয়ালঘরে লম্বালম্বি অবস্থান করে। অন্যথায় পোড়ামাটির বড় পাত্রেও গরুর খাবারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(iii) **বাঁধানো পাকা গোয়ালঘর :** বাইরের জমি হইতে গোয়াল-ঘরের মেঝে কয়েক ইঞ্চি উঁচুতে থাকা ভাল। মেঝের ঢাল নর্দমার দিকে হইবে। যদি গোয়ালঘর বড় হয়, তবে গোয়ালঘরের মধ্যখানে লম্বা খাবার পাত্র থাকে, তাহার উভয় দিকে গরু বাঁধা হয়, সেক্ষেত্রে মেঝের দুই দিকে ঢাল রাখিয়া দুইদিকে নর্দমায় সংযোগ করা প্রয়োজন। মেঝে সিমেণ্টের করা হয়, সিমেণ্টের উপর দড়ি ফেলিয়া দাগ করা থাকে, যাহাতে গরু পড়িয়া গিয়া জখম না হয়। গোয়ালঘরে সকল সময়ই গোমূত্র ও গোবর পরিষ্কার করা প্রয়োজন, তাহাতে মেঝে পিচ্ছিল হইবে না এবং গরুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল।

ইটের তৈরী পাকা দেওয়াল তৈয়ারি করা হয়, দেওয়াল উপরের ছাদের ভারও বহন করে। দেওয়ালের ভিত মজবুত হওয়া দরকার এবং মেঝে হইতেই চার ফুট উচ্চতা হইলেই চলিবে। দেওয়ালের ভিতরের ও বাহিরের দিকে মেঝের মত সিমেণ্টের পালিশ করা থাকে। চারফুট দেওয়ালের উপরে চারফুট তারের জাল লাগাইলে চলে। ইহাতে গোয়ালঘরে উপযুক্ত আলো-বাতাস পায়। ঝড়-বৃষ্টি বা শীতের সময় এই জায়গায় চটের পর্দা দিলেই

চলিবে।

এসবেসটস, টালি বা টিনের ছাদ করাই ভাল। চালার কিনারাগুলি যেন দেওয়ালের দুই ফুট বাহিরে থাকে। টিনের চালায় গোয়ালঘর গরম হয়, ফলে এসবেসটস দিলে ছাদ স্থায়ী হয় এবং ঠাণ্ডাও হয়।

গোয়ালঘরে গোবর ও জল নিষ্কাষনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। নর্দমা দুই ফুট চওড়া হইলে ভাল হয়। নর্দমা প্রতি দশ ইঞ্চিতে এক ইঞ্চি ঢালু করা হয়। নর্দমা দ্বারানির্দিষ্ট জায়গায় মল-মূত্র জমা হয় এবং সারে পরিণত হয়।

অনেক গোয়ালঘরে প্রত্যেকটি গরুর জন্য পৃথক ষ্টল থাকে। গরুর মুখ যেদিকে থাকে, সেই দিকে খাবারের ও জলের পাত্র থাকে। স্টলগুলি পাশাপাশি হইবে এবং মাঝখানে কয়েক ফুট উঁচু ইটের দেওয়াল থাকে। প্রত্যেকটি স্টল দাঁড়ানোর জন্য লম্বায় $5\frac{1}{2}$ ফুট ও চওড়ায় 6 ফুট হইলে গরু ভালভাবে দাঁড়াইতে ও নড়াচড়া করিতে পারে।

প্রত্যেকটি গরুর জন্য লম্বা ও চওড়ায় 6 ফুট করিয়া স্থানের প্রয়োজন। গরুর সংখ্যা অনুযায়ী গোয়ালঘর লম্বা করিতে হইবে। গোয়ালঘরে দুই সারিতে গরু থাকিলে গোয়ালঘর চওড়া করিতে হইবে। কিন্তু ঘরে দুধ দুইবার, খাবার দেওয়ার ও চলাফেরার জায়গা থাকা চাই, সুতরাং সেই অনুযায়ী ঘরের চওড়া অনেক বেশী করা হয়। সব কিছু ধরিয়া গরু প্রতি আশি বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।

পাশাপাশি রাখা গরুর জন্য একটানা লম্বা খাবারের জায়গা করা সুবিধা-জনক। প্রত্যেক গরুর জন্য লম্বা পাত্র দেওয়াল দ্বারা ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। খাবারের পাত্রের ভিতরের মাপ হয় আড়াই ফুট, দুইদিকের পাড়ের মাপ সমেত প্রায় তিনফুট জায়গা লাগে। খাবারের পাত্রের মুখ একদিকে ছয় ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট করিলে গরু সেইদিকে বসিয়া খাইতে পারে। অন্যদিকে প্রায় দেড়ফুট উঁচু করা যায়। পাত্রের ভিতর কিছুটা গোলাকার করিলে পরিষ্কার করিতে সুবিধা হয়।

একসারিতে গাভী রাখিবার ব্যবস্থা :

খাবারের পাত্র	3 ফুট
গরুর জায়গা	5 ফুট 6 ইঞ্চি
খাবার দেওয়ার পথ	3 ফুট 6 ইঞ্চি
চলার পথ	8 ফুট
	20 ফুট গোয়ালঘর মোট চওড়া

দুইসারিতে গরু রাখার ব্যবস্থা :

প্রথম সারি :

খাবারের পাত্র	3 ফুট
খাবার দেওয়ার পথ	$3\frac{1}{2}$ ফুট
গরুর জায়গা	$5\frac{1}{2}$ ফুট
মধ্যের চলার পথ	8 ফুট

(দুই পার্শ্বের নর্দমা সমেত)

দ্বিতীয় সারি :

খাবারের পাত্র	3 ফুট
খাবার দেওয়ার পথ	$3\frac{1}{2}$ ফুট
গরুর জায়গা	$5\frac{1}{2}$ ফুট
গোয়ালঘরের মোট চওড়া—	32 ফুট

গোয়ালঘরে চলিবার পথ অন্ততঃ 8 ফুট চওড়া হওয়া ভাল। এই পথের দুই পার্শ্বে একফুট চওড়া অগভীর নালা থাকে। গাভীগুলিকে যদি পথের দিকে পিছন করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে দুধ দুইবার সুবিধা হয়। তাহাছাড়া গাভীগুলির মূত্র পথের পার্শ্বে নালায় চলিয়া আসিবে, মেঝে নোংরা হইবে না।

খাবারের পাত্র সব সময় একদিকে রাখা হয় তাহা হইলে বালতি করিয়া খাবার দিতে সুবিধা হয়। সেইজন্য পাত্রের একদিকে $3\frac{1}{2}$ ফুট চওড়া পথ রাখা হয়।

রাতেও গোয়ালঘরের দরজা জানালা খোলা থাকা প্রয়োজন এবং সব জায়গায় ভালো আলো পড়ে সেইভাবে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা রাখা হয়।

বাছুরের যত্ন ও পরিচর্যা (Proper care of Calfs) ঃ

উন্নতজাতের বাছুর পালন লাভজনক। সংকর গাভীর বক্না আড়াই বছর বয়সেই বাচ্চা দেয় এবং দিনে 8 হইতে 10 লিটার দুধ দেয়। এই বক্নাকে উপযোগী করিয়া তুলিতে দুই হাজার টাকা খরচা হয়। একটি এই রকম গাভী কিনিতে আড়াই হাজার টাকারও বেশী লাগে। এত টাকা একসঙ্গে জোগাড় করা অসুবিধা। বকনা পোষার সুবিধা এই যে অন্যান্য গরুর খাদ্যের খরচার সঙ্গে ইহার খরচা চলিয়া যায়, পৃথকভাবে খরচা হয় না। নিজের পোষা বক্না কেনা গাভীর চেয়ে অনেক উন্নত হয়।

বাছুর জন্মাবার পরই পৃথকভাবে রাখিয়া পালন করা যায়। দুধ দোহনের সময় গাভীর কাছে আনা হয় না। গাভীর দুগ্ধ দোহনের পর সেই দুধ বাছুরকে খাওয়ানো হয়। এই ব্যবস্থার সুবিধা এই যে বাছুর মারা গেলেও গাভীর দুধ দেওয়া বন্ধ থাকে না। বাছুর সরাসরি বাঁট হইতে মায়ের দুধ খাইলে অসুবিধা এই যে বাছুর মারা যাইলে গাভী দুধ দেওয়া বন্ধ করে।

বাছুরের খাদ্য (Foods) ঃ

বাছুর জন্মাইবার প্রথম 15 দিন দুধ ছাড়া অন্য কিছুই খাইতে দেওয়া হয় না। জন্মের দু'ঘণ্টার মধ্যে বাচ্চাকে মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়। প্রসবের পর গাভীর দুধের বর্ণ হয় লাল, গরম করিলে ছানা কাটিয়া যায়। এই দুধকে গাঁজলা দুধ বা কলোসট্রাম বলে। ইহা বাছুরের পুষ্টিকর খাদ্য, প্রোটিন ও চর্বির পরিমাণ বেশী থাকে। ইহা বাছুরের পেট হইতে যাবতীয় ময়লা বাহির করিয়া দেয়, প্রথম চারদিন বাছুরকে দিনে এক লিটার দুধ খাওয়ানো হয়।

নবজাত বাছুর বাঁট থেকে দুধ খাইতে পারে না। প্রথমে পাত্র হইতে দুধ খাওয়ানো শেখানো হয়। খুব অল্প গরম দুধ একটি অগভীর পাত্রে লওয়া হয়। এই পাত্রটি বাছুরের মুখের সামনে ধরা হয়। প্রথমে একটি আঙুল দুধে ডুবাইয়া আঙুলটি বাছুরের মুখে পুরিয়া দেওয়া হয়। বাছুর প্রথমে আঙুল চুষিতে শুরু করে, পরে পাত্রের দুধ খাওয়া শিখিয়া লয়।

বাছুরের দেহের ওজনের দশ ভাগের একভাগ দুধ দরকার। জন্মের সময় সাধারণতঃ বাচ্চার ওজন কুড়ি হইতে পঁচিশ কিলোগ্রাম হয়। সুতরাং নবজাত বাছুরকে দিনে পাঁচ লিটার দুধ দেওয়া হয়।

বাছুরের দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুধের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। গাভীর দুধ বেশী পরিমাণে বাছুরকে দিলে ব্যবসার দিকে ক্ষতি হয়। সেজন্য একুশ দিন পর হইতে অল্প অল্প গুঁড়া খাদ্য খাওয়ানো অভ্যাস করা উচিত। এই খাবারের পরিমাণ রোজ একটু একটু করিয়া বাড়ানো হয়। এই সময় কচি ঘাসও বাছুরকে খাওয়ানো হয়। এই সময় বাছুরের পাকস্থলী কর্মক্ষম হয়, ফলে প্রথম মাসের শেষে অর্থাৎ দ্বিতীয় মাসের শুরু হইতে অন্য খাবার দেওয়া হয়। তবে এই খাদ্য সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হওয়া চাই। প্রথমে খাদ্যের সহিত আটগুণ জল মিশাইয়া দুধ ও গুড় মিশাইলে বাছুর তৃপ্তি করিয়া খায়। যথা—

(i)	গমভাঙ্গা	30 ভাগ
	তিসি গুঁড়া	40 ভাগ
	গুড়	10 ভাগ
	দুধ	12 ভাগ
	খনিজ	3 ভাগ
	মোট	95 ভাগ

(ii)	যব বা ভুট্টা ভাঙ্গা	60 ভাগ
	গুড়	7 ভাগ
	বাদাম খইল	20 ভাগ
	দুধ	10 ভাগ
	খনিজ	3 ভাগ
	মোট	100 ভাগ

খাদ্যের এই সকল উপাদানের সহিত আটগুণ জল মিশাইতে হয়। বাছুর যখন দিনে আধ কিলোগ্রাম খাবার খায়, তখন দুধ ছাড়াইয়া সুষম খাদ্য দেওয়া উচিত। বাছুরের দেহের বৃদ্ধির জন্য প্রোটিনের পরিমাণ বেশী প্রয়োজন হয়। জই (oats), ভুট্টা, যবভাঙ্গা, গুড় বাছুরের উপযোগী। বাছুর খুব মিহি গুঁড়া খাদ্য পছন্দ করে না, এইজন্য শস্যের দানা ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট দানা ভাঙ্গা খাওয়ানো হয়। বয়সের সঙ্গে প্রতিমাসে বাছুরের দেহের ওজন দ্রুত বাড়িয়া চলে। সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বাছুরের

খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। মাসে প্রায় 13 কিলোগ্রাম ওজন বৃদ্ধি পায়।

বাছুরের খাবারের পরিমাণ ঃ

বয়স	ওজন	দুধ	সুষম খাদ্য	বিচালি ও ঘাস
প্রথম মাস				
এক সপ্তাহ	24 কিগ্রা.	1-2 লিটার		
দ্বিতীয় "		2 লিটার		
তৃতীয় "		2 লিটার		
চতুর্থ "	32 "	3 লিটার	100 গ্রাম	
দ্বিতীয় মাস				
এক সপ্তাহ		2 লিটার	200 গ্রাম	সবুজ ঘাস
দ্বিতীয় সপ্তাহ		2 লিটার	300 "	"
তৃতীয় সপ্তাহ		1 লিটার	400 "	"
চতুর্থ সপ্তাহ	44 "	1 লিটার	500 "	"
তৃতীয় মাস				
এক সপ্তাহ		1 লিটার	600 "	বিচালি অল্প পরিমাণে
দ্বিতীয় সপ্তাহ		1 লিটার	700 "	"
তৃতীয় সপ্তাহ		দুধ বন্ধ	800 "	"
চতুর্থ সপ্তাহ	56 "	দুধ বন্ধ	900 "	"
চতুর্থ মাস	68 "	—	—	250 গ্রাম বিচালি ও ঘাস এক কিলোগ্রাম

বাছুরের পরিচর্যা ঃ

বাছুর জন্মাইবার দুই ঘণ্টা পর যদি পায়খানা না করে, তবে আধ লিটার গরম জলে আধ চামচ কাপড় কাচা সোডা যোগ করিয়া বাছুরকে খাওয়ানো হয়। অথবা গ্যাষ্টিনা বড়ির এক-চতুর্থাংশ, বা অরিওমাইসিন পাঁচ গ্রাম বা টেরামাইসিন পাঁচ গ্রাম পাউডার খাওয়ান হয়। অনেক বাছুর মারা যায় নাভিতে ঘা হওয়ায়। নাভির ক্ষত দ্বারা রোগের বীজাণু দেহে প্রবেশ করে, নাড়ীর ক্ষতে আয়োডিন বা ডেটল দেওয়া হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই রোগ নিবারণের সহজ উপায়। রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বাড়াইবার জন্য

বাছুরকে তিনমাস বয়স পর্যন্ত খাদ্যের সহিত তিনগ্রাম অরোফ্যাক বা টি. এম. 5 দেওয়া হয় এবং সপ্তাহে একদিন ভিটামিন 'A'-এর জন্য রভিমিক্স দেওয়া হয়। জন্মের তিনদিনের মধ্যে উদরাময়ের প্রতিরোধক হিসাবে সালফা-ডায়াজিন দেওয়া হয়। অন্ত্রের কৃমির প্রতিরোধক হিসেবে জন্মের পাঁচদিন পর পাইপারেজিন সিরাপ একচামচ খাওয়ান হয়। ককসিডিওসিস রোগের প্রতিরোধের জন্য জন্মের আটদিন পর সালমেজাথিন দ্রবণ ($12\frac{1}{2}\%$) চারদিন খাওয়ানো হয়।

হলষ্টিন জার্সি বাছুরের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ঃ

চারমাস পর্যন্ত প্রতিমাসে একবার পাইপারজিন এডিপেট 7-10 গ্রাম জলে গুলিয়া রাত্রের খাওয়ার পর বা খুব সকালে খাওয়ানো উচিত। মাসে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়বার অরিওমাইসিন (5 গ্রাম) খাওয়ানো হয়, বাছুরের স্বাস্থ্য খারাপ থইলে বেলামিভ, লিভোজেন, হোল লিভার এক্সট্রাক্ট (টি. সি. এফ) খাওয়ানো হয়। প্রিপালিন ফোর্ট সপ্তাহে দুইটি করিয়া মোট পাঁচবার ইনজেকশন দেওয়া ভাল।

পাঁচমাসের পর 15 হইতে 30 গ্রাম পেনোভিস সমপরিমাণ ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট বা ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটের সহিত মিশাইয়া রাতে খাবারের পর বা ভোরে জলের সঙ্গে মিশাইয়া বাছুরকে খাওয়ানো হয়। কিছুদিন পর এভলোথিন (15-30 গ্রাম) ভাতের ফেনের সঙ্গে খাওয়ানো হয়।

বাছুরের শিং নষ্ট করা ও বলদ করা ঃ

বাছুরের জন্মের তিন সপ্তাহের মধ্যেই শিং মুছে ফেলার দরকার। এই সময় বাছুরের শিং বোতামের মতো অনুভব করা যায়। যে জায়গায় শিং উঠিবে, সেইখানকার লোম কাটিয়া স্থানটি লোমবিহীন করিতে হয়। ঐ লোমবিহীন স্থান ভেসলিন দ্বারা নরম করা হয়। কষ্টিক পটাশ অথবা কষ্টিক সোডা একটি কাগজে মুড়িয়া ঐ শিং জোড়ায় ঘসিয়া দেওয়া হয় যাহাতে রক্ত বাহির হইয়া যায়। কষ্টিক সোডা বা কষ্টিক পটাশ লাগাইবার পর জিংক অক্সাইড পাউডার ছড়ান হয়।

এঁড়ে বাছুর ভালো জাতের হইলে তবেই প্রজননের কার্যে ব্যবহার করা হয়, নয়ত ক্ষেতের কাজ বা গাড়ী টানিবার জন্য বলদ করা হয়। ষাঁড়ের সংখ্যা বাড়িলে দেশী গরুর জন্মের হার বাড়িয়া যায়, তাহা ছাড়া বলদ বিক্রী করিলে আয় হয়।

এঁড়ে বাছুরের পিছনের দিকে দাঁড়াইয়া অণ্ডকোষে হাত দিলে স্পার্মাটিক কর্ডের অস্তিত্ব বোঝা যায়। স্পার্মাটিক কর্ডকে চামড়ার গায়ে ঠেলিয়া দিতে হইবে তারপর অণ্ডগ্রন্থি হইতে এক ইঞ্চি উপরে Burdizzo's Emasculator যন্ত্রটি এমনভাবে লাগান হয় যাহাতে যন্ত্রটির দুইটি চোয়ালের মাঝে কর্ডটি থাকে। যন্ত্রের চোয়ালে চাপ প্রয়োগ করিয়া স্পার্মাটিক কর্ড পিষিয়া দেওয়া হয়।

কৃত্রিম গোপ্রজনন পদ্ধতি ঃ

সাধারণতঃ দুইভাবে কৃত্রিম প্রজনন করাইবার ব্যবস্থা আছে, যথা—স্পেকুলাম পদ্ধতিতে ও মলদ্বারে হাত ঢুকিয়ে।

স্পেকুলাম পদ্ধতি (Speculum process) ঃ এই পদ্ধতিতে স্পেকুলাম যন্ত্র প্রজননক্ষম গাভীর যৌনদ্বারে প্রবেশ করানো হয়। স্পেকুলামের হাতল দুইটি চাপিয়া ধরিলে জরায়ু-মুখ খোলা বা বন্ধ বোঝা যায়। অনেক সময় স্পেকুলাম প্রবেশ করাইবার সময় ঘন রস বাহির হইয়া আসে।

এখন একটি Insertinating pipette বা Cathetor-এ একটি রবারের সরু নল লাগান হয়। এই কাঁচের cathetor-এ ঠাণ্ডায় রাখা স্পার্ম দুই ঘন সেন্টিমিটার তুলিয়া লওয়া হয়। এরপর যন্ত্রটি হাতের তালুতে ঘষাঘষি করিয়া স্পার্মকে গরম করিয়া লইতে হইবে যাহাতে উহারা সঞ্চরণশীল হয়। স্পেকুলাম দ্বারা জরায়ুর মুখ বাহির করিয়া cathetor-এর মাধ্যমে স্পার্ম প্রবেশ করানো হয়। এইভাবে কৃত্রিম প্রজনন করাইবার সঙ্গে সঙ্গে সকল যন্ত্র ও রবারের নালী বীজাণুনাশক পদার্থে ধুইয়া ফেলা প্রয়োজন।

মলদ্বারে হাত ঢুকিয়ে (Recto vaginal method) ঃ এই পদ্ধতিতে কর্মী মলদ্বারের ভিতর হাত প্রবেশ করাইয়া জরায়ুর মুখ খোলা বা বন্ধ বুঝিতে পারে। তারপর পূর্বের ন্যায় cathetor-এর সাহায্যে শুক্রাণু প্রবেশ করান হয়।

হিমায়িত বীর্যের রক্ষণ পদ্ধতি ঃ

ষাঁড়ের থেকে বীর্য সংগ্রহ করা হয়। এই বীর্যকে 28° ডিগ্রী সেলেসিয়াস তাপমাত্রায় জল, ডিমের হলুদ অংশ ও 3·92% সোডিয়াম সাইট্রেটের মিশ্রণে যোগ করা হয়। এই বীর্যকে তরলে রাখিয়া রেফ্রিজারেটরে 5° ডিগ্রী সেলেসিয়াস তাপমাত্রায় রাখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য হিমায়িত বীর্যে মিউটেশান হওয়া সম্ভব এবং প্রজননের সার্থকতা তুলনামূলকভাবে কম।

তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃত্রিম গোপ্রজনন কেন্দ্রে হিমায়িত বীর্য ব্যবহার করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী উদ্যোগ ও গোউন্নয়ন ঃ

হলষ্টিন জার্সি ষাঁড়ের দৌলতে পশ্চিমবাংলার দুধের সঙ্কুলান কিছুটা বাড়িয়াছে। পূর্বে দেশী গাভী আধ কিলোগ্রাম দুধ দিত, বর্তমানে হলষ্টিন জার্সি ষাঁড়ের সাহায্যে প্রজনন করাইয়া সৃষ্ট উন্নত গাভী প্রায় সাত-আট কিলোগ্রাম এমনকি পনের কিলোগ্রাম পর্যন্ত দুধ দিতে পারে। ইহাছাড়া এই জাতের বলদকে গাড়ী টানিতে বা জমি চাষ করিতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে হরিয়ানা ষাঁড়ের মাধ্যমে দেশী গাভীকে প্রজনন করান হয়, তাহাতে সংকর জাতের গরু সৃষ্টি হয়। বর্তমানে শহরাঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে হলষ্টিন ষাঁড় বা জার্সি দ্বারা দেশী গাভীকে প্রজনন করাইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত গরু সৃষ্টি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেশী গাভীর সঙ্গে হলষ্টিন বা জার্সি ষাঁড়ের প্রজনন করাইলে নূতন বাচ্চার ক্ষেত্রে শতকরা 50 ভাগ দেশী গরুর গুণ থাকিবে। এই গরু এই আবহাওয়া সহ্য করিতে পারে, সম্পূর্ণ বিদেশী গরু এই আবহাওয়া সহ্য করিতে পারে না। বর্তমানে দুইটি উন্নত জাতের গরুর মধ্যে ক্রমান্বয়ে বংশবিস্তার করান হয়, ইহাকে criss crossing পদ্ধতি বলে। যেমন, হলষ্টিন ও জার্সির মধ্যে প্রজনন করাইয়া প্রাপ্ত বকনাকে পুনরায় হলষ্টিন ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করান হয়। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বকনার সহিত জার্সি ষাঁড়ের প্রজনন করাইয়া বকনা বা বলদ সৃষ্টি করা হয়। এই বংশধর হলষ্টীন ও জার্সির তুলনায় অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন হয়।

দেশী গাভী প্রতি বিয়ানে প্রায় তিনশ কিলোগ্রাম দুধ দেয়। কিন্তু দেশী গরুর সঙ্গে ভাল জাতের ষাঁড়ের প্রজনন করাইয়া যে সংকর বকনা তৈরী হয় তার থেকে প্রতি বিয়ানে দুই হাজার কিলোগ্রাম দুধ পাওয়া যায়। সংকর গরুর অনেক দাম। তাই দেশী গাই গরু থেকে সংকর বকনা তৈয়ারি করাই লাভজনক।

সংকর বকনার সুবিধা ঃ

(i) সংকর গাভী তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং দেড় হইতে দুই বছরের মধ্যে গাভিন হওয়ার উপযুক্ত হয়।

(ii) গাভিন হওয়া সত্ত্বেও অনেকদিন দুধ দেয়, প্রতি বিয়ানে দুধের

পরিমাণ হয় বেশী।

(iii) বাচ্চা দেওয়ার দুই-তিনমাসের মধ্যেই আবার গাভিন হয়।

(iv) দুধ দোহনের সময় বাছুর না থাকিলেও অসুবিধা হয় না।

গাভিন সংকর গরুর খাদ্য ঃ

গাভিন অবস্থায় গাভীকে ভাল করে খাওয়ানো হয়। পাঁচ মাস পর্যন্ত গরুর নিজের জন্য রোজ দেড় কিলোগ্রাম এবং প্রতি কিলোগ্রাম দুধের জন্য 350 গ্রাম হিসাবে খইল, ডাল চুর্ণ, ভূষি মেশান দানাজাতীয় সুষম খাদ্য দেওয়া হয়। পাঁচমাস পরে গর্ভস্থ বাচ্চার জন্য খাদ্যের সঙ্গে দৈনিক এক কিলোগ্রাম সুষম খাদ্য দেওয়া হয়। এই খাদ্যের সঙ্গে ঘাস দেওয়া হয়। এই সময় দৈনিক 10-15 গ্রাম খনিজ লবণ ও 5-10 গ্রাম ভিটাব্লেণ্ড-A-D-3 খাওয়ান হয়। গাভিন গরুকে দুই-তিনমাস অন্তর 15-30 গ্রাম থায়াবেনডল জাতীয় ঔষধ খাওয়ানো হয়। গাভিন গরুকে পরিষ্কার ও আলো বাতাসযুক্ত গোয়াল ঘরে রাখা হয়। গোয়াল ঘরের মেঝে সমান ও শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন।

বাছুর জন্মাইবার পর মাকে জিভ দ্বারা চাটিতে দেওয়া হয়। শুকনো সমান জায়গায় খড় বিছাইয়া বাছুরটি রাখা হয়। বাছুর জন্মাইবার পর 200 মিলিগ্রাম নেপটিন বড়ি একটি বা দুইটি করিয়া দিনে তিনবার এবং তিনদিন খাওয়ানো হয়। এই বড়ির বদলে আধ গ্রামের টেরামাইসিন বড়ি সকালে অর্ধেক ও বিকেলে অর্ধেক পর পর তিনদিন খাওয়ানো হয়। প্রথম সাতদিন বাচ্চাকে মায়ের গাঁজলা দুধ খাওয়ান হয়। গাঁজলা দুধ বাছুরের পেটের মল বাহির করিতে সাহায্য করে। বাড়তি গাঁজলা দুধ নষ্ট না করিয়া বড় বাছুরকে খাওয়ানো হয়।

বাচ্চাকে অনেকদিন ধরিয়া শুধু দুধ খাওয়াইলে পাকস্থলী পুষ্ট হইতে দেরী হয়। বিক্রয়যোগ্য দুধের পরিমাণও কমিয়া যায়। তাই দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে সংকর বাছুরকে দুধের বিকল্প খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের ডেয়ারী ও পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন বাছুরের জন্য দুধের বিকল্প খাবার তৈয়ারীতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহাছাড়া বাড়ীতে সংকর বাছুরের জন্য দুধের বিকল্প খাদ্য তৈয়ারি করিয়া লওয়া হয়।

বিকল্প খাদ্য

ভুট্টা ভাঙ্গা	50 কিলোগ্রাম
বাদাম খইল	40 "
গমের ভুষি	8 "
খনিজ লবণ	2 "
	100 কিলোগ্রাম

প্রতি 100 কিলোগ্রাম দুধের এই বিকল্প খাবারের সঙ্গে রোভিমিক্স অথবা ভিটাব্লেণ্ড 10 গ্রাম, লবণ 500 গ্রাম এবং অরোফ্যাক 20 গ্রাম মেশান হয়।

তিনমাস পর্যন্ত বাছুরকে খাওয়ানোর নমুনা ঃ

প্রথম 7 দিন ঃ বাছুর জন্মাইবার পর হইতে প্রথম সাতদিন বাছুরের ওজনের দশভাগের একভাগ অর্থাৎ প্রায় মোট দুই কিলোগ্রাম গাঁজলা দুধ পাঁচ-ছয়বারে গরম করিয়া খাওয়ান হয়।

8-14 দিন ঃ 2 কিলোগ্রাম 500 গ্রাম দুধ বারে বারে খাওয়ান হয়। দুধের বিকল্প খাদ্য 50 হইতে 100 গ্রাম ও সবুজ ঘাস 300 গ্রাম খাওয়ান হয়।

15-21 দিন ঃ দুই কিলোগ্রাম 750 গ্রাম দুধ বারে বারে সারাদিনে খাওয়ান হয়। দুধের বিকল্প খাবার 200 গ্রাম ও ঘাস প্রায় 350 গ্রাম খাওয়ান হয়।

22-28 দিন ঃ সারাদিনে আড়াই কিলোগ্রাম দুধ বারে বারে খাওয়ান হয়। 400 গ্রাম দুধের বিকল্প খাবার ও 400 গ্রাম ঘাস দেওয়া হয়।

29-35 দিন ঃ সারাদিন দুই কিলোগ্রাম দুধ, 500 গ্রাম বিকল্প খাবার ও 500 গ্রাম ঘাস খাওয়ান হয়।

36-42 দিন ঃ দিনে দেড় কিলোগ্রাম দুধ, 600 গ্রাম বিকল্প খাবার ও 600 গ্রাম সবুজ ঘাস দেওয়া হয়।

43-63 দিন ঃ দিনে 500 গ্রাম দুধ, এক কিলোগ্রাম বিকল্প খাবার ও এক কিলোগ্রাম ঘাস দেওয়া হয়।

64-77 দিন ঃ বিকল্প খাবার প্রায় দেড় কিলোগ্রাম ও সবুজ ঘাস দেড়

কিলোগ্রাম খাইতে দেওয়া হয়। দুধ দেওয়া হয় না।

78-90 দিন : প্রায় দেড় কিলোগ্রাম বিকল্প খাবার এবং আড়াই কিলোগ্রাম সবুজ ঘাস দেওয়া হয়।

প্রথম সপ্তাহের পর হইতে তিনমাস পর্যন্ত রোজ সকালে ও বিকালে আঙুলের এক টিপ পরিমাণ **Vitablend A-D-3** খাওয়ান ভাল।

সম্ভব হইলে সংকর বকনাকে মায়ের কাছ হইতে পৃথক রাখা ভাল, তবে বকনা তিন-চার মাস পূর্বেই গাভিন হওয়ার উপযুক্ত হয়।

তিনমাস বয়স হইতে সংকর গাভিন হওয়া পর্যন্ত খাদ্য :

3-6 মাস পর্যন্ত : সুষম খাদ্য দেড় কিলোগ্রাম, সবুজ ঘাস 5-8 কিলোগ্রাম।

6-12 মাস পর্যন্ত : সুষমখাদ্য দুই কিলোগ্রাম, সবুজঘাস 8-10 কিলোগ্রাম।

1 বছর হইতে গাভিন হওয়া পর্যন্ত : সুষম খাদ্য প্রায় তিন কিলোগ্রাম, সবুজ ঘাস 10 হইতে 15 কিলোগ্রাম।

প্রতি 100 কিলোগ্রাম সুষম খাদ্য উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ দেওয়া হইল।

বাদাম, তিসি, তিল ও সরিষার খইল	25—35 কিলোগ্রাম
ভুট্টা, গম, যব, জোয়ার ভাঙা	25—35 "
গমের ভূষি, চালের কুঁড়া	10—25 "
অড়হর, ছোলা, মটর, মসুর ডাল চূর্ণ	5—20 "
লবণ	1 "
খনিজ লবণ	1 "
মোট	100 কিলোগ্রাম

প্রতি 100 কিলোগ্রাম সুষম খাদ্যের সহিত 20-30 গ্রাম ভিটাব্লেণ্ড A-D-3 মিশান হয়।

সংকর বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা :

সংকর বাছুরের রোগ হইবার সম্ভাবনা দেশী বাছুরের চাইতে বেশী, তাই পূর্ব থেকেই প্রতিরোধ বা পরিষেধক ব্যবস্থা লওয়া প্রয়োজন। জন্মাইবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সংকর বকনার নিম্নলিখিত রোগগুলি দেখা দিতে পারে।

উদরাময় : এই রোগে বাছুর দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা সাদা মল ত্যাগ করে।

সময়মত চিকিৎসা না হইলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বাছুর মারা যায়।

বাছুর জন্মাইবার পর 200 মিলিগ্রাম নেপটিন বড়ি একটি বা দুইটি করিয়া দিনে তিনবার করিয়া তিনদিন খাওয়ান হয়। এই ঔষধের অভাবে আধ গ্রাম টেরামাইসিন বড়ি অর্ধেক সকালে অর্ধেক বিকালে পর পর তিনদিন খাওয়ানো হয়।

নাভিতে ক্ষত: বাছুরের কাঁচা নাড়ী ফুলিয়া যায়, জ্বর হয় এবং খাওয়া বন্ধ করে। নাভিতে ক্ষত হইলে ড্রেসিং তৈল লাগান হয়। 250 গ্রাম নারিকেল বা তিসির তৈল, 30 গ্রাম তার্পিন তৈল, 5 গ্রাম ইউক্যালিপটাস তৈল ও 5 গ্রাম কর্পূর মিশাইয়া ড্রেসিং তৈল তৈয়ারি করা হয়। রাত্রিবেলা পেনিসিলিন বা টেরামাইসিন জাতীয় মলম লাগান যায়।

নিউমোনিয়া: এই রোগে প্রথমে জ্বর হয়, নাক দিয়ে সর্দি পড়ে ও কাশি হয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং বাছুর মারা যায়। শুষ্ক, পরিষ্কার, ঠাণ্ডা জায়গায় বাছুরকে রাখিলে এই রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

ভিটামিনের অভাব: ভিটামিনের অভাবে বাছুরের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সেইজন্য গাভিন গরুকে ছয় মাস বয়স হইতে বাচ্চা হওয়ার আগে পর্যন্ত ভিটাব্লেণ্ড A-D-3 রোজ অর্ধচামচ সকালে, অর্ধচামচ বিকালে খাওয়ান হয়।

খনিজ লবণের অভাব: দেহে খনিজ লবণের অভাব হইলে বাছুর দাঁড়াইতে পারে না, হাড় নরম হয় ও বাঁকিয়া যায়। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে খনিজ লবণ দ্রবণ খাওয়ান হয়।

কৃমি রোগ: বাছুর জন্মাইবার পর ছয়মাসের মধ্যে বাছুর কৃমিতে মারা যাইতে পারে। কৃমি হইলে পেট বড় হয়, বাছুর রোগা হইয়া যায়। পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ করে। রক্তশূন্যতা, চোখ ফ্যাকাশে ও গলার নীচে ফোলা ভাব দেখা যায়। সাবধানতা হিসাবে দুই থেকে চার সপ্তাহের বয়সের মধ্যে 5 হইতে 10 গ্রাম পাইপারেজিন এডিপেট ঔষধ খাওয়ান হয়। চ্যাপ্টা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হইলে আধগ্রামের ডাইসিসটল বড়ির গুঁড়া একবার খাওয়ান হয়। এই বড়ি না পাওয়া গেলে সুপারি মিহি করিয়া গুঁড়া করিয়া একটু মধুর সঙ্গে মেশাইয়া খাওয়ান হয়।

এঁসো রোগ: এই রোগে বাছুরের জ্বর হয়। ঠোঁট, মাড়ি, জিহ্বার উপর, খুরের চেরা অংশের ভিতর ক্ষত হয়। মুখ হইতে লালা বাহির হয়, কিছু খাইতে পারে না। এক সপ্তাহের মধ্যে বাছুর মারা যায়।

এই রোগের টিকা দেওয়া হয়, একবার তিন-চার মাস বয়সে এবং 6-7 মাস বয়সে আর একবার টিকা দেওয়া হয়। ইহার পর প্রতি বছর একবার করিয়া টিকা দেওয়া হয়।

ব্ল্যাক কোয়ারটার ঃ এই রোগে বাছুরের জ্বর হয়, খাওয়া ত্যাগ করে। বাছুরটি খোঁড়াইতে থাকে। খোঁড়ানো পায়ের উপরের দিক ফুলিয়া যায়, ফোলা অংশে রস জমে। সংকর বকনার ছয়মাস বয়সে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়। এরপর প্রতি বছর একবার করিয়া এই রোগের টিকা দেওয়া হয়।

গোবসন্ত ঃ এই রোগে বাছুরের জ্বর হয় এবং পাতলা পায়খানা করে।

গলাফোলা ঃ এই রোগে বাছুরের জ্বর হয়, খাওয়া বন্ধ করে। জিহ্বা, ঘাড়, গলকম্বল ইত্যাদি ফুলিয়া যায়। শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং দুইদিনের মধ্যে বাছুর মারা যায়। বাছুরের পাঁচ-ছয় মাস বয়সে একবার এবং এরপর প্রতি বছরে একবার করিয়া গলাফোলা রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া প্রয়োজন।

তড়কা ঃ এই রোগে বাছুরের জ্বর হয় ও খাওয়া বন্ধ করে। বাছুরের ছয়মাস বয়সে একবার, এরপর বছরে একবার করিয়া তড়কা রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া প্রয়োজন।

একটি রোগের প্রতিষেধক টিকা দিলে তার অন্ততঃ একমাস পর আর একটি রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হয়। তাই সকলরকম প্রতিষেধক টিকা সময়মত দেওয়া হইলে মূল্যবান সংকর বকনাকে ভালভাবে রক্ষা করা যায়।

সংকর বকনার বয়স	রোগের নাম	টিকার নাম
3 মাস বয়স	এঁসো	পলিভ্যালেন্ট ফুট এ্যাণ্ড মাউথ টিস্যু কালচার ভ্যাকসিন
4 মাস বয়স	গোবসন্ত	এফ. ডি. ল্যাপিলাইজড ভ্যাকসিন অথবা এফ. ডি. জি. টি. ভ্যাকসিন
5 মাস বয়স	গলাফোলা	এইচ. এস. ভ্যাকসিন
6 মাস বয়স	ব্ল্যাক কোয়ারটার	বি. কিউ ভ্যাকসিন
7 মাস বয়স	এঁসো	পূর্বের ন্যায়
12 মাস বয়স	গোবসন্ত	পূর্বের ন্যায়

ইহার পর সংকর বকনাকে বছরে একবার করিয়া এঁসো, ব্ল্যাক কোয়ারটার, গোবসন্ত, গলাফোলা ও তড়কা রোগের টিকা দেওয়া হয়।

গরুর কয়েকটি ব্যাধি ও প্রতিকার (Diseases and Prevention)

ভাইরাস বাহিত কয়েকটি রোগ :

(i) **রিণ্ডারপেষ্ট :** রিণ্ডারপেষ্টকে গরুর প্লেগ রোগও বলা হয়। বিদেশী গরু এই রোগে বেশী মরে। দেশী গরুতে তুলনামূলকভাবে রোগের প্রকোপ কম। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার 4 হইতে 6 দিনের মধ্যে দেহের তাপমাত্রা 106 ডিগ্রী ফারেনহাইট হয়। এই রোগে পিঠ ধনুকের মতো বাঁকিয়া যায়। দাঁতের মাড়িতে, জিভের নিচে, ঠোঁটে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, পাতলা মল ত্যাগ করে। দশদিনের মধ্যে গরু মারা যায়।

চিকিৎসা করিয়া রোগ সারান সম্ভব হয় না। তবে 80 মিলিলিটার সিরাম ত্বকে ইনজেকশান করা হয়। এই রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া যায়।

(ii) **এঁসো রোগ :** ভাইরাস আক্রমণের ফলে দুই-তিন দিনের মধ্যে গরুর 106° ডিগ্রী ফারেণহাইট তাপমাত্রা হয়। জিহ্বাতে, পালানে, বাঁটে, দুই খুরের মাঝে ফোসকা ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। গরুর মুখ দিয়ে লালা পরে। গরু ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া যায়।

ফিটকিরির জল দ্বারা ক্ষত চার-পাঁচবার পরিষ্কার করিয়া পটাসিয়াম প্যারম্যাংগানেট গুঁড়া ক্ষতে প্রয়োগ করা হয়। Terramycin 10 মিলিলিটার বা Dicrystacin 2·5 গ্রাম ইনজেকশান তিনদিন করা হয়। এই রোগের টিকা দেওয়া যায়।

(iii) **গোবসন্ত :** সমস্ত দেহে ছোট ছোট গুটি দেখা যায়, পরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কুড়ি দিন পর গুটি মিলাইয়া যায়। বোরিক অ্যাসিড, পেনিসিলিন মলম, টেরামাইসিন, পেনডিষ্টিরিম মলম ক্ষতে লাগান ভাল।

বীজাণু বাহিত রোগ

(i) **একটিনোমাইকোসিস :** ইহা গরুর দীর্ঘমেয়াদী রোগ। গরুর বেলার চোয়ালের হাড় পিণ্ডের মতো বড় হইয়া ওঠে। চোয়াল আক্রান্ত হইলে খাদ্য চিবাইতে পারে না, অনেক সময় পালানেও এই রোগ হয়।

শল্য চিকিৎসার মাধ্যমেই সারান যায়, কোন টিকার ব্যবস্থা নাই।

(ii) **যক্ষারোগ :** গরুর প্রথমদিকে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বীজাণু ফুসফুস, লসিকাগ্রন্থি, অন্ত্র, পালানকে আক্রমণ করে। পশুচিকিৎসক দ্বারা উপযুক্ত ঔষধ ইনজেকশানের মাধ্যমে রোগ সারান যায়।

(iii) **মূত্রাশয়ের প্রদাহ :** ইহা দীর্ঘস্থায়ী প্লেগ। গরু দুর্বল হয়, ওজন কমিয়া যায়, খাদ্যের প্রতি অনীহা হয়। মূত্রে রক্ত দেখা যায়। মূত্রনালী মোটা হইয়া যায়। মূত্রথলিও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।

প্রাকেইন পেনিসিলিন ছয়দিন ইনজেকশন করা হয়।

(iv) **গলাফোলা :** এই রোগের লক্ষণ দেখা যায় না, গরু হঠাৎ মারা যায়। দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়া যায়, খাওয়া বন্ধ করে, আক্রমণের 24 ঘন্টার মধ্যে গরু মারা যায়। গরু এত তাড়াতাড়ি মারা যায় যে চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না, তবে স্ট্রেপটো পেনিসিলিন ইনজেকশান করা যায়। এই রোগের টিকা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

(v) **বাছুরের ডিপথেরিয়া রোগ :** ছয়মাস পর্যন্ত বাছুরের এই রোগ হয়। স্বরযন্ত্র, গলবিল, মাড়ি ইত্যাদি অংশে সাদা পর্দার নিচে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। টেরামাইসিন বা অক্সিটেকলিন দশ মিলিলিটার মাংসপেশীতে ইনজেকশান করিতে হয়।

(vi) **বাছুরের পায়খানার রোগ :** রোগের প্রথম অবস্থায় মল কাদার মত হয়, পরে জলের মত এবং দুর্গন্ধময় হয়। বাছুর নড়াচড়া করে না, একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। দুই-একদিনের মধ্যে পেটের ব্যথায় মারা যায়।

এই রোগে আক্রান্ত হইলে Cris 4 Dicrysticin অর্ধ গ্রাম দিনে একবার করিরা বা Terramycin অথবা Oxysteclin 5 মিলিলিটার দিনে একটি করিয়া মোট ছয়টি ইনজেকশান দেওয়া হয়।

(vii) **এনথ্রাক্স :** এই রোগে পেট অসম্ভবভাবে ফুলিয়া যায়, প্রস্রাবদ্বার ও মলদ্বার বাহির হইয়া আসে। প্লীহা, লসিকাগ্রন্থি ফুলিয়া ওঠে, চরম অবস্থায় মুখ, নাক ও মলদ্বার পথে রক্ত বাহির হয়।

বর্ষার আগে গরুকে টিকা দেওয়া প্রয়োজন। রোগে আক্রান্ত গরুকে Oxysteclin 10 মিলিলিটার বা প্রোকেইন পেনিসিলিন ইনজেকশান একটি করিয়া পর পর পাঁচদিন করা হয়।

(viii) **নিউমোনিয়া :** গবাদি পশুর মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ।

রোগ অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী হয়। জন্তুটি জাবর কাটে না, কাশিতে বেশ কষ্ট হয়, নাক দিয়া জল পড়ে, দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

Sulphamezathine ($33\frac{1}{2}\%$) চামড়ায় ইনজেকশন করা হয়। Terramycin বা Oxysteclin 10 মিলিলিটার করিয়া তিনদিন ইনজেকশান করা হয়।

পরজীবী বাহিত রোগ

(i) **অ্যাসকেরিয়াসিস :** এক ধরনের গোলকৃমির আক্রমণে এই রোগ হয়। এই কৃমির আক্রমণে গরুর আন্ত্রিক গণ্ডগোল হয়। বাছুর দুর্বলতায় ভোগে, চামড়া খারাপ হইয়া যায়। বাছুর জন্মাইবার এক সপ্তাহের মধ্যে Piperazine adipate প্রথম মাসে 5 গ্রাম, দ্বিতীয় মাসে 10 গ্রাম ও তৃতীয় মাসে 15 গ্রাম দেওয়া হয়। ঐ একই হিসাবে Helmacid খাওয়ান যায়।

(ii) **পাকস্থলীর কৃমির রোগ :** পাকস্থলী এই ধরনের গোল কৃমি থাকিয়া পাচিত ও অর্ধপাচিত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। এই কৃমির আক্রমণে গরু খনিজ লবণের অভাবে ভোগে, দেহ রক্তশূন্য হইয়া পড়ে।

পেনোভিস আর ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট 30 গ্রাম করিয়া জলের সহিত মেশাইয়া বাছুরকে বা বড় গরুকে খাওয়ান হয়।

(ii) **ফুসফুসীয় কৃমি :** কৃমি শ্বাসনালীতে রক্ত গ্রহণ করে, ফলে ফুসফুস ও শ্বাসনালীতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। নিউমোনিয়া রোগে গরু আক্রান্ত হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, দেহের নিচের অংশ ফুলিয়া যায়। সব সময় গরু-বাছুর কাশিতে ভোগে।

Diethyl carbamazine ঔষধ দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য 22 মিলিগ্রাম হিসেবে ইনজেকশান করা হয়।

(iv) **সিস্টোসোমা রোগ :** এক ধরনের চ্যাপ্টা কৃমি গরুর রক্তনালীতে বাস করে। এই কৃমি রক্ত খায়, ফলে গরু দুর্বল হইয়া পড়ে ও রক্তশূন্যতায় ভোগে। গরুর ক্ষেত্রে নাকের ভিতর শিরাগুলি ফুলিয়া ওঠে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। এই রোগটি বলদের বেশী হয়।

এই রোগে Anthiomaline 15 মিলিলিটার ইনজেকশন দুইদিন অন্তর করিয়া মোট ছয়টি ইনজেকশন দেওয়া হয়।

(v) **পাকস্থলী ফ্লুকের আক্রমণ ঃ** এই ধরনের কৃমি গরুর পাকস্থলী, যকৃতে পাওয়া যায়। এই রোগে আক্রান্ত গরুর দুর্গন্ধময় পাতলা মল বাহির হয়, চোয়ালের নিচে গলকম্বল ফুলিয়া যায়। এই কৃমি রক্ত শোষণ করিয়া পোষকের মারাত্মক ক্ষতি করে।

Hexachlorethane 220 এম.জি প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজন পিছু দিতে হয়। দিনে একবার করিয়া এভলোথিন 30 গ্রাম করিয়া দেওয়া ভাল।

ভেড়াপালন (Sheep Rearing)

সূচনা (Introduction) :

পৃথিবীতে প্রায় দুইশত জাতের ভেড়া আছে, এই জাতের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইয়া নূতন ধরনের সংকর ভেড়ার সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিভিন্ন পরিবেশের প্রকৃতি অনুযায়ী ভেড়াকে পশমের বা মাংসের জন্য চাষ করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে ভেড়া পাওয়া যায়। বন্য ভেড়ার চুল ও পশম দুইটি পৃথকভাবে বোঝা যায়। মানুষ এই বন্য ভেড়াকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংকরায়ণ করিয়া উন্নত ভেড়ার সৃষ্টি করিয়াছে। শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চলে পশমের উপযুক্ত ভেড়া পাওয়া যায়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে ভেড়া হইতে নিম্নমানের পশম পাওয়া যায়। মেরিনো ভেড়ায় সর্বাপেক্ষা উচ্চমানের পশম পাওয়া যায়। ভারতে উন্নতমানের পশম উৎপাদনকারী ভেড়ার চাষ করা হয় না।

ভারতে প্রায় ষাট লক্ষ ভেড়া আছে। ভেড়াতে উৎপন্ন পশমের চাহিদা বিদেশের বাজারে আছে। একটি ভাল জাতের ভেড়া বছরে দুই কিলোগ্রাম পশম দিতে পারে। ভারতে ভেড়ার মাংস খাদ্য হিসাবে বহুল প্রচলিত এবং মাংসও সুস্বাদু। ভেড়ার মল জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গোবর অপেক্ষা ভেড়ার মলে নাইট্রোজেন ও পটাশিয়ামের পরিমাণ বেশী থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকহারে ভেড়া পালনের পরিকল্পনা লওয়া হয় নাই। বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের কোন কোন অঞ্চলে ভেড়ার খামার আছে। কল্যাণী রাষ্ট্রীয় পশুপালন খামারে কয়েকজাতের ভেড়া লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে ভাল জাতের ভেড়ার চাষ করা হয় না, যা আছে, সেই ভেড়াকেও যত্ন পরিচর্যা করিয়া পালন করা হয় না।

কয়েকটি সেরা ভেড়ার পরিচয়

(i) **মেরিনো :** ভেড়ার রাজা মেরিনো। এই ভেড়া হইতে সেরা পশম পাওয়া যায়। ইহাদের আদি বাসস্থান স্পেন। ইহাদের স্বজন স্বজাতি প্রীতি প্রবল। ইহারা মাটি ঘেঁসিয়া ঘাস খায়, অন্য শক্তসমর্থ তৃণভোজী জন্তু এইভাবে ঘাস খাইতে পারে না। যে সকল ভেড়া মাংসের জন্য পালন

করা হয়, তাহারা এইভাবে ঘাস খাইতে পারে না।

মেরিনোর মুখ ও পা সাদা, পুরুষ ভেড়ার শিং আছে, স্ত্রী ভেড়া শিং-বিহীন। ইহাদের দেহ গভীর লোমে ঢাকা। স্ত্রী ভেড়া বেশীদিন বাঁচে এবং বেশী পরিমাণে উন্নতমানের পশম দেয়।

(ii) **রামবুইয়ে ঃ** রামবুইয়ের আদিপুরুষ মেরিনো। ফরাসি দেশে মেরিনোকে বিশেষভাবে পালন করিয়া রামবুইয়ে পরিণত করা হইয়াছে। রামবুইয়ে উন্নতমানের পশম দেয় এবং মাংসের জন্যও রামবুইয়ের কদর আছে। স্ত্রী ভেড়া শিংবিহীন, পুরুষ ভেড়ার শিং থাকিতেও পারে নাও থাকিতে পারে। এই ভেড়াগুলি আকারে বড় হয়, পুরুষ ভেড়ার ওজন 110 থেকে 125 কিলোগ্রাম। স্ত্রী ভেড়ার ওজন 70 থেকে 90 কিলোগ্রাম হয়। এই ভেড়ার মাথা হয় বড়, বিরাট নাক, কানের চারিপাশে সাদা চুল থাকে। লোম বেশ ভারী ও ঘন হয়। সমস্ত দেহ, মুখ, পা সব লোমে ঢাকা থাকে। রামবুইয়ে জাতের পুরুষের সঙ্গে মাঝারি লোমওয়ালা স্ত্রী ভেড়ার প্রজনন করিয়া যে ভেড়ার বাচ্চা হয়, সেগুলির মাংস খুব তৈলাক্ত বা সুস্বাদু হয়।

(iii) **সেভিয়ট ঃ** সেভিয়ট মাঝারি লোমওয়ালা ভেড়া। প্রথমে ইহাদের স্কটল্যাণ্ডে পালন করা হইত। এই জাতের ভেড়াগুলি দেখিতে সুন্দর, কানগুলি খাড়া, মুখ ও পা ধবধবে সাদা হয়। মুখ ও পায়ের লোম-গুলি ছোট। নাক, ঠোঁট, পায়ের গোড়ালি কালো হয়। পুরুষের গড় ওজন 80 কিলোগ্রাম ও স্ত্রী ভেড়ার ওজন প্রায় 60 কিলোগ্রাম। পায়ে, পশ্চাদ্‌দেশে, উরুর মাংসগুলি সবল হয়। বছরে আড়াই থেকে তিন কিলোগ্রাম পশম দেয়।

(iv) **কারাকুল ঃ** পশমের জন্য এই জাতের ভেড়াকে ব্যবহার করা হয়। পুরুষের শিং আছে কিন্তু স্ত্রী ভেড়ার শিং নাই। পুরুষের ওজন 90 কিলোগ্রাম এবং স্ত্রী ভেড়ার ওজন 65 কিলোগ্রাম।

(v) **সাউথ ডাউন ঃ** ইহারা ছোট আকারের ভেড়া। পুরুষ ও স্ত্রী ভেড়ার ওজন যথাক্রমে আশি কিলোগ্রাম ও ষাট কিলোগ্রাম। মাথা চওড়া, মুখের রং হাল্কা বাদামী। চোখ, মুখ পশমে ভীষণভাবে ঢাকা থাকে। ইহাদের মাংসের পরিমাণ হয় বেশী ও সুস্বাদু। বছরে প্রায় তিন কিলো-গ্রাম পশম উৎপাদন করে।

(vi) **লিষ্টার ঃ** ইহারা ইংলণ্ডের ভেড়া। ইহারা মাঝারি আকারের,

মুখ ও পা লম্বা ও পরিষ্কার। লোমগুলি খুব লম্বা হয়।

(vii) **লিন্‌কন্‌ঃ** ব্রিটেনের বিরাট আকারের ভেড়া। মাথা চওড়া, কান পুরু, ভারী লোম অবিন্যস্তভাবে থাকে। লোম লম্বা ও ভারী, লোমের ভিতর পশম মেশানো থাকে। বছরে সাত কিলোগ্রাম পর্যন্ত পশম দেয়।

ভারতের কয়েকটি বিশেষ ধরনের ভেড়া

ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভৌগোলিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া ভেড়াকে তিনটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় হিমালয়ের দেশী ভেড়া। দেহে চুল ও সুন্দর পশম থাকে।

(ii) শুষ্ক রাজস্থান অঞ্চলের ভেড়া হইতে প্রাপ্ত পশমে পৃথিবীর সেরা কার্পেট তৈরি করা হয়।

(iii) দাক্ষিণাত্যের লোমসর্বস্ব ভেড়া। ইহাদের মাংস সুস্বাদু।

হিমালয় দেশী ভেড়াঃ

(i) **গুরজেঃ** পশম উৎপাদনের জন্য এই ভেড়া পালন করা হয়। কাশ্মীরের উচু পাহাড়ের গুরেজ তহশীলে ইহাদের পাওয়া যায়। দীর্ঘ আঁশযুক্ত, ঝকঝকে, পশমের বর্ণ সাদা। বছরে দেড় কিলোগ্রাম পশম পাওয়া যায়। কাশ্মীরের বিভিন্ন জাতের ভেড়াদের মধ্যে ইহারা সবচেয়ে লম্বা। ইহাদের কান ছোট; শিং থাকে না।

(ii) **গদ্দীঃ** কাশ্মীরের জম্মুর অন্তর্গত ভাদোরওয়া অঞ্চলে ইহাদের পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের কুলু এবং কাঙড়া উপত্যকায় ইহাদের পাওয়া যায়। লোম সাধারণতঃ সাদা হয়, পশম দ্বারা জামা, শাল, কম্বল তৈয়ারি করা হয়। এই জাতের ভেড়ার গঠন মাঝারি ধরনের হয় এবং পাহাড়ে চলাফেরায় পটু। পুরুষের শিং আছে, স্ত্রী ভেড়ার শিং নাই।

(iii) **কারানাঃ** কাশ্মীরের কেল অঞ্চলে ইহাদের পাওয়া যায়। ইহাদের লোম ভারী, নরম ও সাদা। ইহাদের মুখ লম্বা, সরু নাক এবং পুরুষের একজোড়া বড় বাঁকানো শিং থাকে।

(v) **বাকরাবালঃ** হিমালয়ের পাদদেশে ইহাদের পাওয়া যায়। বাকরাবাল নামে একটি গোষ্ঠী এই ভেড়া পালন করায় বাকরাবাল নাম দেওয়া হইয়াছে। মেষপালকেরা গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের উপরে এবং শীত-

কালে পাহাড়ের নিচে চরায়। পশমের আকার দীর্ঘ, বছরে দেড় কিলোগ্রাম পশম উৎপাদন করে। কানের পাতা লম্বা, চওড়া এবং দুইপাশে ফোলা।

(v) **রামপুর ভুসিয়ার**ঃ হিমাচল প্রদেশের মাহাসু এবং কিন্নর জেলায় এই ভেড়া পাওয়া যায়। ইহাদের লোম বাদামী বর্ণের। চুলের সঙ্গে হাল্কা পশম থাকে। বছরে দুই কিলোগ্রাম পর্যন্ত পশম দেয়।

রাজস্থান ও পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চলের ভেড়া ঃ

(i) **কাথিয়াবাড়ী**ঃ কচ্ছের কাথিওয়াবাড়, দক্ষিণ রাজস্থান, এবং গুজরাটের কাথিয়াবাড়ীতে ইহাদের পাওয়া যায়। এই জাতের পশমের আঁশ লম্বা ও খসখসে। কাথিয়াবাড়ী ভেড়ার বর্ণ সাদা, মুখে ও পায়ে কালো লোম থাকে। মাঝারি আকারের গড়ন, বছরে দেড় কিলোগ্রাম পশম দেয়।

(ii) **কুচী**ঃ সৌরাষ্ট্রে এবং গুজরাটে ইহারা দেহসী নামে পরিচিত। কচ্ছের মরুভূমি অঞ্চলে কুচী ভেড়ার উৎপত্তি। পশ্চিম কচ্ছের নালিয়া অঞ্চলে এই জাতের উন্নতি করার চেষ্টা করা হইতেছে। লোম সাদা, বছরে এক হইতে দুই কিলোগ্রাম পশম পাওয়া যায়।

(iii) **লোহী**ঃ পাকিস্তানের লয়ালপুর ও মন্টোগোমারি অঞ্চল লোহী ভেড়ার আদি বাসস্থান। পাঞ্জাবে বর্তমানে ইহাদের পালন করা হয়। ইহাদের মাংসের পরিমাণ বেশী এবং অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু হয়। এই ভেড়ার পশমের আঁশ লম্বা ও খসখসে হয়। ইহাদের আকার বিরাট এবং কান অপেক্ষাকৃত লম্বা হয়।

(iv) **সারওয়ারী**ঃ জয়পুর ও যোধপুরে সারওয়ারী ভেড়া পাওয়া যায়। মুখের বর্ণ কালো, দেহের গঠন মজবুত, পা লম্বা। এই ভেড়া হইতে উন্নতমানের পশম পাওয়া যায় না। বছরে প্রায় দুই কিলোগ্রাম পশম উৎপাদন করে।

(v) **বিকানেরী**ঃ রাজস্থানের অতি পরিচিত ভেড়া, ইহাদের চোকলা, নালী এবং মগরা নামে তিনটি জাত আছে। দেহের গঠন মাঝারি ধরনের, দেহের বর্ণ বাদামী, পশমের পরিমাণ বছরে দেড় কিলোগ্রাম। এই পশমে উন্নতমানের কার্পেট তৈয়ারী হয়।

দাক্ষিণাত্যের কেশবহুল ভেড়া ঃ

(i) **দখিনী**ঃ মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু

জায়গায় পাওয়া যায়। দখিনীর পশম খসখসে এবং চকচকে। পশমের বর্ণ কালো বা ধূসর। এই পশমে কম্বল ও কার্পেট তৈরী হয়। পশমের পরিমাণ খুব কম হয়, সাধারণতঃ মাংসের জন্য ইহাদের পালন করা হয়।

(ii) **মাণ্ডিয়া ঃ** কর্ণাটক প্রদেশের ভেড়া, পশমে চুলের ভাগ বেশী।

(iii) **বান্দুর ঃ** কর্ণাটকের বান্দুর অঞ্চলের ভেড়া, মাংসের জন্য এই ভেড়া প্রসিদ্ধ। ছোট আকারের গঠন, হাড় সরু এবং মাংসের পরিমাণ অনেক বেশী। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ভেড়ার ওজন প্রায় যাট কিলোগ্রাম এবং স্ত্রী ভেড়ার ওজন প্রায় 45 কিলোগ্রাম। বান্দুর জাতীয় ভেড়া এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত হয়।

(iv) **নেচলাড় ঃ** লোমসর্বস্ব ভেড়া, মাংসের জন্য প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ সাদা বর্ণের তবে হরিণের মত ছাপ দেহে দেখা যায়। পুরুষ ভেড়ার শিং আছে, স্ত্রী ভেড়ার শিং নাই। লেজ খুব ছোট।

(v) **বেলাড়ী ঃ** অন্ধ্রপ্রদেশের বেলাড়ী এবং কারনুল জিলায় ইহাদের পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহারা কালো বর্ণের ভেড়া, চামড়া খুব উন্নত এবং দেহ মজবুত। পশম খসখসে এবং বছরে এক কিলোগ্রাম পশম দেয়।

বয়স হিসাবে ভেড়ার উপযোগিতা ঃ

ভেড়া সাধারণতঃ বাঁচে 10 থেকে 12 বছর। ভেড়ার জাত, স্থানীয় বাজার, স্ত্রী ভেড়া কেমন বাচ্চা দেয়, ভেড়াতে মাংসের পরিমাণ, গড়ে বছরে কত পশম পাওয়া যায় প্রভৃতির উপর ভেড়ার উপযোগিতা বা দাম নির্ভর করে। পুরুষ ভেড়া পালন মেষপালকের পক্ষে লাভজনক নয়, কুড়িটি স্ত্রী ভেড়া প্রতি একটি পুরুষ ভেড়া রাখা হয়। যে সকল স্ত্রী ভেড়া নিয়মিত বাচ্চা দেয় না তাদেরও বেচে দেওয়াই ভাল। যাদের পশম উৎপাদনের পরিমাণ কম বা নিম্নমানের সেই সকল ভেড়াকে বিক্রী করা হয়। সাধারণতঃ পশম ও মাংসের জন্য ভেড়ার চাষ করা হয়। ভারতে স্ত্রী ভেড়া নয় থেকে চৌদ্দ মাসের মধ্যে প্রজননক্ষম হয়। একসঙ্গে একটি বা কখনও দুইটি বাচ্চা দেয়। তিন চারিবার বাচ্চা দেওয়ার পর মাংসের জন্য বেচা হয়।

দাঁত দেখে ভেড়ার বয়স নির্ধারণ ঃ

ভেড়ার নিচের পাটিতে আটটি কৃন্তক (incisor) এবং চব্বিশটি পেষক থাকে। উপরের চোয়ালে কৃন্তকের পরিবর্তে শক্ত মাংসপেশীর তৈয়ারী একটি পিণ্ড বা dental pad থাকে। বাচ্চা ভেড়ার আটটি দুধ-দাঁত থাকে। 12

হইতে 14 মাসের মধ্যে একজোড়া দুধ-দাঁত পড়িয়া যায়। ইহার বদলে একজোড়া বড় গোলাকার স্থায়ী দাঁতের সৃষ্টি হয়। এই সময় পুরুষ ভেড়াকে এঁড়ে ও স্ত্রী ভেড়াকে বকনা বলে। দুই বছর বয়সে আর একজোড়া, তিন বছরে পরবর্তী জোড়া এবং চতুর্থ বছর বয়সে শেষ জোড়া দুধ দাঁত পড়িয়া যায়।

ভেড়ার পালের যত্ন : ভেড়া অন্যান্য গবাদি পশুর ন্যায় রোমন্থনকারী জীব। শুষ্ক ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ইহারা ভাল থাকে। আবহাওয়া খারাপ হইলে মেষপালকেরা পছন্দমত স্থানে ভেড়াকে লইয়া যায়। ভেড়ার স্থায়ী ঘর উঁচু জায়গায় করা হয়, যাহাতে বর্ষায় জল না জমে। প্রতিটি ভেড়ার জন্য 15 বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন। ভেড়া সব সময় গাদাগাদি করিয়া থাকে ফলে যে কোন রোগ উহাদের মধ্যে ছড়াইবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রজননকাল ও বাচ্চা প্রসব :

গর্ভবতী স্ত্রী ভেড়া যদি সুস্থ স্বাভাবিক হয় এবং বাঁচিয়া থাকিবার উপযুক্ত খাদ্য পায়, তবে পূর্ণ গর্ভকালের পর বাচ্চা প্রসব করে। খাদ্যের পরিমাণ কম হইলে কিংবা উপযুক্ত ভিটামিনের অভাবে গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকে। বাচ্চা জন্মাইবার সময় স্ত্রী ভেড়া অন্যান্য ভেড়া হইতে আলাদা থাকে। লেজটি লম্বভাবে খাড়া হইয়া যায়, সামনের পা দিয়া মাটি আঁচড়ায়। স্ত্রী ভেড়া নয় হইতে চৌদ্দ মাস বয়সে প্রথম গর্ভিণী হয়। একটি পুরুষ ভেড়া বছরে তিরিশ হইতে চল্লিশটি স্ত্রী ভেড়াকে পাল (mating) দিতে পারে। পুরুষ ভেড়ার বুক গভীর হয়, পিছনের কটিদেশ সরু হয়, পাঁজরাগুলি কাণ্ডের মত ও পা শক্তসমর্থ হয়। পুরুষ ভেড়ার পশম বেশী থাকা চাই, তবে সন্তানের মধ্যে পশমের পরিমাণ বেশী হইবে। ভাল স্ত্রী ভেড়ার লক্ষণ হইবে লম্বা দেহ, পিছনের দিকে পালান ভারী, বাঁট বড়। পুরুষের মত স্ত্রী ভেড়ার পশম থাকা প্রয়োজন তবে সন্তানের মধ্যে পশমের পরিমাণ বেশী হইবে। স্ত্রী ভেড়ার দুধ দেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই, কারণ বাচ্চারা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়।

ভেড়ার খাদ্য ও বাসস্থান (Foods & Rearing places) :

রুক্ষ, অনুর্বর পাথুরে মাটির ঘাস, লতা-পাতা, খামারের ফেলে দেওয়া আবর্জনা খায়। ভেড়া সাধারণতঃ জলযুক্ত খাদ্য পছন্দ করে। শুধুমাত্র খামারে রাখিয়া সুষম খাদ্য পরিবেশন করিয়া ভেড়াকে পালন করা যায় না।

ভেড়া পালন করিবার জন্য বড় বিচরণক্ষেত্র প্রয়োজন। সাধারণতঃ ভেড়ার ফার্মগুলিতে ভেড়া মাঠে চরানো হয়। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ভেড়া পালন করা হয়, সেইখানে চরানোর মাঠের সুবিধা আছে। ভেড়া যদি রোজ মাঠে চরিয়া খায় তবে নিম্নলিখিত পরিপূরক খাদ্য প্রতিদিন 250 গ্রাম প্রয়োজন ঃ

গমের ভূষি	30 ভাগ
অড়হর চূর্ণ	38 ভাগ
বাদাম খইল	30 ভাগ
খনিজ লবণ ও সাধারণ লবণ	2 ভাগ
	100 ভাগ

ভেড়া মুক্ত আকাশের নিচে থাকিতে ভালবাসে। তবে প্রতিকূল আবহাওয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঘরের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। তবে ইহাদের বেশী শক্ত মেঝেতে রাখা ভাল নয়, পশম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিটি ভেড়ার জন্য প্রায় 15 বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন। চোরের হাত হইতে বা ক্ষতিকারক প্রাণী হইতে রক্ষার জন্য আস্তানার চারিপাশে প্রাচীর বা বেড়া থাকিলেই চলে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হইলে মাথায় আচ্ছাদন দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না।

ভেড়াপালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importance of Sheep rearing) ঃ

(i) **পশম ঃ** ভেড়া হইতে পশম পাওয়া যায়। পশম বছরে একবার, দুইবার বা কোন কোন ভেড়ার ক্ষেত্রে তিনবার পর্যন্ত পশম কাটা হয়। একটি পশমের সূতার ব্যাস এক ইঞ্চির দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। মেরিনো ভেড়ার পশমের ব্যাস 15-25 মাইক্রন হয়। একটি পশমের সূতা যত বেশী লম্বা হইবে ও পাক খাইবে তত বেশী তার অর্থমূল্য। পশম ভেড়ার স্বাস্থ্য রক্ষা করে। খুব শীতে বা গরমে পশম কাটা চলে না। পশম কাটার সময় ভেড়াকে ভালোভাবে খাইতে দিতে হয়। শীতের শেষে পশম কাটা হয়।

পশম কাটার আগে ভেড়ার শরীর ভালো করিয়া পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। চারিপার্শ্বে ঢাকা গরম জায়গায় পশম কাটা হয়, বাইরের নোংরা যাহাতে পশমে না পড়ে তা দেখা হয়। কাঠের পাটাতনের

উপর ভেড়াকে তুলিয়া পশম কাটা হয়। পাটাতনের মাঝে 3-4 ইঞ্চি ফাঁক থাকে। এই ফাঁকের মধ্য দিয়া ভেড়ার মল-মূত্র নিচে পড়ে।

(ii) **ভেড়ার চামড়া :** ভেড়ার চামড়া দ্বারা অথবা পশমসহ ভেড়ার চামড়া দ্বারা নানা ধরনের পোশাক হয়।

(iii) **মাংস :** মেষপালকের টাকার দরকার হইলেই মাংসের জন্য ইহাদের বিক্রী করা হয়। ভেড়ার পিছনের দিক, পা ও কাঁধে মাংস বেশী থাকে। কম বয়সের ভেড়াকে খাসী করিলে তাহার মাংস নরম ও সুস্বাদু হয়। মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার বৃদ্ধির হার দ্রুত। বাজারে পুরুষ ও স্ত্রী ভেড়া উভয়েরই মাংস হিসাবে কদর আছে।

(iv) **সার :** ভেড়ার মল সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পেস্ট বা ক্ষতিকারক প্রাণী (Pests)

সূচনা (Introduction) :

কৃষিপণ্যের সঙ্গে জড়িত শস্যবানিকর কীটপতঙ্গকেই কৃষি প্রাণিবিদ্যায় **পেস্ট** (Pest) বা **ক্ষতিকারক প্রাণী** বলিয়া অভিহিত করা হইত। বর্তমানে এই ধারণা নতুন চিন্তাধারার আলোকে অন্যভাবে গণ্য করা হয়। কারণ অনেক প্রাণীই মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতি সাধন করে। কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য কিছু প্রাণী মাঠে ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে শস্য ও উদ্ভিদের ক্ষতি করে। শস্য গুদামজাত হইবার পরও ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণী কর্তৃক এই ক্ষতি সময়ে সময়ে অর্থনৈতিক ক্ষতির পর্যায় অতিক্রম করে। ইহা ব্যতীত কিছু পতঙ্গ ও প্রাণী (মশা, মাছি, ইঁদুর প্রভৃতি) বিভিন্ন রোগের জীবাণু বহন করিয়া মানুষের স্বাস্থ্যহানি করে। সুতরাং পেস্ট বা ক্ষতিকারক প্রাণীপ্রজাতির উপস্থিতিতে মানুষের কৃষিজ শস্যের, স্বাস্থ্যের অর্থাৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যাঘাত ঘটে।

কোনো একটি প্রাণী প্রজাতির নির্দিষ্ট বসতিতে যখন ইহাদের সংখ্যাধিক্য ঘটে এবং **থ্রেসহোল্ড অব অ্যাবানডান্স** (Threshhold of abundance) স্তর অতিক্রম করে; তখনই ইহাদের পেস্ট হিসাবে গণ্য করা হয়। কোনও পতঙ্গ প্রজাতির পেস্ট রূপে আত্মপ্রকাশ বিভিন্ন কারণেই ঘটিতে পারে। যেমন—বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বন্য উদ্ভিদপোষকের বিনাশ, অরণ্যানী হইতে ক্ষেতে পরিযান এবং প্রাকৃতিক শত্রুর অনুপস্থিতি ইত্যাদি। পৃথিবীতে সকল প্রণীর মধ্যে পতঙ্গ কর্তৃকই মানুষের সর্বাধিক অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন হয়।

উন্নত কৃষিবিদ্যার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িতেছে। কিন্তু এই সকল ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও প্রাণী কর্তৃক ইহার বৃহৎ একটা অংশের অপচয়ও সেই হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষিপণ্যের চাষ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্য যাহাতে এই সকল ক্ষতিকর প্রাণী কর্তৃক ও বিধ্বংসী রোগে নষ্ট না হয় এবং খাদ্য গুদামজাত অবস্থাতেও যাহাতে

ইহাদের হাত হইতে রক্ষা করা যায় সেইদিকে বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

কীটতত্ত্ববিদ (Entomologists)-দের প্রচেষ্টায় বর্তমানে বিভিন্ন পেস্ট নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির (Pest control measure) মাধ্যমে ইহাদের দমনের যথোচিত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হইয়াছে। কৃষি উন্নতিতে এই সকল পেস্ট গুলিরদমনের জন্য প্রয়োজন ইহাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান।

অতএব, অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ, অন্যান্য প্রাণীদের সনাক্তকরণ, জীবন-বৃত্তান্ত, ক্ষতির প্রকৃতি, পেস্টদের ধ্বংস করার উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

পেস্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির যথোপযোগী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ফসলের আবর্তন অর্থাৎ একই জমিতে বৎসর অন্তর অন্য ফসলের জন্য চাষ করা উচিত। ইহাতে একই প্রজাতির পেস্টের খাদ্যভাণ্ডার ফুরাইয়া সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। ফলে, ইহাদের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং এইভাবে পেস্টের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। গবেষণালব্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত ক্রপ ভ্যারাইটির চাষ করিয়াও ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।

কীটনাশক, রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার পেস্ট নিয়ন্ত্রণের বিশেষ দিক হিসাবেই সারা বিশ্বে গণ্য করা হয়। এই সকল পেস্টিসাইডের (Pesitcides) যথাযোগ্য ব্যবহারে খাদ্যশস্যের ক্ষতি বহুলাংশে রোধ করা যায়। কিন্তু বর্তমানে এই সকল রাসায়নিক পদার্থের কুফল মানুষ ও জীবজগতের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পরিবেশ দূষিতকরণে এবং জীবজগতের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার দরুন এইসকল রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার কমাইয়া **জৈবিক ব্যবস্থায়** (Biological control) নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। এই পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য খাদক, পরজীবী, নিয়ন্ত্রণ ভাইরাস ও ছত্রাকের অনুসন্ধান এবং পুরুষ পেস্টদের নির্বীজকরণের জন্য নিরলস গবেষণা চলিতেছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে জৈবিক নিয়ন্ত্রণের সুফলও পাওয়া গিয়াছে।

ফসলের ক্ষতিকারক পোকা (Insect pests of crops)

সমগ্র প্রাণিকূলের মধ্যে পতঙ্গগোষ্ঠীই কৃষিলব্ধ খাদ্যশস্যের অশেষ ক্ষতি-

সাধন করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদিত ফসলের প্রায় 13-15% পতঙ্গ কর্তৃক বিনষ্ট হয়। উন্নত কৃষি প্রথায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া যে ভাবেই চাষ হউক না কেন শস্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল পতঙ্গকূল বিঘ্নিত পরিবেশের সহিতও খাপ খাওয়াইয়া নিজেদের অভিযোজিত করে। এবং বংশবৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখে। এই সকল ক্ষতিকারক পতঙ্গসমূহ **কৃষিজ ক্ষতিকারক পতঙ্গ** বা **এগ্রিকাল্চারাল পেস্ট** (Agricultural pests) নামে অভিহিত।

বিভিন্নভাবে এই এই সকল পেস্ট ফসলের ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। বেশীর ভাগ কীটপতঙ্গ ফসল উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফল, বীজ এমনকি গঠনশীল শস্যদানার খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ লার্ভা (Larva) বা শুককীট অবস্থায় উদ্ভিদের কাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্ভিদাংশ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং নিশ্চিন্তে জীবনচক্র সমাধা করিয়া উদ্ভিদের ক্ষতিসাধন করে। আবার, কেহ কেহ ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমিত করিয়া উদ্ভিদ ব্যাধির সৃষ্টি করে। ফলে, ফসলের পরোক্ষ-ভাবে ক্ষতিসাধন হয়। কিছু কিছু কীটপতঙ্গ গুদামজাত শস্যেরও ভীষণভাবে ক্ষতি করিয়া থাকে।

কৃষি-উন্নতিতে এইসকল পেস্টদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এই অধ্যায়ে ফসলের ক্ষতিকারক উল্লেখযোগ্য পেস্টদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

পলিফ্যাগাস পেস্ট (Polyphagous pests) **:**

কোনও কোনও পেস্ট উহাদের জীবনের বিভিন্ন দশায় বহু ফসলের ক্ষতি করিয়া থাকে। খুব কমসংখ্যক প্রজাতির উদ্ভিদের নাম করা যায় যেগুলি এই সকল পেস্টদের খাদ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নহে। এই ধরনের স্বভাব-বৈচিত্র্যের জন্য সকল পেস্টদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যেমন— **মনোফ্যাগাস** (Monophagous), **অলিগোফ্যাগাস** (Oligophagous) এবং **পলিফ্যাগাস** (Polyphagous) ইত্যাদি। খুব কমসংখ্যক প্রজাতির পেস্ট **মনোফ্যাগাস** অন্তর্ভুক্ত। যে সকল পেস্ট একটি গোত্রের (Family) অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের উপর জীবনধারণ করে তাহাদের **অলিগোফ্যাগাস** শ্রেণীভুক্ত করা হয়। **পলিফ্যাগাস** অর্থাৎ বহু প্রজাতির (বিভিন্ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত) উদ্ভিদের উপর জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এই

সকল পেস্টদের এই নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের খাদ্যের তালিকায় অনেক বন্য উদ্ভিদও অন্তর্ভুক্ত। এই সকল পেস্টদের মধ্যে পঙ্গপাল (Locust), উইপোকা (Termite), হেয়ারি ক্যাটারপিলার (Hairy Caterpillar—*Diacrassia Obliqua*) এবং গঙ্গাফড়িং (Grasshoppers) উল্লেখযোগ্য। উইপোকা এবং গঙ্গাফড়িং-এর ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ ও জীবনবৃত্তান্ত এবং দমন পদ্ধতি ইক্ষুর ক্ষতিকারক পেস্টদের সহিত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইখানে কেবলমাত্র পঙ্গপালের (Locust) ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ, জীবনবৃত্তান্ত এবং দমন পদ্ধতি দেওয়া হইল।

পঙ্গপাল (Locust)

ভারতবর্ষে লোকাস্টের আক্রমণ উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দেখা গিয়াছিল। বেশ কয়েকবার (1812, 1821, 1834, 1843, 1863, 1869, 1878, 1896-97, 1901-03, 1906-07, 1912-15, 1926-31, 1940-46 এবং 1948-63) ইহাদের উপদ্রব মারাত্মক রূপ ধারণ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

পৃথিবীতে 11টি প্রজাতি-উপপ্রজাতির লোকাস্টের মধ্যে ভারতবর্ষে তিনটি প্রজাতির লোকাস্ট দেখা যায়। এগুলি হইল ;

(1) বোম্বে লোকাস্ট (Bombay Locust)—*Putange Succineta.*

(2) মাইগ্রেটরি লোকাস্ট (Migratory Locust)—*Locusta migratoria Linn.*

(3) ডেসার্ট লোকাস্ট (Desert Locust)—*Schistocerca gregaria* F.

ইহাদের মধ্যে ডেসার্ট লোকাস্টেরই প্রাধান্য বেশী এবং কয়েকবার ইহাদের আক্রমণ ভয়ংকর রূপ লইয়াছিল। প্রায় সব রকম কৃষিজাত ফসলের উদ্ভিদ এবং বন্য উদ্ভিদে ইহাদের আক্রমণ দেখা যায়।

লোকাস্টের বিস্তৃতি (Distribution) : লোকাস্ট দুইভাবেই দেখা যায়। যথা—এককভাবে (Solitary) অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভাবে ইহাদের আক্রমণ দেখা যায় এবং দলবদ্ধভাবে (*Gregarius*) অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে সক্রিয় হইয়া আক্রমণ করে এবং প্রচুর সংখ্যায় অল্প সময়ে বংশবৃদ্ধি করে। ভারতবর্ষে লোকাস্টের এককভাবে আক্রমণ সীমিত অঞ্চলে যথা—রাজস্থান, বরোদা,

সৌরাষ্ট্রের কিছু অংশ, হিসার প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায়।

পৃথিবীর সর্বত্রই—"ডেসার্ট লোকাস্টে"র বিস্তৃতি দেখা যায়। ভারতবর্ষের রাজস্থান হইতে শুরু করিয়া পাকিস্তান, আরব এবং মিড্‌ল্ ইস্ট (Middlle east) দেশগুলি এবং পূর্ব আফ্রিকাতে বিস্তৃত। দলবদ্ধভাবে ইহাদের আক্রমণ আফ্রিকা মহাদেশের সর্বত্র, পারসিয়া, প্যালেস্তাইন, রাশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশেও দেখা যায়।

পঙ্গপালের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of Locust and habit) ঃ

গঙ্গাফড়িং (Grasshoppers)-এর ঘনিষ্ঠতম হইলেই ইহাদের বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ইহারা প্রচুর সংখ্যায় উপযুক্ত পরিবেশে দলবদ্ধভাবে থাকে। পূর্ণাঙ্গ লোকাস্টদের উড়িবার ক্ষমতাও অনেক বেশী। ইহা ব্যতীত ইহারা প্রায় সমস্ত উদ্ভিদকেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

সাধারণভাবে দলবদ্ধভাবে যাহারা আক্রমণ করে উহাদের বর্ণ হলুদ অথবা গোলাপী হয় এবং সুস্পষ্ট কালো দাগ বিদ্যমান। এককভাবে যেসব লোকাস্ট দেখা যায় উহাদের বর্ণ পরিবেশের উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে ইহারা ধূসর বর্ণের হয়। ইহা ব্যতীত এই দুই রকম লোকাস্টের নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।

বৈশিষ্ট্য	দলবদ্ধভাবে আক্রমণকারী লোকাস্ট (GregariusLocust)	এককভাবে আক্রমণকারী লোকাস্ট (Solitary Locust)
1. ইলাইট্রার দৈর্ঘ্য এবং পেছনের পা-এর ফিমার-এর দৈর্ঘ্যের অনুপাত	2 : 15	2 : 5
2. চোখের উপরের দাগ (eye stripes)	7 সাধারণভাবে 6	কখনও কখনও 8টি
3. শুড়খণ্ডক	26	27-30

লোকাস্টের ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণকে 'সোয়ার্ম' (Swarm) বলা হয়। সমুদ্র উপকূলের প্রায় 1200 মাইল জুড়িয়া 'সোয়ার্ম' হইতে পারে।

জীবন ইতিহাস (Life history) :

স্ত্রী লোকাস্ট মিলনের পরই গর্তের মধ্যে ভিজা বালুমাটিতে 4-6 ইঞ্চি গভীরতায় প্রায় 50-100 ডিম পাড়ে। ডিম পাড়িবার পর স্ত্রী লোকাস্ট গর্তের মুখ ইহাদের দেহ-নিঃসৃত আঠালো পদার্থ দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। বসন্তকালে ডিম ফুটিতে 3-4 দিন এবং গ্রীষ্মকালে প্রায় দুই সপ্তাহ সময় লাগে। ডিম ফুটিয়া সদ্যোজাত ডানাবিহীন হপার্স বাহির হয় এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ খাইতে শুরু করে। ইহারা প্রথম দিকে কালো বর্ণের হয়। বৃদ্ধির সাথে সাথে 3-5 দিনের মধ্যে খোলস পরিত্যাগ করিতে থাকে। পূর্ণাঙ্গ লোকাস্ট হইতে পাঁচবার খোলস ত্যাগ করে। লোকাস্টের পূর্ণাঙ্গের আগের দশার সম্পূর্ণ সময়কাল বসন্তকালে ছয় সপ্তাহ এবং গ্রীষ্মকালে চার সপ্তাহ সময় লাগে। খোলস ত্যাগ করিবার পরপরই ইহাদের বর্ণেরও পরিবর্তন হইতে থাকে। পূর্ণাঙ্গ দশার প্রথমদিকে ইহাদের গোলাপী বর্ণ হইতে দেখা যায়। জননদশা প্রাপ্ত হইলে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ ধারণ করে। গোলাপী বর্ণের পূর্ণাঙ্গ দ্বারা কৃষিজাত ফসলের বেশী ক্ষতি হয়।

লোকাস্টের সোয়ার্মিং চক্রাকারে হয় এবং বিভিন্ন সময়ের দূরত্বে কিছুদূর অন্তর অন্তর পরিবেশের প্রভাবে বিস্তার লাভ কার। ভারতবর্ষে পূর্বে উল্লিখিত সালগুলিতে ইহাদের আক্রমণ দেখা গিয়াছিল। সাধারণভাবে 3-8 বৎসর ধরিয়া ইহাদের সক্রিয় আক্রমণ থাকে। বসন্তকালেই "সোয়ার্ম" বেশী দেখা যায়। বৃষ্টির শুরুতেই লোকাস্ট ডিম পাড়ে এবং অনেকদিন ধরিয়া এই কার্য সম্পাদন করে।

লোকাস্ট দমনে প্রতিরোধক সংস্থা অথবা অ্যান্টি লোকাস্ট অরগা-নাইজেশান (Anti Locust Organization) :

লোকাস্ট দমনের জন্য ভারতবর্ষে বিশেষ সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। যেহেতু লোকাস্ট বিশেষ কোন ফসলের নির্দিষ্ট পেস্ট বলিয়া বিবেচিত নয়, সেই কারণে চাষীদের দ্বারা বা এককভাবে ইহাদের দমন সম্ভবপর হয় না। সম্পূর্ণ বিষয়গুলি রাজ্যের সংস্থাকে দেখাশুনা করিতে হয়।

লোকাস্ট দমনের জন্য তাই দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে জোর দেওয়া হয়। প্রথমতঃ, লোকাস্ট দমনের কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত অর্থাৎ অ্যাডমিনিস-ট্রেটিভ (Administrative) এবং দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন দমন পদ্ধতির ব্যবহার অর্থাৎ টেক্‌নিক্যাল (Technical) দিক।

টেক্‌নিক্যাল দিকে লোকাস্টের নির্মূলীকরণ অথবা ধ্বংসসাধনের জন্য ইহাদের সব রকম বিবরণ জানা হয়। এই সব বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া দমনের উপায়গুলি ভাবা হয়।

পাকিস্তান, ইরান ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ হইতে লোকাস্টের নিয়মিত বিবরণ পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষে এই ধরনের সংস্থা রহিয়াছে। এই সংস্থা দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে লোকাস্ট বিস্তৃতির খবরাখবর প্রেরণ করে।

দমনের উপায় (Control measure) : নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে লোকাস্ট দমনের কথা ভাবা হয়।

1. **ডিমগুলির ধ্বংসসাধন** (Destruction of eggs) : লোকাস্ট যে সব স্থানে ডিম পাড়ে সেই নির্দিষ্ট স্থানের সন্ধান করিয়া সেইখানে গর্ত খোঁড়া হয়। এইবার সদ্যোজাত হপারগুলি সংগ্রহ করিয়া মারিয়া ফেলা হয়।

2. **রাসায়নিক** (Chemical) : ডিম ফুটিয়া সদ্যোজাত হপারগুলি তিনদিনের মধ্যে বাহির হয়। ইহাদের প্রথম ও দ্বিতীয় দশার জন্য 3% বি. এইচ. সি. (B. H. C.) প্রতি একরে 20-25 পাউণ্ড হারে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়, চতুর্থ দশার ক্ষেত্রে 5% বি. এইচ. সি. এবং পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দশায় উপনীত হইলে 10% বি. এইচ. সি. ঐ একইভাবে ছড়াইয়া দিতে হয়। 3% এলড্রিন (Aldrin) ব্যবহার করিয়া ইহাদের সব দশা দমনও সম্ভব হয়।

উপরোক্ত রাসায়নিক পদ্ধতিতে দমন ব্যতীত **বিষাক্ত পদার্থের টোপ** (Poison baits) ব্যবহার করিয়াও ইহাদের দমন করা যাইতে পারে।

বিষাক্ত টোপগুলি নিম্নোক্ত উপাদানগুলির সমন্বয়ে তৈয়ারি করা হয়।

1. সোডিয়াম ফ্লুয়োসিলিকেট—1 কিঃ গ্রা ;
2. গমের ব্রান, চালের খোসা ইত্যাদি—30 কিঃ গ্রা ;
3. গুড়—3 কিঃ গ্রা ;
4. জল—প্রয়োজন অনুযায়ী।

এই বিষাক্ত টোপ প্রতি একরে 20-30 পাউণ্ড হারে ব্যবহার করিতে হয়।

3. **সোয়ার্ম দমন** (Control of Swarms) : গ্রীষ্মকালে সোয়ার্মিং-এর সময় সতর্ক রাখিয়া ইহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়। সক্রিয় লোকাস্টগুলি রাত্রে ফসলের উপর আশ্রয় নেয়। এই সময় ইহাদের বিরক্ত করা হইলে দূরে উড়িয়া চলিয়া যায়। বিভিন্নভাবে ধোঁয়া সৃষ্টি করিয়া

ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হয়। ইহা ব্যতীত কীটনাশক ব্যবহার করিয়া পূর্ণাঙ্গদের দমন করা হয়। লোকাস্ট দমনের জন্য উন্নতিশীল দেশগুলিতে বিমান হইতে কীটনাশক ছড়ান হইয়া থাকে।

4. **প্রাকৃতিক শত্রু** (Natural enemies) ঃ কয়েকটি পাখী যেমন, ময়না, স্টারলিং ইহাদের ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ধানগাছের পেস্ট (Pests of paddy)

ভারতবর্ষের প্রধান ফসল ধান (Paddy) বৎসরে প্রায় 75 লক্ষ একর জমিতে চাষ করা হয়। পৃথিবীতে ধান্য উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। আধুনিক কৃষিপদ্ধতি অনুসরণে ধানের ফলন আগের তুলনায় বাড়িলেও কেবলমাত্র ধানগাছের বিভিন্ন ক্ষতিকারক পোকার আক্রমণে উৎপাদন অনেকাংশে ব্যাহত হয়। আসলে ধানক্ষেতের সৃষ্ট আবহাওয়াই বহুসংখ্যক ভ্যারাইটির ক্ষতিকারক পোকার বংশবৃদ্ধির সহায়ক হয়। এই সকল ক্ষতিকারক পোকা ধানগাছের বিভিন্ন অবস্থায় উহাদের বিভিন্ন দশায় আক্রমণ করিয়া বিশেষভাবে ক্ষতি করে। সেইজন্য ধানগাছকে এই সকল ক্ষতিকারক পোকার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতর্ক থাকিতে হইবে এবং পেস্ট নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Pest control measure) ব্যবহার করিতে হইবে।

ধানগাছে অসংখ্য পোকা আক্রমণ করে এবং ইহাদের মধ্যেও ডজনেরও বেশী পোকা সক্রিয়ভাবে ক্ষতি করে। ধানের ক্ষতিকারক এই সকল পোকা কখনও মেজর পেস্ট (Major pest) এবং মাইনর পেস্ট (Minor pest) হিসাবে গণ্য করা হয়। আক্রমণের প্রকৃতি অনুযায়ী এই সকল পেস্টের **স্টেম বোরার, পাতা ভক্ষণকারী সোয়ার্মিং ক্যাটারপিলার, রাইস-বার্গ, গলফ্লাই, লীফ হপ্‌ফার** প্রভৃতি নামকরণ করা হইয়াছে। নিম্নে ইহাদের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ, জীবনবৃত্তান্ত এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচিত হইল।

1. স্টেম বোরার বা কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা (Stem borer) ঃ

এই শ্রেণীর পেস্ট ধানগাছের কাণ্ড ছিদ্র করিয়া উহার অভ্যন্তরের নরম কলা (Tissue) ও রস ভক্ষণ করিয়া ধানগাছের ও শস্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। লেপিডপ্‌টেরা বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ছয়টি প্রজাতির মথের

লার্ভা এই প্রকার ধানগাছের পেস্ট। ইহাদের মধ্যে **ট্রাইপোরাইজা ইনসারটুলাস** (Tryporyza incertulus) ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধান উৎপাদনশীল অঞ্চলে ধানগাছের চরম ক্ষতি করে। শুধু ভারতবর্ষ নহে, পৃথিবীর সকল ধান্য-উৎপাদনকারী দেশগুলিতে এই মেজর পেস্টের আক্রমণ মারাত্মক হয়।

ট্রাইপোরাইজা ইনসারটুলাস (Tryporyza incertulus Walker) :

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)

বর্গ (Order) : লেপিডপ্‌টেরা (Lepidoptera)

গোত্র বা পরিবার (Family) : পাইরালেডি (Pyralidae)

ট্রাইপোরাইজা একটি মথ। এই মথের লার্ভা বা শুককীট ধানচাষী ভাইদের কাছে **মাজরা পোকা** নামে পরিচিত। ক্ষতিসাধনের মাপকাঠিতে এই মাজরা পোকার স্থান সর্বাগ্রে। এই পেস্ট কেবলমাত্র ধানগাছকেই আক্রমণ করে। সেইজন্য ইহাকে **মনোফ্যাগাস** (Monophagous) পেস্ট বলে।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stages and nature of damage) :

এই পেস্টের পূর্ণাঙ্গ দশা অর্থাৎ মথ ধানগাছের কোন ক্ষতি করে না। শুককীট বা লার্ভা দশাই কেবলমাত্র ধানগাছের পক্ষে ক্ষতিকারক। মথের শুককীটগুলি গাছের গোড়ার দিকের কাণ্ডে অর্থাৎ মূলের কাছাকাছি অঞ্চলের কাণ্ডাংশ ছিদ্র করিয়া কাণ্ডাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং নরম কলা ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ করে। ফলে, গাছটি শুকাইতে থাকে এবং 'ডেড্‌-হার্ট'-এ পরিণত হয়।

বাহির হইতে এই মাজরা পোকার আক্রমণ সহজেই বোঝা যায়। প্রারম্ভিক অবস্থায় এই মাজরা পোকার আক্রমণ ঘটিলে, সমগ্র ধানগাছটি শুকাইয়া যায় এবং ইহার কিছু পরে অর্থাৎ শীষ হইবার পরে আক্রান্ত হইলে ধানগাছের অগ্রাংশ সাদা হইয়া যায় এবং ধানের শীষ ঝরিয়া পড়ে। সাধারণভাবে মাজরা পোকার আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় গড়ে উৎপন্ন শস্যের শতকরা 20-25 ভাগ।

মাজরা পোকার বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of stem-borer and habit) :

পূর্ণাঙ্গ মথ দৈর্ঘ্যে প্রায় $\frac{1}{2}$ ইঞ্চির মত এবং ইহার ডানাজোড়া হলুদ বর্ণের। পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রীমথদের সহজেই আলাদা করিয়া চেনা যায়। স্ত্রীমথ আকারে তুলনামূলকভাবে বড় হয় এবং উহাদের উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের অগ্রডানার প্রতিটিতে একটি করিয়া ছোট অথচ সুস্পষ্ট কালো স্পট থাকে। গোধূলি এবং রাত্রির অন্ধকারে মথেরা উড়িয়া বেড়ায় এবং আলোকের দিকে আকৃষ্ট হয়।

জীবনচক্র (Life cycle) : মথেরা সচরাচর দিনের বেলায় বিশ্রাম করে, গোধূলির পরেই পুরুষ ও স্ত্রীমথ মিলিত হয়। যৌন মিলনের 2-3 দিন পরে স্ত্রীমথ দফায় দফায় ধানগাছে ডিম প্রসব করে। স্ত্রীমথ এককালীন 300-এর অধিক ডিম প্রসব করিতে সক্ষম। ডিমগুলি কয়েকটি স্তূপে কচি পাতার উপর সজ্জিত থাকে এবং ঈষৎ পীত বর্ণের শোঁয়া দ্বারা আবৃত থাকে। ডিমগুলি প্রথমদিকে কিছুটা সাদা বর্ণের হয় এবং পরে অর্থাৎ ডিম ফুটিবার প্রাক্কালে পুরো বাদামী বর্ণের রঙ ধারণ করে।

লার্ভা বা শুককীট (Larva) : ডিম ফুটিয়া লার্ভা বা শুককীট নির্গত হইতে 6-8 দিন সময় লাগে। ইহাদের গায়ে অসংখ্য শোঁয়া বা রোম হয়। ডিম হইতে উদ্ভূত লার্ভা প্রথমে পাতার উপরিতলের অংশ খাইতে খাইতে পাতার শীর্ষদিকে যায়। আবার কিছু কিছু লার্ভা নিজেদের লালা-নিঃসৃত সূতার সাহায্যে পাতায় আটকে থাকিয়া ঝুলিতে থাকে। অতঃপর বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া কাছাকাছি অন্য ধানগাছের উপর আসিয়া পরে এবং সেই গাছের কাণ্ডের কোন এক অংশে একটি ছিদ্র করিয়া উহার কলার মধ্যে অবস্থান করে। কিছু কিছু লার্ভা ধানগাছের কাণ্ডের নীচের দিকে নামিয়া বিটপ অংশে পৌছায়। অতঃপর লার্ভা কাণ্ডে ছিদ্র করিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং নরম কলা খাইতে শুরু করে। কাণ্ডাভ্যন্তরে উহার কলা ভক্ষণ করিয়া লার্ভা পরিণতি লাভ করে। কাণ্ডের মধ্যে থাকাকালীন লার্ভা 1 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। পরিণত লার্ভার মসৃণ দেহ ঈষৎ হলুদ বর্ণের এবং এবং মস্তকটি পীতাভ কমলা বর্ণের হয়। অবশেষে লার্ভা বা শুককীট পিউপায় রূপান্তরিত হয়। এই দশা সম্পন্ন হইতে 20-30 দিন লাগে।

পিউপা (Pupa) : এই দশাও কাণ্ডের ভিতরে অতিবাহিত হয়। পিউপায় রূপান্তরিত হইবার পূর্বে লার্ভাটি আহার ত্যাগ করে। লার্ভা কাণ্ডের মধ্যে নিজের লালানিঃসৃত করিয়া কোকুন (Cocoon) বা গুটি

তৈয়ারি করে এবং পিউপায় পরিণত হয়। পিউপা দশার সময়কাল 9 হইতে 10 দিন। এই সময়কাল অতিবাহিত হইবার পর পিউপা হইতে সমঙ্গ মথ তৈয়ারী হয়। যে ছিদ্রের মধ্য দিয়া লার্ভা কাণ্ডাভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই ছিদ্র দিয়া অথবা পিউপায় রূপান্তরিত হইবার পূর্বে লার্ভা কর্তৃক নতুন আর একটি ছিদ্র পথে কাণ্ড হইতে মথ বাহির হয়।

পূর্ণাঙ্গ (Adult) : পূর্ণাঙ্গ দশা 3 হইতে 5 দিন স্থায়ী হয় এবং পুনরায় একটি নতুন জন্তুর সৃষ্টির সূচনা করে। এইভাবে মাজরা পোকার জীবনচক্র বৎসরে একাধিকবার আবর্তিত হয়।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) :

বোরো ধানে মার্চ হইতে এপ্রিল এবং আমন ধানে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে মাজরা পোকার সর্বোচ্চ আক্রমণ ঘটিয়া থাকে। অবশ্য ফসলের যে কোনো সময়েই অর্থাৎ মার্চ হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ইহাদের উপদ্রব চলিতে থাকে।

2. **সোয়ার্মিং ক্যাটারপিলার** (Swarming caterpillar) : (চিত্র 28)

ধানগাছের সবুজ পাতা ভক্ষণকারী এই শ্রেণীর পেস্টের আক্রমণ সময়ে সময়ে খুবই মারাত্মক হইয়া উঠে। এই মেজর পেস্ট **স্পোডোপটেরা মাউরিসিয়া** (Spodoptera mauritia) ধানগাছের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকারক পতঙ্গ। ভারতবর্ষে বিশেষত : সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইহাদের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। প্রাচ্য দেশ ব্যতীত ও অস্ট্রেলিয়ান প্রদেশ, এমনকি পশ্চিম আফ্রিকাতেও ইহাদের বিস্তৃতির সন্ধান মেলে। দলবদ্ধভাবে ইহাদের আক্রমণে গাছের ফলন নিদারুণ ভাবে ব্যহত হয়।

স্পোডোপটেরা মাউরিসিয়া (Spodoptcra mauritia Boisduval) :

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)

বর্গ (Order) : লেপিডপ্‌টেরা (Lepidoptera)

পরিবার (Family) : নক্‌টুইডি (Noctuidae)

ইহারা একজাতীয় মথ। ইহাদের শুককীটগুলি পশ্চিমবঙ্গের চাষী-ভাইদের কাছে **লেদাপোকা** নামে পরিচিত। ধানগাছ ব্যতীত ভুট্টা, গম, বার্লি, জোয়ার ইত্যাদি উদ্ভিদে ইহাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখে। সেইজন্য ইহারা পলিফ্যাগাস (Polyphagous) পেস্ট।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি
(Harmful stage and nature of damage)

মথের শুককীট বা শুঁয়াপোকা (caterpiller) দশাই নার্শারী এবং ক্ষেতের কচি ধানগাছের সবুজ পাতা খাইয়া ধ্বংস করে। শুঁয়াপোকাগুলি দলবদ্ধভাবে থাকে এবং দলবদ্ধভাবে ধানক্ষেত আক্রমণ করে এবং ফসলের পাতা খাইয়া ফসলের উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যাহত করে। ক্ষেতে ইহাদের উপদ্রবে মনে হয় যেন গো-মহিষাদি দ্বারাই ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। আবার দলবদ্ধভাবে পাশের ধানক্ষেতে চলিয়া যায় এবং সেইখানেও একই-ভাবে ধানগাছের পাতা খাইয়া নষ্ট করে। এইভাবে ধানক্ষেত আক্রমণ করাতেই এই পেস্টদের **'আর্মি ওয়ার্ম'**ও বলে।

লেদাপোকার বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of swarming caterpillar and habit) :

ধূসর বাদামী রঙের পূর্ণাঙ্গ মথ মাঝারি আকৃতির হয়। মথের পিছনের ডানজোড়া প্রায় সাদা এবং সামনের ডানাজোড়ার প্রান্তে ঢেউখেলানো বিচিত্র ধরনের নক্সা বিদ্যমান। ইহারা কেবলমাত্র রাত্রে ক্ষেত আক্রমণ করে। এবং দিনের বেলায় লুকাইয়া যায়।

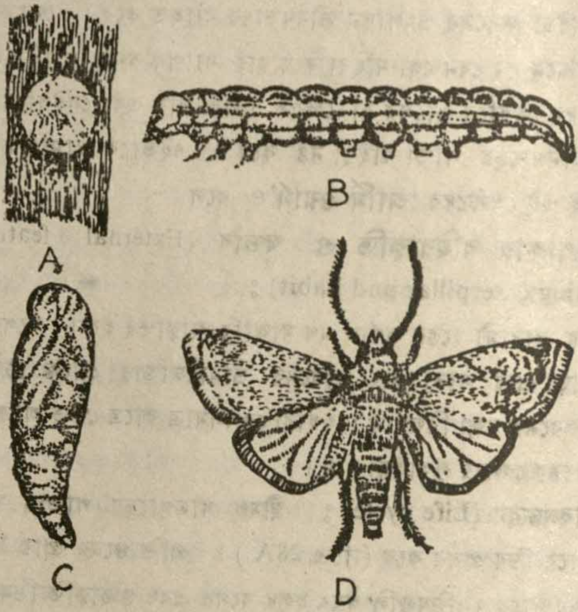
জীবনচক্র (Life cycle) : স্ত্রীমথ ধানগাছের পাতার অঙ্কীয়তলে গুচ্ছাকারে ডিম প্রসব করে (চিত্র 28A)। প্রতি গুচ্ছে প্রায় 100 হইতে 400 ডিম থাকে। ডিমগুলি ঈষৎ হলুদ বর্ণের এবং গুচ্ছাকৃতি ডিমগুলি ঈষৎ পীতবর্ণের শোঁয়া দ্বারা আবৃত থাকে।

শুককীট (Larva) : 6 হইতে 8 দিনের মধ্যে ডিম হইতে শুককীট (চিত্র 28B) নির্গত হয়। শুককীটগুলি কচি ধানগাছের পাতা খাইয়া দৈর্ঘ্যে বাড়িতে থাকে। পরিণত শুককীট প্রায় দেড় ইঞ্চির মত লম্বা হয়। শুঁয়াপোকার দুই পাশের দৈর্ঘ্য বরাবর হলুদ-বাদমী বর্ণের দাগ থাকে। শুককীট দশার সময়কাল প্রায় তিন সপ্তাহ। অতঃপর পিউপা দশায় রূপান্তরিত হয়।

পিউপা (Pupa) : ইহাদের পিউপা দশা (চিত্র 28C) মাটির ভিতরে অতিক্রান্ত হয়। ঠিক এই সময়ে ধামক্ষেতে ইহাদের উপস্থিতি খুব একটা বোঝা যায় না। চাষীভাইরা একটু আশ্বস্ত হন। পিউপা দশা 10-12 দিনের মত স্থায়ী হয়।

পিউপা পূর্ণাঙ্গ মথে (চিত্র 28D) পরিণত হইয়া মাটির বাহিরে চলিয়া আসে এবং আবার নূতন জন্তুর সৃষ্টির সূচনা ঘটনা। বৎসরে 2 হইতে 4 বার এই পেস্টের জীবনচক্র আবর্তিত হয়।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) : বিভিন্ন অঞ্চলের এই পেস্টের আক্রমণের সময়ও বিভিন্ন। তবে, পশ্চিমবঙ্গে ফেব্রুয়ারী-



চিত্র 28 : সোয়ার্মিং ক্যাটারপিলার
A-ডিম, B-শুককীট, C-পিউপা এবং D-পূর্ণাঙ্গদশা

মার্চ মাসে বোরো ধানে এবং মে হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত আউস ও আমন ধানে ইহাদের আক্রমণ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

3. রাইস বাগ বা গাঁধি পোকা (Gundhi bug) :

এই ধরনের পেস্ট কচি ধানের শীষ এবং পাতা ও কাণ্ডের রস শোষণ করিয়া ধানগাছের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। **লেপটোকরাইজা অ্যাকুটা** (*Leptocorisa acuta*) বা **লেপটোকরাইজা ভেরিকরনিস্** (*Leptocorisa varicornis*) এ ধরনের একপ্রকার চোষক পোকা। ইহাদের আক্রমণের ব্যাপকতায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসল ধ্বংস হয়। ভারতবর্ষ

ছাড়াও চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন এবং অস্ট্রেলিয়া প্রদেশে ইহাদের বিস্তৃতির ইতিহাস জানা যায়।

লেপটোকরাইজা ভেরিকরনিস্ (Leptocorisa varicornis Fabr) :

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)

বর্গ (Order) : হেমিপ্‌টেরা (Hemiptera)

পরিবার (Family) : করিডি (Coreidae)

পশ্চিমবঙ্গে এই পেস্ট সচরাচর ধানক্ষেতে আক্রমণ করে। ইহারা **পলিফ্যাগাস** (Polyphagous) হইলেও ধানগাছেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব বেশী। ইহাদের দেহ হইতে একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়। সেই কারণেই ইহারা **গাঁধিপোকা** নামে-ই বেশী পরিচিত।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature damage) :

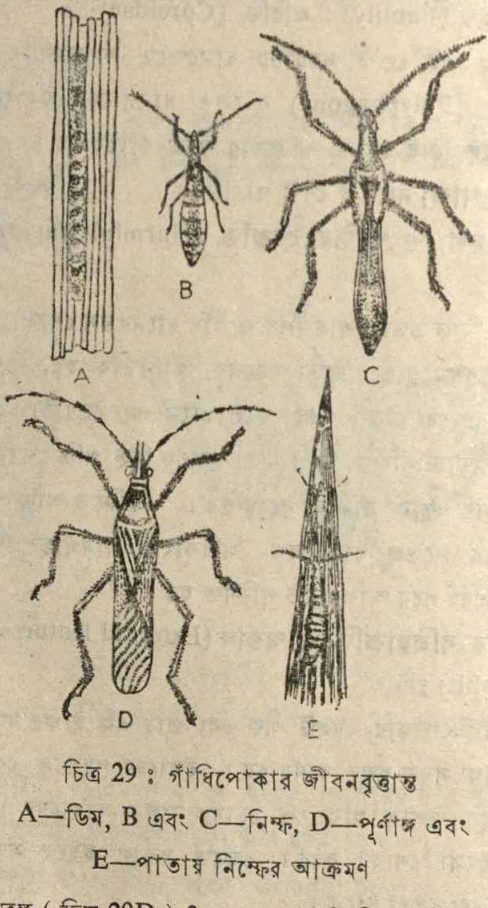
পূর্ণাঙ্গ ও নিম্ফ উভয় দশাই শিষ ও কচি ধানের রস শোষণ করে। ইহারা ধানের শীষের যখন দুধের মতো তরলের আবির্ভাব হয়, তখনই এই রস চোষন করে খেয়ে নেয়। এর ফলে ধানে শষ্য তৈয়ারী হইতে পারে না বলে ধান আগড়ায় পরিণত হয়। আক্রমণের চিহ্ন প্রতি শীষেই লক্ষ্য করা যায়। আক্রান্ত স্থান বাদামী রঙের হয়। এমনিতে আক্রান্ত ধানের শীষ স্বাভাবিকভাবে সতেজ থাকিলেও অধিকাংশ ধানগাছই আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় এবং পরে আগড়াতে পরিণত হয়।

গাঁধিপোকার বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of Gundhi bug and habit) :

পূর্ণাঙ্গ গাঁধিপোকার দেহটি সরু এবং প্রায় এক ইঞ্চির মত লম্বা হয়। গায়ের রঙ হাল্কা সবুজ-হলুদ বর্ণের হয়। ইহাদের পদগুলি বেশ লম্বা এবং পরিবর্তিত মুখ উপাঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট চোষক নলের সাহায্যে শিষ এবং কচি ধানের রস দুবেলা শোষণ করে। ক্ষেতে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই গাঁধিপোকার তৎপরতা থাকে।

জীবনবৃত্তান্ত (চিত্র 29) : স্ত্রী গাঁধিপোকা পাতার উপর এক সারিতে 15-20টি করিয়া ডিম (চিত্র 29A) প্রসব করে। বীজের মত ডিমগুলি বাদামী বর্ণের হয়। সাধারণতঃ একসপ্তাহের পরেই ডিম ফুটিয়া নিম্ফ বাহির হয়।

নিম্ফ (Nymph) ঃ সক্রিয় সবুজ রঙের নিম্ফ কচি ধানগাছের পাতা (চিত্র 29E) ও কাণ্ডের রস শোষণ করে খেতে থাকে। নিম্ফ (চিত্র **29B, C**) অনেকটা পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের মতো। তবে ইহারা আকৃতিতে ছোট এবং ডানা বিহীন। নিম্ফ দশা 14 হইতে 25 দিন স্থায়ী হয়। এই সময়ের মধ্যে নিম্ফ পাঁচবার খোলস ত্যাগ করিয়া পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয়।



চিত্র 29 : গাঁধিপোকার জীবনবৃত্তান্ত
A—ডিম, B এবং C—নিম্ফ, D—পূর্ণাঙ্গ এবং
E—পাতায় নিম্ফের আক্রমণ

পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ (চিত্র 29D) 3 মাসেরও বেশী দিন বাঁচিয়া থাকে। সমগ্র জীবনচক্র সম্পন্ন করিতে 20 হইতে 30 দিন সময় লাগে। গাঁধিপোকার জন্তুর সৃষ্টি বৎসরে কয়েকবার আবর্তিত হয়। ফসল কাটিবার পর গাঁধিপোকা পার্শ্ববর্তী উদ্ভিদ অথবা ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের উপর বাস করে। এবং সেই সব উদ্ভিদে ইহাদের জীবনচক্রের ধারাহিকতা বজায় থাকে।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) :

গাঁধিপোকার আক্রমণ আগষ্টের মাঝামাঝি হইতে নভেম্বর পর্যন্ত আউস ও আমন ধানেই উপদ্রব বেশী হয়।

4. **গল্ ফ্লাই** (Gall fly) :

এই ধরনের পেস্টের আক্রমণে ধানগাছের কাণ্ডে রূপার মত শুভ্রবর্ণের নলাকার গল্ সৃষ্টি হয় এবং গাছের ফলন নিদারুণভাবে ব্যহত হয়। **প্যাকিডিপ্লোসিস ওরাইজি** (*Pachydiplosis oryzae*) নামক গল্ফ্লাই এক প্রকার মেজর পেস্ট। ভারতবর্ষের আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, এবং মহারাষ্ট্রে গলসৃষ্টিকারী এই পতঙ্গের প্রাদুর্ভাবে ধানগাছের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

প্যাকিডিপ্লোসিস ওরাইজি (Pachydiplosis Oryzae) :

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)

বর্গ (Order) : ডিপ্‌টেরা (Diptera)

পরিবার (Family) : সিসিডোমাইডি (Cecidomyidae)

পশ্চিমবঙ্গের চাষীভাইদের কাছে এই পেস্ট **'ভেঁপুপোকা'** এবং হিন্দীভাষীদের কাছে 'গঙ্গাই' নামে পরিচিত। ডিপ্‌টেরা বর্গের অন্তর্গত এই পতঙ্গের প্রাদুর্ভাব সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলেই বেশী দেখা যায়।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature of damage) :

এই পেস্টের লার্ভা বা গ্রাব দশাই ধানগাছের পক্ষে ক্ষতিকারক। 5-6 সপ্তাহের ক্ষেতের ধানগাছই ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। গ্রাব বা লার্ভা মধ্যবর্তী কাণ্ডাংশের কলার ভেতরে প্রবেশ করিয়া নষ্ট করে। ফলে, গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং ক্ষুদ্রাকার গলের সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ এই গল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং রূপার মতো শুভ্রবর্ণের রঙ ধারণ করে। জলাবদ্ধ ধানক্ষেতে এই পেস্টের আক্রমণ বেশী দেখা যায়।

গলফ্লাই-এর বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of Gall fly and habit) :

আকৃতিগতভাবে মশার সাথে মিল পাওয়া যায়। স্ত্রী মাছি উজ্জ্বল লাল বর্ণের এবং আকারে তুলনামূলকভাবে পুরুষদের থেকে বড় হয়। পূর্ণাঙ্গ মাছি রাত্রিবেলায় সক্রিয় থাকে এবং দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে। ইহারা

আলোকের দিকে আকৃষ্ট হয়।

জীবনবৃত্তান্ত : স্ত্রীমাছি পাতার অঙ্কীয়তলে একসঙ্গে 2 হইতে 6টি, আবার কখনও কখনও একটি ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি 0·5 হইতে 0·6 মি. মি. দৈর্ঘ্য হয় এবং লাল রঙের হয়। 4 হইতে 5 দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া লার্ভা বা গ্রাব নির্গত হয়।

গ্রাব বা লার্ভা (Grub) : সদ্যজাত গ্রাব পাতা বাহিয়া নীচে নামিতে থাকে যতক্ষণ না কাণ্ডে পৌঁছায়। কাণ্ডে পৌঁছাইয়া উহা কাণ্ড ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং কলা ধ্বংস করে এবং ফলে ধানের শীষ সমেত কাণ্ডের পরিবর্তে একটি ফাঁপা শুভ্রবর্ণের গল সৃষ্টি করে। গ্রাবের গাঁয়ের রঙ হাল্কা গোলাপী বর্ণের হয়। গ্রাব অতঃপর গলের মধ্যে পিউপাতে পরিণত হয়।

পিউপা (Pupa) : পিউপার দৈর্ঘ্য 2 থেকে 2·5 মি. মি. পর্যন্ত হয়। পিউপার বর্ণও গোলাপী থাকে। পিউপা দশা 3 হইতে 5 দিনের মত স্থায়ী হয়। এবং অতঃপর পূর্ণাঙ্গ মাছিতে পরিণত হয়। এবং কাণ্ডের ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসে। সমগ্র জীবনচক্রের সময়কাল 14 হইতে 20 দিনের মত।

আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী বৎসরে একাধিকবার জীবনচক্র সম্পন্ন হয়।

ধানগাছের ক্ষতিকারক আরও কয়েকটি পোকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
(Other insect pests of paddy) :

5. **সাধারণ নাম : রাইস লীফ্ হপ্ফার** (Rice leaf hopper)।

বৈজ্ঞানিক নাম : *Nephotettix apicalis* Mot.

বহিরাকৃতি : সবুজ বর্ণের পোকা চাষীদের কাছে 'জ্যাসিড' (Jassid) নামে পরিচিত। পতঙ্গের সামনের ডানাজোড়ায় কালো 'প্যাচ' থাকে। দেহের দুই ধারে কালো রঙের দাগ বিদ্যমান।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি : পূর্ণাঙ্গ ও নিম্ফ দশা পাতা হইতে রস শোষণ করিয়া ক্ষতি করে। আক্রান্ত পাতা শুকাইয়া হলুদ বর্ণের হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমিয়া যায়।

জীবনচক্র (Life cycle) : সম্পূর্ণ জীবনচক্রের সময়কাল প্রায় 20-23 দিন। একটি স্ত্রীপতঙ্গ প্রায় 420টির মত ডিম পাড়ে। গুচ্ছাকৃতি ডিম

ফুটিয়া নিম্ফ বাহির হয়। ডিম ফুটিতে 6-7 দিন সময় লাগে। নিম্ফ পাঁচবার খোলস ত্যাগ করিয়া পূর্ণাঙ্গতে পরিণত হয়। স্ত্রীপতঙ্গের আয়ুষ্কাল প্রায় দুই মাস।

6. **সাধারণ নাম :** রাইস কেস ওয়ার্ম (Rice case warm)।

বৈজ্ঞানিক নাম : *Nymphula depunctalis* Guen.

বহিরাকৃতি : পূর্ণাঙ্গ মথ সাদা বর্ণের এবং সম্মুখ ডানাজোড়ায় হলুদ রঙের ছাপ থাকে। হাল্কা সবুজ বর্ণের লার্ভা দৈর্ঘ্যে প্রায় 15 মি. মি.। মস্তক অংশ হলুদ বর্ণের হয়।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি : লার্ভা দশায় পাতার এপিডারমিস্ অংশ খায়। ফলে পাতা গুটাইয়া যায়। গুটানো পাতাগুলি গাছের তলায় জলে ভাসিতে দেখা যায়। আক্রান্ত উদ্ভিদের শস্যদানার সৃষ্টি হয় না। ধানক্ষেতে লক্ষ্য করিলে মনে হয় গবাদি পশু দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।

জীবনচক্র (Life cycle) **:** 38-40 দিন ধরিয়া জীবনচক্র সম্পন্ন করে। স্ত্রীমথ পাতার নীচে ডিম পাড়ে। স্ত্রী মথের আয়ুষ্কাল 4 দিন। এরই মধ্যে স্ত্রীমথ 50টির মত ডিম পাড়ে। 5-7 দিনের পর ডিম ফুটিয়া লার্ভা বাহির হয়। পরিণত লার্ভা সবুজ বর্ণের হয়। লার্ভা দশার স্থায়ীকাল প্রায় 25 দিন। লার্ভা পিউপায় পরিণত হয়। পিউপা দশা প্রায় 8 দিন কাটাইয়া সমঙ্গ মথ বাহির হয়।

7. **সাধারণ নাম :** রাইস হিস্পা (Rice hispa) অথবা **পামরি পোকা**।

বৈজ্ঞানিক নাম : *Dicladispa armigera* Oliv.

বহিরাকৃতি : পূর্ণাঙ্গ বিটল ঘন কালো বর্ণের হয়। দেহে রোম থাকে।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি : পূর্ণাঙ্গ ও লার্ভা উভয় দশাই ক্ষতিকারক। পূর্ণাঙ্গ বিটল পাতার সবুজ অংশ খাইয়া ক্ষতি করে। লার্ভা পাতার মধ্যবর্তী কলা খাইয়া ধ্বংস করিয়া থাকে। আক্রান্ত পাতার উপর সমান্তরাল রেখার সৃষ্টি হয়। পাতা সাদা পর্দার মতো হইয়া মরিয়া যায়।

জীবনচক্র (Life cycle) **:** স্ত্রীবিটল কচি পাতায় একটি করিয়া ডিম পাড়ে। 6-10 দিন পর ডিম ফুটিয়া লার্ভা বাহির হয়। লার্ভা পাতার

মধ্যবর্তী অংশে ঢুকিয়া কলা খাইতে থাকে। লার্ভা দশার স্থায়ীকাল 9-12 দিন। পিউপা দশাও পাতার ভিতরে দুই স্তরের মধ্যে 9-12 দিন থাকে। পূর্ণাঙ্গ বিটল পাতার এপিডারমিস ফুটা করিয়া বাহির হয়।

8. **সাধারণ নাম :** খারিফ্ গ্রাস্ হপ্‌ফার (Kharif grass hopper) অথবা **ধানের ফড়িং**।

বৈজ্ঞানিক নাম : *Hieroglyphus banian* Fabr.

বহিরাকৃতি : সবুজ-হলুদ বর্ণের হপার প্রায় 2·5 ইঞ্চির মত দৈর্ঘ্য সম্পন্ন হয়। বক্ষ অংশের দুই ধারে তিনটি কালো রঙের দাগ থাকে।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি : পূর্ণাঙ্গ ও নিম্ফ উভয় দশাতেই পাতা ও কাণ্ড খাইয়া অশেষ ক্ষতি সাধন করে। আক্রান্ত পাতার শুধু মধ্যশিরা দেখা যায়। গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ইহারা সময়ে সময়ে দেখা যায়। এবং তখন ক্ষতি খুব মারাত্মক আকার ধারণ করে।

জীবনচক্র (Life cycle) **:** মাটির নীচে স্ত্রীপতঙ্গ একসাথে প্রায় 30 40টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি মাটির কুটুরীর মধ্যে অনেকদিন ধরিয়া (কয়েকমাস) থাকে। ডিম ফুটিয়া ডানাবিহীন নিম্ফ বাহির হয়। প্রায় 8-10 সপ্তাহ পর নিম্ফ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। নিম্ফ 5-6 বার খোলশ ত্যাগ করে।

ধানগাছের পেস্ট দমনের উপায় (Control measures of paddy pests) **:**

বিভিন্ন পেস্টের আক্রমণ হইতে ধানগাছকে রক্ষা করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যায়।

(1) **যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ** (Mechanical control) **:** ধানের ক্ষেতে পেস্ট দেখা দিলেই হাত দিয়া যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া অন্যত্র মারিয়া ফেলিতে হইবে। অনেক সময় ডিম পাতায় দৃশ্যমান হয়। যেমন, মাজরা ও লেদাপোকার ডিম। ইহাদের ডিমগুলি পাতা হইতে সংগ্রহ করিয়া ধান-গাছের ক্ষতি কিছুটা রোধ করা সম্ভব হয়। যেহেতু **ট্রাইপোরাইজা** এক-প্রকার মথ সুতরাং আলোর দিকে ইহারা ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়। **আলোক ফাঁদ** (Light trap) পাতিয়া ইহাদের সংগ্রহ করিয়া কীটনাশক দ্রবণে ডুবাইয়া ধ্বংস করা হয়। ট্রাইপোরাইজা ব্যতীত অন্যান্য ধরনের পোকার পূর্ণাঙ্গ দশাকেও এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(2) **রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ** (Chemical control) : বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ফসলের রক্ষার্থে প্রয়োগ করিতেই হয়। ব্যাপকভাবে ধানক্ষেত আক্রান্ত হইলে বিভিন্ন কীটনাশক তখন অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। কীটনাশকের কার্যপদ্ধতির উপর ইহাদের কয়েকভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

(i) **সিস্টেমিক কীটনাশক** (Systemic insecticide) : উদ্ভিদ-কলার অভ্যন্তরে এই প্রকার কীটনাশক দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে। যেমন,—লেড্ আরসিনেট, ডিমেক্রন, প্যারাথিয়ন, পলিথিয়ন, এনড্রিন ইত্যাদি।

মাজরা পোকার লার্ভা বা পিউপা দশা এইপ্রকার কীটনাশক প্রয়োগে কাণ্ডের ভিতরেই মারা যায়। অন্যান্য আরও পেস্টও এইভাবে দমন করা সম্ভব হয়।

(ii) **কনট্যাক্ট কীটনাশক** (Contact insecticide) : সাবান দ্রবণ, নিকোটিন দ্রবণ, নিকোটিন সালফেট, কেরোসিন ইমালসান প্রভৃতি কনট্যাক্ট কীটনাশক প্রয়োগে পোকা দমন করা হয়। এই কীটনাশক পোকার স্পর্শে গেলেই স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়।

(iii) **ফিউমিগেশান বা বাষ্পস্নান** (Fumigation) : কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের (ফিউমিগ্যান্টস) বাষ্প বা ধূপ পেস্টের পক্ষে বিষাক্ত। এইগুলির প্রয়োগে অধিকাংশ পেস্ট ধ্বংস করা যায়। মিথাইল ব্রোমাইড, ক্যালসিয়াম অ্যাগানাইড প্রভৃতি ফিউমিগ্যান্টস ব্যবহার করা হয়।

(3) **জৈবিক নিয়ন্ত্রণ** (Biological control) : ক্ষতিকারক পেস্টের উপযুক্ত শত্রুর (খাদক, পরজীবী, ভাইরাস) ব্যবহারে পেস্টের নিধন এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়ে।

নির্বীজকরণ (*Sterilization*) : বর্তমানে ধানের ক্ষতিকারক পেস্ট নিয়ন্ত্রণে এই পদ্ধতি লইয়া গবেষণা চলিতেছে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Preventive measure) :

ধান চাষের প্রথম হইতেই নিম্নোক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে বিভিন্ন পেস্ট দমনে সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

(1) **ফসলের আবর্তন** (Crop rotation) : একই জমিতে বার বার ধান চাষ করা হইলে পেস্টের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং বংশবৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ

রাখে। সেই জন্য ফসলের আবর্তন করা প্রয়োজন। ইহাতে একই উদ্ভিদ না পাওয়ায় ইহাদের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ফলে নিয়ন্ত্রণে থাকে।

(2) **আগাছা ধ্বংসসাধন** (Destruction of weeds)ঃ নিয়মিত আগাছা কাটা কয়েকটি পেস্ট হইতে পরিত্রাণের উপায়, যেমন—মাজরা পোকা, পামরী পোকা, ইত্যাদি। ফসল কাটিয়া লইবার পর ইহারা ধান-ক্ষেতের পাশে আগাছায়ও ডিম পাড়ে। পরবর্তী ফসলের শুরুতেই ইহাদের আক্রমণ করিতে দেখা যায়।

(3) **ধানগাছের গোড়ার ধ্বংসসাধন**ঃ চাষের পূর্বে পড়িয়া থাকা ধানগাছের গোড়া তুলিয়া পোড়াইয়া দিতে হইবে। ইহাতে মাজরা পোকার শুককীট বা লেদা পোকার পিউপা থাকিলে ধ্বংসসাধন হয়।

ধানের পেস্টদমনে কার্যকরী কীটনাশকের প্রয়োগবিধি
(Application of effective insecticides for control of paddy pests)

1. **মাজরা পোকা** (*Tryporyza incertulus*)—নার্শারীতে 15 দিন অন্তর অন্তর প্রতি একরে 270 মিলিলিটার এনড্রিন (20 E. C) স্প্রে করিতে হইবে। ইহার পর ক্ষেতে ধান গাছ রোপণ হইলে 0·025% প্যারাথিয়ন অথবা ·08% এনড্রিন প্রতি একরে 60-80 গ্যালন হিসাবে 15 এবং 35 দিন অন্তর দুইবার স্প্রে এবং 60 দিন পর আর একবার স্প্রে করিলে মাজরা পোকার আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষা করা যায়। লিনডেন (2%) এবং এণ্ডোসালফান (4%)-এর দানা প্রতি একরে 12 কি.গ্রা হিসাবে ছড়াইয়া ইহাদের রোধ করা যায়।

2. **লেদা পোকা** (*Spodoptera mauritia*)—প্রতি একরে 15 পাউণ্ড হিসাবে 10% বি. এইচ. সি. ছড়াইতে হয়। ইহা ব্যতীত 0·04% এণ্ডোসালফান অথবা 0·2% কার্বারিল স্প্রে করিলেও ইহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

3. **গাঁধিপোকা** (*Leptocorisa varicornis*)—উদ্ভিদে শস্যদানা আসিবার পূর্বেই প্রতি একরে 0·25% ডি. ডি. টি. (D. D. T.) ইমালশান 60-80 গ্যালন হিসাবে স্প্রে করিলে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

4. **গলফ্লাই** (*Pachydiplosis Oryzae*)—0·037% ইথাইল প্যারা-থিয়ন অথবা 0·04% এনড্রিন ধানগাছের বৃদ্ধির সময় চারবার স্প্রে করিতে

হয়। ডায়াজিনন, সেভিডল, এনড্রিন-এর দানাদার কীটনাশকের ব্যবহারও কার্যকরী হয়।

5. **রাইস লীফ হপার** (*Nephotettix apicalis*)—নার্শারী ও ক্ষেতে রোপণ করিবার পর 525 সি.সি. ফরোডন (35 E.C.) অথবা 900 সি.সি. এনড্রিন (20 E.C.) অথবা 100 C.C. ডেমক্রন 500 লিটার স্প্রে করিলে সুফল পাওয়া যায়। লিনডেন অথবা কার্বারিল দানাদার কীটনাশক ব্যবহারেও উপকার পাওয়া যায়।

6. **রাইস কেস ওয়ার্ম** (*Nymphula depunctalis*)—প্রতি একরে 20-30 কি.গ্রা. হিসাবে 5% বি. এইচ. সি. ছড়াইলে ইহাদের আক্রমণ বন্ধ করা যায়। 0·02-0·05 ইথারের সহিত প্যারাথিয়ন অথবা সেভিন মিশাইয়া স্প্রে করিলেও সুফল পাওয়া যায়।

7. **রাইস হিস্‌পা** (*Dicladispa armigera*) : 0·04-0·05% প্যারাথিয়ন অথবা 0·03-0·04% এনড্রিন স্প্রে অথবা 5% বি. এইচ. সি. ছড়াইলে উপকার পাওয়া যায়।

8. **ধানের ফড়িং** (*Hieroglyphus banian*)—প্রতি একরে 15-20 পাউণ্ড 5% বি. এইচ. সি. আক্রমণ দশার উপর ছড়াইলে উপকার পাওয়া যায়। 616 সি.সি. ম্যালাথিয়ন (50 E.C.) 300 লিটার জলে প্রতি একরের জন্য গুলিয়া স্প্রে করিলে ইহাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়। প্রতি একরে 60-80 গ্যালন অ্যালড্রিন (0·02%) স্প্রে করিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

গম গাছের পেস্ট (Pests of wheat)

ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে গম গাছের ক্ষতিকারক পেস্টের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কিন্তু পৃথিবীর অন্যত্র কয়েকটি দেশে বিশেষতঃ আমেরিকা ও রাশিয়ায় গম উৎপাদনশীল অঞ্চলগুলিতে বেশ কয়েকটি ক্ষতিকারক পেস্টের প্রকোপ খুব বেশী। ভারতবর্ষের গম উৎপাদনশীল অঞ্চলগুলিতে উঁইপোকা (Termite) এবং গুজিয়া উইভিল (Gujhia weevil)-ই গম শস্যের বেশী ক্ষতি করিতে দেখা যায়। ইহা ব্যতীত এক ধরনের স্টেম বোরার (Stem borer), এফিড্ (Aphid), আর্মি ওয়ার্মস্ (Army worms) প্রভৃতি ক্ষতিকারক পতঙ্গ মাঝে মাঝে গমক্ষেতে ক্ষতি করিতে দেখা যায়।

যাহা হউক, মোটের উপর জোর দিয়া বলা যাইতে পারে যে গমক্ষেতে

জল সেচনের সুব্যবস্থায় এই শস্য পেস্ট কর্তৃক তেমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তবে, শস্যদানা গুদামে স্থানান্তরিত হইলে, সেইখানে বিভিন্ন পেস্ট কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং গম উৎপাদন ব্যাহত হয়। **"গুদামজাত শস্যের ক্ষতি-কারক পোকামাকড়"**—এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

উঁইপোকা ও গুজিয়া উইভিল ব্যতীত গম গাছের ক্ষতিকারক পেস্টগুলি হইল—

1. **মাথিম্না সেপারেটা**—*Mathimna Separata* (Mawortta)
2. **টক্সোপ্‌টেরা গ্রামিনাম**—*Toxoptera graminum* R.
3. **সিসামিয়া ইনফারেন্স**—*Sesamia inferens* wlk.
4. **সিরফিস্ লোরেই**—*Cirphis loreyi* Dup.

উঁইপোকা ও গুজিয়া উইভিল গম গাছের প্রাথমিক অবস্থাতেই ক্ষতি করিয়া থাকে। উভয়ই গম গাছের মূলেই আক্রমণ করে এবং ক্ষতির প্রকৃতিও একই রকম। ক্ষতিগ্রস্ত গম গাছে ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।

গম গাছ ব্যতীত উঁইপোকা আরও বিভিন্ন শস্যের ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। আখ বা ইক্ষুর একটি উল্লেখযোগ্য পেস্ট বলিয়া গণ্য করা হয়। **"ইক্ষু গাছের পেস্ট"**—এইখানেই উঁইপোকার আলোচনা করা হইয়াছে। এইখানে কেবলমাত্র গুজিয়া উইভিল-এর ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ, জীবনবৃত্তান্ত এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচনা করা হইল।

গুজিয়া উইভিল (Gujhia weevil) **বা ট্যানিমেকাস ইণ্ডিকাস** (Tanymecus indicus Faust) :

শ্রেণী (Class) : ইনসেক্টা (Insecta)
বর্গ (Order) : কোলেওপটেরা (Coleoptera)
গোত্র (Family) : Curculionidae

ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যেই এই পেস্টের বিস্তৃতি দেখা যায়। গম গাছ ব্যতীত বার্লি, ভূট্টা, মটর প্রভৃতি শস্যও ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহারা গম গাছের প্রভূত ক্ষতি করে এবং সময়ে সময়ে পুনরায় রোপণ করিবার দরকার হয়।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature of damage) :

পূর্ণাঙ্গ ও লার্ভা উভয় দশাই গম গাছের মূলে ক্ষতি করিয়া থাকে। পূর্ণাঙ্গ

উইভিল সময়ে সময়ে গাছের উপরি অংশে আসিয়াও ক্ষতি করে। অঙ্কুরোদ্গমের পরেই মাটির নীচে মূল অঞ্চলে কাটিয়া দেয়, ফলে উদ্ভিদের আর বৃদ্ধিই ঘটে না।

পেস্টের বহিরাকৃতি ও জীবনবৃত্তান্ত (External features of the pest & life history):

কালো বাদামি বর্ণের উইভিল দৈর্ঘ্যে প্রায় 4-8 মি.মি. এবং প্রস্থে প্রায় 2-3 মি.মি. পর্যন্ত হয়। ইহার জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণভাবে জানা না গেলেও ইহা নিশ্চিত যে মাটির নীচেই স্ত্রী উইভিল ডিম পাড়ে। লার্ভা ও পিউপা দশায় মাটির নীচেই কাটাইয়া দেয়।

দমন পদ্ধতি (Control operations):

মাটির নীচে লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ উইভিল দমন করিবার জন্য এলড্রিন (Aldrin), হেপ্টাক্লোর (Heptachlor) অথবা ক্লোরডেন (Chlordane) প্রভৃতি কীটনাশক প্রতি হেক্টরে 20 কি.গ্রা. হারে বপন করিবার সময়েই ব্যবহার করিতে হয়। গাছে শস্য সৃষ্টি হইলেই 5% B. H. C. প্রায় 15-20 কি.গ্রা. হারে প্রতি হেক্টরে ছড়াইয়া দিতে হয় এবং ইহাতে ভাল ফল দেখা যায়।

আখ বা ইক্ষুর ক্ষতিকারক পেস্ট (Pests of sugarcane)

ভারতবর্ষের অর্থকরী গুরুত্বপূর্ণ ফসলের মধ্যে আখ বা ইক্ষু অন্যতম। প্রায় 2·5 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে প্রতি বৎসর ইক্ষুর চাষ হয়। ক্রমবর্ধমান চিনি-শিল্প বর্তমানে ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং উপদ্বীপ অঞ্চল-গুলিতেই এই শিল্পের প্রসার বাড়িতেছে।

কিন্তু অর্থকরী এই ফসলের উৎপাদন বিভিন্ন পেস্টের আক্রমণে দারুণ-ভাবে ব্যহত হয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

100-র বেশী প্রজাতির পতঙ্গ এই ফসলের ক্ষতি করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর সমগ্র ইক্ষু উৎপাদনের প্রায় 10% কেবলমাত্র পতঙ্গ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা ব্যতীত Acarina বর্গের অন্তর্গত মাইট (Mite), নিমাটোড (Nematodes), ইদুর (Rats), শৃগাল (Jackals), কাঠবিড়ালী (Squirrels) এবং কয়েকপ্রকার পাখী দ্বারাও

বিনষ্ট হয়।

ক্ষতিকারক পতঙ্গদের মধ্যে প্রায় দুই ডজন প্রজাতি মেজর পেস্ট বলিয়া গণ্য করা হয়। মথ বোরার (Moth borer), টারমাইট (Termite), হোয়াইট-গ্রাব (White-grubs), স্কেল ইনসেক্ট (Scale insect), লাইগিড বাগ্ (Lygaeid bug), মিলি বাগ্ (Mealy bug), পাইরিলা (Pyrilla), আর্মি ওয়ার্ম (Army worm) এবং গঙ্গা ফড়িং অথবা গ্রাস হপার্স্ (Grass-hoppers) প্রভৃতি ইক্ষু গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন দশায় ক্ষতি করিয়া থাকে। উপদ্বীপ অঞ্চলগুলির তুলনায় সমগ্র উত্তর ভারতে এই সব পেস্টদের উপদ্রব বেশী এবং চাষের বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

সুতরাং এই সকল পেস্টদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রতি-রোধের উপায়গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিগত চার দশক ধরিয়া এই সকল পেস্টদের জীবন ইতিহাস, আক্রমণ পদ্ধতি ও সময়কাল, এবং দমন পদ্ধতি বিষয়ক অনেক গবেষণা চলিতেছে। এইখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পেস্টের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ, জীবনবৃত্তান্ত ও প্রতিরোধের উপায় আলোচিত হইল।

1. মথ বোরার (Moth borers) ঃ

আখ বা ইক্ষুর বিভিন্ন পেস্টদের মধ্যে মথ বোরারদের উপদ্রব সর্বত্র বিস্তৃত। ইহাদের দমন করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষে প্রায় একডজন প্রজাতির মথ ইক্ষুর ক্ষতি করিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে টপ্ বোরারদের (Top borers) ব্যাপকতা সমগ্র ইক্ষু উৎপাদনশীল অঞ্চলেই দেখা যায়। অন্যান্য বোরার পেস্ট কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ক্ষতি করিয়া থাকে। টপ্ বোরারের সম্পূর্ণ বিবরণ ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি বোরারদের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ, বহিরাকৃতি, ও নিয়ন্ত্রণ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইল।

ইক্ষু টপ্ বোরার (*Sugarcane top borer*) ঃ

ভারতবর্ষের ইক্ষু উৎপাদনশীল অঞ্চলের প্রায় সব জায়গাতেই এই মেজর পেস্টের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নাম থেকেই স্পষ্টতঃ বলা যায় উদ্ভিদের উপরি অংশেই ইহাদের দ্বারা আক্রমণ ঘটে। মধ্যপাতার মধ্য দিয়া টানেল সৃষ্টি করিয়া লার্ভা আক্রমণ করে ফলে, পাতা শুকাইয়া যায় এবং অবশেষে **'ডেড্ হার্ট'**-এ পরিণত হয়।

ট্রাইপোরাইজা নিভেল্লা (*Tryporyza nivalla Fab*) ঃ

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insceta)

বর্গ (Order) : লেপিডপ্‌টেরা (Lepidoptera)

পরিবার (Family) : পাইরালেডি (Pyralidae)

উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, এবং বিহারেই এই মথ জাতীয় পেস্টের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করিতে দেখা যায়।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature of damage) ঃ

লার্ভা বা শুককীট দশাই ক্ষতিকারক। সদ্যোজাত লার্ভা ডিম হইতে ফুটিয়াই পাতার মধ্যশিরা বরাবর অগ্রসর হইতে থাকে। উদ্ভিদের উপরি-অংশে প্রবিষ্ট হইয়া কাণ্ডের মধ্যবর্তী অংশে গর্ত করিয়া উহার ভিতরে টানেলের সৃষ্টি করে। এই রকম অনেকগুলি গর্ত যখন সৃষ্টি হয় পাতার বর্ণ বিবর্ণ হইয়া যায় এবং 'ডেড্‌হার্ট'-এ পরিণত হয়। মধ্যবর্তী পাতা আক্রান্ত হইলে ইহার ধার হইতে আরও পাতার উদ্ভব হয়। উদ্ভিদের এই অবস্থা সৃষ্টি হইলে 'বাঞ্চিটপ' (Bunchytop) নামে অভিহিত করা হয়। উদ্ভিদের সব দশাতেই এই পেস্ট আক্রমণ করে।

পেস্টের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of the pest and behaviour) ঃ

সিলভার বর্ণের মথ প্রসারিত ডানা হইয়া প্রায় $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চির মত দৈর্ঘ্য সম্পন্ন হয়। স্ত্রীমথের উদর খণ্ডক পুরুষ মথের তুলনায় মোটা হয় এবং এনালটাক্ট কমলা বর্ণের হয়। পুরুষ মথের প্রথম ডানাজোড়ায় প্রতিটিতে একটি করিয়া কালো স্পট দেখা যায়।

সন্ধ্যার পরই মথদের আক্রমণের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

জীবনচক্র (Life cycle) ঃ ইহাদের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হইতে প্রায় 7-8 সপ্তাহ সময় লাগে।

ডিম (Eggs) ঃ গুচ্ছাকৃতি (6-70) ডিমগুলি পাতার নীচে বাদামী বর্ণের রোমে ঢাকা থাকে। আঁশের মত চ্যাপ্টা আকৃতির ডিমগুলি সূর্যের বিপরীতে সহজেই দৃশ্যমান হয়। একটি স্ত্রীমথ প্রায় 500টির মত ডিম পাড়িতে পারে। 6-13 দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া লার্ভা বাহির হয়।

লার্ভা বা শুককীট (Larva) ঃ প্রায় সাদা অথবা মাখন বর্ণের

সদ্যোজাত লার্ভা কিছুক্ষণ পরই পাতার মধ্যশিরা বরাবর অগ্রসর হইয়া উদ্ভিদের উপরিভাগে উপনীত হইয়া ছিদ্র তৈয়ারি করে। এইরকম চার-পাঁচটি ছিদ্র করিয়া অবশেষে কাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে টানেল সৃষ্টি করে। পরিণত লার্ভা হলুদ বর্ণের এবং দৈর্ঘ্য প্রায় $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চির মত হয়। লার্ভা-দশার স্থায়ীকাল 26-52 দিন।

পিউপা (Pupa): লার্ভা বা শুককীট টানেলের মধ্যে সিল্কের কোকুন তৈয়ারি করিয়া পিউপা দশায় রূপান্তরিত হয়। পিউপার বর্ণ বাদামী হয় এবং এই দশার স্থায়ীকাল উপযুক্ত পরিবেশে 7-11 দিন।

পূর্ণাঙ্গ (Adult): পিউপা সিলভার বর্ণের সমঙ্গ মথে রূপান্তরিত হইয়া অন্য ছিদ্র তৈয়ারি করিয়া বাহিরে আসে। ইহারা পাতার উপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্ত্রীমথ নিষিক্ত হইয়া গুচ্ছাকৃতি ডিম পাড়িতে শুরু করে।

বৎসরে প্রায় 5-7টি জনু দেখা যায়। সম্পূর্ণ শীতকাল লার্ভা দশায় কাটাইয়া দেয়।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation):

মার্চের প্রথমেই ইহাদের আক্রমণ শুরু হয়। ইহারা এপ্রিলের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ডিম পাড়ে। মার্চের শেষ পর্যন্ত প্রথম জনু (1st generation) সৃষ্টি হইতে থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইহাদের সক্রিয় আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রাকৃতিক শত্রু (Natural enemies): কয়েক প্রজাতির চালসিড্ (Chalcid) পরজীবী ইহাদের ডিম, লার্ভা ও পিউপা দশায় আক্রমণ করে। উল্লেখযোগ্য chalcid হইল—**চোগ্রাম্মা মাইনুটাম** (*Chogramma minutum*)।

দমন (Control)

(1) **যান্ত্রিক** (Mechanical): ডিম সমেত পাতার অপসারণ এবং প্রয়োজনে সম্পূর্ণ উদ্ভিদটিই নিয়মিত কাটিয়া ফেলিতে হয়। চাষ করিবার সময় পরিত্যক্ত পাতা এবং আখের গোড়া তুলিয়া পুড়াইয়া দেওয়া হয়। লার্ভা বা শুককীট ইহাতে থাকিলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(2) **রাসায়নিক** (Chemical): প্রতি হেক্টরে প্রায় 1 কেজি

(সক্রিয়তায়) করিয়া এনড্রিন (Endrin) অথবা এণ্ডোসালফান (Endosulfan) স্প্রে করিলে ইহাদের দমন করা যায়। জুন মাসের শেষে অথবা জুলাইয়ের প্রথমেই এই স্প্রে করা প্রয়োজন। এরপর নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী স্প্রে করিলে ফলপ্রসূ হয়। ডাইএলড্রিন (Dieldrin), ক্লোরোডেন প্রভৃতি কীটনাশক ব্যবহারেও সুফল পাওয়া যায়।

আখ বা ইক্ষুর অন্যান্য বোরার পেস্টদের সংক্ষিপ্ত ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি

(Brief description, damages of other borer pests of sugarcane and their control measure)

2. **সাধারণ নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম** (Common name and scientific name)—শুট বোরার (Shoot borer) *Chilo infuscatellus shell.*

ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ (Description of damage) : ধূসর বাদামী বর্ণের মথ। লার্ভাদশায় কাণ্ডের উপর হইতে ফুটা করিয়া মূল অংশের কাছাকাছি পর্যন্ত টানেলের সৃষ্টি করে। আক্রান্ত উদ্ভিদ 'ডেড হার্ট'-এ পরিণত হয় এবং উৎপন্ন আখরস নিম্নমানের হয়। ইহাদের লার্ভা বা শুককীট অন্যান্যদের থেকে সহজেই আলাদা করা যায়। লার্ভার দেহ বরাবর উপরি অংশে পাঁচটি বেগুনী বর্ণের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। ইহা ব্যতীত সম্মুখ পা-জোড়ায় অর্ধ-গোলাকার ক্রোচেট (Crochets) বিদ্যমান। ডিম, লার্ভা ও পিউপা দশার স্থায়ীকাল যথাক্রে 4-6 দিন, 21-28 দিন, এবং 6-7। জুন-জুলাই মাসেই ইহাদের আক্রমণ বেশী লক্ষ্য করা যায়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control measure) : চাষের সময় পরিত্যক্ত পাতা ও কাণ্ডের অপসারণ এবং পুড়াইয়া দিতে হয়। আলোকফাঁদের সাহায্যে মথ সংগ্রহ করিয়া মারিয়া ফেলিতে হয়। আখগাছ লাগাইবার পরেই গামা বি. এইচ. সি. (gama B.H.C.) হেপ্টাক্লোর (Heptachlor) অথবা টেলোড্রিন (Telodrin) ইমালশান প্রতি হেক্টরে এক কে.জি. হারে (সক্রিয়-ভাবে) 1500 লিটার জলে গুলিয়া ছড়াইয়া দিলে ইহাদের আক্রমণ অনেকাংশে কম হয়।

3. **সাধারণ নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম** (Common name and

scientific name)—রুট বোরার (Root borer) *Emmalocera depresella* Swinh.

ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ (Description of damage) ঃ ইহারাও মথ জাতীয়। র‍্যাটুন (Ratoon) ফসলেই ইহাদের লার্ভা বা শুককীট আখ-গাছের গোড়ায় কাণ্ডাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভীষণভাবে ক্ষতি করে। ইহাদের আক্রমণের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ইহারা কাণ্ডের উপরের দিকে না গিয়া মূল অঞ্চলের দিকেই টানেল সৃষ্টি করিয়া ক্ষতি করে। আক্রান্ত উদ্ভিদ 'ডেড্ হার্ট'-এ পরিণত হয়। মথের পশ্চাদদিকের ডানাজোড়ায় লম্বালম্বি স্ট্রাইপস থাকে। লার্ভা দশার স্থায়ীকাল প্রায় 40 দিনের মত। এপ্রিল মাসের শেষ হইতে অক্টোবরের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ইহাদের বেশী আক্রমণ করিতে দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control measure) ঃ উপরোক্তভাবেই ইহাদের দমন করা হয়। 0·05% মনোক্রোটোফস (Monocrotophos) কীট নাশক ব্যবহারেও সুফল পাওয়া যায়।

4. **সাধারণ নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম** (Common name and scientific name)—স্টক বোরার (Stalk borer)—*Chilo auricilius* Ddgn ঃ

ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ (Description of damage) ঃ ধূসর বর্ণের মথের সম্মুখস্থ ডানাজোড়ার ধারে বাদামী বর্ণের ছোপ দেখা যায়। লার্ভা কাণ্ডের কলা সম্পূর্ণভাবে খাইয়া টানেলের সৃষ্টি করে। কখনও কখনও 6-7টি ক্যাটার-পিলার একই টানেলে অবস্থান করিয়া আক্রমণ করে। আক্রান্ত আখ গাছ সম্পূর্ণভাবেই 'মড্ হার্ট-এ পরিণত হয়। প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরিয়া জীবন-চক্রের এক মাসেরও বেশী লার্ভা দশা স্থায়ী হয়। বৎসরে প্রায় 5-6টি জন্ম দেখা যায়। মার্চ হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইহাদের আক্রমণ মারাত্মক হয়। জলবদ্ধ ক্ষেতেই পেস্টের আক্রমণ বেশী দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control measure) ঃ জলাবদ্ধ ক্ষেতের আখের সেট্স (Setts)-এর অপসারন। ক্ষেতে যাহাতে জল না জমিতে পারে নালি কাটিয়া তাহার সুব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আক্রমণের শুরু হইতেই 0·1% এনড্রিন (Endrin) নিয়মিত স্প্রে করিলে ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

5. **সাধারণ নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম** (Common name and scientific name)—গুরুদাস বোরার (Gurudas borer) ***Bissetia Steni ellus*** Hmpsn :

ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ (Description of damage) : ধূসর-বাদামী বর্ণের মথগুলির সম্মুখস্থ ডানাজোড়ায় ছোপ দেখা যায়। লার্ভা দশায় কাণ্ডে গোলাকার ছিদ্র করিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সর্পিল রেখায় ইহারা টানেল সৃষ্টি করিয়া আখের ক্ষতি করে। আক্রান্ত আখ গাছ অল্প বাতাসেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। ডিম, লার্ভা ও পিউপা দশার স্থায়ীকাল যথাক্রমে 6-10 দিন, 21-28 দিন এবং 7-14 দিন। জুলাই মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইহাদের আক্রমণ বেশী দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control measure) : ফসল কাটিবার পর গভীর করিয়া হাল চাষ করিতে হয়। ফলে হাইবারনেটিং লার্ভার ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘটে। 0·1% এনড্রিন (Endrin) নিয়মিত স্প্রে করিলে এই বোরারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আখগাছ লাগানোর পরপরই স্প্রে করা উচিত।

6. **সাধারণ নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম** (Common name and scientific name)—**প্লেসিবোরার** (Plassey borer)—Chilo tumidi costalis.

ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ (Description of damage)—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং আসামে এই মথের উপদ্রব বেশী দেখা যায়। আখের পর্বমধ্যে লার্ভাগুলি জমায়েত হয় এবং গর্ত করিয়া উদ্ভিদের উপরি অংশের কলা খাইয়া ধ্বংস করে। আক্রান্ত উদ্ভিদের সমস্ত পাতাগুলিই শুকাইয়া যায় এবং উদ্ভিদটি আর বাড়িতে পারে না। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ইহাদের সম্পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করিতে প্রায় 39-64 দিন লাগে। লার্ভা দশায় স্থায়ীকাল 26-46 দিন। এপ্রিল-অক্টোবর মাস পর্যন্ত আক্রমণ বেশী দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control measure)—আলোকফাঁদ ব্যবহারে মথ সংগ্রহ করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। এনড্রিন (Endrin) ইমালশান ব্যবহারে প্লেসিবোরারের আক্রমণ কম হয়। ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর, টোক্সাফেন স্প্রে করিয়াও ইপ্সিত ফল পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রজাতির মথ বোরারের সনাক্তকরণ (Identification of various species of moth-borers) :

ইক্ষু বা আখ গাছের ক্ষতিকারক বোরার পেস্টদের প্রত্যেকেরই পৃথক দমন পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়। সেইজন্য এর পূর্বেই প্রত্যেকটি প্রজাতিকেই ভালভাবে চেনা দরকার।

ইক্ষু গাছের মথ বোরারদের বিভিন্ন প্রজাতির লার্ভা দশা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়। যেমন—(ক) সরেখ (Striped) অর্থাৎ লার্ভার গায়ে দাগ বিদ্যমান, এবং (খ) অরেখ (Unstriped) অর্থাৎ লার্ভার গায়ে কোন রকম দাগ থাকে না।

পরপৃষ্ঠায় বিভিন্ন প্রজাতির মথ বোরারদের (লার্ভা দশায়) সহজে চিনিবার জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি ছকের মাধ্যমে দেখানো হইল।

মথ বোরারদের জৈবিক নিয়ন্ত্রণ (Biological control of moth-borer) :

বর্তমানে মথ বোরার দমনে বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহারের সাথে সাথে জৈবিক নিয়ন্ত্রণের উপরও সমান জোর দেওয়া হইতেছে। এই সকল মথ বোরারদের ডিম, লার্ভা ও পিউপা দশায় পরজীবী পতঙ্গ দ্বারা বংশবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হয়। উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং মধ্যপ্রদেশের এই সকল পরজীবী ব্যবহার মথ বোরারদের দমনে ফলপ্রসূ হইয়াছে। দেশীয় পরজীবীদের মধ্যে **আইসোটোমিয়া জ্যাভেনসিস** (*Isotomia javensis* Rohw.) ইক্ষু টপ বোরার-এর বংশবৃদ্ধিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখা যায়। ইহারা পেস্টের প্রি-পিউপা (Pre-pupa) দশায় আক্রমণ করে। উড়িষ্যাতেও শুট বোরারের লার্ভা ও পিউপা দশায় এক ধরনের ট্যাকনিড ফ্লাই (Tachnid fly) ব্যবহার করিয়া ভাল ফল লক্ষ্য করা হইয়াছে। হরিয়ানাতেও এই ট্যাকনিড ফ্লাই—*Sturmiopsis inferens* Tns-এর ব্যবহার সন্তোষজনক।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দেশীয় আরও কতকগুলি পরজীবীর ব্যবহার জৈবিক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। যেমন—

1. **ডিমের পরজীবী** (Egg parasites)—**ট্রাইকোগ্রামা ইভানেসসেন্স মাইনুটাম** (*Trichogramma evanescens minutum* Riley. **টেলেনোমাস বেনিফিসিয়েন্স** (*Telenomus beneficiens* Zehnt.)

মথ বোরার

(ক) সরেখ সম্পন্ন (Striped)

বৈশিষ্ট্য	গুটবোরার	স্টকবোরার	গুরুদাস বোরার	প্লেসী বোরার
1. দাগের সংখ্যা	পাঁচ	পাঁচ	চার ধারের দিকের দুইটি দাগ অপেক্ষাকৃত মোটা	চার
2. বর্ণ	বেগুনী	বেগুনী	বেগুনী	গোলাপী-বাদামী বর্ণের
3. টিউবরকূল-এর বর্ণ	ধূসর	ধূসর	পৃষ্ঠায় টিউবরকূল ধূসর বর্ণের এবং ধারের দিকের টিউবরকূল ধূসর কালো বর্ণের	ধূসর

(খ) অরেখ (Unstriped)

বৈশিষ্ট্য	টপবোরার	রুটবোরার	গ্রীনবোরার	পিঙ্কবোরার
1. বর্ণ	ঈষৎ হলুদ দাগ	সাদা	তুঁতরঙের	গোলাপী বর্ণের
2. স্বভাব প্রকৃতি	মন্থর	কিছুটা সক্রিয়	খুব সক্রিয়	খুব সক্রিয়
3. আকৃতি	সম্পূর্ণ দৈহিক আকৃতি একই প্রকার	বক্ষের প্রথম অংশ খুব চওড়া এবং উদর অংশের শেষ অংশ খুব সরু হইয়া যায়।	ক্ষুদ্র আকৃতির সম্পূর্ণই একই প্রকার	সম্পূর্ণ একই প্রকার

2. লার্ভার পরজীবী (Larval parasites)—অ্যাপান্টেলেস ফ্লাভিপেস (*Apanteles flavipes* Cam.), স্টেনোব্রাকন ডিসি (*Steno-bracon deesae* Cam.), র‍্যাকোনোটাস স্কিরপোফ্যাগী (*Rhaconotus Scirpophagae* Wlk.)

3. পিউপার পরজীবী (Pupal Parasites)—টেট্রাসটিকাস ইসরায়েলি (*Tetrastichus israeli* Mani & Kurian), টেট্রাটিকাস আয়ারি (*Tetrastichus ayyari* Mani).

এই সকল দেশীয় পরজীবী ব্যতীত বর্তমানে বহির্দেশীয় পরজীবীর ব্যবহারও কোনও কোনও অঞ্চলে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য বহির্দেশীয় সকল পরজীবীর মধ্যে *C. indicus*-এর ডিমের পরজীবী ট্রাইকোগ্রামা অস্ট্রালিকাম (*Trichogramma australicum* Gir) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ইক্ষুক্ষেত্রে C. I. B. C. (ব্যাঙ্গালোর) দ্বারা ব্যবহৃত পরজীবী টেলেনোমাস আলেক্টো (*Telenomus alecto* Crast) পশ্চিমবঙ্গের শুটবোরার-এর ক্ষেত্রে জৈবিক নিয়ন্ত্রণে ভাল ফল লক্ষ্য করা হইয়াছে।

7. উইপোকা (Termite) :

পৃথিবীর সর্বত্র উইপোকার বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। প্রায় বেশীর ভাগ ফসল এবং অন্যান্য মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু ইহাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাঠের আসবাবপত্র, বাড়ীঘর, প্রভৃতির মারাত্মকভাবে ক্ষতি করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের ইক্ষু আক্রমণকারী উইপোকার বিভিন্ন প্রজাতিগুলি হইল—

1. ওডোনটোটারমেস ওবেসাস (*Odontotermes obesus* Ramb.)

2. ওডোনটোটারমেস অ্যাসিউম্থি (*Odontotermes assumthi* Hlmgr.)

3. ওডোনটোটারমেস ট্যাপ্রোবেন্‌স (*O. taprobanes* Wlk.)

4. ওডোনটোটারমেস বেনগালোরেনসিস্ (*O. bengalorensis* Hlmgr.)

5. এরেমোটারমেস প্যারাটোক্সালিস্ (*Eremotermes para-toxalis* Hlmgr.)

6. ট্রাইনারভিটারমেস বাইফরমিস (*Trinervitermes biformis*

Wasm.)

7. **মাইক্রোটারমেস ওবেসি** (*Microtermes obesi* Hlmgr.) এবং

8. **কোপ্‌টোটারমেস হিমি** (*Coptotermes heimi* Wasm.)

ইক্ষু ক্ষেতে সেট্‌স (Setts)-গুলি রোপণ করিবার কিছুদিনের মধ্যেই ইহাদের দ্বারা আক্রমণ শুরু হয়। আখ গাছের কাটা দিকটাতে (মাটির ভিতরের অংশ) এবং কুড়িতেই প্রথম ইহাদের আক্রমণ দেখা যায়। মারাত্মকভাবে আক্রমণের ফলে অঙ্কুরোদ্গোম তো ঘটেই না আবার নতুনভাবে সেট্‌সগুলি রোপণ করিবার প্রয়োজন হয়। যে সকল অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ সেচের ব্যবস্থা থাকে না সেই সব অঞ্চলের দোঁয়াশ মাটিতে এবং শুষ্ক অঞ্চলে সাধারণভাবে অঙ্কুরিত হইবার পরই আক্রান্ত হয়। প্রথমাবস্থায় বাহিরের দিকের পাতাগুলি শুকাইতে থাকে। পরবর্তীকালে সর্বত্র আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণ উদ্ভিদটিই শুকাইয়া যায়। বেশীরভাগ অঞ্চলে বৃষ্টি শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের আক্রমণ কমিয়া যায়। কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে যেমন, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে বর্ষার পরও ইহাদের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এইসব ক্ষেত্রে উদ্ভিদের নীচের অংশ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়।

দমন (Control)ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ সেট্‌স রোপণ করিবার পরই উইপোকার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রতি হেক্টর জমিতে 1·0 kg (a. i.) of B. H. c. ক্লোরডেন (Chlordane), হেপ্টাক্লোর (Heptachlor), অলড্রিন (Aldrin) অথবা 0·5 kg ডাইএনড্রিন (Diendrin) ব্যবহার করা হয়। B. H. C-এর বিষক্রিয়া 2 হইতে 3 মাস পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। কিন্তু অন্যান্য বিষক্রিয়া বর্ষার পরও থাকে এবং উইপোকার আক্রমণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

8. **পাইরিলা লীফ্‌ হপার** (*Pyrilla leaf-hopper*)ঃ

সমগ্র উত্তর ভারতের ইক্ষু বর্ধিষ্ণু-অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে এই মেজর পেস্টের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এই পেস্টের পূর্ণাঙ্গ এবং নিম্ফ (Nymph) উভয় দশাই আখগাছের পাতার নিম্নতলে অবস্থান করে এবং কোষরস শোষণ করে। আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ হইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত গুটাইয়া যায়। 'Honey Dew' নামক একপ্রকার আঠালো রস ইহাদের দেহ হইতে নির্গত হয় এবং পাতায় Sooty mould সৃষ্টি করে। ইহা পাতার

শ্বসনকার্যে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে পাতাগুলি এমনভাবে বিনষ্ট হয় যে গবাদি পশুর খাদ্যেরও অযোগ্য হইয়া পড়ে।

পাইরিলা পারপুসিল্লা (*Pyrilla perpusilla* Wlk.) :

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)

বর্গ (Order) : হেমিপ্‌টেরা (Hemiptera)

পরিবার (Family) : ফালগোরিডি (Fulgoridae)

পূর্বে ধারণা ছিল এই পেস্টের তিনটি প্রজাতি ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে সর্বত্র স্বীকৃত যে রঙের পার্থক্য থাকিলেও উহারা সকলেই একই প্রজাতির। 1938 সনে উত্তরপ্রদেশে এই পেস্টের ভয়াবহ আক্রমণ দেখা গিয়াছিল।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature of damage) :

নিম্ফ হইতে শুরু করিয়া পূর্ণাঙ্গ দশার স্থায়ীকাল পর্যন্ত ইহারা দলবদ্ধভাবে ইক্ষুর পাতায় আক্রমণ করে। কচি পাতার রস শোষণ করিয়া আখের বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দেয়। পাতাগুলি ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায় এবং হলুদ বর্ণে রূপান্তরিত হয়। আক্রান্ত গাছ হইতে চিনি ও গুড় কম উৎপন্ন হয় এবং খুব নিম্নমানের হয়। ইহারা দেহ হইতে 'Honey dew' নিঃসরণ করিয়া অন্যান্য পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। পাতায় 'Sooty mould' সৃষ্টি হয়। ফলে পাতার শ্বসনকার্য স্বাভাবিক হয় না।

পাইরিলার বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of *Pyrilla* and habit) :

পূর্ণাঙ্গ দশায় পুরোপুরি খড়ের বর্ণের হয়। দৈর্ঘ্যে প্রায় 10 মি.মি. পর্যন্ত হয়। মস্তক অংশের সম্মুখ ভাগ প্রসারিত হইয়া ঠোঁটের মত 'স্নাউট' (Snout) তৈয়ারি করে। স্ত্রী বাগের উদর খণ্ডের পশ্চাদে একজোড়া 'প্যাড' বিদ্যমান। ডিম পাড়িবার সময় ইহার উপরে সাদা মোমের মত সূতা বাহির হয়। হাজার হাজার পাইরিলা বাগ্‌ একসাথে একই উদ্ভিদে আক্রমণ করে। ইহাকে 'সোয়ার্ম' বলা হয়।

জীবন ইতিহাস (Life history) :

সম্পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করিতে প্রায় 40-60 দিন সময় লাগে।

ডিম (Eggs) : স্ত্রী বাগ্‌ পাতার নীচে ঈষৎ হলুদবর্ণের ডিম গুচ্ছ-

ভাবে (10·60) পাড়ে। ডিমগুলি সাদা সুতা দ্বারা আবৃত থাকে। এই মোমের মত সাদা সুতা স্ত্রীর **"এনাল টাফট্"** হইতে বাহির হয়। গ্রীষ্মকালে 7-12 দিনের মধ্যে এবং শীতকালে 3 হইতে 4 সপ্তাহের মধ্যে ডিম প্রস্ফুটিত হয়।

নিম্ফ (Nymph) ঃ সদ্যোজাত নিম্ফ ডিম ফুটিয়া বাহির হয় এবং ঈষৎ বাদামী বর্ণের হয়। নিম্ফের পশ্চাদভাগে দুইটি দীর্ঘ "টাফট্" (Tuft) বিদ্যমান। ইহা হইতে সাদা মোম নির্গত হয়। নিম্ফ পাতার রস খাইয়া পরিণত হইতে থাকে এবং কয়েকবার (4-5) খোলস ত্যাগ করে। গ্রীষ্মকালে 5-10 সপ্তাহ এবং শীতকালে 15-22 সপ্তাহ নিম্ফ দশার স্থায়ীকাল হয়।

পূর্ণাঙ্গ (Adult) ঃ নিম্ফ শেষবার খোলস ত্যাগ করিয়া পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় আসে। ডানা পরিণত হইয়া উদর খণ্ডকের অংশ সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া রাখে। বৎসরে প্রায় 3-4টি জনু দেখা যায়।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) ঃ

সারা বৎসরে এই পেস্টের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। আগষ্ট-নভেম্বর মাসেই ইহাদের ক্ষতি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায়। সম্পূর্ণ শীতকাল প্রায় নিম্ফ দশাতেই কাটাইয়া দেয়। মার্চের মধ্যবর্তী সময়ে এই নিম্ফগুলি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পরিণত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে এপ্রিলের শুরুতেই ডিম পাড়িতে শুরু করে।

ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে এই পেস্টের আধিপত্য খুব সাংঘাতিকভাবে ঘটিলে ইহারা অন্য উদ্ভিদের বিশেষতঃ গমের ক্ষেতে চলিয়া যায় এবং সেইখানে আক্রমণ শুরু করে। মে-জুন মাসের অল্প অল্প বৃষ্টি এবং একটানা জুলাই হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত এই রকম থাকিলে পেস্টের বংশবৃদ্ধি বেশী হইতে দেখা যায়।

পেস্টের সক্রিয়তায় পরিবেশের প্রভাব (Effect of climatic conditions on the pest activity) ঃ

এই পেস্টের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হইয়াছে (Sugarcane Research Station, Jullunder হইতে গবেষণালব্ধ ফল) যে—(1) বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ 60-80% ; (2) তাপমাত্রা (35°-38°C) এবং অল্প বৃষ্টির পরিমাণই এই পেস্টের বংশবৃদ্ধি ও সক্রিয়তার সহায়ক। জুন মাসেই এই

পেস্টের বিপদ সময় হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে যদি পেস্ট কোনওভাবে বাঁচিয়া থাকে পরবর্তীকালে উপরোক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হইলেই ইহাদের বিপদ-মুহূর্ত কাটিয়া যায় এবং ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেয়।

প্রাকৃতিক শত্রু (Natural enemies) ঃ এই পেস্টের বিভিন্ন দশায় বিভিন্ন পরজীবী পতঙ্গ কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

1. **ডিমের পরজীবী পতঙ্গ** (Egg parasite)—**টেট্রাস্ট্রিকাস পাইরিলি** (*Tetrastrichus pyrillae* Craw.)

2. **নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ দশায় পরজীবী পতঙ্গ** (Nymphal and adult parasite)—**এপিপাইরপ্‌স মেলানোলিউকা** (*Epipyrips melanoleuca* F.)

উপরোক্ত, পরজীবী পতঙ্গ ব্যতীত ইহারা ছত্রাক দ্বারাও আক্রান্ত হয়। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে এই ছত্রাক **মেটারাইজিয়াম অ্যানাইসোপ্লি** (*Metarrhizium anisopliae* Metch) পেস্টের বংশবৃদ্ধি অধিকাংশে রোধ করে।

দমন (Control) ঃ

1. **যান্ত্রিক** (Mechanical) ঃ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেতে চাষ করিবার পর সমস্ত পরিত্যক্ত পাতাগুলি সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে যে সকল পাতায় ডিম পাড়ে সেই সকল পাতাগুলি সঙ্গে সঙ্গেই অপসারিত করা প্রয়োজন।

2. **রাসায়নিক** (Chemical) ঃ আখগাছের উপর বি. এইচ. সি. (B. H. C.), টক্সাফেন (Toxaphane) অথবা কার্বারিল (Carbaryl) প্রতিটির 10% অথবা 5% ম্যালথিয়ন প্রতি হেক্টরে 20-40 কি.গ্রা. ছড়াইতে হয়। এনড্রিন (Endrin), এণ্ডোসালফান (Endosulfan), ট্রাইথিয়ন (Trithion), ফসফামিডন (Phosphamidon) অথবা ডাইমিথোয়েট (Dimethoate) অথবা ফরমোথিয়ন (Formothion) প্রতি হেক্টরে 0·5-1·0 Kg (সক্রিয়তায়) স্প্রে করিলে ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

আক্রান্ত ক্ষেতের সর্বত্র ছড়াইলে উপর হইতে স্প্রে করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে U. L. V. দ্বারা প্রতি হেক্টরে ম্যালাথিয়ন 1-1·25 লিটার হারে স্প্রে করিলে সুফল পাওয়া যায়।

9. **গ্রাসহপার্স অথবা গঙ্গাফড়িং** (Grass hoppers) ঃ

ভারতবর্ষে ইক্ষুর ক্ষতিকারক 15টি প্রজাতির গঙ্গাফড়িং-এর মধ্যে নিম্নোক্ত ছয়টি প্রতাজি বিশেষ ক্ষতি করে।

1. **কোলেমানিয়া স্ফেনেরয়ডিস** (*Colemania sphener-oides* B.)

2. **হিরোগ্লাইফাস বেনিয়ান** (*Hieroglyphus banian* F.)—সাধারণভাবে ধানের গঙ্গা ফড়িং নামে পরিচিত।

3. **হিরোগ্লাইফাস নাইগ্রোরেপ্লেটাস** (খাদক গঙ্গাফড়িং)—(*Hieroglyphus nigrorepletus* Bol.)

4. **হিরোগ্লাইফাস কনকলর** (*Hieroglyphus concolor* Wlk.)

5. **গ্যাসট্রিমারগাস মারমোরেটাস** (*Gastrimargus marmoratus* Thu.)

6. **কোরোডোকাস ইলাসট্রিস** (*Chorodocus illustris.*)

উপোরোক্ত ছয়টি প্রজাতির গঙ্গাফড়িং-এর মধ্যে *H. banian* ভারতের সব রাজ্যেই বিস্তৃত। ইহাদের প্রথম ও দ্বিতীয় দশা (নিম্ফের) সাধারণতঃ ঘাসেই বিচরণ করে এবং দলবদ্ধভাবে থাকে। তৃতীয় দশায় ইক্ষু ক্ষেতে আসে এবং আক্রমণ শুরু করে। মধ্যশিরা ব্যতীত পাতার সবুজ কলা খাইয়া শেষ করে।

দমন (Control) ঃ গাছের উপর কীটনাশক ছড়াইয়া ইহাদের দমন করা হয়। 10% B. H. C. at 25 Kg. প্রতি হেক্টরে ছড়াইয়া দিতে হয়। এনড্রিন পদার্থবিশেষ (emulsion) at 225 গ্রাম প্রতি হেক্টরে স্প্রে করিলেও ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

10. **এফিড্স** (Aphids) ঃ

ইক্ষুর ক্ষতিকারক কয়েকটি প্রজাতির ভেক্টর এফিড উদ্ভিদের ভাইরাস রোগ ঘটায়। ইহাদের মধ্যে **মেলানেফিস স্যাকারি** (*Melanaphis Sacchari* (Zehntner) অন্যতম এবং **গ্রাসি সুট রোগ** (Gassy shoot disease)-এর ভেক্টর হিসাবে কাজ করে। ইহারা সরাসরি উদ্ভিদের পাতা হইতে ফ্লোয়েম রস শোষণ করিয়াও ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। ইক্ষুর মূলেও কয়েকটি প্রজাতির এফিড আক্রমণ করে। যেমন—

1. **টেট্রানিউরা জাভেন্সিস্** (*Tetraneura javensis*) (v. d.goot.)

2. টেট্রানিউরা হিরস্যুটা *Tetraneuru hirsuta* Baker.)

3. জিওয়কা স্পাটুলা (*Geoica spatula* Thal.)

দমন (Control) : 0·1% ম্যালথিয়ন ইমালশান (Malathion emulsion) স্প্রে করিলে ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। 0·03% ফসফামিডন ইমালশান ও (Phosphamidon emulsion) ইহাদের দমনে কার্যকরী হইতে দেখা যায়।

পতঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পেস্টসমূহ

(Non-Insect pests)

11. **মাইট** (Mite) :

দুইটি প্রজাতিই ক্ষতি করে।

(i) ওলিগোনাইকাস ইণ্ডিকাস (*Oligonychus indicus*)

(ii) সাইজোটেট্রানাইকাস এণ্ড্রোপোগোনি (*Schizotetranychus andropogoni*)

12. **ইঁদুর** (Rats) :

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি প্রজাতির ইঁদুর আখগাছের ভীষণ ক্ষতি করে। ইহারা হইল—

(i) ব্যাণ্ডিকুটা বেঙ্গালেনসিস (*Bandicota bengalensis*)

(ii) র‍্যাট্টাস রাট্টাস (*Rattus rattus*)

(iii) ব্যাণ্ডিকুটা ইণ্ডিকা ইণ্ডিকা (*Bandicota indica indica*)

ইক্ষুর পেস্ট দমনে বিভিন্ন উপায়গুলির একত্রে ব্যবহার (Integrated control of sugarcane pests) :

যে সব অঞ্চলের ইক্ষুক্ষেত্রে বিভিন্ন পেস্টের আক্রমণ দেখা যায় সেই সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন দমন পদ্ধতিগুলি, যেমন—যান্ত্রিক (Mechanical), রাসায়নিক (Chemical), এবং জৈবিক (Biological) ইত্যাদি একত্রে এমনভাবে করা হয় যাহাতে পেস্টের উপদ্রব কম হয়। এই ব্যবস্থায় কীটনাশক ব্যবহারের উপর কম জোর দেওয়া হয়। ইহাতে বিভিন্ন পরিবেশের দূষণও কম হয়।

ইক্ষুর বিভিন্ন পিস্ট এই সিস্টেমে (System) নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করা হয়।

1. Seed-cane গুলি 0·1% ম্যালথিয়ন ইমালশান (স্কেল-ইনসেক্ট

এবং মিলিবাগদের বিরুদ্ধে) এবং 0·2% ট্রাইক্লোরফন (Trichlorphon) দ্রবণ (বোরার লার্ভাদের ক্ষেত্রে) দ্বারা স্প্রে করা উচিত।

2. শুট বোরারদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আরও পূর্বে আখ গাছ লাগানো উচিত। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলিতে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষেই এই বপন শেষ করা হয়।

3. টারমাইটের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রতি হেক্টরে 1·0 Kg. সক্রিয়তায় গামা বি. এইচ. সি. (Gamma B. H. C.) অথবা হেপ্টাক্লোর ইমালশান (Heptachlor emulsion) সদ্য লাগানো আখ সেট্‌স (Cane setts)-এর ছড়াইয়া দিতে হয়।

4. ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে টপ্‌বোরার এবং পাইরিলার দৃশ্যমান ডিমগুলি সংগ্রহ করিয়া ক্ষেতের মধ্যস্থানে তারজালির বাক্সে রাখিয়া দিতে হয়। ইহাতে ডিমের পরজীবী পতঙ্গ বাহির হইয়া আবার অন্যত্র আক্রমণ করিতে পারে।

5. বোরার পেস্ট দ্বারা আক্রান্ত আখ গাছগুলি মার্চ হইতে জুন মাসের মধ্যেই সরাইয়া ফেলা দরকার। ইহাতে আক্রান্ত গাছের সকল লার্ভা বিনষ্ট হয়। ফলে পপুলেশান রোধ হয়।

6. গুরুদাস বোরার-এর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উদ্ভিদের উপরি অংশ মাঝে মাঝে কাটিয়া ফেলা হয়। জুন-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নিয়মিত করা প্রয়োজন।

7. উদ্ভিদ বৃদ্ধির সময়ে টপবোরার, পাইরিলা এবং হোয়াইট ফ্লাই ইত্যাদির আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়ে সময়ে সময়ে কীটনাশক ব্যবহার করিতে হয়। মনোক্রোটোফস (Monochrotophos) দ্রবণ তিন সপ্তাহ অন্তর অন্ততঃ চারবার স্প্রে করা উচিত।

8. সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে স্টক বোরার ও অন্যান্য কয়েকটি বোরারের বংশবৃদ্ধি রোধে শুকনো পাতাগুলির অপসারণ করা দরকার।

9. স্কেল ইনসেক্ট দমনের জন্য শুকনো পাতা অপসারণের পরই 0·1% ম্যালথিয়ন স্প্রে করা উচিত।

10. চাষের সময় পরিত্যক্ত পাতা ও আখের গোড়া সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে অবস্থানরত 'লার্ভাগুলির ধ্বংস সাধন হয়।

তিল ইত্যাদি তৈল বীজ ফসলের ক্ষতিকারক পেস্ট
(Pests of oilseeds crops)

অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন এই সকল উদ্ভিদ ও শস্য বিভিন্ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত পেস্ট কর্তৃক ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। ফলে, উৎপাদন বহুলাংশেই কমিয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার পেস্টের উপদ্রব থাকায় প্রতিরোধের উপায়ও বিভিন্ন। নারকেলের পেস্ট আলাদাভাবে আবাদী ফসলের মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। এইখানে সরিষার ক্ষতিকারক উল্লেখযোগ্য একটি পেস্টের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ, জীবনবৃত্তান্ত ও দমন সম্বন্ধে আলোচিত হইল।

সরিষার দুইটি উল্লেখযোগ্য পেস্ট

1. **ম্যাসটার্ড এফিড** (Mustard Aphid) *Lipaphis erysimi* (Kalt.)

2. **স-ফ্লাই** (Saw-fly) *Athalia promixa* Klug.

ম্যাসটার্ড এফিড্ (Mustard Aphid) :

সরিষার সব থেকে মারাত্মক ক্ষতিকারক পেস্ট বলিতে ইহাদের বুঝায়। পৃথিবীর সর্বত্র ইহাদের বিস্তৃতির খবর জানা যায়। Cruciferae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের ইহারা ক্ষতি করিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 15%-50% দাঁড়ায়।

লিপাফিস ইরাইসিমি *Lipaphis erysimi* (Kalt.)

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)
বর্গ (Order) : হেমিপ্‌টেরা (Hemiptera)
গোত্র (Family) : এফিডাইডি (Aphididae)

পশ্চিমবঙ্গের চাষীভাইদের ভাষায় "জাব পোকা" বলিয়া পরিচিত। আকৃতি, স্বভাব, আক্রমণ পদ্ধতি ও জীবন ইতিহাস বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। কখনও কখনও ইহাদের সংখ্যা প্রতি একর জমিতে 200 কোটির মত দাঁড়ায় তখন কৃষকের পক্ষে ভয়াবহ হইয়া উঠে।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature of damage) :

এই এফিড্ কলোনী করিয়া সব দশাতেই সরিষা উদ্ভিদ ও শস্যের ক্ষতি

করে। কাণ্ডে, পাতায় এবং পড-এ ঘন কলোনী সৃষ্টি করে। উদ্ভিদের সকল অংশেই হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের মত প্রোবোসিস্ ঢুকাইয়া ফ্লোয়েম রস শোষণ করে। ইহাদের মারাত্মক আক্রমণে উদ্ভিদের বর্ণ পাল্টাইয়া যায়, দুর্বল হইয়া পড়ে এবং শস্যদানার সৃষ্টি হয় না।

ইহারা অন্যভাবেও সরিষা উদ্ভিদের ক্ষতি করিয়া থাকে। ইহাদের দেহের কর্নিকল বা সাইপানকুলি (Siphunculi) হইতে "Honey dew" রস নিঃসৃত হয়। ইহা পাতার নীচে জমা হইয়া চটচটে পদার্থের আস্তরণ তৈয়ারি করে। ইহাতে "Sooty mould" সৃষ্টি হয় এবং সেই সব স্থান কালো বর্ণের হইয়া যায়। পাতার জৈবনিক কার্যকলাপ বন্ধ হইয়া যায়।

এফিডের বহিরাকৃতি ও স্বভাব :

সবুজ বর্ণের এফিডগুলি লম্বায় প্রায় 2 মি.মি. পর্যন্ত হয়। দেহের পঞ্চম বা ষষ্ঠ উদর খণ্ডের পৃষ্ঠদেশে একজোড়া নলাকার কর্ণিকল্ বা সাইপানকিউলি (Siphunculi) বিদ্যমান। ছয় খণ্ডক যুক্ত একজোড়া শুঁড় মস্তক অংশে থাকে। এফিডের, যাহাদের ডানা বিদ্যমান, সেই ডানার রং সাদা হয়। ইহারা ডানাযুক্ত ও ডানাবিহীন হয়।

বিশ্রামরত অবস্থায় ডানাদুটি দেহের উপরে লম্বালম্বিভাবে থাকে।

জীবন ইতিহাস (Life history) :

ইহাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। ইহারা সরাসরি নিম্ফের জন্ম দেয়। এই ঘটনা "Viviparity" ও "Parthenogenesis" নামে অভিহিত। বছরের বেশীর ভাগ সময়েই ইহারা "Viviparous" কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পরিবেশে ইহারা যৌনজননেও সক্ষম।

"Parthenogenesis" পদ্ধতিতে দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে। একটি মাত্র এফিড্ ছয় বিলিয়ন-এরও বেশী নিম্ফের জন্ম দিতে পারে।

শরতের প্রারম্ভেই সরিষা উদ্ভিদে ইহাদের আগমন হয়। তখন খুব ছোট কলোনি সৃষ্টি করে। ডানাবিহীন স্ত্রী এফিড্ খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে এবং নিম্ফগুলি উদ্ভিদের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ডানাযুক্ত এফিডের সৃষ্টি হয়। ইহারা উড়িয়া অন্য উদ্ভিদে যায় এবং সেইখানে কলোনি গঠন করে।

নিম্ফ কয়েকবার খোলস ত্যাগ করিয়া পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় আসে। নিম্ফের বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণাঙ্গদের মধ্যে বিদ্যমান। শীতকালে বেশ কয়েকটি জনুক্রম

দেখা যায়। সাধারণতঃ দিনের দুই সময়ে—(সকাল ও বিকাল) এফিড্‌রা খুব বেশী সংখ্যায় স্থান পরিবর্তন করে।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestations) :

ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাসেই ইহাদের আধিক্য বেশী এবং এই সময়ে সরিষা উদ্ভিদ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রাকৃতিক শত্রু (Natural enemies) : এই এফিড ছত্রাক ও হাইমনোপটেরা বর্গের অন্তর্গত পতঙ্গ পরজীবী (*Aphelinus* Sp.) দ্বারা আক্রান্ত হয়।

উল্লেখযোগ্য খাদক প্রাণীগুলি বেশীর ভাগই পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন প্রজাতির মাকড়সাও ইহাদের ভক্ষণ করিয়া থাকে। নিম্নে ইহাদের নাম উল্লেখ করা হইল।

1. Araneida **বর্গের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির মাকড়সা :**
   - (i) *Oxopes javanus* Thorell
   - (ii) *Theridion* Sp.
   - (iii) *Thomisus Pujilus* Stoliczka
2. শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta) :

(A) **বর্গ** (Order) **: কোলেওপটেরা** (Coleoptera) :

গোত্র (Family) : ককসিনিলিডি (Coccinellidae)

(i) *Coccinella* *septempunctata* L.
(ii) „ *transversalis* Thunberg
(iii) *Menochilus* *sexmaculatus* (F.)
(iv) *Scymnus* (*Pullus*) *pyrocheilus* Mulsant

(B) **বর্গ** (*Order*) : **ডিপ্‌টেরা** (Diptera)

গোত্র (Family) সিরফিডি (Syrphidae)

(i) *Episyrphus* *balteatus* (deGreen)
(ii) *Metasyrphus* *confrater* (wied)
(iii) *Ischiodon* *scutellaria* (F.)
(iv) *Paragus* *serratus* (Fab.)

(C) বর্গ (Order) : নিউরোপটেরা (Neuroptera)

গোত্র (Family) হেমেরোবিডি (Hemerobiidae)

(i) *Micromus* *timidus* Hagen.

দমন (Control) :

এফিডের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বপন অনেক আগেই করা হয়। কীটনাশক (Inseeticide) প্রয়োগে ইহাদের হাত হইতে সাময়িক রক্ষা পাওয়া যায়। সরিষারক্ষেতে অন্ততঃ দশদিন অন্তর স্প্রে করিলে আক্রমণ বাড়িতে পারে না। ম্যালাথিয়ন 0·03% (Malathion), প্যারাথিয়ন (Parathion) 0·02% এবং ডায়জিনন 0·03% (Diazinon) প্রভৃতি কনট্যাক্ট কীটনাশক প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। নিকোটিন সালফেট 40% (Nicotine sulphate) এবং টোব্যাকো-সোপ (Tobacco-soap) মিশ্রণ, ব্যবহারেও কার্যকরী হইতে দেখা যায়। জৈবিক নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষালব্ধভাবে (Biological control) বর্তমানে "লেডিবার্ড বিটল, সিরফিড, ক্রাইসোপা প্রভৃতি খাদক পতঙ্গের ব্যবহার কার্যকরী হইতে দেখা যায়।

শাক-সবজির ক্ষতিকারক পেস্ট (Pests of vegetables) :

বিভিন্ন রকম শাক-সবজির বিভিন্ন রকম ক্ষতিকারক পোকামাকড় দেখা যায়। নিম্নে কয়েকটি শাক-সবজি বিনষ্টকারী পেস্টদের নাম দেওয়া হইল। সরিষা উদ্ভিদের ক্ষতিকারক Mustard Aphid পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই ক্ষতিকারক পেস্ট ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, গাজর প্রভৃতিরও ভীষণ ক্ষতি করিয়া থাকে।

শাক-সবজি (Vegetables)	পেস্টের সাধারণ নাম (Common name of the pest)	বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name)
1. লাউ, কুমড়া, শসা ইত্যাদি	**পাম্পকিন বিট্‌লস** (Pumpkin beetles)	*Aulacophora foveicollis* Lucas,
2. শসা, কড়লা, লাউ, টম্যাটো ইত্যাদি	**ফ্রুট ফ্লাই** (Fruit fly)	*Dacus* (*Strumeta*) *cucurbitae* Coqr.
3. আলু, টম্যাটো	**পটেটো টিউবার মথ** (Potato tuber moth)	*Gnorimoschema operculella* Zell.

শাক-সবজি (Vegetables)	পেস্টের সাধারণ নাম (Common name of the pest)	বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name)
4. আলু, বেগুন, টম্যাটো ইত্যাদি	লিফ্ বিট্‌লস (Leaf beetles)	*Epilachna vigintioctopunctata* Fabr.
5. বেগুন	ব্রিঞ্জাল শুট এবং ফ্রুট বোরার (Brinjal shoot and fruit borer)	*Leucinodes Orbonalis* Guen.
6. বাঁধাকপি	ক্যাবেজ বাটারফ্লাই (Cabbage butterfly)	*Pieris brassicae* Linn.

এইখানে কেবলমাত্র Cucurbitaceous উদ্ভিদের ক্ষতিকারক পেস্ট Pumpkin beetles-এর ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ, জীবনবৃত্তান্ত ও দমন পদ্ধতি আলোচিত হইল।

পাম্পকিন বিট্‌লস (Pumpkin beetles)ঃ

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র, পূর্ব-আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এই পেস্টের বিস্তৃতির খবর পাওয়া যায়। এই পেস্টের অনেকগুলি প্রজাতি Cucurbitaceous উদ্ভিদের ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। উল্লেখযোগ্য একটি প্রজাতির বিবরণ দেওয়া হইল।

অলোকোফোরা ফোভিকোলিস (*Aulacophora foveicollis* Lucas)

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)
বর্গ (Order) : কোলেওপটেরা (Coleoptera)
গোত্র (Family) : ক্রাইসোমেলিডি (Chrysomelidae)

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage & nature of damage)ঃ

লার্ভা দশাই পাতা, কুড়ি, ফুল ও ফল প্রভৃতি খাইয়া বেশী ক্ষতি করে। উদ্ভিদ বৃদ্ধির প্রাক্কালেই ইহাদের আধিক্য বেশী দেখা যায়। বাড়ন্ত উদ্ভিদের পাতা ফুটা করিয়া দেয় এবং এমনভাবে খাইয়া বিনষ্ট করে যে উদ্ভিদ

অকালেই শুকাইয়া মরিয়া যায়। বয়োবৃদ্ধ উদ্ভিদে বিট্‌লের ক্ষতি ততটা মারাত্মক হয় না। অঙ্কুরোদ্গম হইবার পর সেই সব উদ্ভিদের মূলে ও কাণ্ডে লার্ভা ফুটা করিয়া প্রবেশ করে এবং সেইখানে কলারস খায়। ফলে সম্পূর্ণ উদ্ভিদটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লার্ভা বা গ্রাব ফলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এমন ক্ষতিসাধন করে—যাহা বাজারেও বিক্রিযোগ্য হয় না।

পেস্টের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of the pest and habit) ঃ

পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল দৈর্ঘ্যে প্রায় 6·5-7মি.মি. এবং প্রস্থে প্রায় 3·4-3·7 মি.মি. হয়। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ গাঢ় কমলা রঙের হয়। অঙ্কীয়দেশ কালো বর্ণের হয় এবং সাদা রোমে ঢাকা থাকে।

জীবনচক্র (Life cycle) ঃ সম্পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করিতে প্রায় 30-35 দিন সময় লাগে। নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল শীতঘুম অবস্থায় কাটাইয়া দেয়। মাটির ফাটলের মধ্যে, শুকনো পাতায়, ঘাসে অথবা অন্যান্য জঞ্জাল উদ্ভিদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যায় থাকে। মার্চ মাসের শুরুতেই পোষক উদ্ভিদের ক্ষেতে আগমন ঘটে।

ডিম (Eggs) ঃ স্ত্রী বিট্‌ল নিষিক্ত হইবার পর পোষক উদ্ভিদের কাছেই ভিজা মাটিতে একসাথে অনেকগুলি ডিম পাড়ে। কমলা বর্ণের ডিমগুলি গুচ্ছাভাবে থাকে। একটি স্ত্রী বিট্‌ল প্রায় 300টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিতে প্রায় 7-15 দিন সময় লাগে। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার উপর ডিম ফুটিবার সময় নির্ভর করে।

লার্ভা অথবা গ্রাব (Grub) ঃ সদ্যোজাত গ্রাব হলুদ বর্ণের হয়। মস্তক ও বক্ষের প্রথম খণ্ড বাদামী বর্ণের হয়। গ্রাব কচিপাতা ও উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ খাইয়া বড় হইতে থাকে। গ্রাবের উদর খণ্ডকের শেষ অংশে একটি নলাকার অংশের সৃষ্টি হয়। ইহা দ্বারা লার্ভা ভালভাবে পাতা বা অন্যান্য অংশে ঘুরিয়া বেড়ায়। গ্রাব পরিণত অবস্থায় আসিতে চারবার খোলস ত্যাগ করে এবং 13-15 দিন সময় নেয়। পরিণত হইবার পূর্বে লার্ভা সক্রিয় হইয়া পোষক উদ্ভিদের মল হইতে শুরু করিয়া প্রায় সমস্ত অংশেই ক্ষতি করিতে থাকে। এর পর গ্রাব পিউপা দশায় যায়।

পিউপা (Pupa) ঃ মাটির নীচে প্রায় 1 ইঞ্চি গভীরতায় গোলাকার কুঠুরী সৃষ্টি করিয়া গ্রাব পিউপা দশায় যায়। পিউপা দশার স্থায়ীকাল

7-15 দিন।

পূর্ণাঙ্গ (Adult) : পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল রূপান্তরিত হইয়া খাইতে শুরু করে। প্রায় 7 দিন পর স্ত্রীবিট্‌ল নিষিক্ত হইয়া ডিম পাড়িতে শুরু করে। এইভাবে ইহাদের জীবনচক্র সমাধা হয় এবং বৎসরে প্রায় পাঁচটি জনুক্রম দেখা যায়।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) : এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত ইহাদের তৎপরতা দেখা যায়।

সম্পূর্ণ শীতকাল ইহারা ঘাস, জঙ্গল, ঝোঁপ, মাটির ফাটলের মধ্যে কাটাইয়া বসন্তের প্রারম্ভেই ক্ষেতে আসিতে শুরু করে। এই সময় ক্ষেতে ঐ সকল উদ্ভিদের বীজ বপন করা হয়। এই বীজগুলি ইহারা খাইয়া ধ্বংস করে।

দমন (Control) :

1. **যান্ত্রিক উপায়** (Mechanical) : পূর্ণাঙ্গ বিট্‌লগুলি জালের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া কেরোসিনের মধ্যে ফেলিয়া মারিয়া ফেলা হয়। বপন আরও আগে করিলে ইহাদের হাত হইতে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যায়। মার্চ-এপ্রিল মাসে উদ্ভিদ বৃদ্ধির প্রাক্কালে ছাই (ash) ছড়াইয়া দিলে ইহাদের আক্রমণ কম হর। ফসল তুলিয়া লইবার পর জমি পুনরায় চাষ করিলে শীতঘুম অবস্থায় গ্রাব ও পিউপার ধ্বংস ঘটে।

2. **রাসায়নিক** (Chemical) : 5% এলড্রিন (Aldrin) অথবা 4% কার্বারিল (Carbaryl)-এর পাউডার মাটিতে ছড়াইয়া দিলে গ্রাবগুলির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ হয়। 0·05% ম্যালাথিয়ন (Malathion) স্প্রে করিলে ইহাদের আক্রমণ সাময়িকভাবে রোধ করা যায়।

তন্তুজাত ফসলের ক্ষতিকারক পেস্ট (Pests of fibre crops) :

ভারতবর্ষের তন্তুজাত ফসলের মধ্যে তুলা ও পাটের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। ইহাদের ক্ষতিকারক কয়েকটি পেস্টের ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ, জীবনবৃত্তান্ত ও দমনের উপায়গুলি আলোচিত হইল।

1. তুলা উৎপন্নকারী উদ্ভিদের ক্ষতিকারক পেস্ট (Pest of cotton) :

পৃথিবীর তুলা উৎপাদনকারী দেশগুলির মাঝে ভারতবর্ষের স্থান চতুর্থ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এই উদ্ভিদের চাষ হয়। কিন্তু বিভিন্ন পেস্টের আক্রমণে তুলা উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যহত হয়।

প্রায় দুই ডজন প্রজাতির পতঙ্গ এই উদ্ভিদের বিভিন্ন দশায় বিভিন্নভাবে ক্ষতি করে। কয়েকটি প্রজাতির পেস্টের নাম উল্লেখ করা হইল।

সাধারণ নাম (Common name)		বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name)
1. কট্‌ন লিফ রোলার (Cotton leaf roller)	=	*Sylepta derogata* Fabr.
2. স্পটেড্ বল ওয়ার্ম (Spotted ball worm	=	(i) *Earias fabia* Stoll. (ii) *Earias insulana Brisel.*
3. পিঙ্ক বল ওয়ার্ম (Pink ball worm)	=	*Pectinophora gossypiella* Saund.
4. রেড কট্‌ন বাগ (Red cotton bug)	=	*Dysdercus cingulatus* Fabr.

এইখানে কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য একটি পেস্টের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

রেড কট্‌ন বাগ (Red cotton bug) বা **ডিস্‌ডারকাস্ সিনগুলেটাস** (*Dysdercus cingulatus*)

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)
বর্গ (Order) : হেমিপ্‌টেরা (Hemiptera)
গোত্র (Family) : পাইরোকরিডি (Pyrrho coridae)

ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি রাজ্যে যেমন, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মাদ্রাজে এই পেস্টের আধিক্য বেশী দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গেও এই পেস্টের আক্রমণ সময়ে সময়ে মারাত্মক হয়। ইহারা তুলা উদ্ভিদ ব্যতীত ঢেড়স গাছেও আক্রমণ করিয়া থাকে।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmul Stage and nature of damage) :

নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ উভয় দশাতেই ইহারা রস শোষণ করিয়া ক্ষতি করে। ফলে, অপরিণত হয় এবং ইহা হইতে কম পরিমাণ তুলা সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত তুলাবীজ হইতে তৈল উৎপাদন করা যায় না এবং বপনযোগ্য হয় না। আক্রান্ত হইতে যে তুলা উৎপন্ন হয় সেই তুলাগুলি রঞ্জিত করিয়া ব্যবহার

করা হয়।

পেস্টের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of the pest and habit) :

পূর্ণাঙ্গ বাগ-এর দৈর্ঘ্য প্রায় ½ ইঞ্চির বেশী হয়। দেহের রঙ সাধারণতঃ লাল হয়। ডানার প্রান্তভাগ বেশী কালো বর্ণের হয়। প্রতি ডানায় একটি "স্পট" বিদ্যমান। দেহের বক্ষ ও উদর অংশের নিম্নতলে আড়াআড়িভাবে অনেকগুলি দাগ দেখা যায়।

জীবনচক্র (Life cycle) : উদ্ভিদের কাছাকাছি ইহারা প্রায় 70-80টি **ডিম** (Eggs) গুচ্ছাকারে মাটির ফাটলের মধ্যে পাড়ে। গোলাকার ডিমগুলি হলুদ বর্ণের হয় এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় 1·2 মি.মি.। প্রায় এক সপ্তাহ পর ডিম ফুটিয়া সরাসরি **নিম্ফ** (Nymph) বাহির হয়। নিম্ফগুলি দলবদ্ধভাবে রস শোষণ করিতে থাকে। **পূর্ণাঙ্গ** (Adult) দশায় আসিতে প্রায় 49-89 দিন সময় নেয়। ইতিমধ্যে পাঁচবার খোলস ত্যাগ করে।

তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার উপর ইহাদের সংখ্যা ও অবস্থান নির্ভর করে। জুন-জুলাই মাসে ইহাদের আক্রমণ করিতে খুব কমই দেখা যায়।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) : আগষ্ট মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইহাদের প্রকোপ খুব বেশী দেখা যায়

দমন (Control) :

1. **যান্ত্রিক উপায়** (Mechanical) : জমি চাষ করিয়া ডিমগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ হাত দিয়া ধরিয়া কেরোসিনের মধ্যে ফেলিয়া মারা হয়।

2. **রাসায়নিক** (Chemical) : মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হইলে 5% B. H. C. প্রতি একরে 25-35 পাউণ্ড হারে ছড়াইয়া দিতে হয়। স্প্রে করিয়াও সুফল পাওয়া যায়।

2. পাট উদ্ভিদের ক্ষতিকারক পেস্ট (Pests of Jute) :

বর্তমানে পাটের ক্ষতিকারক পেস্টগুলির দমন কিছুটা সম্ভব হইলেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকারক পেস্ট, যেমন—জুট সেমিলুপার (Jute semilooper = *Anomis sabulifera*), জুট এপিয়ন (Jute apion = *Apion corchori*), জুট স্টেম গার্ডলার (Jute stemgirdler = *Nupserha bicolor*

Postbrunnea) প্রভৃতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া চাষীভাইদের ভীষণ কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। তাই, এই সকল পেস্ট দমনে Intregrated প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Intregrated control measure) লওয়া হয়।

এইখানে উল্লেখযোগ্য একটি ক্ষতিকারক পেস্টের বিশদ্ বিবরণ দেওয়া হইল।

জুট স্টেম উইভিল (Jute Stem Weevil) বা এপিয়ন করকরি (*Apion corchori* Marshall)

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)
বর্গ (Order) : কোলেওপটেরা (Coleoptera)
উপবর্গ (Suborder) : পলিফেগা (Polyphaga)
গোত্র (Family) : এপিওনিডি (Apionidae)

এই পেস্টের মস্তক অংশের সম্মুখভাগ প্রসারিত ইহারা "স্নাউট" (snout)-এর সৃষ্টি করে এবং এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ায় সাধারণভাবে "জুট এপিয়ন" (Jute Apion) নামে পরিচিত। ইহারা পাটের ভীষণভাবে ক্ষতি করে। উৎপন্ন তন্তু নিম্নমানের হয়।

এই পেস্ট আরও কতকগুলি পোষক উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল হইলেই পাটের বিশেষতঃ *Capsularis* এবং *Olitorius* প্রজাতির উদ্ভিদদের ইহারা বেশী পছন্দ করে।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature of damage) :

লার্ভাদশাই ভীষণ ক্ষতিকারক। অঙ্কুরোদ্গম হইবার ঠিক পরমুহূর্তেই আক্রান্ত হইলে সম্পূর্ণ উদ্ভিদটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হইলে কাণ্ডের উপরিঅংশ শুকাইয়া যায়। কাণ্ডের চারিপাশে আরও অনেক শাখা বাহির হয়। ফলে উৎপন্ন তন্তু নিম্নমানের হয় এবং দৈর্ঘ্যে ছোট হয়। লার্ভা কাণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহার সমস্ত কলা খাইয়া ফেলে। কখনও ইহারা "পড্"ও আক্রান্ত করে। ইহাতে পাটের তন্তু আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। আক্রান্ত অংশে একধরনের আঠালো পদার্থ নিঃসৃত হয়। ফলে, উদ্ভিদের এই স্থানে "নট্" (knot)-এর সৃষ্টি হয়।

পেস্টের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of the pest and habit) :

ক্ষুদ্রাকার উইভিল দৈর্ঘ্যে প্রায় 1·8 মি.মি. এবং 0·8 মি.মি. প্রস্থ সম্পন্ন হয়। মস্তক অংশে সুস্পষ্ট "স্নাউট" (snout) বিদ্যমান। গাঢ় বাদামী অথবা ঘন কালো বর্ণের উইভিলের সারা দেশে সাদা রঙের রোমে ঢাকা থাকে।

জীবন চক্র (Life cycle) : স্ত্রী বিটল উদ্ভিদের অগ্রভাগে পাতার গোড়ায় ছিদ্র করিয়া উহার মধ্যে ডিম পাড়ে। সম্পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করিতে প্রায় 15 দিন লাগে।

ডিম (Eggs) : ডিমের দৈর্ঘ্য গড়ে প্রায় 2·85 মি,মি. পর্যন্ত হয়। ডিম ফুটিতে মাত্র তিনদিন সময় লাগে। একটি স্ত্রী বিট্‌ল 124 দিনে প্রায় 675টির মত ডিম পাড়ে।

লার্ভা বা গ্রাব (Grub) : পরিণত গ্রাব-এর দৈর্ঘ্য প্রায় 2·85 মি.মি. এবং 0·98 মি. প্রস্থ সম্পন্ন হয়। গ্রাব দশার সময়কালও খুবই কম। মাত্র আট দিন ধরিয়া গ্রাব দশা সম্পূর্ণ করিয়া পিউপা দশায় যায়। লার্ভা কাণ্ডের ভিতরের অংশ খাইয়া শেষ করে এবং তন্তুর ক্ষতি করে।

পিউপা (Pupa) : পিউপাদশার স্থায়ীকাল মাত্র চারদিন। পরিণত গ্রাব কাণ্ডের ভিতরে কুঠুরী সৃষ্টি করে এবং উহার মধ্যে পিউপা দশায় অবস্থান করে।

পূর্ণাঙ্গ (Adult) : পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল পূর্বের ছিদ্র দিয়া অথবা নতুনভাবে ছিদ্র তৈয়ারী করিয়া কাণ্ডের বাহিরে আসে। পূর্ণাঙ্গ বিট্‌লদের আয়ুষ্কাল প্রায় 209 দিনের মত দেখা গিয়াছে। কয়েকটি জন্ম বৎসরে দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল শীতকালে অন্যত্র ঝোঁপ-ঝাঁড়ে কাটাইয়া দেয়।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) : মার্চ-জুলাই মাসে ইহাদের আক্রমণ বেশী দেখা যায়। জুলাই-এর পর হইতে উদ্ভিদের অগ্রভাগে কম আক্রমণ হয়। কারণ এই সময় পেস্টরা কাণ্ডের নীচের দিকে ডিম পাড়িতে পছন্দ করে।

প্রাকৃতিক শত্রু (Natural enemies) : লার্ভা দশায় বেশ কিছু সংখ্যক পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রায় 50% পেস্ট পপুলেশানের ক্ষতি করে।

দমন (Control) :

1. **যান্ত্রিক উপায়** (Mechanical means) : আক্রান্ত উদ্ভিদগুলি উপড়াইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে অপরিণত দশার অপসারণ সম্ভব হয়। চাষের পূর্বে গাছের গোড়া সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে হয়।

2. **রাসায়নিক** (Chemical) : (ক) 0·05% এণ্ডোসালফান (Endosulfan) অথবা 0·1% কার্বারিল (Carbaryl) স্প্রে করিলে ইহাদের হাত হইতে সাময়িক রক্ষা পাওয়া যায়।

(খ) 0·08% ফলিডন স্প্রে করিলে কাণ্ডের অভ্যন্তরের 'গ্রাব' সবই ধ্বংস হয়।

(গ) 0·75% D.D.T অথবা 5-10% B.H.C স্প্রে করিয়াও ভাল ফল পাওয়া যায়।

আবাদী ফসলের ক্ষতিকর পেস্ট (Pests of plantation crops) :

চা, কফি, নারকেল প্রভৃতি উদ্ভিদ বহুবর্ষজীবী। অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন এই সকল উদ্ভিদের চাষ-আবাদ প্রায় 50 বৎসর বা তারও বেশী দিন ধরিয়া করা হয়। বাস্তু-তন্ত্রের দিক হইতে দীর্ঘদিন উদ্ভিদ একই স্থানে থাকিবার দরুন বিভিন্ন পেস্ট কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

উপরিউক্ত উদ্ভিদগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে চাষ করা হয়। এইখানে কেবলমাত্র চা ও নারকেল উদ্ভিদের ক্ষতিকারক পেস্টদের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ, জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি আলোচিত হইল।

চা-গাছের পেস্ট (Pests of Tea) :

চা-গাছ প্রায় 30 ফুট হইতে 50 ফুট উচ্চতা সম্পন্ন হয়। এই উদ্ভিদের চাষপদ্ধতি এমনভাবে করা হয় যাহাতে নরম কচি শাখা বেশী সংখ্যায় উৎপন্ন হয়। ফলে, বিভিন্ন পেস্টের বংশবৃদ্ধিরও সহায়ক হয়। চা-উদ্ভিদের ফসলের জন্য নিয়মিত ছাঁটা হয়। ফলে উদ্ভিদের উপরি অঞ্চলের শাখায় যে সব ক্ষতিকারক পেস্ট অবস্থান করে তাহাদের কিছুটা আক্রমণ প্রতিহত হয়।

চা-উদ্ভিদের ক্ষতিকারক প্রায় 147টি পেস্টের নাম জানা যায়। টোকা-লাই এ-অবস্থিত Tea Research Association হইতে প্রকাশিত (1965) G. M. Das-এর লিখিত বইতে এই সকল ক্ষতিকারক পেস্টদের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাইবে।

চা-গাছের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পেস্ট হইল—

1. **বাঞ্চ ক্যাটারপিলার** (Bunch caterpillar)—*Andraca bipunctata* (wlker)

2. **মসকুইটো বাগ** (Mosquito bug) *Helopeltis theivora* waterhouse.

3. **চা-গাছের লুপার** (Tea looper) = *Biston Suppressaria* Green

4. **রেড স্পাইডার** (Red Spider) = *Oligonychus Coffeae*

5. **সাইকিড্স** (Psychids)—বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে

(i) *Clania cramerii* westw

(ii) *Metsia plana* wlk

(iii) *Mantha assamica* walt.

—প্রভৃতিই ভীষণভাবে ক্ষতি করে।

বাঞ্চ ক্যাটাপিলার (Bunch caterpillar) ঃ

ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান এবং ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে এই পেস্টের বিস্তৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। উদ্ভিদের শাখায় লার্ভাদশা একসাথে বসবাস করে। এই বিচিত্র স্বভাবের দরুন সাধারণভাবে ইহাদের বাঞ্চ ক্যাটারপিলার বলা হয়।

অ্যানড্রাকা বাইপাঙ্কটাটা (*Andraca bipunctata*)

শ্রেণী (Class) ঃ পতঙ্গ (Insecta)

বর্গ (Order) ঃ লেপিডপ্‌টেরা (Lepidoptera)

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature of damage) ঃ

লার্ভাদশাই কচি চা-পাতার কলা খাইয়া ভীষণভাবে ক্ষতি করে। সংঘবদ্ধভাবে লার্ভাদশা উদ্ভিদের কচি নরম শাখায় বসবাস করে। এই পেস্টের আক্রমণ সময়ে সময়ে এত মারাত্মক হয় যে উদ্ভিদের শাখাগুলিতে পাতা দেখা যায় না। শুকনো ডালে লার্ভার অবস্থান সহজেই লক্ষণীয় হয়।

পেস্টের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of the pest and habit) ঃ

পূর্ণাঙ্গ মথের সম্পূর্ণ ডানার বিস্তৃতি 40 মি.মি. হইতে 50 মি.মি. পর্যন্ত হয়। সম্মুখস্থ ডানায় কতকগুলি ঢেউখেলানো দাগ ব্যতীত প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া সাদা গোলাকার চিহ্ন থাকে। পিছনের ডানার অগ্রপ্রান্তের তুলনায় পশ্চাদদিকে বাদামী বর্ণের অবস্থিতি বেশী দেখা যায়।

গাঢ় বাদামী বর্ণের লার্ভার গায়ে অনু দৈর্ঘ্য ও আড়াআড়িভাবে বিচিত্র বর্ণের দাগ বিদ্যমান। লার্ভা দলবদ্ধভাবে গাছের শাখায় অবস্থান করে।

জীবনচক্র (Life cycle) ঃ ডিম (Eggs) স্ত্রী মথ নিষিক্ত হইবার পর চা-পাতার অঙ্কীয়তলে একই সরল রেখায় সারিবদ্ধভাবে হলুদ বর্ণের ডিম পাড়ে। একটি স্ত্রী মথ প্রায় 500টির মত ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিতে প্রায় এক সপ্তাহের মত সময় লাগে।

লার্ভা বা শুককীট (Larva) ঃ সদ্যোজাত লার্ভা ইষৎ হলুদ বর্ণের হয়। পাতার কলা খাইবার পূর্বে ইহারা ডিমের খোলস খাইতে শুরু করে। এর পরই খুবই চঞ্চল হইয়া পাতা খায়। পরিণত লার্ভা হইতে চারবার খোলস ত্যাগ করে। লার্ভা দলবদ্ধভাবে গাছের শাখায় অবস্থান করে। পরিণত লার্ভার দৈর্ঘ্য প্রায় 40 হইতে 50 মি.মি.। লার্ভাদশা সম্পূর্ণ করিতে প্রায় তিন হইতে চার সপ্তাহ সময় লাগে। পিউপা দশায় যাইবার পূর্বে লার্ভা আর দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে না।

পিউপা (Pupa) ঃ কোকুনের মধ্যে পিউপা নিশ্চল অবস্থায় থাকে। কোকুনগুলি গাছের শাখায় একত্রে থাকিতে দেখা যায়। অনেক সময় লার্ভা পিউপা দশায় যাইবার পূর্বে উদ্ভিদের শুকনো পাতায় চলিয়া যায়। বাদামী বর্ণের পিউপার দৈর্ঘ্য প্রায় 25 মি.মি.। পিউপা দশার স্থায়ীকাল 2-4 সপ্তাহ।

পূর্ণাঙ্গ (Adult) ঃ কোকুন ফাটিয়া পূর্ণাঙ্গ মথ বাহির হয় ও জননে লিপ্ত হয়।

ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের অঞ্চলগুলিতে এই পেস্টের সাধারণতঃ চারিটি জনুক্রম দেখা যায়।

দমন (Control) ঃ

যেহেতু লার্ভাদশায় দলবদ্ধভাবে থাকিতে দেখা যায়, জীবন বৃত্তান্তের

এইখানেই ইহাদের দমন করা সহজ হয়।

1. **যান্ত্রিক উপায়** (Mechanical means) : দলবদ্ধ লার্ভাগুলিকে সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই মারিয়া ফেলা হয়। পাতার নীচে ডিমগুলি চোখে পড়িলেই পাতা ছিঁড়িয়া ফেলা হয় এবং নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

2. **রাসায়নিক** (Chemical) : বিভিন্ন কীটনাশক প্রয়োগে লার্ভা দমন করা সম্ভব। 0·2% কার্বারিল (Carbaryl) ও 0·05% এণ্ডোসালফান কীটনাশকের কার্যকারিতা ফলদায়ক।

3. **জৈবিক নিয়ন্ত্রণ** (Biological) : লার্ভাদশায় এই পেস্ট এক-ধরনের পরজীবী পতঙ্গ (Parasitc fly) কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ইহা ব্যতীত একধরনের ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ঘটিত রোগেও ইহারা আক্রান্ত হয়। দলবদ্ধ লার্ভার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণের জন্য ইহাদের সময়োচিত ব্যবহার করা প্রয়োজন।

মসকুইটো বাগ (Mosquito bug)

চা-গাছের ক্ষতিকারক পেস্টের মধ্যে সবথেকে বেশী ক্ষতিকর এই বাগ বর্তমানে আধুনিক কীটনাশক ব্যবহারে দমন করা সম্ভব হইয়াছে। পাতা ও গাছের নরম শাখার কলা, রস শোষণ করিয়া চা-গাছের ভীষণভাবে ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা ক্ষতির প্রকৃতি এমন আকার ধারণ করে যাহা "Mosquito blight of tea" বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দো-চীন প্রভৃতি অঞ্চলে এই পেস্টের বিস্তৃতি দেখা যায়।

হেলোপেল্টিস্ থিয়োভোরা (*Helopeltis theivora*)

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)

বর্গ (Order) : হেমিপ্‌টেরা (Hemiptera)

গোত্র (Family) : মিরিডি (Miridae)

এই প্রজাতির পেস্ট ব্যতীত ইহাদের ঘনিষ্ঠ অন্যান্য প্রজাতিগুলিও চা, সিঙ্কোনা ও কোকো উদ্ভিদের ভীষণ ক্ষতি করিয়া থাকে। তবে এই প্রজাতিই চা-গাছের অন্যতম পেস্ট বলিয়া অভিহিত।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature of damage) :

অন্যান্য বাগ জাতীয় পতঙ্গের মত ইহারাও নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ দশায় পাতা ও কাণ্ডের রস শোষণ করিয়া চা-গাছকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে। পাতা ও কাণ্ডের যে স্থানে ইহারা প্রোবোসিস ঢুকাইয়া রস শোষণ করে সেই সেই স্থান বাদামী বর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের প্রোবোসিস হইতে লালা নিঃসৃত হয় ফলে ধীরে ধীরে আক্রমণ স্থান কালো বর্ণের হইতে থাকে। এইরকমভাবে ইহারা পাতার বিভিন্ন স্থান হইতে রস শোষণ করে। ফলে, ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়, পাতা এবং শাখা হইতে খসিয়া পড়ে। অনুরূপভাবে কাণ্ডেরও ক্ষতি করে। উদ্ভিদের সমস্ত নরম শাখাগুলি এইভাবে ধীরে ধীরে কালো বর্ণের হইয়া যায়।

পেস্টের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of the pest and habit) :

দেহটি নলাকার এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় 6-8 মি.মি. পর্যন্ত হয়। মস্তক ও উদর অংশ হলুদাভ-বাদামী বর্ণের এবং বক্ষ অঞ্চল গাঢ় লাল বর্ণের হয়। বক্ষের প্রথম অংশে একটি সুস্পষ্ট শিং বিদ্যমান। ইহাদের পদগুলি খুব লম্বা হয়। পূর্ণাঙ্গ বাগ উড়িয়া বেশীদুর যাইতে পারে না।

জীবনচক্র (Life cycle) : সম্পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করিতে শীতকালে প্রায় 8 সপ্তাহের মত সময় লাগে। জুন মাসে এই সময়কাল প্রায় 2 সপ্তাহের মত।

ডিম (Eggs) : স্ত্রী পতঙ্গ গাছের নরম শাখায় অথবা পাতা ও কুড়ির অক্ষে ফুটা করিয়া উহার মধ্যে ডিম পাড়ে। ডিমগুলির প্রান্তভাগের দুইটি সরু পাতা এই ছিদ্র হইতে বাহিরে বেরিয়ে থাকে। এইভাবে ডিমগুলি রাখে বলিয়াই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হইতে পারে না। ডিম ফুটিতে প্রায় 5-27 দিন সময় লাগে।

নিম্ফ (Nymph) : ডিম ফুটিয়া সদ্যোজাত নিম্ফ বাহির হয়। ইহারা মাকড়সার মত দেখিতে হয়। পাগুলি খুব লম্বা হয়। পাতার বিভিন্ন স্থানে ক্ষত করিয়া রস শোষণ করিতে থাকে।

পূর্ণাঙ্গ : নিম্ফ পাঁচবার খোলস ত্যাগ করিয়া পূর্ণাঙ্গ দশায় রূপান্তরিত হয়। পূর্ণাঙ্গ দশায় গাছের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রস শোষণ করে।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) : জুন-জুলাই মাসে ইহাদের আক্রমণ বেশী হয়।

দমন (Control) :

1. **যান্ত্রিক উপায়** (Mechanical means) : আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ করিয়া ধ্বংস করা হয়।

2. **রাসায়নিক** (Chemical) : বর্তমানে যে কোন কনট্যাক্ট কীটনাশক (0·1% ম্যালাথিয়ন অথবা 0·5% লিনডেন) প্রয়োগে ইহাদের দমন করা সম্ভব হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া স্প্রে করিলে ইহাদের হাত হইতে খুব সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়।

নারকেল গাছের পেস্ট (Pests of coconut plantation)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 750-এর বেশী প্রজাতির বিভিন্ন পতঙ্গ নারকেল উদ্ভিদের ক্ষতি করে। ইহার মধ্যে প্রায় 100 প্রজাতির বেশী পতঙ্গ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এই আবাদের ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে।

সব থেকে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকারক একটি পেস্টের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ, জীবন বৃত্তান্ত এইখানে আলোচনা করা হইল।

রাইনোসেরস বিট্‌ল (Rhinoceros beetle)

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই পেস্টের বিস্তৃতির খবর পাওয়া যায়। কোন কোন জায়গায় এই পেস্টের আক্রমণে প্রায় 50% উদ্ভিদ একেবারে বিনষ্ট হয়।

অরিক্টিস্ রাইনোসেরস (*Oryctes rhinoceros*)

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)

বর্গ (Order) : কোলেওপ্‌টেরা (Coleoptera)

মস্তকের সম্মুখভাগে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাকানে শিং থাকায় ইহাদের নামকরণ এইরূপ হইয়াছে।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature of damage) :

রাইনোসেরস বিট্‌ল পূর্ণাঙ্গ দশায় উদ্ভিদের ক্রাউন (crown) অংশ খাইয়া উদ্ভিদের ক্ষতি করে। লার্ভাদশায় আবর্জনা খায়। পাতা বাহির হইবার পূর্ব মুহূর্তেই কাটিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। কখনও কখনও উদ্ভিদ বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থাতেই কাটিয়া উদ্ভিদটিকে নষ্ট করিয়া দেয়। এইভাবে ক্ষতি

করা ব্যতীত এই সব স্থানে ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে সম্পূর্ণ গাছটি পরবর্তীকালে শুকাইয়া মরিয়া যায়।

পেস্টের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of the pest and habit) ঃ

বৃহৎ কালোরঙের বিট্‌ল দৈর্ঘ্যে প্রায় 30 মি.মি. হইতে 50 মি.মি. এবং প্রস্থে প্রায় 14 মি.মি. হইতে 21 মি.মি. পর্যন্ত হয়। দেহের অঙ্কীয় তল লাল-বাদামী বর্ণের হয়। পুরুষ বিট্‌লের শিং স্ত্রী বিট্‌লের শিঙের তুলনায় দীর্ঘ হয়।

জীবনচক্র (Life cycle) ঃ সম্পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করিতে প্রায় 22 দিন সময় লাগে।

ডিম (Eggs) ঃ স্ত্রী বিট্‌ল আবর্জনার স্তূপে, পচা নারকেলের খোলসের মধ্যে বা অন্যান্য পচা শাক-সবজীর স্তূপে, জমা সারের মধ্যে প্রায় 100-র বেশী ডিম পাড়ে। ডিমগুলি এমনিতেই বৃহৎ (2·5 × 3·5 মি.মি.) এবং পরের দিকে আরও বড় হয়। এক হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটিয়া লার্ভা বাহির হয়।

লার্ভা বা গ্রাব (Larva or Grub) ঃ সদ্যোজাত লার্ভা প্রায় দৈর্ঘ্যে 7 মি.মি.। পচা আবর্জনা খাইয়া লার্ভা বাড়িতে থাকে। পরিণত লার্ভা খুব মাংসল হয়। ইহাদের পশ্চাদ দিক বাঁকিয়া আংটির মত আকার ধারণ করে। লার্ভা দশায় দুইবার খোলস ত্যাগ করে। লার্ভাদশার স্থায়ীকাল প্রায় আড়াই মাসের মত, কখনও ছয় মাসও লাগিয়া যায়। লার্ভা পিউপা দশায় যাইবার পূর্বে মাটি বা যে স্থানে খাওয়া দাওয়া করে সেইখানেই ঘুরিতে শুরু করে।

পিউপা (Pupa) ঃ পিউপা দশা মাটির নীচে বা আবর্জনার নীচে প্রায় 120 সে.মি. গভীরতায় কাটাইয়া দেয়। লার্ভা কোকুন তৈয়ারী করিয়া পিউপা অবস্থায় থাকে। বাদামী বর্ণের পিউপার দৈর্ঘ্য প্রায় 50 মি.মি. হইতে 70 মি.মি.। পিউপা দশার স্থায়ীকাল প্রায় দুই হইতে চার সপ্তাহের মত।

পূর্ণাঙ্গ (Adult) ঃ কোকুন কাটিয়া পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল বাহিরে আসে। প্রথম দিকে হাল্কা বাদামী বর্ণের থাকে পরে ধীরে ধীরে কালো বর্ণের হয়।

স্ত্রী বিট্‌ল পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় বাহির হইবার পর 3 হইতে 9 সপ্তাহ পর ডিম পাড়িতে শুরু করে।

প্রাকৃতিক শত্রু (Natural enemies) ঃ এই পেস্টের ছত্রাক ও ব্যাক্টিরিয়া ঘটিত রোগ হয়। ইহা ব্যতীত পতঙ্গ পরজীবী ও খাদক প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। খাদক প্রাণীদের মধ্যে ব্যাঙ, পাখী, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দমন (Control) ঃ

যেহেতু ডিম হইতে পিউপা দশা মাটির নীচে, আবর্জনার স্তূপে বা অন্যান্য পচন জিনিষের নীচে থাকে সেই কারণে এই সব স্থানে নিয়মিত কীটনাশক (0·1% B.H.C) ব্যবহারে ইহাদের ভালভাবেই দমন করা সম্ভব। যে সব স্থানে ইহারা ডিম পাড়ে সেই সব স্থান সব সময়ই পরিষ্কার রাখা উচিত। ইহাতেও ইহাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করা যায়।

নারকেল বাগানে অন্যভাবেও প্রতিরোধ করা হয়। পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল উদ্ভিদের যে সব স্থানে আক্রমণ করে সেইখানে লোহার রড ঢুকিয়ে ইহাদের আঘাত করা হয়। গর্ত হইতে বিট্‌ল অপসারিত করিয়া সেই স্থানে বালি ও কীটনাশক (0·5% B.H.C, ক্লোরডেন ও বালি) দেওয়া হয়। এই-ভাবেও ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

ফল ও ফলস্থষ্ট উদ্ভিদের পেস্ট (Pests of fruits and fruit trees)

গ্রীষ্মকালীন নাতিশীতোষ্ণ ফলগুলির মধ্যে আপেল, অর্চাডস, নাসপাতি, এপ্রিকট, পীচ, লেবু, আম, পেয়ারা ইত্যাদিই প্রধান ফল। বিভিন্ন বর্গের অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য ক্ষতিকারক পতঙ্গ এ সকল ফলও ফলস্থষ্ট উদ্ভিদের ভীষণভাবে ক্ষতি করিয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটি ফলের উল্লেখযোগ্য পেস্টগুলির নাম দেওয়া হইল এবং কেবলমাত্র আমের ক্ষতিকারক একটি পেস্টের সম্পূর্ণ বিবরণ ও তাহাদের প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচিত হইল।

ফ্রুট ফ্লাই (Fruit fly)

আম, পেয়ারা, এপ্রিকট, পীচ, নাসপাতি প্রভৃতি ফলের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকারক পেস্ট। আমেই ইহাদের আধিক্য বেশী এবং ক্ষতিগ্রস্ত ফল খাদ্যের অনুপযোগী হইয়া যায়।

ফল (Fruits)	সাধারণ নাম (Common name)	বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name)
1. আপেল	উলি এফিড (Woolly aphid)	*Eriosoma lanigerum* (Hausmaun)
2. নাসপাতি	ফ্রুট সাকিং মথ (Fruit sucking moth)	*Otheris materne* (Luin)
3. আম	(i) ফ্রুট ফ্লাই (Fruit fly)	*Dacus dorsalis* (Hendel)
	(ii) লীফ্ হপার (Leaf hopper)	*Idiocerus clypealis* Leth
	(iii) স্টেম বোরার (Stem borer)	*Batocera rufomaculata* De Geer.
	(iv) মিলি বাগ্ (Mealy bug)	*Drosicha mangiferae* Green
4. অর্চাড, লিচু ইত্যাদি	বার্ক-ইটিং ক্যাটারপিলার (Bark-eating catterpillar)	*Inderbela quadrinoteta* Walk
5. পেয়ারা	এনার বাটারফ্লাই (Anar butterfly)	*Vira chola isocrates* Fabr.
6. লেবু	(i) লেমন্ বাটারফ্লাই (Lemon butterfly)	*Papilio demoleus* Linn.
	(ii) সাইট্রাস লিফ্ মাইনার (Citrus leaf miner)	*Phyllocnistis citrella* Stainton

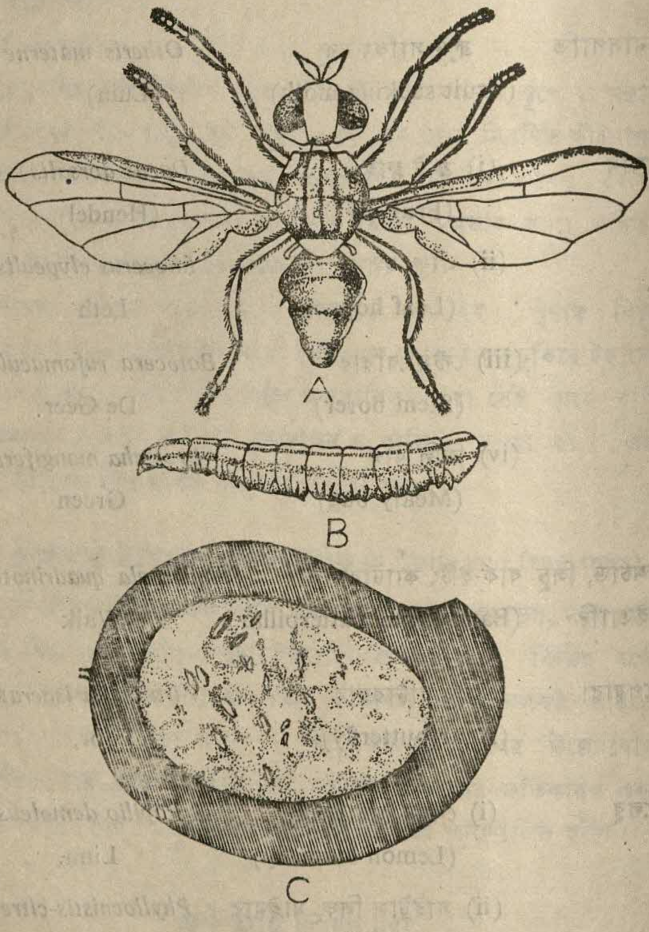
ড্যাকাস ডরসালিস্ (*Dacus dorsalisl*)

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)

বর্গ (Order) : ডিপ্‌টেরা (Diptera)

গোত্র (Family) : ট্রাইপেটিডি (Tripetidae)

মাছির (Housefly) থেকে একটু বড় আকৃতির পেস্ট উপরোক্ত ফল-



চিত্র 30 : ফ্রুট ফ্লাই

A—পূর্ণাঙ্গ মাছি, B—পরিণত লার্ভা এবং C—ফলের এক অংশ কাটিয়া লার্ভার অবস্থান দেখান হইয়াছে।

গুলির অশেষ ক্ষতিসাধন করে। লাল বাদামী বর্ণের মাছির গায়ে কালো ও হলুদ বর্ণের ছিট দেখা যায়।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage & nature of damage) ঃ

ইহাদের লার্ভাগুলিকে ম্যাগট (maggot) বলা হয়। ম্যাগট ফলের পাল্প (pulp) অংশ খায় (চিত্র 30C)। ফলের উপরিত্বকে গোলাকার ফুটা করিয়া ইহার অভ্যন্তরের রস খাইয়া নষ্ট করে। ইহাদের আক্রমণে ফল অপরিপক্ক অবস্থাতেই ঝড়িয়া পড়ে। ফলের উপরের গোলাকার ছিদ্র দিয়া রস পড়িতে থাকে। আক্রান্ত ফলগুলি নরম হইয়া যায় এবং মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী হইয়া দাঁড়ায়। পেয়ারা বিশেষতঃ স্পঞ্জের মত হইয়া যায়।

জীবনচক্র (Life cycle) ঃ সারা বৎসরই ইহাদের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রচণ্ড শীতে খুবই কম দেখা যায়।

ডিম (Eggs) ঃ স্ত্রী মাছি পরিপক্ক ফলের ত্বকের নীচে এক জায়গায় ডিম পাড়ে। গুচ্ছাকৃতি ডিমগুলি উজ্জ্বল সাদা বর্ণের হয়। একটি স্ত্রী মাছি প্রায় 50 হইতে 200টি ডিম পাড়ে। গ্রীষ্মকালে 2-3 দিন এবং শীতকালে 15 দিনের মধ্যে ডিম ফাটিয়া ম্যাগট বাহির হয়।

ম্যাগট (Maggot) ঃ প্রায় এক হইতে চার সপ্তাহ ধরিয়া ম্যাগট ফলের পাল্প অংশ খায়। সাদা বর্ণের পরিণত ম্যাগট (চিত্র 30B) প্রায় 8-9 মি.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। ম্যাগট পরিণত হইতেই পরিত্যক্ত ফলের রসের সহিত মাটিতে পড়িয়া যায়। এরপর ম্যাগট পিউপা দশায় যায়।

পিউপা (Pupa) ঃ হাল্কা বাদামী বর্ণের পিউপা দৈর্ঘ্যে প্রায় 4-5 মি.মি.। মাটির নীচে 3-7 ইঞ্চি গভীরতায় পিউপা দশা কাটাইয়া দেয়। পিউপা দশার স্থায়ীকাল শীতকালে ছয় সপ্তাহ এবং গ্রীষ্মকালে প্রায় এক সপ্তাহের মত।

পূর্ণাঙ্গ (Adult) (চিত্র 30A) ঃ পিউপা সমঙ্গতে পরিণত হয়। বৎসরে কয়েকটি জনুক্রম আবর্তিত হয়।

দমন (Control) ঃ আক্রান্ত ফলগুলির অপসারণ ব্যতীত আর কোন রকম প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। আমের অন্যান্য পেস্টগুলির দমনে বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার করা হয়।

গুদামজাত খাদ্যশস্যের ক্ষতিকারক পোকামাকড়
(Insect pests of stored grains)

প্রায় কয়েকশত প্রজাতির পোকামাকড় কর্তৃক গুদামজাত খাদ্যশস্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন হয়। গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলিতেই ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক।

সঞ্চিত খাদ্যশস্যের প্রধান পেস্টগুলি বিট্‌ল ও মথ জাতীয়। ইহার মধ্যে বিট্‌ল জাতীয় পেস্টের আধিক্য বেশী দেখা যায়। এই দুই রকমের বিভিন্ন প্রজাতির পেস্ট ব্যতীত আরও অন্যান্য পতঙ্গাদি গুদামজাত খাদ্যশস্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আরশোলা, পিঁপড়ে, সিলভার ফিস, উইপোকা উল্লেখযোগ্য। ইহারা খাদ্যশস্য খাইয়া যত না ধ্বংস করে ইহাদের উপস্থিতিই বিনষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অ্যাকারিনা (Acarina) বর্গের অন্তর্গত মাইট (Mite)-এর উপস্থিতিও গুদামজাত খাদ্যশস্যে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন আবহাওয়ায় নিম্নোক্ত কয়েকটি ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ বেশী দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে **ব্রুকিডি** (Bruchidae) গোত্রের অন্তর্গত কয়েকটি প্রজাতির পোকা কেবলমাত্র ডালজাতীয় (Pulse) গুদাম শস্যে এবং বাকী মথ ও বিট্‌ল জাতীয় প্রজাতির (বিভিন্ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত) পোকাগুলি চাল, গম, ভুট্টা প্রভৃতির আস্ত দানা ও গুড়ায় (Cereals and dust) আক্রমণ করে। ইহাদের পরিচিতি, জীবনবৃত্তান্ত এবং ইহাদের হাত হইতে গুদামজাত খাদ্যশস্য রক্ষা করিবার পদ্ধতি বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইল।

1. ধানের উইভিল (Rice weevil) ঃ

পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষতঃ উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের খাদ্যশস্যকণার ক্ষতিকারক অন্যতম বিট্‌ল। যদিও এই ধরনের পেস্ট **ধানের উইভিল** নামে পরিচিত কিন্তু ইহারা সকল প্রকার খাদ্যশস্যের এবং মিলেটের দারুণভাবে ক্ষতি করিয়া থাকে।

সিটোফাইলাস অরাইজি (*Sitophilus oryzae* Linnaeus) ঃ

শ্রেণী (Class) ঃ পতঙ্গ (Insecta)
বর্গ (Order) ঃ কোলেওপটেরা (Coleoptera)
গোত্র (Family) ঃ কুরকুলিওনিডি (Curculionidae)

ইহারা একপ্রকার বিট্‌ল জাতীয় পতঙ্গ। গুদামজাত শস্যেই ইহাদের প্রকোপ খুব বেশী। ইহাদেরই খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত প্রায় একই রকমের বিট্‌ল (*Sitophilus granarium*)-ও খাদ্যশস্যের প্রভূত ক্ষতি করে। ইহারা গ্রানারী উইভিল (Granary weevil) নামে পরিচিত।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage & nature of damage) :

পূর্ণাঙ্গ ও লার্ভা উভয় দশায় শস্যদানা এমনভাবে ক্ষতি করে যে মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী তো বটেই এমনকি বীজের জন্য ব্যবহার অযোগ্য হইয়া পড়ে। লার্ভার আক্রমণই উল্লেখযোগ্য।

ইহারা শস্যের ভিতরের সারাংশ ভক্ষণ করিয়া শস্যটিকে ফাঁপা করিয়া দেয়। পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল তুণ্ডের সাহায্যে এবং ইহাদের লার্ভা চাউলদানা ফুটা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। ইহাদের আক্রমণ হঠাৎ এবং অনিয়মিত।

পেস্টের বহিরাকৃতি (External features of the Pest) :

পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল প্রায় 3 মি.মি.-এর মতো লম্বা, লালচে বাদামী অথবা কালো রঙের হয়। মস্তক অংশের সম্মুখভাগ প্রসারিত হইয়া একটি তুণ্ডের সৃষ্টি করে এবং এই তুণ্ডের শেষে একজোড়া শক্ত চোয়াল বিদ্যমান। গ্র্যানারী উইভিল-এর সহিত পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ—

Rice weevil (*S. oryzae*)	Granary weevil (*S. granarium*)
1. আকৃতিতে ছোট (যখন একই রকম খাদ্যে দেখা যায়) এবং শক্ত ডানার উপরে লাল বা হলুদ রঙের দাগ দেখা যায়।	আকৃতিতে বৃহৎ (যখন একই রকম খাদ্যে দেখা যায়) এবং সর্বত্র উজ্জ্বল বর্ণের হয়। ডানার উপর কোনরকম দাগ থাকে না।
2. প্রোনোটামের উপর গোলাকার, ক্ষুদ্র আকৃতির পিট্‌স (Pits) বর্তমান।	বৃহৎ আকৃতি পিট্‌স থাকে।

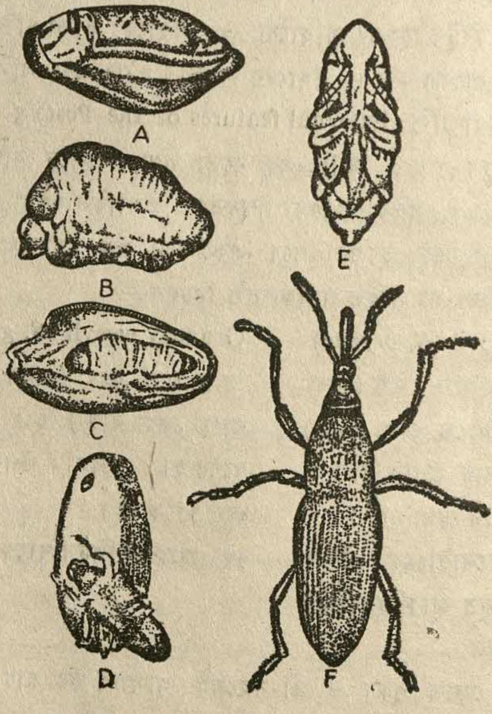
উভয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী সহজেই আলাদা করা যায়। পুরুষদের তুণ্ডগুলি স্ত্রীর তুলনায় মোটা ও আকৃতিগতভাবে ছোট হয়।

গ্র্যানারী উইভিলগুলি ভালভাবে উড়িতে সক্ষম এবং চোখের নিমেষে গুদাম হইতে ক্ষেতে গিয়া আক্রমণ করিতে দেখা যায়।

জীবনচক্র (Life cycle) : পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী বিট্‌ল শস্যের নরম অংশে একটি

ছোট গর্ত করে (চিত্র 31A ও D) এবং সেখানেই একটি ডিম পাড়ে। অবশ্য শস্যের আকার অনুযায়ী 1 হইতে 4টি ডিমও পাড়িতে দেখা যায়। সাদারঙের গোলাকার ডিমগুলি প্রায় 0·7 মি.মি. লম্বা এবং চওড়ায় 0·3 মি.মি. পর্যন্ত হয়। স্ত্রী বিট্‌ল এককালীন প্রায় 250টি ডিম পাড়ে। গ্রীষ্মকালে 4 দিনে লার্ভা বাহির হয়। শীতকালে অবশ্য 6-9 দিন সময় লাগে।

লার্ভা বা গ্রাব (Larva or Grub) : ডিম ফুটিয়া থলথলে লার্ভা প্রথমে শস্যের কার্ণেল অংশে প্রবেশ করে। সাদারঙের লার্ভাটির (চিত্র 31B) মস্তক অংশ হলুদ-বাদামী বর্ণের হয়। ইহাদের পা থাকে না। লার্ভা শস্য-দানার সারাংশ সম্পূর্ণ খাইয়া ফেলিয়া শুধুমাত্র খোলসের মধ্যেই পড়িয়া থাকে



চিত্র 31 : ধানের উইভিল

A—শস্যদানার উপর ডিম পাড়ার গর্ত, B—লার্ভা, C—শস্যদানার অভ্যন্তরে লার্ভা, D—তুণ্ড দ্বারা পূর্ণাঙ্গকে শস্যের উপর গর্ত করতে দেখা যাইতেছে, E—পিউপা এবং F—পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল

(চিত্র 31C) এবং পিউপা দশায় পরিণত হয়। পরিণত লার্ভা হলুদ-সাদাবর্ণের হয় এবং প্রায় $\frac{1}{8}$ ইঞ্চির মত লম্বা হইতে দেখা যায়। লার্ভাদশা 19-34 দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

পিউপা (Pupa) : লার্ভা শস্যদানার অভ্যন্তরেই পিউপা-খোলস (Pupa-cell) তৈয়ারী করে। 3-6 দিনের মত পিউপাদশা স্থায়ী হয়। কখনও কখনও 20 দিনের মত সময়ও লাগে। সাদা রঙের পিউপা (চিত্র 31E) পরবর্তীকালে গাঢ় বাদামী রঙ ধারণ করে।

পূর্ণাঙ্গ (Adult) **বিট্‌ল** (চিত্র 31F) : শস্যদানা হইতে বাহির হইয়া যৌনমিলনের প্রস্তুতি নেয়। পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল 4-5 মাস পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা বৎসরে পাঁচটি প্রজন্ম সৃষ্টি করে। ইহারা শীতকালে দেওয়ালের ফাটলে অথবা গুদামঘরের অন্যান্য আশ্রয়স্থলে গুপ্ত অবস্থায় কাটাইয়া দেয়।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) : আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসেই ইহারা ভীষণভাবে ক্ষতি করে। শীতকালে ইহাদের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম।

প্রাকৃতিক শত্রু (Natural enemies) : এই পোকার লার্ভা কয়েকটি পতঙ্গ পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়। হাইমেনোপ্‌টেরা (Hymenoptera) বর্গের অন্তর্গত পরজীবীগুলি হইল—

1. *Aplastomorpha Calandrae* How.
2. *Larrophagus distinguendus* Forst

2. **খাপরা বিট্‌ল** (Khapra beetle) :

যদিও :এই পেস্টের বিস্তৃতি সর্বত্র কিন্তু যে সব অঞ্চলের তাপমাত্রা 90°-110°F থাকে সেই সব স্থানেই ইহাদের প্রকোপ বেশী। তণ্ডুল জাতীয় শস্য, মিলেট বা ডাল জাতীয় শস্যের কণার উপরিস্তর খাইয়া সমুদয় শস্যের ক্ষতি করে।

ট্রগোডারমা গ্র্যানারিয়াম (*Trogoderma granarium* Everts) :

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecla)
বর্গ (Order) : কোলেওপ্‌টেরা (Coleoptera)
গোত্র (Family) : ডার্মেসটিডি (Dermestidae)

ইহারা গাঢ় বাদামী ডিম্বাকৃতির বিট্‌ল পোকা। শস্যদানার ভ্রূণ অংশই

ইহাদের দ্বারা প্রথম দিকে আক্রান্ত হয়। পরবর্তীকালে মারাত্মকভাবে শস্যের সব অংশই নিঃশেষ হয়।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature of damage) :

এই পেস্টের বৈশিষ্ট্য যে শুধুমাত্র লার্ভা বা শুককীট দশাই শস্যের ক্ষতি করে। সাধারণতঃ শস্যের কনার উপরিস্তরেই অবস্থান করে। ভ্রূণ অংশ খাইতে খাইতে কনার অন্য অংশও ভক্ষণ করিয়া ফ্রাস (Frass)-এ পরিণত করে। ক্ষতির প্রকৃতি অনেকটা লেসার **গ্রেনবোরার**-এর মত।

পেস্টের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of the pest & habit) :

পূর্ণাঙ্গ পুরুষ বিট্‌ল আকৃতিতে স্ত্রীর তুলনায় ছোট ও গাঢ় বাদামী বর্ণের হয়। স্ত্রী বিট্‌ল প্রায় 2·5 মি.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহাদের ডানায় অস্পষ্ট রেখা বিদ্যমান। ইহাদের শুককীটগুলি ধূসর শুভ্র এবং সারা দেহে লাল-ধূসর বর্ণের গোছা গোছা কুর্চ থাকে .

শস্যের উপরিতলে অর্থাৎ 10-15 ইঞ্চির স্তরেই ইহাদের প্রকোপ দেখা যায়।

জীবনচক্র (Life cycle) : এই পেস্টের লার্ভাদশা শীতকালের সম্পূর্ণ সময়ই অর্থাৎ অক্টোবর-মার্চ মাসে দেওয়ালের ফাটলে, মেঝে অথবা গুদাম-ঘরের অন্যান্য যে কোন জায়গাতেই কাটাইয়া দেয়। এপ্রিলের শেষে অথবা মে মাসের প্রথম দিকেই পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল যৌনমিলন সম্পন্ন করে। স্ত্রী বিট্‌ল এর পরই শস্যদানার উপরে একটি অথবা 2-5টি ডিম পাড়ে। একটি স্ত্রী বিট্‌ল একদিনে 26টির মত ডিম পাড়িতে পারে এবং শেষ জীবন পর্যন্ত প্রায় 125টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিতে প্রায় 6-16 দিনের মত সময় লাগে।

লার্ভা অথবা গ্রাব (Larva or Grub) : লার্ভার গায়ে অসংখ্য কুর্চ বিদ্যমান। দেহের শেষ অংশে লম্বা লম্বা কুর্চ থাকে। ধূসর শুভ্র লার্ভা পরবর্তীকালে বাদামী বর্ণের হয় এবং দেহে আড়াআড়িভাবে হলুদ-বাদামী বর্ণের দাগ দেখা যায়। 3 হইতে 7 সপ্তাহ পর লার্ভা পরিণত অবস্থায় আসে।

উল্লেখযোগ্য, লার্ভাদশা চার বৎসর পর্যন্তও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে। যে কোন অবস্থাতেই অর্থাৎ তাপমাত্রা, আর্দ্রতার পরিবর্তন অথবা খাদ্য না

খাইয়া ইহারা কাটাইতে পারে।

পিউপা (Pupa) ঃ প্রি-পিউপা অবস্থা কাটাইয়া লার্ভা পিউপাতে পরিণত হয়। পিউপা দশা সম্পূর্ণ হইতে 4-6 দিনের মত, কখনও কখনও 16-17 দিনও লাগে।

পিউপা **পূর্ণাঙ্গ** (Adult) বিট্‌ল-এ রূপান্তরিত হয়। স্ত্রী বিট্‌ল 2-3 দিন পরই ডিম পাড়িতে শুরু করে। পূর্ণাঙ্গ দশা 10-32 দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

সম্পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করিতে কম করিয়া 4 সপ্তাহের মত সময় লাগে এবং দুঃসময়ে আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) ঃ জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইহাদের আক্রমণ বেশী দেখা যায়।

প্রাকৃতিক শত্রু (Natural enemies) ঃ নির্দিষ্ট কোন পরজীবী ও ভক্ষণকারী প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত না হইলেও এই পোকার লার্ভাদশায় Reduviidae গোত্রের অন্তর্গত এক প্রকার শোষক (Bug) পোকার অবস্থান লক্ষ করা যায়।

3. **লেসার গ্রেন বোরার** (Lesser grain borer) ঃ

বিট্‌ল জাতীয় এই পেস্ট পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিস্তৃত। তণ্ডুল ও ডাল জাতীয় গুদামজাত শস্যের বিপুল ক্ষতিসাধন করে। কিছু কিছু অঞ্চলে এই পেস্টের আক্রমণ **সিটোফিলাস**-এর থেকেও মারাত্মক হয় বলিয়া জানা যায়।

রাইজোপারথা ডোমিনিকা (*Rhizopertha dominica* Fabr.)

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insceta)
বর্গ (Order) : কোলেওপ্‌টেরা (Coleoptera)
গোত্র (Family) : বস্‌ট্রিচিডি (Bostrichidae)

ভারতবর্ষেই এই প্রজাতির উদ্ভব বলিয়া জানা যায় এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে এই পেস্টের অবস্থিতির কথা জানা যায়। 1792 সালে Fabricius সর্বপ্রথম এই পেস্টের বর্ণনা দেন।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage and nature of damage) ঃ

পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল ও লার্ভা উভয়ই শস্যের ক্ষতি করে। তবে, পূর্ণাঙ্গ দশাই

বেশী ক্ষতিকর। ইহারা শস্যদানায় ছিদ্র করিয়া উহার অভ্যন্তরে বাস করে। লার্ভা শস্যের স্টার্চ (Starch) অংশ খাইয়া শুধুমাত্র খোসা রাখিয়া দেয়। লার্ভা যত না বেশী খায় নষ্ট করে বেশী। সদ্যোজাত লার্ভা শস্যদানার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিতে পারিলে পূর্ণাঙ্গ বিট্‌লের বর্জিত গুড়া খাইয়া বৃদ্ধি পায়।

পেস্টের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of the pest & habit) : এই বিট্‌লগুলি লম্বা ধরনের, দেহ ধূসর কালো বর্ণের ও অতি কর্কশ। মস্তক অংশ বক্ষদেশের নীচে এমনভাবে রাখিয়া দেয় যাহাতে ত্রিকোনাকৃতি 'হুড' (Hood)-এর সৃষ্টি হয়। 10 খণ্ডকযুক্ত শুড়গুলি শেষ প্রান্ত নবের (Knob) আকার ধারণ করে। ময়লা সাদা রঙের গ্রাব বা লার্ভার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম থাকে। পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল অনেকদূর পর্যন্ত উড়িয়া যাইতে সক্ষম এবং সেখানে বিস্তৃতি লাভ করে।

জীবনচক্র (Life cycle) : পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল ও লার্ভা উভয়ই ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাসে সুপ্ত অবস্থায় (Hibernate) কাটায়। মার্চের শুরুতেই ইহাদের আক্রমণ শুরু হইতে থাকে।

স্ত্রী বিট্‌ল শস্যের দানায়, শস্য দানার বস্তায়, গুদামঘরের দেওয়ালে এবং দেওয়ালের ফাটলে ডিম পাড়ে। **ডিমগুলি** (Eggs) নাসপাতি আকৃতির হয়। একটি স্ত্রী বিট্‌ল সাধারণতঃ 300-500 ডিম পাড়ে। গ্রীষ্ম-কালে ডিম ফুটিয়া লার্ভা বাহির হইতে প্রায় 5-6 দিন এবং শীতকালে আরও বেশী সময় লাগে।

লার্ভা বা গ্রাব (Larva or Grub) : সদ্যোজাত লার্ভা বা গ্রাব খুব চঞ্চল প্রকৃতির হয় এবং শস্যদানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া খাইতে শুরু করে। লার্ভাদশা 40-44 দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এই দশায় 4-5 বার খোলস ত্যাগ করে। পরিণত লার্ভার মস্তক অংশ বাদামী বর্ণের হয় এবং উদর অংশ বাঁকানো থাকে। লার্ভা শস্যের অভ্যন্তরে পিউপা দশায় যায়।

পিউপা (Pupa) : পিউপা দশা সম্পূর্ণ করিতে 7-8 দিনের মত সময় লাগে এবং পূর্ণাঙ্গ (Adult)-তে রূপান্তরিত হয়।

সম্পূর্ণ জীবনচক্র সম্পন্ন করিতে প্রায় দুই মাস লাগে এবং বৎসরে 5টি জন্ম পর্যন্ত বংশবিস্তার করে।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) : জুলাই হইতে

অক্টোবর।

প্রাকৃতিক শত্রু (Natural enemies)ঃ কয়েকটি প্রজাতির মাইট (*Pediculoides* spp.) এই পোকার ডিম ও লার্ভা ভক্ষণ করে। এক ধরনের Chalcid পরজীবী ইহাদের লার্ভা ও পিউপার অভ্যন্তরে বাস করে।

4. **রাস্ট-রেড ময়দার পোকা** (Rust red flour beetle)ঃ

আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতি গুঁড়া শস্যের চূর্ণ দানা ভক্ষণকারী এই পেস্টের আক্রমণ সর্বত্র দেখা যায়। তুলাবীজ, চিনাবাদামবীজ ও শুষ্ক ফলও ইহাদের দ্বারা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ট্রাইবোলিয়াম ক্যাসটেনিয়াম (*Tribolium castaneum* Herb.)ঃ

শ্রেণী (Class) : পতঙ্গ (Insecta)
বর্গ (Order) : কোলেপ্‌ওটেরা (Coleoptera)
গোত্র (Family) : টেনেব্রিওনিডি (Tenebrionidae)

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage & nature of damage)ঃ লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল খাদ্যশস্যের চূর্ণদানা এবং আটা-ময়দা প্রভৃতি ভক্ষণ করে। ইহাদের অত্যধিক আক্রমণে ভীষণ দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং আটা-ময়দার রঙ পাল্টাইয়া যায়। ফলে, মানুষের খাদ্যের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

পেস্টের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of the pest & habit)ঃ লাল ধূসর বর্ণের বিট্‌ল লম্বায় প্রায় $\frac{1}{4}$ ইঞ্চির মত হয়। ফিকে হলুদ রঙের লার্ভার দেহে অসংখ্য রোম থাকে।

জীবনচক্র (Life cycle)ঃ পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল বসন্তের প্রারম্ভেই সক্রিয় হয়। স্ত্রী বিট্‌ল আটা-ময়দার উপর গড়ে প্রায় 450টির মত ডিম (Eggs) পাড়ে। সাদা রঙের লম্বাটে ডিমগুলি গুঁড়ায় ঢাকিয়া যায়। 4-12 দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া লার্ভা বাহির হয়।

লার্ভা বা গ্রাব (Larva or Grub)ঃ সদ্যোজাত লার্ভা ছোট ও লম্বাটে ধরনের হয়। দেহের শেষ খণ্ডে একজোড়া কাটার (Spine) মত উপাঙ্গ দেখা যায়। লার্ভা 27-90 দিন পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে আটা-ময়দা খায় এবং পিউপা দশায় উপনীত হয়।

পিউপা (Pupa)ঃ সাদা রঙের পিউপার উপরিতলে অসংখ্য রোম থাকে। পিউপা শেষের দিকে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। 6-9 দিন পিউপা দশা

কাটাইয়া পূর্ণাঙ্গ (Adult) বিটল্-এ রূপান্তরিত হয়।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation)ঃ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর।

5. **ডালের পোকা** (Pulse beetles)ঃ

ডাল জাতীয় গুদামশস্যের ক্ষতিকারক পোকাগুলি এক গোত্রের (Bruchidae) অধীনেই ন্যস্ত। পৃথিবীর সর্বত্র ইহাদের বিস্তৃতির খবর পাওয়া যায়। যদিও অন্যান্য দেশে তেমন ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে স্বীকৃত নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পেস্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। বিভিন্ন প্রজাতির **ব্রুকিড্স** (Bruchids)-গুলো অন্যান্য গুদামজাত শস্যের ক্ষতি-কারক পোকাগুলি হইতে সহজেই চেনা যায়।

ক্যালোসোব্রুকাস প্রজাতিসমূহ (*Callosobruchus* spp.)

শ্রেণী (Class)	ঃ পতঙ্গ (Insecta)
বর্গ (Order)	ঃ কোলেওপ্টেরা (Coleoptera)
গোত্র (Family)	ঃ ব্রুকিডি (Bruchidae)

বেশীর ভাগ ব্রুকিড্স ক্ষেত হইতে শস্যদানার সহিত বাহিত হইয়া গুদামঘরে উপনীত হয়। ইহারা গুদামজাত বিভিন্ন প্রকার ডালের নিদারুণ ক্ষতি করে।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি (Harmful stage nature of damage)ঃ লার্ভা বা গ্রাব দানা অথবা পড (Pod) খায় এবং দানা ফুটা করিয়া অভ্যন্তরে বাস করে। শস্যদানার সম্পূর্ণ অংশ নিঃশেষ করিয়া খোসায় পরিণত করিয়া দেয়। পূর্ণাঙ্গ বিট্ল শস্য দানায় গোলাকার গর্ত তৈয়ারি করিয়া বাহির হইয়া আসে।

পেস্টসমূহের বহিরাকৃতি ও স্বভাব (External features of the pests & habit)ঃ সাধারণতঃ চকোলেট বর্ণের বিট্লগুলি লম্বায় $\frac{1}{2}$ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। ক্ষুদ্রাকার মস্তক অংশে ভোঁতা স্নাউট (Snout) বিদ্যমান। শুড় উপাঙ্গে করাতের মত খাঁজযুক্ত। পশ্চাদ পায়ের ফিমার (Femur) অংশ অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। ইলাইটা (Elytra) উদর খণ্ডক সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া রাখে না।

জীবনচক্র (Life cycle)ঃ শস্যক্ষেতে কাঁচা, নরম পড (Pod)-এর উপরে স্ত্রী বিট্ল ডিম পাড়ে। গুদামজাত শস্যের উপর একটি স্ত্রী বিট্ল

প্রায় 100-র মত ডিম (Eggs) পাড়ে। একটি শস্যদানার উপর অনেকগুলি ডিম পাড়িতে পারে অথবা একটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি হ্যাচিং (Hatching) করিবার মুহূর্তে ইষৎ হলুদাভ বা ধূসর বর্ণের হয়। ডিম ফুটিয়া 4-5 দিনের মধ্যে লার্ভা বাহির হয়।

লার্ভা বা গ্রাব (Larva or Grub) ঃ সদ্যোজাত লার্ভা পড খায় এবং দানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সাদা বর্ণের, লম্বাটে ধরনের লার্ভাগুলি প্রায় $\frac{1}{4}$ ইঞ্চির মত লম্বা হয়। গ্রীষ্মকালে 2-3 সপ্তাহের মধ্যে লার্ভা পরিণত হইয়া পিউপা দশায় যায়। ইতোমধ্যে লার্ভা কয়েকবার খোলস পরিত্যাগ করে।

পিউপা (Pupa) ঃ গ্রীষ্মকালে এই দশার স্থায়ীকাল প্রায় 4 দিনের মত কিন্তু শীতকালে প্রায় 4 সপ্তাহের মত সময় লাগে। পূর্ণাঙ্গ (Adult) দশা দুই সপ্তাহের বেশী স্থিতিশীল হয় না। শস্যদানার অভ্যন্তরে পিউপা দশা কাটাইয়া খোলসের কোন অংশ গোল করিয়া কাটিয়া বাহিরে আসে।

সম্পূর্ণ জীবনচক্র শেষ করিতে প্রায় দুই মাস বা ততোধিক সময়া লাগিতে পারে। দীর্ঘ সময়কাল তাপমাত্রা, আদ্রতা ও শস্য দানার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। উল্লেখযোগ্য, একটি শস্য দানার অভ্যন্তরে আটটি লার্ভার অবস্থানের রিপোর্ট পাওয়া যায়।

আক্রমণের সময়কাল (Period of infestation) ঃ শীতকালে ইহাদের প্রকোপ থাকে না কারণ লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ বিট্‌ল সুপ্ত অবস্থায় (Hibernate) জীবন অতিবাহিত করে। মার্চের শুরুতেই ক্ষেতে আক্রমণ করিতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে গুদামজাত বিভিন্ন ডালে তিন সপ্তাহ ধরিয়া এক একটি জন্তু ধ্বংসকার্য চালাইতে থাকে।

গুদামজাত খাদ্যশস্যের ক্ষতিকারক আরও কয়েকটি পোকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
(Other insect pests of stored grains)

6. ফ্লাই উইভিল (Fly weevil) অথবা **অ্যানগাউমইস গ্রেইন**

সাধারণ নাম ঃ

মথ (Angoumois grain moth) বা পুঁতিপোকা

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ Sitotroga cerealella (oliver)

বহিরাকৃতি ঃ হলুদ বাদামী বর্ণের মথগুলির ডানার প্রান্তভাগ সরু হয়

এবং ফ্রিঞ্জ (Fringe) থাকে। পরিণত লার্ভার বর্ণ সাদা হয় এবং 0·5 মি.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি ঃ লার্ভা দশাই ক্ষতিকারক। শস্য-দানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্টার্চ অংশ পুরোপুরি খাইয়া ফেলে। 2-3 সপ্তাহ ধরিয়া এক একটি জন্তু এই ধ্বংসকার্য চালাইতে থাকে। ইহারা প্রধানতঃ গম, ভুট্টাতেই বেশী আক্রমণ করে।

7. (a) **হলুদ মিল কীট** (Yellow meal worm) ; (b) **ভারতীয় মিল মথ** (Indian meal moth)

(a) Tenebroides mauritanicus ; (b) Plodia interpunctella Hubn.

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ চকচকে কালো রঙের পোকা ও লার্ভার বর্ণ সাদা-হলুদাভ হয়।

ক্ষতিকারক দশা ও ক্ষতির প্রকৃতি ঃ উভয় দশাই শস্যকণা ও গমচূর্ণ ভক্ষণ করে। ইহাদের আক্রমণের ফলে আটা-ময়দা দলা পাকাইয়া যায়। লার্ভা দশার স্থায়ীকাল 10-20 মাস পর্যন্ত হয়।

গুদামজাত শস্যের সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ (Analysis of grain storage problems) ঃ

গুদামজাত খাদ্যশস্য প্রধানতঃ ইঁদুর, পতঙ্গ, মাইট এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রোগজীবাণু কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইঁদুর ব্যতীত অন্যান্য পেস্ট ও জীবাণু হইতে গুদামজাত খাদ্যশস্যকে সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যথা—(i) শস্যদানায় জলীয় অংশ নিয়ন্ত্রণ, (ii) গুদামের মধ্যে বাতাস চলাচল এবং (iii) তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ। শস্যে জলের পরিমাণ ও তাপমাত্রা গুদামজাত পোকার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

দেখা যায় যদি শস্যে জলের পরিমাণ শতকরা 8 ভাগের বেশী থাকে তাহা হইলে পেস্টের বৃদ্ধি বাড়ে। সেইকারণে শস্যকে গুদামে আনিবার পূর্বেই শুকাইয়া জলের পরিমাণ শতকরা 8 ভাগে আনা হয়। ইহার ফলে প্রায় সব রকম পেস্টের কবল হইতে শস্যকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। সিটো-ফাইলের বৃদ্ধি শস্যে ন্যূনতম 9·5% জল থাকিলেই বেশী হয়। সেইজন্য শস্যে জলের পরিমাণ এর কম রাখা উচিত। ইহাতে ইহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়।

ইহা ব্যতীত গুদামঘরে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা এবং 120°F তাপমাত্রার উপরে বা 55°F তাপমাত্রার নীচে শস্যকে সংরক্ষিত করিলে বিভিন্ন পেস্টের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

গুদামজাত শস্যের দমনের উপায়
(Control measures for stored grain pests)

A. **প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা** (Preventive measures) :

1. শস্য গুদামে মজুত করিবার পূর্বে ভালভাবে ঝাড়িয়া (Screening) লওয়া প্রয়োজন।

2. শস্য থলির মধ্যে ভরিবার সময় থলিগুলিও ভালভাবে ঝাড়িয়া লওয়া উচিত। খালি থলির মধ্যে লার্ভা বাস করে। সেইজন্য ভালভাবে পরিস্কার করিয়া তবেই ইহার মধ্যে নূতন শস্য ভরা উচিত।

3. শস্যদানাগুলি সরাসরি গুদামে আনা উচিত এবং গুদামজাত করিবার পূর্বে শস্য ভালভাবে শুকাইয়া থলিতে ভরা প্রয়োজন।

4. গুদামে শস্য রাখিবার পূর্বেই পড়িয়া থাকা ধূলা, নোংরা এবং পরিত্যক্ত শস্যকণা প্রভৃতি ভালভাবে ঝাড় দিয়া পরিস্কার করা প্রয়োজন।

5. যতদূর সম্ভব এক ধরণের গুদামজাত শস্যকণার গুলি একই গুদামে রাখা উচিত।

6. গুদামের দেওয়াল, মেঝে বা ছাদে কোন ফাটল থাকিলে সেগুলি সিমেণ্ট দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে অথবা 10% সেভিন ছড়াইয়া দিতে হয়। ফাটলের মধ্যে পেস্টের বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

7. বর্ষাকালে গুদামজাত শস্যদানার উপর যথেষ্ট সতর্ক থাকা দরকার। প্রয়োজনমত গুদামঘর খোলা রাখিয়া জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যায়ক্রমিক পোকার আক্রমণ সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বর্ষাকাল শেষ হইলেই শস্যদানার শুষ্ককরণ এবং পুনরায় গুদামজাত করিবার জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

8. শস্যের সঙ্গে কিছু সংরক্ষণশীল পদার্থ (Preservatives) মিশাইয়া গুদামে রাখিলে পেস্টের আক্রমণ কম হয়। কাঠকয়লার ছাই, জিপসাম, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় পদার্থের গুড়া সংরক্ষণশীল পদার্থ হিসাবে বিশেষ কার্যকরী। ইহা ব্যতীত সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম ফ্লুরো-সিলিকেট বা সোডিয়াম ফ্লুরাইড 60 পাউণ্ড শস্যের সঙ্গে $\frac{1}{2}$ আউন্স অনুপাতে

মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়। ইহাতেও ভাল সুফল লক্ষ্য করা হইয়াছে।

B. রাসায়নিক ব্যবহার করিয়া দমন (Chemical control operations) :

গুদামজাত শস্যের পেস্টের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য উপরিউক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিভিন্ন কীটনাশক **ধূপনদ্রব্য** (Fumigant) ব্যবহার করা হয়। তবে, সঠিক ধূপন দ্রব্য নির্বাচনের দিক যথেষ্ট নজর রাখা উচিত।

ধূপন পদ্ধতি বা **ফিউমিগেশান** (Fumigation) : কীটনাশক পদার্থের গ্যাস ব্যবহার পেস্ট নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ফিউমেগেশান বলা হয়। পূর্বে গন্ধকের ধোওয়া ধূপন পদ্ধতিতে ব্যবহারযোগ্য ছিল। বর্তমানে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ইথিলিন ডাইব্রোমাইড, ইথিলিন ডাই-ক্লোরাইড, মিথাইল ব্রোমাইড প্রভৃতি ধূপন দ্রব্য বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়। ইহাদের মধ্যে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড দ্বারা পেস্ট নিয়ন্ত্রণ কম হইলেও শস্যদানায় ইহার প্রভাব কম থাকে। মিথাইল ব্রোমাইড-এর গ্যাস মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং শস্যদানায় ইহার প্রভাব থাকে বলিয়া ইহার ব্যবহার খুব সতর্কতার সহিত করা হয় হয়। কার্বন-ডাই সালফাইড-এর ব্যবহারও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বহুলভাবে প্রচলিত। গুদামশস্যের উপর এই বর্ণহীন তরল ঢালিয়া দিলে বায়ুর সংস্পর্শে সহজেই গ্যাসে পরিণত হয়। এই গ্যাস বাতাস হইতে ভারী হয় এবং সহজেই শস্যের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং পেস্ট নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা ব্যতীত ফস্‌টক্সিন (Phostoxin) ট্যাবলেটের ব্যবহারও কোথাও কোথাও প্রচলিত। তবে, এই ট্যাবলেট হইতে নির্গত ফসফাইন (Phoshine) গ্যাস যথেষ্টভাবে পরিবেশ দূষিত করে। সেই কারণে ইহার ব্যবহার সব সময় করা হয় না।

ধূপনদ্রব্য ব্যবহারের সতর্কতা (Precautions) : ধূপনদ্রব্যগুলি হইতে বিষাক্ত গ্যাস মানবদেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেইকারণে এই সব রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্ক লওয়া হয়। বাহিরের বাতাসে এই বিষাক্ত গ্যাস যথেষ্টভাবে যাহাতে না মিশিতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ধূপনদ্রব্য প্রয়োগের সময় শস্যকে অবশ্যই বায়ুনিরুদ্ধ গুদামে রাখার প্রয়োজন। কারণ ইহাতে অল্প ধূপনদ্রব্যের ব্যবহার কার্যকরী হয়।

স্তন্যপায়ী ক্ষতিকারক প্রাণী (Mammalian pest)

সূচনা (Introduction) :

স্তন্যপায়ী শ্রেণীর **রোডেনশিয়া** (Rodentia) বর্গের **মুরিডি** (Muridae) গোত্রের অন্তর্গত অনেক প্রজাতির ইঁদুর মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপ্রাণী পেস্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ইহারা ক্ষেতের ফসল, চাষ-জমির বাঁধ, সঞ্চিত খাদ্যের প্রভৃত ক্ষতিসাধন ব্যতীত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানাপ্রকার রোগও সংক্রামিত করে। ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সর্বত্রই কয়েকটি প্রজাতির ইঁদুরের আধিপত্য বেশী দেখা যায়। উন্নত ধরনের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপস্থিতি এবং সম্মুখস্থ তীক্ষ্ণ কৃদন্ত থাকায় ইহাদের **রোডেন্ট** (Rodent) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ভারতবর্ষে 70টি প্রজাতির ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রজাতির ইঁদুর বাড়ী-ঘরের আনাচে-কানাচে দেখা যায়। যেমন—**র‍্যাট্টাস র‍্যাট্টাস** (*Rattus rattus*), **মাস মাসকিউলাস** (*Mus Musculus*), **র‍্যাট্টাস নরভেজিকাস** (*Rattus norvegicus*)। ফসল ও মজুত শস্যের ক্ষতিকারক ইঁদুর হিসাবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রজাতি হইল— **ব্যাণ্ডিকুটা বেঙ্গলেনসিস** (*Bandicoota bengalensis*), **ব্যাণ্ডিকুটা ইণ্ডিকা** (*Bendicota indica*), **মিলারডিয়া মেলটোডা** (*Millardia meltoda*) প্রভৃতি নিয়ে ইহাদের প্রধান কয়েকটি প্রজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও স্বভাব উল্লেখ করা হইল। ইহা ব্যতীত শস্যক্ষেত্রের ও মজুত খাদ্যের বিশেষতঃ ধানের প্রভৃতি ক্ষতিসাধনকারী **ধেঁড়ে ইঁদুর** বা **মেঠো ইঁদুর** (Mole rat)-এর বিবরণও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচিত হইল।

ভারতীয় ধেঁড়ে ইঁদুর (Indian Mole Rat)

বৈজ্ঞানিক নাম : **ব্যাণ্ডিকুটা** (*Bandicoota*) **বেঙ্গলেনসিস** (*bengalensis*)

"মোলর‍্যাট" (Mole Rat) বলিয়া পরিচিত যেহেতু গর্ত খনন স্বভাব এই ধরনের ইঁদুরের। ইহাদের **"ক্ষুদ্রতর"** (Small) অথবা **"লেসার

কয়েকটি প্রজাতির ইঁদুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাহাদের স্বভাব

1. সাধারণ কালো ইঁদুর বৈজ্ঞানিক নাম—*Rattus rattus*	2. ধেঁড়ে ইঁদুর বা মেঠো ইঁদুর বৈজ্ঞানিক নাম—*Bandicoota bengalensis*	3. নেংটি ইঁদুর বৈজ্ঞানিক নাম—*Mus musculus*
বৈশিষ্ট্যবলী ঃ		
1. **ওজন**- 340 গ্রাম।	1. **ওজন**—350 গ্রাম।	1. **ওজন**—23-26 গ্রাম।
2. **দৈর্ঘ্য**—31-43 সেন্টিমিটার। নোক হইতে লেজের শেষ পর্যন্ত।	2. **দৈর্ঘ্য**—31-42 সেন্টিমিটার।	2. **দৈর্ঘ্য**—2·5-3 ইঞ্চি।
3. **লেজ**—মাথা ও শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় বড়, সর্বত্র একই বর্ণের এবং আঁইশ বিদ্যমান।	3. **লেজ**—মাথা ও শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় কখনই বড় হয় না। আঁইশের দ্বারা গঠিত আংটির ন্যায় দৃশ্যমান হয়। সর্বত্র একই বর্ণের।	3. **লেজ**—মাথা ও শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় বড় হয়। সর্বত্র একই বর্ণের হয়।
4. **মস্তক**—ছুঁচালো।	4. **মস্তক**—ভোঁতা ও শুয়োরের ন্যায় দেখায়।	4. **মস্তক**—অল্প ছুঁচালো।

1. সাধারণ কালো ইঁদুর বৈজ্ঞানিক নাম—*Rattus rattus*	2. ধেঁড়ে ইঁদুর বা মেঠো ইঁদুর বৈজ্ঞানিক নাম—*Bandicoota bengalensis*	3. নেংটি ইঁদুর বৈজ্ঞানিক নাম—*Mus musculus*
5. **কান**—বৃহৎ ও লোম থাকে না।	5. **কান**—মোটা ও গোলাকার।	5. **কান**—গোলাকার।
6. **দেহের বর্ণ**—ঘন বাদামী।	6. **দেহের বর্ণ**—ঘন বাদামী অথবা কালো বর্ণের।	6. **দেহের বর্ণ**—ধূসর বর্ণের।
7. **শরীরের লোম**—অসংখ্য ও নরম। লম্বা লম্বা লোমও বর্তমান।	7. **শরীরের লোম**—কর্কশ ও ছোট হয়। লম্বা লোমও বিগুমান।	7. **শরীরের লোম**—পাতলা, নরম ও ঘন।
8. **দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ**—10 গ্রাম।	8. **দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ**—10 গ্রাম।	8. **দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ**—2·5 গ্রাম।
9. **স্বভাব**—গর্তের মধ্যে থাকিতে পছন্দ করে না। মাটির উপরেই বেশী থাকে এবং উঁচুতে উঠিতে পারে। ইহারা সাঁতার কাটিতেও পারে।	9. **স্বভাব**—গর্তের মধ্যেই থাকে। উঁচুতে উঠিতে পারে ও সাঁতারও ভাল কাটিতে পারে।	9. **স্বভাব**—মাঝে মাঝে গর্তে থাকে।

1. সাধারণ কালো ইঁদুর বৈজ্ঞানিক নাম—*Rattus rattus*	2. ধেঁড়ে ইঁদুর বা মেঠো ইঁদুর বৈজ্ঞানিক নাম—*Bandicoota bengalensis*	3. নেংটি ইঁদুর বৈজ্ঞানিক নাম—*Mus musculus*
10. **বাসস্থান**—শহরে ও গ্রামে দেখা যায়। বাড়ীর ভিতরে ও গুদামজাত শস্যভাণ্ডারেই বেশী দেখা যায়।	10. **বাসস্থান**—শহরে ও গ্রামে দেখা যায়। শস্যক্ষেত্রে ও গুদামে দেখা যায়।	10. **বাসস্থান**—গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের মধ্যে কিংবা ফাটলের মধ্যেই থাকে।
11. **আয়ুষ্কাল, প্রজনন ও সন্তান সংখ্যা**—প্রায় এক বৎসর। সারা বৎসরই প্রজনন হয়। তবে বসন্ত ও শরৎকালেই প্রজনন বেশী হয়। 4-6 বার গর্ভবতী হয়। এবং যুগপৎ 6-8টি সন্তান প্রসব করিয়া থাকে।	11. **আয়ুষ্কাল, প্রজনন ও সন্তান সংখ্যা**—গড় আয়ুষ্কাল 7 মাসের মত। সারা বৎসরে 10-12 বার গর্ভবতী হয় এবং যুগপৎ 6-15টি সন্তান প্রসব করিয়া থাকে।	11. **আয়ুষ্কাল, প্রজনন ও সন্তান সংখ্যা**—প্রায় এক বৎসর হইতে সামান্য বেশী হয়। সারা বৎসরে 8-12 বার গর্ভবতী হয় এবং 6-10টি সন্তান প্রসব করিয়া থাকে।

ব্যাণ্ডিকুট" (Lesser bandicoot)ও বলা হয়। এই প্রজাতির ইঁদুর মালয় উপদ্বীপ, বর্মা, থাইল্যাণ্ড এবং ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তৃত। ইহারা মানুষের খাদ্য ও সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন রোগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হিসাবে গণ্য।

স্বভাব ও বাসস্থান (Habit and Habitat) : ধেঁড়ে ইঁদুর ধান-ক্ষেতে, বাড়ীঘরের আনাচে-কানাচে এবং গুদামঘরে বসবাস করে। যেহেতু গ্রামের ধান ও তৃণভূমিতে গর্ত খুঁড়িয়া বাসস্থান তৈয়ারি করে সেই অর্থে মেঠো ইঁদুরও বলা হয়। ইহাদের বিস্তারণ শহরের দিকে যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে (চিত্র 33) এবং পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইহাদের বিস্তারের ঘনত্ব বর্তমানে 98%। পরিবেশের সহিত অভিযোজন, গর্ত খনন স্বভাব, উচ্চ প্রজনন হার, সঞ্চিত খাদ্যের ভাণ্ডার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রভৃতিই ইহাদের সংখ্যাধিক্যের কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

ধেঁড়ে ইঁদুর স্বভাবে নিশাচর। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পরই ইহাদের তৎপরতা বাড়িয়া যায়। ইহারা দ্রুত দৌড়াইতে পারে এবং সাঁতার কাটিতেও সক্ষম।

ইহারা ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য মজুত করিয়া রাখে এবং শিশুরা এই মজুত খাদ্যের উপর নির্ভর করে।

ক্ষতির প্রকৃতি (Nature of damage) : ক্ষেতের ধানগাছ ও ধান-শস্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। গুদামঘরে থাকাকালীন মজুত শস্যেরও ভীষণ ক্ষতি করে। ধানের চারাগাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া নষ্ট করে। ধানের কচি শীষ ও পাকা ধানের শীর্ষ সম্মুখস্থ তীক্ষ্ণ কৃন্তক দন্ত দ্বারা কাটিয়া ভক্ষণ করে ও বেশীই অপচয় করে। বাদামের চারাগাছও ইহাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কার্যতৎপরতা ও সময়কাল এবং পরিযান (Activity, periods and migraition) :

শীতকালে ইহারা মাঠে থাকে এবং প্রচুর সংখ্যায় বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বর্ষাকালের প্রারম্ভেই মাঠ হইতে সন্নিকটবর্তী গ্রামের কুঁড়েঘর বা গুদামঘরে চলিয়া আসে। নতুন বোনা ফসলের মাঠে ইহারা এককভাবেও পরিযান করে।

বহিরাকৃতি (External features) :

1. সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য—31-42 সেন্টিমিটার।

2. ওজন—350 গ্রাম পর্যন্ত।

3. দেহের বর্ণ—পৃষ্ঠদেশের বর্ণ ঘন বাদামী এবং অঙ্কীয় দেশ সাদা হয়।

4. দেহ—স্থূলকায়। লেজ ব্যতীত সমগ্র দেহে স্থূল এবং কর্কশ লোম বিদ্যমান।

5. মস্তক—গোলাকার এবং মুখমণ্ডল শুকরের ন্যায়।

6. কান—গোলাকার ও পুরু।

7. চোখ—গোলাকার ও উজ্জ্বল।

8. অগ্র ও পশ্চাদপদ—সুগঠিত ও নখরযুক্ত।

9. লেজ—দৈর্ঘ্য 15 হইতে 18 সেন্টিমিটার, আঁশযুক্ত এবং অঙ্গুরী বর্তমান।

10. স্তনগ্রন্থী—12 হইতে 18টি, দুইটি সারিতে সজ্জিত।

লেসার ব্যাণ্ডিকুটার খাদ্য (Food)ঃ ইহারা সর্বভুক। শস্যদানা, শাক্-সব্জী, ফল, বীজ এবং মৃত প্রাণীর মাংস ইহাদের খাদ্যতালিকাভুক্ত। গুদামঘরে সঞ্চিত খাদ্যশস্যের মধ্যে গম ও ধান ইহাদের বেশী পছন্দ। প্রতি ইঁদুর 11·5 গ্রাম শস্যকণা প্রতিদিনে ভক্ষণ করে এবং এই পরিমাণের দ্বিগুণ ক্ষতি করিয়া থাকে।

ব্যারো সিস্টেম (Burrow system)ঃ পূর্বেই উল্লিখিত ইহারা মাটির নীচে গর্ত করিয়া বসবাস করে। এই গর্তখনন স্বভাবের (Burrowing habit) জন্য ইহাদের নিরাপত্তা ও খাদ্যসঞ্চয় সম্ভব হয়।

এই প্রজাতির দ্বারা গর্তখনন প্রকৃতি (Burrow system) চিত্রের



চিত্র 32 : ইঁদুরের গর্তখননের প্রকৃতি

মাধ্যমে (চিত্র 32) দেখান হইল। ইহাদের দ্বারা খনিত গর্ত প্রায় 45 মিটার দৈর্ঘ্যের হইতে পারে। একটি সম্পূর্ণ "ব্যারোসিস্টেমে" প্রবেশ ও

নির্গমন দ্বার অনেকগুলি থাকে এবং প্রতি প্রধান কক্ষ অনেকগুলি সুড়ঙ্গ-পথ দ্বারা যুক্ত। সুড়ঙ্গ-পথগুলি প্রতিটি শাখায় সুড়ঙ্গের সহিত সংযোগ রক্ষা করে। সুড়ঙ্গগুলিতে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। ইহারা শস্যক্ষেত্রের আলের নরম মাটিতে ব্যারো করিয়া বসবাস করে।

প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি : সারাবৎসর ধরিয়াই প্রজনন হয়। প্রজননক্ষম স্ত্রী ইঁদুরের দৈর্ঘ্য প্রায় 160 মি.মি. পর্যন্ত হয়। মেঠো ইঁদুরের প্রজনন হার বেশী দেখা যায় এবং মৃত্যুহারও অধিক হয়। ইহাদের গড় আয়ুষ্কাল প্রায় 7 মাস। শহরাঞ্চলের ইঁদুরদের মধ্যে প্রায় 97% মৃত্যুহার এই সময়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বৎসরে একটি ধেঁড়ে ইঁদুর 10-12 বার গর্ভবতী হইতে পারে এবং যুগপৎ 6-15 বাচ্চা প্রসব করিতে পারে। ইহার ফলে বৎসরে প্রায় 70টি সন্তান একটি স্ত্রী ইঁদুর কর্তৃক সৃষ্টি হয়। নিরাপত্তা, খাদ্য-সরবরাহ ইত্যাদিই ইহাদের বংশহার বৃদ্ধির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয়।

জন্মের প্রায় 3 হইতে 5 মাসের মধ্যেই ইহারা প্রজননক্ষম হয়। স্ত্রী ইঁদুরের তুলনায় পুরুষ ইঁদুর অনেক আগেই প্রজনন উপযোগী হয়। একটি স্ত্রী ইঁদুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

লেসার ব্যাণ্ডিকুট ইঁদুরের গর্ভধারণকাল 23 দিন। বয়স্ক স্ত্রী ইঁদুর বেশী সংখ্যায় শাবক প্রসব করে।

সামাজিক কারণ (Social behaviour) **:**

এই প্রজাতির ইঁদুর নিঃসঙ্গভাবে (**Solitary**) বাস করে, তবে স্ত্রী ও পুরুষ একসাথেও কখনও দেখা যায়। যৌন মিলনে সংকেত (**Signals**) ব্যবহার করিতে দেখা যায়। সঙ্গমের পূর্বে উভয়ই ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া যৌন জনন সম্পন্ন করে।

মাতা কর্তৃক সন্তান পালনের জন্যও সংকেতের বিশেষ প্রয়োজন হয়। শব্দসংকেত দ্বারা ইহারা নিজের অঞ্চল অন্যান্যদের হাত হইতে রক্ষা করে। অন্য ইঁদুরের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইলে তীব্র আর্তনাদও করে।

সংক্রমণ ও রোগবাহক : ইঁদুর খাদ্য খাইয়া যত না বেশী ক্ষতি করে, অপচয়ই বেশী করে। ইহা ব্যতীত খাদ্যবস্তুর উৎসটিকে মলমূত্র ত্যাগ এবং আরও বিভিন্ন ভাবে সংক্রামিত করে। মানুষের রোগ সৃষ্টিকারী অনেক জীবাণু ইঁদুর কর্তৃক বাহিত হয়। কয়েকটি রোগের মধ্যে (i)

লেপ্টোস্পাইরোসিস (Leptospirosis), (ii) **স্যালমোনেলোসিস** (Salmonelosis) এবং (iii) **প্লেগ** (Plague), মানুষের প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। —ফ্লী (Flea) দ্বারা **প্লেগ ব্যাসিলাস** (Plague bacillus) এক ইঁদুর হইতে অপর ইঁদুরে সংক্রামিত হয়।

প্রাকৃতিক শত্রু (Natural enemies) ঃ কয়েক রকম প্রাণী ইঁদুরকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। কুকুর, বিড়াল, পেঁচা, কাক ও সাপ ইহাদের ভক্ষণ করিয়া সংখ্যা সীমিত রাখতে সাহায্য করে।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Methods of control) ঃ

ধেঁরে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়—

1. **শিকার** (Hunting) ঃ এই পদ্ধতিতে ইহাদের আবাসস্থলের গর্তগুলি খনন করিতে হয় এবং শিকারী কুকুর, বিড়াল দ্বারা অথবা প্রত্যক্ষ-ভাবে সংহার করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। কোন কোন সময়ে ব্যারোসিস্টেমে জলপূর্ণ করিয়া ইহাদের গর্তের বাহিরে আসিতে বাধ্য করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়।

2. **ফাঁদ ব্যবহার** (Use of trap) ঃ ইঁদুরের গর্তের নিকট লোভনীয় খাদ্যবস্তু রাখিয়া কৃত্রিম ফাঁদ তৈয়ারি করিয়া ইহাদের ধরা যায়। বাড়ীঘরে ইহাদের উৎপাত বন্ধ রাখিতে নানারকম ইঁদুর কল বা ফাঁদ (Trap) ব্যবহার করা হয়।

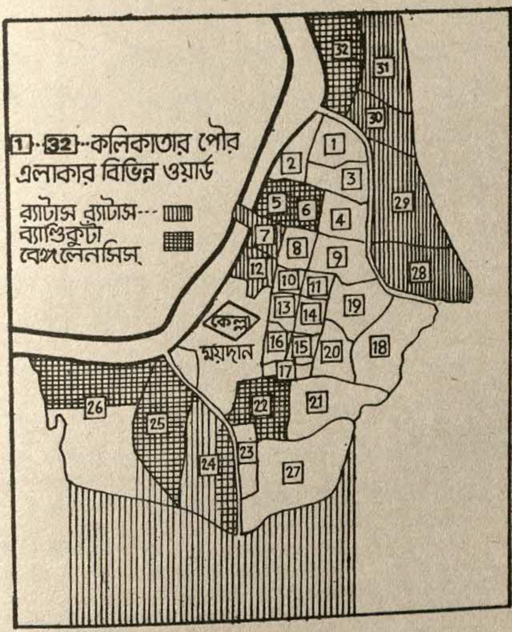
3. **রোডেন্টিসাইডের ব্যবহার** (Use of rodenticides) ঃ নানাপ্রকার রাসায়নিক ইহাদের দমনে ব্যবহার করা হয়। **বিষাক্ত টোপ** (Poison bait) ইঁদুর দমনের প্রচলিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। টোপে নিম্নলিখিত বিষগুলি ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

(i) **এক মাত্রার ইঁদুর মারা বিষ** (Single dose rodenticides) ঃ স্ট্রিকনিন (Strychnine), জিঙ্ক ফসফাইড (Zinc phosphide), কম্পাউণ্ড (Compound) 1080, থেলিয়াম সালফেট (Thalium Sulphate) এবং এ এন টি ইউ (ANTU) অর্থাৎ আলফা-নেফথল থাইও-উরিয়া। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ইঁদুর দমন করা হয়। এই সকল রোডেন্টিসাইডের মধ্যে জিঙ্ক ফসফাইডের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। এই বিষের বড়ি তৈয়ারি (সাধারণভাবে 1 ভাগ বিষ, 40 ভাগ আটা অথবা ময়দা, 3 ভাগ গুড় এবং যথেষ্ট পরিমাণ জল) করিয়া গর্তের বাহিরে এবং

ইহাদের যাতায়াতে পথে রাখিয়া দিলে কার্যকরী হয়।

(ii) **দীর্ঘকালীন প্রয়োগবিষ** (Chronic poison) : পাইভ্যাল (Pival), র‍্যাজল (Razol), প্রভৃতি রাসায়নিক কয়েকদিন ধরিয়া বার বার ব্যবহার করিতে হয়। ব্যবহৃত বিষগুলি রক্তক্ষনে বাধা সৃষ্টি করে। এই বিষগুলি খাবারের সহিত ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করে। এইবার ইঁদুরের দেহে ক্ষত সৃষ্টি হইলে এই বিষ তঞ্চন প্রতিরোধক (anticoagulant) হইয়া দাঁড়ায় ফলে ইঁদুর বাঁচিতে পারে না।

4. **ফিউমিগেশান** বা **ধূপন পদ্ধতি** (Fumigation) : চাষের জমিতে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে ফলপ্রদ। **সেলফস্ ট্যাবলেট** (Celphos tablet) নামক ফিউমিগ্যান্ট (Fumigant) ইহাদের গর্তের সুড়ঙ্গে ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। প্রতিটি ট্যাবলেটে তিন গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম



চিত্র 33 : কলিকাতার পৌর এলাকায় ইঁদুরের বিস্তার

ফসফাইড (Aluminium phosphide) থাকে। সেইজন্য প্রতি গর্তে ১/৪ ট্যাবলেটের ব্যবহার যথেষ্টভাবে কার্যকরী।

দূষণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বর্তমানে **"সায়ানো গ্যাস**

এ ডাস্ট" (Cyano gas "A" dust)-এর ব্যবহার প্রায়শঃ কমিয়া গিয়াছে। এই পাউডার বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস নির্গত করে। এই গ্যাস খুবই বিষাক্ত, ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ফিউমিগেশান বা ধূপনে (Fumigation) ব্যবহারের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ করা হয়।

বন্যপ্রাণী ও সংরক্ষণ

সূচনা (Introduction) ঃ

বনে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল চমৎকার প্রাণীগুলিকে এবং সুন্দর সুন্দর বিচিত্র বর্ণের পাখিদের একত্রে **"বন্যপ্রাণী"** (Wild life) আখ্যা দেওয়া হয়। এমনকি পাহাড়, নদ-নদী, সমুদ্র বা সমতলভূমিতে বসবাসকারী গৃহপালিত নয় এমন সকল প্রাণীরাও ব্যাপক অর্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃতির নৈসর্গিক পরিবেশের এই সকল বন্যপ্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের খাদ্য, বস্ত্রের প্রয়োজন মেটানো ব্যতীত শোভাবর্ধক রূপে মানুষের মনোরঞ্জন করে এবং কৌতূহল মিটাইয়া থাকে।

প্রত্যেক দেশের বন্যপ্রাণী, সেই দেশের জাতীয় সম্পদ এবং সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বন্য-প্রাণীজ সামগ্রী ও বন্যপ্রাণী বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করা সম্ভব। অবশ্যই সুপরিকল্পিতভাবে ও প্রয়োজনমত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

বন্যপ্রাণীর যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার, হত্যা এবং অরণ্যের ধ্বংসসাধন বন্যপ্রাণী অবলুপ্তির প্রধান কারণ। ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক ও সৌন্দর্যের ক্ষতি ব্যতীত প্রকৃতির ভারসাম্যও বিঘ্নিত হয় এবং জীবের অস্তিত্ব বজায় রাখাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব, বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা (আবাসস্থল, আচরণবিধি এবং বন্যপ্রাণী সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি) প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এবং সুষ্ঠুভাবে ইহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লওয়া প্রয়োজন।

বন্যপ্রাণী—অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ

প্রত্যেক দেশের বন্যপ্রাণী বনভূমির শোভাবর্ধন ব্যতীত সেই দেশের অর্থনীতিকে নানারূপে প্রভাবিত করে—যেমন, (1) বন্যপ্রাণীজ সামগ্রী—চামড়া, লোম, মাংস, কবিরাজী ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়। (2) বৈচিত্র্যময় প্রাণী সম্ভার পর্যটন ব্যবসায়

অর্থোপার্জনে সাহায্য করে। যেমন, আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাণী—রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সাদা বাঘ, ময়ূর, হাতি, গণ্ডার, কুমীর প্রভৃতি প্রকৃতিপ্রেমী ও পর্যটকদের অনাবিল আনন্দ দান করে। (3) বন্যপ্রাণীর বিক্রয় ও বিনিময় দ্বারাও প্রভূত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। ভারতীয় বন্যপ্রাণীদের মধ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, কুমীর, নানা জাতের বানর, পাখী ও সাপ বিশ্বের অন্যান্য দেশে যথেষ্ট মূল্যবান হয়। দুষ্প্রাপ্য প্রাণী সকলের বৈজ্ঞানিক প্রথায় বংশবৃদ্ধি ঘটাইয়া বিনিময় মাধ্যমে অন্যদেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করা যায়। ইহাতে বন্যপ্রাণীর সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব। মৃত দুষ্প্রাপ্য বন্যপ্রাণীও যাদুঘরের জন্য সংগ্রহ করা হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বন্যপ্রাণী সম্ভার সেই দেশের অতুলনীয় সম্পদ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বন্যপ্রাণীর অবদান নেহাৎ কম নয়।

বন্যপ্রাণী ও বাস্তুতন্ত্র (Wild life and eco-system) :

প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখিতে বন ও বন্যপ্রাণী অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন প্রকার কার্য সম্পাদন করে ও কারণ ঘটায়। প্রকৃতির ভারসাম্য কোন কারণে বিঘ্নিত হইলেই মানব সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাস্তুতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা হয় এবং বাস্তুতন্ত্রের জৈবিক শর্তগুলি (Biotic factors) নির্দিষ্ট খাদ্যশৃঙ্খল সম্পর্কিত। যেমন মাংসাশী প্রাণী শাকাশী প্রাণীদের শিকার করিয়া খায় এবং খাদ্য শৃঙ্খলে দ্বিতীয় সারিতে অবস্থান করে। এইবার প্রথম সারির প্রাণীদের অথবা দ্বিতীয় সারির প্রাণীদের (যে কোন সারির) সংখ্যা বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হইলে ভারসাম্য নষ্ট হইবে। মানুষের জীবন বিভিন্নভাবে বিপন্ন হইবে।

বন্যপ্রাণী—কৃষ্টি ও সৌন্দর্যের প্রতীক : বন্যপ্রাণীর সৌন্দর্য অনেক সাহিত্যেই স্থান পাইয়াছে এবং সাংস্কৃতিক উপযোগিতাও দেখা যায়। বন্যপ্রাণীর আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কৌতূহল প্রত্যেক দেশের বর্তমান ছেলে-মেয়েদের বৈজ্ঞানিক পাঠ্যবিষয়ই মেটায়। প্রাণিবিদ্যার গবেষণায়ও বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব অপরিসীম।

বন্যপ্রাণীর ক্রমিক অবলুপ্তি ও কারণ :

ভারতবর্ষের বনাঞ্চল একদা বন্যপ্রাণীতে সমৃদ্ধ বলিয়া পৃথিবী প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে মানুষ বনভূমিকে যথেচ্ছভাবে কাটিয়া

বসতি স্থাপনের নিমিত্ত বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল নষ্ট করিয়া দিতেছে। ফলে বন্যপ্রাণীর বাসভূমির উপযুক্ত পরিবেশ থাকছে না এবং ক্রমে অবলুপ্তির সম্মুখীন হইয়াছে। বন্যপ্রাণীদের ক্রমিক অবলুপ্তি পৃথিবীর সকল দেশেই বর্তমানে মারাত্মক রূপ লইয়াছে।

শিকারের জন্য এবং অর্থলোভেও মানুষ নির্বিচারে বন্যপ্রাণী হত্যা করিয়া চলিতেছে। কয়েকটি বন্যপ্রাণীর চামড়া, পালক, শিঙ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে অধিক মূল্যবান হেতু এই প্রাণীদের নিধন করা হইতেছে। এই সকল কারণে প্রায় সহস্রাধিক প্রজাতি ও উপপ্রজাতির বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হইয়াছে। এইভাবে চলিতে থাকিলে দেশের এই অতুলনীয় সম্পদের অস্তিত্ব শীঘ্রই বিলীন হইবে। সুস্বাদু হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় শামুকখোল, জলপিপি প্রভৃতি পাখী এবং নানা জাতের হরিণ প্রভৃতি অবলুপ্তির মুখোমুখি সীমায় দাঁড়িয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীতে নিশ্চিহ্ন প্রাণীদের হিসাব 1600 খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বিগত 2000 বৎসরে প্রায় 100 প্রজাতির স্তন্যপায়ী লুপ্ত হইয়াছে। আমাদের দেশের চিতাবাঘ 1953 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ইহা ব্যতীত একশৃঙ্গ গণ্ডার, বুনো মহিষ, বন্যবরাহ, হরিণ এবং পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার বিভিন্ন কারণেই সীমিত সংখ্যায় পৌঁছাইয়াছে। তাই বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহাদের সংরক্ষণের বন্দোবস্ত না করিলে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহাদের অধিকাংশেরই অবলুপ্তি ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে।

বিরল ভারতীয় বন্যপ্রাণী (Rare Indian wild animals)

(A) স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণী ঃ	বৈজ্ঞানিক নাম
1. ভারতীয় সিংহ (Indian lion)	*Panthera leo persica*
2. ব্যাঘ্র (Tiger)	*panthera tigris*
3. চিতাবাঘ (Common leopard)	*Panthera pardus*
4. তুষার চিতাবাঘ (Snow leopard)	*Panthera uncia*
5. মেঘচিতা (Clouded leopard)	*Neofelis nebulosa*

6.	ভারতীয় নেকড়ে (Indian wolf)	*Canis lupes*
7.	হিমালয়ের ধূসর ভাল্লুক (Himalayan brown bear)	*Ursus arctos*
8.	শ্লথ ভালুক (Sloth bear)	*Melursus urcinus*
9.	সোনালী বিড়াল (Golden cat)	*Felis temmineki*
10.	মর্মর বিড়াল (Marble cat)	*Felis marmorata*
11.	চিতা বিড়াল (Leopard cat)	*Felis bengalensis*
12.	মরিচা রঙা ছোপওয়ালা বিড়াল (Rusty spotted cat)	*Felis rubiginosa*
13.	লিন্‌ক্স (Lynx)	*Felix caracal*
14.	বন্য কুকুর (Wild dog)	*Quon alpinus*
15.	পাণ্ডা (Red panda)	*Ciiursus fulgens*
16.	বুনো গাধা (Wild ass)	*Equus hemionus khur*
17.	ভারতীয় একশৃঙ্গী গণ্ডার (Indian one horned rhinoceros)	*Rhinoceros unicornis*
18.	ভারতীয় হাতী (Indian elephant)	*Elephas maximus*
19.	বন্য মহিষ (Wild buffalo)	*Bubalus bubalis*
20.	গাউর (Gaur)	*Bos gaurus*
21.	আইবেক্স (Ibex)	*Capra ibex*
22.	ভারাল (Bharal)	*Pseudois nayaur*
23.	চিন্‌কারা (Gazelle)	*Gazella gazella*
24.	কৃষ্ণসার (Black buck)	*Antelope cervicapra*
25.	কাশ্মিরী হরিণ (Hangul)	*Cervus elephus hanglu*
26.	থামিন হরিণ (Thamin deer)	*Cervus eldi eldi*
27.	কস্তুরী হরিণ (Musk deer)	*Mosehus moschiferous*
28.	জলার হরিণ (Swamp deer)	*Cervus duvancelli*

29.	বামন বরাহ (Pigmy hog)	*Sus salvanius*
30.	বন্য চমরী গাই (Wild yak)	*Bos mutus*
31.	প্যাঙ্গোলীন (Pangolin)	*Manis crarsicaudata*
32.	উল্লুক (Hoolock)	*Hylobates hoolock*
33.	নীলগিরি হনুমান (Nilgiri langur)	*Presbytis johnii*
34.	লোরিস (Loris)	*Nycticebus coucang*
35.	সোনালী হনুমান (Grolden langur)	*Presbytis geei*

(B) উল্লেখযোগ্য অবলুপ্তপ্রায় পাখী :

1.	ভারতীয় বাস্টার্ড (Indian Great Bustard)	*Chorotis nigriceps*
2.	ফ্লোরিকান (Florican)	*Eupodotis bengalensis*
3.	ঈগল (Eagles)	*Accipeter gentiles*
4.	ট্রাগোপান (Tragopan)	*Tragropan melanocephulus*
5.	অসপ্রে (Osprey)	*Pandion haliactus*
6.	সাদা ডানাওয়ালা হাঁস (White winged wild duck)	*Cairina scutulata*
7.	সারস (Hooded crane)	*Grus monacha*
8.	বৃহৎ টিল (Large whistling teal)	*Dendrocygna bicolon*

(C) সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত প্রাণী :

1.	কুমীর (Crocodile)	*Crocodilus porosus*
2.	গোসাপ (Monitor lizard)	*Varanus griseus*
3.	ঘড়িয়াল (Garial)	*Gavialis gangeticus*
4.	সমুদ্রের কচ্ছপ (Green sea-turtle)	*Chelonia mydas*

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রচেষ্টা :

সারা বিশ্বব্যাপী বন্যপ্রাণীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ইহাদের সংরক্ষণের বাস্তব প্রচেষ্টা চলিতেছে। 1900 খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সাতটি ইউরোপীয় দেশের প্রতিনিধিরা আফ্রিকার পশুপক্ষী ও মৎস্য সংরক্ষণের জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। পরবর্তীকালে 1913 খ্রীষ্টাব্দে বার্ণার শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমগ্র পৃথিবীর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত করার প্রস্তাব রাখা হয় কিন্তু কার্যকরী করা সম্ভব হইয়াছিল না। যাহা হউক, 1931 সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত পুনরায় আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রস্তাব 1933 খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে এক চুক্তিপত্রে গৃহীত হয় এবং আফ্রিকার সকল প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের প্রকল্প গ্রহণ হয়।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 1935 সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে পক্ষী সংরক্ষণ সমিতি এবং বন্যপ্রাণী পর্ষদ গড়িয়া উঠে। 1955 সালে পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ বন্যপ্রাণী পর্ষদ গঠিত হয়।

বিশ্বের সর্বত্র বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় 1961 খ্রীষ্টাব্দে **ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড** (WORLD WILD LIFE FUND) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অবলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের সংরক্ষণ। এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করিয়া বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাহায্য ও পরামর্শ দান করা হইয়া থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর 77টি দেশে 840টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রকল্প এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে চলিতেছে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপায় ঃ

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সকল দেশেই উদ্যোগী সংস্থার সহায়তায় নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে।

1. **জাতীয় উদ্যান, সংরক্ষিত বন ও অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা ঃ** অবলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণী এবং অন্য প্রাণীর উদ্দেশ্যে কিছু বন্যপ্রাণীর সংখ্যাধিক্যের জন্য জাতীয় উদ্যান (National park), সংরক্ষিত বন (Reserve forest) এবং অভয়ারণ্য (Sanctuary) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠাকল্পে আমেরিকার অগ্রণী ভূমিকা পৃথিবীর সকল দেশকেই অনুপ্রাণিত করে।

ভারতবর্ষে বর্তমানে 48টি জাতীয় উদ্যান বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। জাতীয় উদ্যানের প্রাকৃতিক পরিবেশ, বন্যপ্রাণী ও ঐতিহাসিক



চিত্র 34 :

গুরুত্বপূর্ণ বস্তুসকল চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত করা হয়।

সংরক্ষিত বন হিসাবে সেই অঞ্চলগুলির বন আইন প্রয়োগ করিয়া প্রাণীশিকার বা গাছকাটা নিষিদ্ধ করা হয়। ভারতবর্ষে 1972 সালে ভারতীয় বন আইন (Indan Forest Act) চালু করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও গোরুমারা, আসামের মানস, উত্তরপ্রদেশের চন্দ্রপ্রভা, তামিলনাড়ুর মধুমালাই, কেরালার পেরিয়ার এইরকম কয়েকটি সংরক্ষিত বন।

অভয়ারণ্যে বিলুপ্তপ্রায় বিরল প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য বনদপ্তর আইনের মাধ্যমে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। বন্যপ্রাণী হত্যা, শিকার বা উহাদের প্রতি কোন রকম অত্যাচার এইসব স্থানে আইনত দণ্ডনীয়।

2. **সংরক্ষণের আইন প্রতিষ্ঠা** : পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আইন প্রতিষ্ঠা করিয়া কিছু প্রাণীকে সংরক্ষিত ঘোষণা করিয়াছে (ভারত সরকার কর্তৃক গণ্ডার সংরক্ষণ আইন, হাতী সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি)। ভারতবর্ষে বন দপ্তর কর্তৃক অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানে অনুপ্রবেশ ও বনের বিভিন্ন প্রাণীর চোরাশিকার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

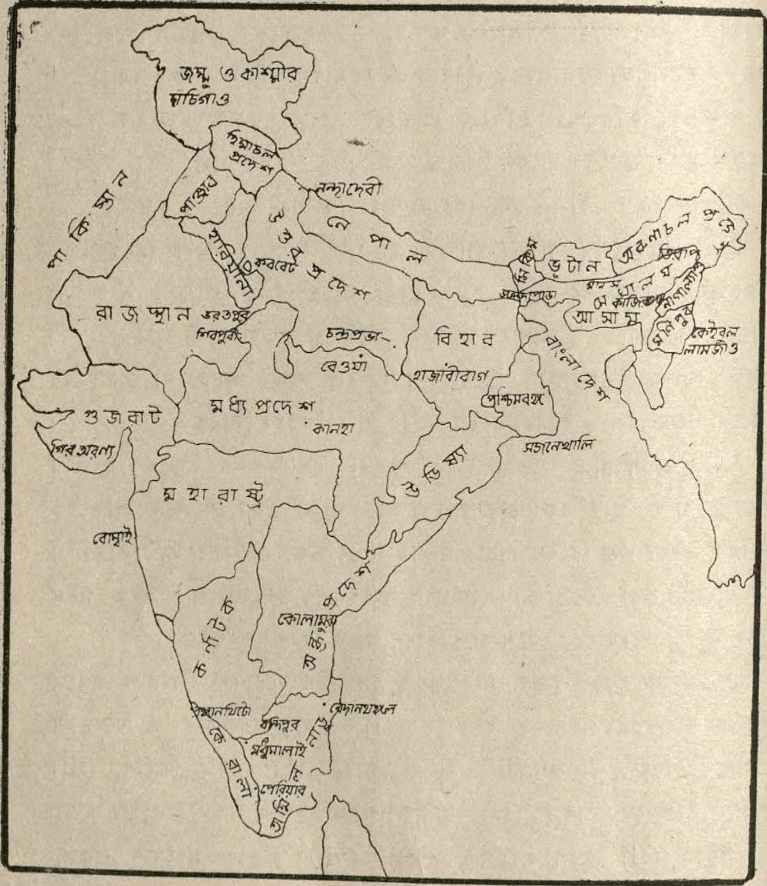
3. **জনশিক্ষা** : বন্যপ্রাণীদের গুরুত্ব, ইহাদের সংরক্ষণে জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকা ইত্যাদি জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম (রেডিও, টেলিভিসন, সিনেমা) দ্বারা প্রচেষ্টা করা হইতেছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উন্নতিকল্পে জনমত গঠন করার কাজও আমাদের দেশে যথেষ্টভাবে গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে।

ভারতবর্ষে বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য উপোরোক্ত উপায় অবলম্বনে কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে—(i) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা, (ii) উঁচু জায়গায় পাখীর বাস নির্মাণ, (iii) বন্যপ্রাণী বিহারের ব্যবস্থা, (iv) রাষ্ট্রীয় পার্কের বিকাশ, (v) রাষ্ট্রীয় চম্বল পথ বিকাশ, (vi) ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প, (vii) গণ্ডার সংরক্ষণ প্রকল্প, (viii) কুমীর ও জলহস্তী সংরক্ষণ ও প্রজনন। আলোচ্য অধ্যায়ে বাঘ ও গণ্ডার সংরক্ষণ প্রকল্প উল্লেখ করা হইল।

ভারতের উল্লেখযোগ্য জাতীয় উদ্যান, সংরক্ষিত বন ও স্যাংচুয়ারী

পূর্বে উল্লিখিত বন্যপ্রাণীদের (স্তন্যপায়ী, পক্ষী ও সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রজাতিগুলি) এবং অন্যান্য যে সকল বন্যপ্রাণী প্রায় অবলুপ্তি সীমায়

পৌঁছাইয়াছে তাহাদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 5টি জাতীয় উদ্যান এবং 126টি সংরক্ষিত অঞ্চল (সংরক্ষিত বন ও স্যাংচুয়ারী) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই সকল বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ এলাকা ভারতবর্ষের



চিত্র 35 : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উল্লেখযোগ্য জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত অঞ্চল

সমগ্র অরণ্যের প্রায় 2-3 শতাংশ। মানচিত্রে (চিত্র 35) উল্লেখযোগ্য কয়েকটির অবস্থান দেখান হইয়াছে এবং নিম্নে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখা হইল।

A. **জাতীয় উদ্যান** (National Park) :

1. **করবেট জাতীয় উদ্যান :** ভারতবর্ষে প্রথম প্রতিষ্ঠিত উত্তর-প্রদেশের **জিম করবেট জাতীয় উদ্যান**। 1935 সালে ঐ উদ্যান **হাইলে জাতীয় পার্ক** (Hailey National Park) নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী-কালে 1957 সালে বিখ্যাত ব্যাঘ্র শিকারী জিম করবেটের নামানুসারে এই উদ্যানের নাম করবেট জাতীয় পার্ক রাখা হয়। উত্তরপ্রদেশের উত্তর দিকে রামগঙ্গা নদীর তীরে প্রায় 125 বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া এই পার্ক তৈয়ারী করা হইয়াছে। শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন জলবায়ুতে শাল, শিমূল বৃক্ষের উপস্থিতি এবং জঙ্গলের অভ্যন্তরে জলাভূমি থাকায় বন্যপ্রাণীদের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মূলতঃ ব্যাঘ্র সংরক্ষিত বনাঞ্চল হইলেও হাতি, চিতা, হায়না, কালো ভাল্লুক, সম্বর, হরিণ, চিতল, বার্কিং ডিয়ার, বন্য কুকুর, সজারু প্রভৃতি বন্য-প্রাণীও বাস করে। ময়ূর ও বিভিন্ন প্রকার পাখী এবং নদীতে ঘড়িয়াল ও কুমীর বাস করে।

পর্যটকদের থাকার ও পরিদর্শনের সুব্যবস্থা থাকায় এই পার্কে নভেম্বর মাস হইতে মে মাস পর্যন্ত পর্যটনের উপযুক্ত সময়। নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন রামনগর ও হল্‌দোয়ানী হইতে এই পার্কে পৌঁছাইতে হয়।

2. **কানহা জাতীয় উদ্যান :** ভারতীয় সংরক্ষিত জাতীয় উদ্যানগুলির মধ্যে মধ্যপ্রদেশের **কানহা জাতীয় উদ্যানও** অন্যতম। 1955 সালে প্রায় 1,500 ফুট উঁচুতে 250 বর্গ কি.মি. এলাকা লইয়া এই জাতীয় উদ্যান পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়।

বাইসন, বাঘ, চিতল ছাড়া চিতাবাঘ, হায়না, গৌর, কালো হরিণ ও নানারকম পাখির সঙ্গে সারস, শকুনি, ঈগল প্রভৃতি উদ্যানের পরিবেশকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের নৈনপুর জংশন থেকে Narrow ট্রেন লাইন পৌছাইয়াছে মাণ্ডুলা দুর্গে। এই স্থান হইতে পার্কে পৌছানোর থেকে জব্বলপুর হইতে বাসে চড়িয়া আসাই সুবিধাজনক। ভ্রমণের উপযুক্ত সময় এপ্রিল মাস হইতে জুন মাস এবং অক্টোবর মাস হইতে জানুয়ারী মাস।

3. **হাজারীবাগ জাতীয় উদ্যান :** 1954 সালে বিহার রাজ্যে এই জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়। শাল ও অন্যান্য বনজ বৃক্ষের উপস্থিতিতে

এই উদ্যানের পরিবেশ নয়নাভিরাম হয়।

বাঘ, চিতাবাঘ, সম্বর, পিগ, নীলগাই, চিতল, প্যান্থার এই উদ্যানে বাস করে।

বনবিভাগ হইতে বন্যপ্রাণী দেখিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অক্টোবর মাস হইতে এপ্রিল মাস ভ্রমণের উপযুক্ত সময়। কোডারমা রেল স্টেশন হইতে জাতীয় উদ্যানে যাওয়া যায় তবে হাজারীবাগ থেকেই পৌঁছাইতে সুবিধা হয়।

B. **সংরক্ষিত বন** (Reserve forest) :

1. **সুন্দরবন সংরক্ষিত বন :** ভারতবর্ষের সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল আয়তনে সর্ববৃহৎ রূপে স্থান পাইয়াছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের মোহানায় এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের ব-দ্বীপ লইয়া গঠিত হইয়াছে।

এখানকার জলবায়ুর তারতম্য লক্ষণীয়। লবণাক্ত স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের সমাবেশ এবং চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি দ্বারা ঘন জঙ্গলে বহু বৈচিত্র্যময় প্রাণীর সমাবেশ।

পৃথিবীর বিখ্যাত **রয়াল বেঙ্গল টাইগার** (Royal Bengal Tiger) এবং বিভিন্ন প্রকার হরিণ, বন্যবরাহ, বানর, বন্যশূকর এবং অনেক প্রজাতির বিষধর সাপ (চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড়, গোখড়ো, কেউটে প্রভৃতি) ও গোসাপ এবং লোনা জলের কুমীর এইখানে বাস করে।

কলিকাতা হইতে কাকদ্বীপ ও নামখানা হইয়া লঞ্চে সুন্দরবন যাওয়া যায়। ক্যানিং ও গোসাবা হইতেই লঞ্চে এইখানে আসা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটক দপ্তর কর্তৃক এই স্থানে পরিভ্রমণের ও থাকিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

সুন্দরবন সংরক্ষিত অঞ্চলের কিছু কিছু অংশ বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষিত করার জন্য রাখা হইয়াছে।

1. ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চল।
2. পক্ষীর জন্য সজনাখালি সংরক্ষিত অঞ্চল।
3. হ্যালিডে দ্বীপ—2·3 বর্গমাইল এলাকায় কিছু ব্যাঘ্র, হরিণ, বন্যবরাহ বাস করে।
4. লোথিয়ান দ্বীপ—15 বর্গমাইল পরিমিত এলাকায় অল্প সংখ্যক

ব্যাঘ্র, চিতল হরিণ ও বুনো শূয়োর বাস করে।

2. **বন্দীপুর সংরক্ষিত বন** : পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্বদিকে মহীশূর শহর হইতে 80 কি.মি. দূরত্বে বন্দীপুর সংরক্ষিত বনের আয়তন 22 বর্গমাইলের কিছু বেশী। 1941 সালে সংরক্ষিত বন হিসাবে স্থান পায়।

শুষ্ক আবহাওয়ায় সেগুন গাছ, চন্দন গাছ ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের উপস্থিতি এবং বসন্তকালে ফুলের সমারোহ এই সংরক্ষিত বনের প্রধান আকর্ষণ।

বাঘ, ভাল্লুক, প্যান্থার, বন্যহাতী, বাইসন, সম্বর হরিণ প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় এই সংরক্ষিত বনে বাস করে। বিভিন্ন প্রকার পাখীরও সমাবেশ দেখা যায়।

পর্যটকদের জন্য সুব্যবস্থা থাকায় বৎসরের যে কোন সময়ই এই স্থানে পরিদর্শন করা যায়।

3. **গীর জঙ্গল** (সংরক্ষিত বন) : ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও গুজরাট রাজ্যের পশ্চিম দিকে এই অরণ্য অবস্থিত। 1967 সালে এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অভয়ারণ্যে রূপ দেওয়া হয়। ইহার আয়তন 500 বর্গমাইল এবং অত্যন্ত শুষ্ক অঞ্চল পর্ণমোচী টিক (Teak) গাছ, সেগুন ও স্থানে স্থানে কাঁটা জাতীয় গুল্ম ঝোঁপের প্রাচুর্য দেখা যায়।

উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণীদের মধ্যে এশিয়ায় সিংহ ভারতের এইখানে পাওয়া যায়। বর্তমানে দুইশত সিংহ এই স্থানে বাস করে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের মধ্যে সম্বর, নীলগাই, হাতি, বন্যবরাহ ও নানা প্রকার পাখী এই অরণ্যে বাস করে। জুনাগড় হইতে ট্রেনযোগে এই অরণ্যে যাওয়া যায়। ডিসেম্বর হইতে জুন মাস এই স্থান পরিদর্শনের উপযুক্ত সময়।

C. **স্যাংচুয়ারী** (Sanctuary) :

1. **জলদাপাড়া** : উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার হাসিমারা শহরের কাছেই তোরসা নদীর তীরে এই অভয়ারণ্য অবস্থিত। প্রায় 105 বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া এই অভয়ারণ্য 1941 সালে ভারতের গণ্ডারের সংরক্ষণের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি ছোট ছোট পার্বত্য নদী এই বনাঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের ন্যায় এই স্থানের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। শাল, সিধা, অর্জুন বৃক্ষের উপস্থিতি দেখা যায়।

ভারতীয় গণ্ডার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আদর্শ স্থান। ইহা ব্যতীত হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, গৌর, সম্বর, হরিণ, বন্যবরাহ, বন্যমুরগী ও নানা ধরনের পাখি বাস করে।

পর্যটকদের এই স্থানে স্বাভাবিক পরিবেশে গণ্ডার দেখার সুযোগ থাকে। শিলিগুড়ি হইতে মিটার গেজ ট্রেনে আসিয়া অথবা জলপাইগুড়ি হইতে বাসে মাদারহাট হইয়া জলদাপাড়ায় যাওয়া যায়। পর্যটকদের থাকিবার সুবন্দোবস্ত আছে।

2. **পেরিয়ার স্যাংচুয়ারী ঃ** কেরালা প্রদেশের কোট্টায়াম ও মাদুরাই যাওয়ার পথে এই বিচরণভূমি 700 স্কোয়ার কি.কি. জমি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পেরিয়ার লেক্‌কে ঘিরিয়া প্রায় 3300 ফুট উঁচুতে এই অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।

হাতির নিভৃত নিবাস এবং সম্বর, বন্য মহিষ, হরিণ, প্যান্থার, বাঘ ও চিতাবাঘের আবাসস্থল। বিভিন্ন জাতের পাখিও এখানে দেখা যায়।

নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন কোট্টায়াম হইতে মাদুরাই যাওয়ার পথে এই অভয়ারণ্যে আসা যায়। ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস পর্যন্ত এই স্থান উপভোগ্য।

ব্যাঘ্র ও গণ্ডার সংরক্ষণ পদ্ধতি (Methods of Conservation of Tiger and Rhinoceros) ঃ

আমাদের দেশের কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঘ ও গণ্ডার গর্বের বস্তু হিসাবে পৃথিবীতে বিশেষ স্থান দখল করিয়া আছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণেই ইহাদের সংখ্যা দ্রুত হারে হ্রাস পাইয়াছে। পূর্বের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় বর্তমানে রয়াল বেঙ্গল টাইগার (সুন্দরবনাঞ্চলে) ও গণ্ডারের (আসাম ও জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে) সংখ্যা যথাক্রমে 2,000 এবং 442টিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গণ্ডারের অনেক লোককাহিনী ও অন্ধবিশ্বাস ঘিরিয়া আছে ইউরোপের মধ্যযুগ হইতে। গণ্ডারের তথাকথিত শিং (নাকের চামড়ার উপরে খুব সরু চুলের মত শক্ত আঁশ সব জড়াজড়ি করিয়া শৃঙ্গ বা শিঙ-এর সৃষ্টি)-এর এমন গুণ যাহা মানুষের সকল প্রকার রোগের প্রতিষেধক এবং পুরুষত্বহীনতার মহৌষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গণ্ডারের মাংস ভক্ষণ করিলে ঊর্ধ্বতন চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়। এদের রক্ত দিয়া তর্পণ করিলে পূর্বপুরুষরা স্বর্গে চিরকালের জন্য মৌরসী পাট্টা ভোগ

করেন। নেপাল ও চীনের অধিবাসীরা এরকমই ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ইহাদের প্রস্রাব বিভিন্ন ক্ষতের পচন নিবারণ এবং নানাবিধ ব্যাধি ও ভূতপ্রেতের প্রতিরোধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। হাঁপানির সক্রিয় প্রতিষেধক হিসাবে গণ্ডারের প্রস্রাব আমাদের দেশের অনেক জায়গাতেই খুব চাহিদা দেখা যায়। এই সকল কারণেই গণ্ডারের সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পাইয়াছে।



চিত্র 36 : ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পের অঞ্চল

মূল্যবান এই সকল প্রাণীগুলিকে লোভী ব্যবসায়ী ও চোরা শিকারীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য 1952 এবং 1973 সালে "বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পর্ষদ" বাঘ ও গণ্ডার সংরক্ষণে ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করিয়া নিধন বন্ধ করেন।

ব্যাঘ্র সংরক্ষণ (Tiger project) ঃ

ভারতবর্ষ পৃথিবীর কোথাও কোথাও বাঘের দেশ বলিয়া উপস্থিত করা হয় যদিও এই হিংস্র মাংসাশী স্তন্যপায়ীর আদি বাসভূমি সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে হিমালয় পর্বতমালার পূর্বপ্রান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে থাকে। ভারতবর্ষে 1973 সালে বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিলের (World wild life fund) সহায়তায় 'ব্র্যাঘ্র প্রকল্প' চালু হইয়াছে। ব্র্যাঘ্রের সংরক্ষণ, রক্ষা এবং বংশবৃদ্ধি করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় বেশ কয়েকটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে (চিত্র 36)। ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি কনজারভেশান অব্ নেচার অ্যাণ্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources or IUCN)-এর সহায়তায়ও এই প্রকল্পের ফলে আশানুরূপ ফল লাভ সম্ভব হইয়াছে। 1976 সালে ব্যাঘ্র সুমারীর (Tiger census) রিপোর্ট অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত অঞ্চলগুলিতে বাঘের সংখ্যা নিম্নরূপ।

ব্যাঘ্র প্রকল্পভুক্ত অঞ্চল	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	ব্যাঘ্রের সংখ্যা
আসামের মানস অভয়ারণ্য	2837	41
বিহারের পালোমৌ অভয়ারণ্য	900	30
পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন সংরক্ষিত বন	2585	200
উত্তরপ্রদেশের করবেট জাতীয় উদ্যান	525	55
রাজস্থানের রণথম্বোর ব্যাঘ্র সংরক্ষিত বন	298	20
মহারাষ্ট্রের মেলঘাট ব্যাঘ্র সংরক্ষিত বন	1572	32
মধ্যপ্রদেশের কান্হা জাতীয় উদ্যান	1100	48
উড়িষ্যার সিম্লিপাল অভয়ারণ্য	2750	75
কর্ণাটকের বন্দিপুর সংরক্ষিত বন	689	19

উপোরোক্ত নয়টি অঞ্চলে ব্যাঘ্র সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আবাসভূমি রক্ষা

করা, ইহাদের শিকারের জন্য হরিণ, শূয়োর ও অন্যান্য প্রাণীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, সশস্ত্র রক্ষী নিয়োগ এবং চোরা শিকারীদের কঠোর শাস্তিদান ইত্যাদি সংরক্ষণের উপায়গুলি এই প্রকল্পভুক্ত। বন্যপ্রাণী সংস্থা এবং IUCN-এর উদ্যোগে ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্য বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনের ব্যাপক প্রচেষ্টাও চলিতেছে।

গণ্ডার প্রকল্প (Rhinoceros project) ঃ

সশফ্ গোষ্ঠীর (Ungulates) অযুগ্মক্ষুর বর্গের (Perissodactyla) অন্তর্গত গণ্ডার স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। কেবল সংরক্ষণের জন্য আফ্রিকার দুইটি জাত এবং ভারতের একটি আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে **বড় ভারতীয় এক শিং-ওয়ালা গণ্ডার** (*Rhinoceros unicornis*), **সুমাত্রার দুই শিং-ওয়ালা গণ্ডার** (*Dicerorhinus sumatraensis*) এবং **জাভার ছোট এক শিং-ওয়ালা গণ্ডার** (*Rhinoceros sondaicus*) প্রায় অবলুপ্তি সীমায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে।

1904 সালে ভারতীয় গণ্ডারের হ্রাসপ্রাপ্ত মারাত্মক হওয়ায় গণ্ডার সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংস্থা এই ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়। 1932 সালে বঙ্গীয় গণ্ডার সংরক্ষণ আইন এবং 1934 সালে আসাম গণ্ডার সংরক্ষণ আইন প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ইহাদের সংখ্যা কিছুটা বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজ নিজ প্রকল্পের মাধ্যমে কয়েকটি সংরক্ষিত অঞ্চলগুলিতে গণ্ডার সংরক্ষণের ভার লইয়াছেন। সংরক্ষিত অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গের গরুমারা ও জলদাপাড়ায় এবং আসামের কাজিরাঙা, সোনাইরূপা, ওরাং প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। কাজিরাঙা অভয়ারণ্যে প্রায় 700-র বেশী গণ্ডার জীবিত আছে।

গণ্ডার প্রকল্পে নিম্নলিখিত শর্তগুলি অন্তর্ভুক্ত—

1. আইনগুলির যথাযথ প্রয়োগ।
2. অনুমতিপ্রাপ্ত দর্শনার্থী ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ, আইন লঙ্ঘনকারীদের কঠোর শাস্তিদান ইত্যাদি।
3. সশস্ত্র রক্ষী নিয়োগ
4. গণ্ডার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত প্রচার ও জনমত গঠন।
5. গণ্ডারের শিং-এর ভেষজগুণ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করা।
6. সরকারী সংস্থার মাধ্যমে ভেষজগুণ সম্পন্ন গণ্ডারের মূত্র সংগ্রহ।

7. অধিক সংখ্যায় অভয়ারণ্য তৈয়ারি।

মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ব্যাঘ্র ও গণ্ডার প্রকল্প ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকায় "কুমীর প্রকল্প" (Crocodile project) লওয়া হইয়াছে এবং কুমীর খামার (Crocodile farm) স্থাপন করা ইইয়াছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কুমীরের চামড়া বিক্রয় করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হইতেছে। অতএব আমাদের দেশের এই অতুলনীয় সম্পদ সমৃদ্ধিতে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পর্যটন ব্যবসা এবং বিক্রয় ও বিনিময় দ্বারা দেশে অর্থনীতির উন্নয়ন ব্যতীত, প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং জীবের অস্তিত্বের জন্য সুষ্ঠু প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখিবার জন্য বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী

মাতৃভাষায় প্রকাশিত ফলিত শাখার উপর বিভিন্ন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ব্যতীত বিশেষভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকাগুলি লিপিবদ্ধ করা হইল।

Ali, S. 1968. The book of Indian Birds. Bombay Natural Hist. Soc., Bombay.

Atwal, A. S. 1979. Agricultural Pests of India and South East Asia, Kalyani Press, New Delhi.

Atwal, A. S. & O. P. Sharma. 1970. Brood rearing activity of the Italian honey bee *Apis mellifera* L. in the Punjab Plains at Ludhiana. Indian Bee Jour., 32 (3-4) : 62-67.

Barnett, S. A. 1953. Experiments on the food preferences of wild rats (*Rattus norvegicus* Berkenhout). J. Hyg. Comb. 51 : 16-34.

Barnett, S. A. 1967. Rats Scientific Americana 6.

Banerjee, G. C. 1982. Animal Husbandry.

Bose, S. 1969. Review of Poultry breeding work in India and abroad. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 158-164.

Cahn, A. R. 1949. Pearl Culture in Japan.

Chandy, M. 1970. Fishes, National Book Trust, India, New Delhi.

Chondar, S. L. 1980. Hypophysation of Indian Major Carps, Agra, Satish Book Enterprise.

Chowdhury, S. N. 1967. The Silkworm and its culture. Mysore Printing and Publishing House, Mysore.

Clive, T. C. 1967. Commonwealth Poultry.

Felt, E. P. 1940. Plant galls and gall makers. Comstock Publishing Co., Inc. Ithaca, N. Y.

Frost, S. W. 1942. General Entomology. Mc. Graw-Hill Book Co., Inc. N. York and London.

Gee, E. P. 1964. Wild life of India, Collins Publishers, London.

Gepulpure, R. S., B. P. Mehra and S. Krishnaswami. 1963. Damage to laccrops by Monkeys. Indian Forester 89 (4) : 291-292.

Glover, P. M. 1937. Lac cultivation in India. Indian Lac Res. Inst. 123-124.

Jhingran, V. G. 1983. Fish and fisheries of India, New Delhi, Hindustan Publishing Corpn. (India)

Jotwani, M. G. and Y. P. Beri. 1968. Economic losses due to rats, Proc. Intern. Symp. Bion and Control of Rodents Kanpur, 9-16.

Kalra, A. N. 1965. Major pests of sugarcane in North India, Ind. Sug., 15 (5).

Khalifman, I. 1951. Bees. Foreign Languages Publishing House, Moscow.

Krishnaswami, S., N. S. Chauhan & P. S. Negi. 1957. Studies on non insect enemies of lac with special reference to squirrel and birds as serious seasonal Predators. Jour. Bom. Nat. Hist. Soc., 54 (4) : 887-907.

Krishnaswani, S., B. K. Purakayastha & M. K. Choudhury. 1959. Rat menace to lac Crop. Indian. J. Ent., 21 (3) : 222-225.

Kumar, S. 1971. Review of the work done on sub-terranean pests of sugarcane in India, Indian Sugar, 81 (9) : 605-608.

Land, P. 1982. Keeping your own poultry.

Meyer, O. 1982. The beekeeper's handbook.

Misra, A. B. 1961. Discourse on Economic Zoology. Book I. The Zoological Society of India.

Misra, C. S. 1928. The Cultivation of lac in the Plains of India.

Morley, A. J. 1979. Poultry Husbandry.

Naidu, P. M. N. 1967. Poultry Keeping in India, Indian Counc. Agric. Res. New Delhi.

Negi, P. S. 1929. A contribution to the life history of the lac insect. Bull. Ent. Res. Vol. XXQ, 541.

Negi, P. S. 1954. Dimorphism in lac insects. Indian Forester 80 (8).

Pfadt, E. R. 1971. Fundamentals of Applied Entomology (Edited). Macmillan Publishing Co., N. Y. and Collier Macmillan Publishers, London.

Pradhan, S. Insect pests of crops. National Book Trust, India, New Delhi.

Pradhan, S., M. G. Jotwani and P. Sarup. 1960. Control schedule for mustard crop particularly against mustard aphid. Indian oilseed J., 4 (3) : 125-418.

Prater, S. H. 1971. The book on Indian animals, Bombay Natural Hist. Soc., Bombay.

Pruthi, H. S. 1969. Text book of Agricultural Entomology.

Saharia, V. B. 1982. Wild life of India.

Santanam, R., Sukumaran, N. and Natarajan, P. 1987. A Manual of Fresh-water Aquaculture, Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd.

Sarkar, D. C. 1980. Sericulture and Silk Industry in India. Indian Museum Bulletin.

Srivastava, A. S. 1964. Non-insect pests. In Entomology in India : 433. Entomological Soc. of India, New Delhi.

Srivastava, P. D. 1977. *Economic Zoology* The role of Animal Life in Human Welfare, Agriculture and Industry, Commercial Publications Bureau, New Delhi.

বর্ণানুক্রমিক সূচী

পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী আছে, যারা মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভুত উপকার করে। সেইসঙ্গে অপকারী প্রাণীও মানুষের ক্ষতি করে, অবশ্য প্রধানতঃ পরোক্ষভাবে। এইসব উপকারী ও অপকারী প্রাণীদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাহার বাস্তব প্রয়োগ এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। রেশমচাষ, মৌমাছি পালন, লাক্ষাচাষ, মুরগী পালন, মৎস্যচাষ, মুক্তাচাষ এবং বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক কীটশত্রু বন্যপ্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান বাস্তব জীবনে কাজে লাগে ও বিজ্ঞান শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন হয়।

বিভিন্ন প্রাণীজ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই আজ উপরোক্ত চাষগুলি বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়েছে। নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণে এই সকল শিল্প হতে প্রভুত অর্থোপার্জন সম্ভব। এই সকল শিল্পে নিযুক্ত থেকে কোটি কোটি মানুষ তাদের জীবিকাও নির্বাহ করে। আমাদের দেশেও এই সকল শিল্পে অসংখ্য মানুষ নিযুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটান। সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের এই ফলিত শাখার ভূমিকা অপরিসীম।

ত্রিশ টাকা